Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর
একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
এপ্রিল ২০২১

গবেষক

মোঃ সাহেব আলী
নিবন্ধন নং : ২৮
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬–২০১৭
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. নেহাল করিম
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচ. ডি.) ডিগ্রি লাভের নিমিত্ত অধ্যাপক ড. নেহাল করিম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত 'বাংলাদেশে রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সমাজবিজ্ঞান বিভাগে উপস্থাপন করছি। এটি আমার মৌলিক গবেষণাকর্ম। ইতিপূর্বে এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশ করা হয়নি। কিংবা এটি অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

পিএইচ.ডি. গবেষক–

মোঃ সাহেব আলী

নিবন্ধন নং : ২৮

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬–১৭

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদনপত্র

'বাংলাদেশে রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত সমাজবিজ্ঞান বিভাগে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করা হলো। অভিসন্দর্ভটি গবেষক মোঃ সাহেব আলী আমার তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করেছে। এটি তার মৌলিক গবেষণাকর্ম। অভিসন্দর্ভটি তথ্যসমৃদ্ধ ও সরেজমিন মাঠগবেষণার ভিত্তিতে প্রণীত। এটি বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্তমান বাস্তবতা ও পরিবর্তন অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি গবেষকের সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করি।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. নেহাল করিম

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার আব্বা-মা
মোঃ মন্তাজ গাজী ও আছিয়া খাতুন

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পিএইচ. ডি. গবেষণার প্রতি আমার বরাবরই ভীষণ আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহের বাস্তব রূপায়ন সম্ভব হয়েছে অনেকের সাহায্য-সহযোগিতা ও সহানুভূতির দ্বারা। তা ব্যতীত পিএইচ. ডি. গবেষণার মতো সৃষ্টিশীল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্মরণ করতে চাই, আমার এই গবেষণা কাজে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. নেহাল করিম। তাঁর প্রশ্রয় এবং সাগ্রহ ও আন্তরিক নির্দেশনার কারণে নানান প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। নৃগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা করতে তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন। এজন্য তাঁর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। এ-ব্যাপারে পরামর্শ প্রদানপূর্বক নানাভাবে প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে সহযোগিতা করেছেন আমার শিক্ষক সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল আহসান চৌধূরী। তাঁর কাছেও আমি ঋণী।

গবেষণা প্রস্তাবনা পুনর্লিখনের জন্য অধ্যাপক মিসেস সালমা আক্তার, অধ্যাপক ড. শাহ এহসান হাবীব কৃতজ্ঞতাবদ্ধ করেছেন। সেমিনার পেপার উপস্থাপনকালে নানান বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে এবং পরামর্শ দিয়ে গবেষণার মানোন্নয়নে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক ড. মনিরুল ইসলাম খান, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানউল্লাহ, অধ্যাপক ড. ফাতেমা রেজিনা, অধ্যাপক ড. শাহ এহসান হাবীব, অধ্যাপক ড. সালমা বেগম, অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফা, সহকারী অধ্যাপক ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ডু– সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও অধ্যাপক ড. মো. মশিউর রহমান ও অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে নানান পরামর্শ দিয়ে গবেষণা কাজকে সহজ করে দিয়েছেন। তাঁদের সহযোগিতায় এই গবেষণাকর্মে প্রভূত ভূমিকা রেখেছে। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দাপ্তরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সিনিয়র এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ, এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার জনাব মো. কামরুল আলম, কারিগরি কর্মকর্তা সুব্রত মন্ডল, অফিস সহকারী জনাব আলী ভাই প্রমুখ সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির অনুমতি প্রদান করেন। এজন্য একাডেমী কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষকরে প্রাক্তন পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুনের কাছে ঋণী।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গবেষণা সহায়তা হিসেবে তথ্য সংগ্রহ, থিসিস কম্পোজ ও বাঁধাইয়ের জন্য ছোট্ট অনুদান প্রদান করেন। এজন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে ধন্যবাদ।

ক্ষেত্র গবেষণাকালে হাড়িপাড়ার নি[illegible]রের বাড়িতে থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিচালনা করি। তাঁর স্ত্রী মাখেনো আমাকে [illegible]আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন। এছাড়া তার মামা মহেন চিং মাতবর ও মামী মেখেন-এর পারিবারিক সাহচর্য লাভ করি। দীর্ঘদিন একত্রে আহারাদি গ্রহণ করি। তাদের আতিথেয়তা ভোলার নয়। এই দুটি পরিবার আমার স্মৃতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, থকবেও। নিপু মাতবর ও মহেন চিং তথ্য সংগ্রহে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছেন। তাঁদের জন্য আমি গ্রামবাসীর কাছে অপরিচিত আগন্তুক থেকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পরিচিত ও আপন হয়ে উঠি। এছাড়া মধুপাড়ার এমং মাতবর ও তুলাতুলিপাড়ার চামন কবিরাজ বিভিন্ন সময় তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে এমং মাতবর দীর্ঘদিন ধরে আমার প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো ধৈর্যের সাথে সহ্য করে আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে দিয়েছেন, রাখাইন সমাজ-সংস্কৃতি অনুধাবনে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের প্রতি আমি যার পর নেই কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বালা একাডেমী গ্রন্থাগার, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার কক্ষের সম্মানীয় কর্মীগণ আমাকে প্রভূত সহযোগিতা দিয়েছেন। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক গবেষণার স্বার্থে পটুয়াখালী জেলার মহিলা কলেজ সন্নিকটস্থ ও মল্লিকা রেস্তরাঁর সম্মুখস্থ শহিদ স্মৃতি পাঠাগার (১৯৫৪ সালে স্থাপিত) এবং সরকারি কলেজের পার্শ্বস্থ বনানীর সামনের পটুয়াখালী পাবলিক লাইব্রেরিতে (১৯৬০ সালে স্থাপিত) অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু রাখাইনদের বিষয়ে ন্যূনতম প্রকাশনাও ভাগ্যে মেলেনি।

পিএইচ. ডি. গবেষণায় নিযুক্ত হতে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন আমার বড় ভাই মোঃ পিয়ার আলী। সর্বদা তাগাদা ও প্রেরণা দিয়ে মানসিক শক্তি জুগিয়েছেন তিনি। আমার গবেষণার পরিসমাপ্তি দেখে তিনিই সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন। মেজ ভাই মোঃ রাজু আহমদ সবসময় সহমর্মিতা জানিয়েছে। এই কাজে সর্বাত্মক সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে সুহৃদ আবু ইসহাক হোসেন, ড. কুতুব আজাদ, ড. মোজাম্মেল হক, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ কামাল উদ্দীন আহমেদ, ড. শামীমা সুলতানা, নার্গিস সানজিদা সুলতানা রিয়া, ইশরাত জাহান পপি, এসএম জাহাঙ্গীর কবীর, মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার, মুহম্মদ খোরশেদ আলম– গন্তব্যে পৌঁছুতে তাদের সহায়তা ও সহানুভূতি অপরিমেয়। এরা অকৃপণভাবে মেধা, শ্রম, সময় ব্যয় করেছেন। গবেষণাধীন গ্রামের পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন লালুয়ার মামুন, জহির, নাহিদ ও মোশাররফ হোসেন থেকে সহযোগিতা পেয়েছি। সহধর্মিণী সাজেদা খাতুন অনেক সহানুভূতি দেখিয়েছে। পুত্র সাহিল মন্তাজ সুজাল থেকে অনেক সময় নিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রজ, অনুজ, বন্ধু, সহকর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী অনেকেই উৎসাহ জুগিয়েছেন যাদের নাম উল্লেখ করা যায়। তাদের অন্তর্দৃষ্টি ও অনুপ্রেরণার জন্য আমি ঋণী।

এপ্রিল ২০২১ মোঃ সাহেব আলী

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালি। বাঙালি ব্যতীত এই ভূখণ্ডে আরো অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে। এই ভূখণ্ডটি পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশ আটানব্বই বর্গমাইল আয়তন নিয়ে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয় সশস্ত্র বিপ্লবে বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে। এর আগে ১৯৪৭ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি প্রদেশ ছিল। মূলত ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের ফলে বাংলাদেশে বসবাসকারী অনেক নৃগোষ্ঠী ভারতে বসবাসকারী তাদের প্রধান অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সুপ্রাচীন 'বঙ্গীয় ব-দ্বীপ'-এর অংশবিশেষ বর্তমানের বাংলাদেশ। প্রত্ন-প্রস্তর যুগ থেকে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশেও মানুষের বসবাসের শুর। তারও আগে অর্থাৎ হিমযুগের পর থেকে (আরম্ভ প্রায় ৪০ লক্ষ বছর আগে, শেষ প্রায় ১০ হাজার বছর পূর্বে) মানুষের বসবাসের খবর পাওয়া গেলেও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশে বর্তমানে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে রাখাইন বা মারমারা তৃতীয় বৃহত্তম। বাঙালিদের কাছে এক সময় এরা মগ নামে অভিহিত ছিল। এদের মধ্যে যারা সমুদ্র উপকূলস্থ সমতল ভূমি কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরিশাল ও বরগুনা জেলায় বসবাস করে তারা নিজেদের রাখাইন, এবং যারা পার্বত্য এলাকা বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাস করে তারা নিজেদের মারমা নামে পরিচয় দেয়।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার বালিয়াতলী ইউনিয়নের অন্তর্গত তিনটি গ্রাম হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ার রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক নিবিড় পর্যবেক্ষণপূর্বক ২রা মার্চ থেকে ৩রা জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩ মাস ৪ দিন হাড়িপাড়ার নিপু মাতবরের বাড়িতে থেকে মাঠ গবেষণার কাজ সম্পন্ন করি। গবেষণায় প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উভয় প্রকার উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়েছে। তিনটি গ্রামের রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন দেশের নৃগোষ্ঠীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে কিছু দিক-নির্দেশনা দিতে পারে।

অভিসন্দর্ভটি মোট আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'গবেষণা পরিচিতি'। এই অধ্যায়ে ভূমিকা, বাংলাদেশের ইতিহাস ও জনগোষ্ঠীর সাধারণ বর্ণনা, রাখাইন নৃগোষ্ঠীর পরিচয়, প্রত্যয়, সংজ্ঞা, নৃগোষ্ঠীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, উপজাতি বনাম আদিবাসী বিতর্ক, পূর্বানুমান, গবেষণা এলাকা, গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নসমূহ, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার পর্যায়সূহ, গবেষণা নৈতিকতা, তাত্ত্বিক কাঠামো, প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা, অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণার গুরুত্ব, উপসংহার ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় 'গবেষণা পদ্ধতি'। এই অধ্যায়ে গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ যেমন সামাজিক জরিপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, ঐতিহাসিক পদ্ধতির বর্ণনা এবং এসব পদ্ধতি গ্রহণের যৌক্তিকতা; দলগত আলোচনা, কেস স্টাডি, তথ্যের উৎস, গবেষণা সময়কাল, গবেষণা কৌশল, তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ প্রভৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় 'রাখাইন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন : তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণ'। এই অধ্যায়ে সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজতত্ত্ব, সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বসমূহ, রাখাইন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, আধুনিকায়ন বা উন্নয়ন তত্ত্ব, নির্ভরশীলতা তত্ত্ব, নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ও রাখাইন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে সরকারি বেসরকারি নানান সম্পৃক্ততা রাখাইনদের আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে চরম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে; উত্তরোত্তর নির্ভরশীলতাকে বেগবান ও দৃঢ়ভিত্তি প্রদান করছে। নির্ভরশীলতার এই বন্ধন তাদের ক্রমানুন্নয়নের অস্ত্র হিসেবে কাজ করছে। তাই নির্ভরশীলতাই তাদের অনুন্নয়নের প্রধান কারণ।

চতুর্থ অধ্যায় 'রাখাইনদের ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট'। এখানে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথ ধরে বিভিন্ন কারণে বার্মা ও আরাকান থেকে রাখাইনদের এই ভূখণ্ডে এসে বসতি গড়ে তোলার ঐতিহাসিক পটভূমি; এবং নৃগোষ্ঠী বিচারে রাখাইনদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায় 'গবেষণা এলাকার প্রতিবেশ ও সামাজিক পটভূমি'। এই অধ্যায়ে গবেষণা এলাকার অবস্থান, গ্রামবিন্যাস, গবেষণা এলাকার ঐতিহাসিক পটভূমি, জলবায়ু, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা, ঋতু পরিক্রমা ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় হলো 'গবেষণা এলাকার সামাজিক সংগঠন'। এখানে তিনটি গ্রামের রাখাইনদের গোত্র, গোষ্ঠী, পরিবার, বিয়ে, জ্ঞাতিসম্পর্ক ও সমাজ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করাসহ ভিন্ন সংস্কৃতি বা বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় 'রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন বিশ্লেষণ'। এই অধ্যায়ে গবেষণা এলাকার আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন চলক যেমন গৃহস্থালী, জনসংখ্যা, লিঙ্গ ও বয়সভেদে জনগোষ্ঠীর বিন্যাস, ভাষা দক্ষতা, শিক্ষাগত অবস্থা, বৈবাহিক অবস্থা, পরিবারের ধরন, পরিবারের আকার, গৃহের ধরন, জমির প্রকরণ, গ্রামের ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা, জমি মালিকানা, জমি মালিকানার ভিত্তিতে কৃষক শ্রেণি, ভূমিহীনতা, খাসজমি প্রাপ্তি, জমি নিয়ে বিরোধ, জমি বন্ধক, জমি বর্গা, মজুরি ব্যবস্থা, কৃষি যান্ত্রিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উপকরণের ব্যবহারের প্রভাব, রাখাইনদের পেশা, রাখাইনদের উপার্জন, রাখাইনদের পারিবারিক মাসিক ব্যয়, সঞ্চয়, ব্যাংক

Dhaka University Institutional Repository

অ্যাকাউন্ট, পানির উৎস, উত্তরদাতাদের স্বাস্থ্য অবস্থা, চিকিৎসা গ্রহণ, গর্ভধারণকালে নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, গর্ভবতী নারীদের বিশেষ খাবার প্রদান, শিশুদের শারীরিক সমস্যা ও চিকিৎসা গ্রহণ, শৌচাগার ব্যবস্থা, এনজিও সম্পৃক্ততা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, চিত্তবিনোদন, তাঁত মালিকানা, গবাদি পশুর মালিকানা, কৃষি যন্ত্রপাতির মালিকানা, আসবাবপত্রের মালিকানা, ইলেকট্রনিক সামগ্রীর মালিকানা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে (সিডর) ক্ষয়ক্ষতি, উত্তরদাতাদের বঞ্চনা অনুভব, প্রতিবেশি বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি, নারীদের চলাফেরা ও কাজকর্মে সমস্যা, নারীদের কর্ম সংযুক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে সন্তুষ্টি, অভিবাসনের সম্ভাবনা, লোক-সংস্কৃতির বিলুপ্তি, রাজনৈতিক সংগঠনে পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব, নিরাপত্তার অবাধবোধ প্রভৃতি বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণপূর্বক রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের সর্বশেষ ও অষ্টম অধ্যায় হলো ‘সার-সংক্ষেপ ও উপসংহার’। এই অধ্যায়ে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনসহ উপসংহার টানা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে যে, রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্তনের পথ ধরে এগুচ্ছে। যেভাবেই পরিবর্তন আসুক, তা রাখাইনদের জীবনব্যবস্থায় অনিবার্যভাবে প্রভাব ফেলছে। এই প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামগুলোর রাখাইনদের জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে সরকারি-বেসরকারি সহায়তানির্ভর হয়ে উঠছে এবং এক ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। যে পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এ-দেশে টিকে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়ছে।

অধ্যায়গুলো পরিসমাপ্তির পর ‘গ্রন্থপঞ্জি’ উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে লেখকের নামের বর্ণানুক্রম অনুসারে প্রথমে ইংরেজি বই, অতঃপর ইংরেজি প্রবন্ধ, তারপর বাংলা বই, অতঃপর বাংলা প্রবন্ধ উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে আরো কয়েকটি সরকারি দলিলের উল্লেখ আছে।

এছাড়া, গ্রন্থপঞ্জির পর পরিশিষ্টাংশে বিভিন্ন প্রশ্নমালা, বিশেষ সাক্ষাৎকারদাতাদের তালিকা ও মাঠ গবেষণার কয়েকটি স্থিরচিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে।

আমার দীর্ঘদিনের শ্রমসাধ্য এই গবেষণাকর্ম বাংলাদেশে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীদের নিয়ে ভবিষ্যৎ গবেষকদের উত্তরোত্তর আরো গভীর গবেষণায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে বলে বিশ্বাস। অধিকন্তু, ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ছাড়াও এ-গবেষণা সরকারি-বেসরকারি পরিকল্পনাবিদদের নানান পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের জন্য কাজে আসবে।

এপ্রিল ২০২১ **মোঃ সাহেব আলী**

Dhaka University Institutional Repository

সারণির তালিকা

সারণি ১.১	: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নৃগোষ্ঠী ও জনসংখ্যা	....	৫
সারণি ১.২	: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিন্যাস	....	৭
সারণি ১.৩	: বাংলাদেশের রাখাইন নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিন্যাস ও জনসংখ্যা	....	১০
সারণি ৪.১	: ১৮২৮-১৯৯১ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়জনিত মৃত্যুর পরিসংখ্যান	....	১০৯
সারণি ৬.১	: তিনটি গ্রামের গোত্রসমূহের বিন্যাস	....	১১৭
সারণি ৬.২	: তিনটি গ্রামের রাখাইনদের গোষ্ঠীর বিন্যাস	....	১২২
সারণি ৬.৩	: বিয়েতে বর ও কনে পক্ষের খরচের নমুনা	....	১২৯
সারণি ৬.৪	: তিনটি গ্রামে বরের বিবাহ-উত্তর বাসস্থান	....	১৩০
সারণি ৬.৫	: জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত্তিতে রাখাইন জ্ঞাতিবাচক শব্দ	....	১৩৫
সারণি ৭.১	: তিনটি গ্রামের রাখাইন ও বাঙালি গৃহস্থালী পরিসংখ্যান	....	১৮৬
সারণি ৭.২	: তিনটি গ্রামের রাখাইন ও বাঙালি জনসংখ্যার পরিসংখ্যান	....	১৮৮
সারণি ৭.৩	: ১৯৭৯ ও ২০১৮ সালে রাখাইন গৃহস্থালী ও জনসংখ্যার তুলনামূলক চিত্র	....	১৮৯
সারণি ৭.৪	: রাখাইন উত্তরদাতাদের বয়ঃবিন্যাস	....	১০০
সারণি ৭.৫	: বয়স ও লিঙ্গভেদে রাখাইন জনসংখ্যার বণ্টন	....	১৯২
সারণি ৭.৬	: গ্রামভিত্তিক রাখাইন গৃহস্থালী প্রধানদের ভাষা-দক্ষতা	....	১৯৪
সারণি ৭.৭	: স্থানীয় টোল ব্যবস্থা চালু না থাকার বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমত	....	১৯৫
সারণি ৭.৮	: উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত অবস্থা	....	১৯৯
সারণি ৭.৯	: রাখাইন গৃহস্থালী সদস্যদের শিক্ষাগত অবস্থা	....	২০০
সারণি ৭.১০	: বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতিতে উত্তরদাতাদের সন্তুষ্টি	....	২০২
সারণি ৭.১১	: বিদ্যমান শিক্ষার সমস্যা দূরিকরণে উত্তরদাতাদের অভিমত	....	২০৩
সারণি ৭.১২	: উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা	....	২০৫
সারণি ৭.১৩	: রাখাইন গৃহস্থালী সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা	....	২০৬
সারণি ৭.১৪	: রাখাইনদের লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক বৈবাহিক অবস্থা	....	২০৬
সারণি ৭.১৫	: তিনটি গ্রামের রাখাইনদের পরিবারের ধরন	....	২০৮
সারণি ৭.১৬	: তিনটি গ্রামের রাখাইনদের পরিবারের আকার	....	২১২
সারণি ৭.১৭	: রাখাইনদের গৃহের ধরন	....	২১৪
সারণি ৭.১৮	: একনজরে রাখাইনদের গৃহের ধরনে পরিবর্তন	....	২১৫
সারণি ৭.১৯	: রাখাইনদের গৃহে কক্ষের সংখ্যা	....	২১৬
সারণি ৭.২০	: তিনটি গ্রামের ২০১৮ সালের ভূ-বিতরণ ব্যবস্থা	....	২২৬
সারণি ৭.২১	: ২০১৭ সালে তিনটি গ্রামের গড় উৎপাদন ব্যবস্থা	....	২৩০
সারণি ৭.২২	: ১৯৫০-২০১০ সাল পর্যন্ত তিনটি গ্রামের জমির মূল্য	....	২৩১

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৭.২৩	: রাখাইন ও বাঙালিদের মালিকানাধীন জমির বণ্টন	....	২৩৩
সারণি ৭.২৪	: জমি মালিকানার ভিত্তিতে রাখাইন কৃষকদের শ্রেণিবিন্যাস	....	২৩৮
সারণি ৭.২৫	: জমি মালিকানার ভিত্তিতে রাখাইন ও বাঙালি কৃষকদের শ্রেণিবিন্যাস	....	২৩৯
সারণি ৭.২৬	: একনজরে রাখাইনদের জমি মালিকানা পরিবর্তন	....	২৪০
সারণি ৭.২৭	: উত্তরদাতাদের ভূমিহীনতা কাল	....	২৪১
সারণি ৭.২৮	: খাসজমি না পাওয়ার বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমত	....	২৪২
সারণি ৭.২৯	: জমি নিয়ে উত্তরদাতাদের চলমান মামলা	....	২৪৩
সারণি ৭.৩০	: জমি নিয়ে মামলাকারী	....	২৪৩
সারণি ৭.৩১	: উত্তরদাতাদের জমি বন্ধক গ্রহণ ও প্রদান	....	২৪৫
সারণি ৭.৩২	: উত্তরদাতাদের বন্ধক গ্রহণ ও প্রদানকৃত জমির পরিসংখ্যান	....	২৪৬
সারণি ৭.৩৩	: একনজরে বন্ধকি ব্যবস্থার পরিবর্তন	....	২৪৮
সারণি ৭.৩৪	: ১৯৮০-২০১০ সাল পর্যন্ত গ্রামের বন্ধকি জমির মূল্য	....	২৪৯
সারণি ৭.৩৫	: উত্তরদাতাদের জমি বর্গা গ্রহণ ও প্রদান	....	২৫১
সারণি ৭.৩৬	: রাখাইনদের পত্তন বা বর্গা জমি বণ্টন ২০১৮	....	২৫২
সারণি ৭.৩৭	: বর্গাজমি হাতছাড়া হওয়ার বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমত	....	২৫৪
সারণি ৭.৩৮	: একনজরে রাখাইনদের জমি পত্তনির পরিবর্তন	....	২৫৫
সারণি ৭.৩৯	: ১৯৮০-২০১০ সাল পর্যন্ত গ্রামের বৈটিয়াল শ্রমের মূল্য	....	২৫৭
সারণি ৭.৪০	: ১৯৭০-২০১০ সাল পর্যন্ত দৈনিক ভিত্তিক উন্মুক্ত মজুর শ্রমের মূল্য	....	২৫৯
সারণি ৭.৪১	: এক নজরে কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন	....	২৬৪
সারণি ৭.৪২	: রাখাইন গৃহস্থালী প্রধানদের পেশা	....	২৬৪
সারণি ৭.৪৩	: রাখাইন গৃহস্থালী সদস্যদের পেশা	....	২৬৬
সারণি ৭.৪৪	: একনজরে রাখাইনদের পেশা পরিবর্তন	....	২৬৯
সারণি ৭.৪৫	: রাখাইনদের উপার্জন	....	২৭২
সারণি ৭.৪৬	: উত্তরদাতাদের মাসিক পারিবারিক আয়	....	২৭৩
সারণি ৭.৪৭	: উত্তরদাতাদের মাসিক পারিবারিক ব্যয়	....	২৭৪
সারণি ৭.৪৮	: উত্তরদাতাদের সঞ্চয়	....	২৭৬
সারণি ৭.৪৯	: উত্তরদাতাদের পারিবারিক মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ	....	২৭৭
সারণি ৭.৫০	: উত্তরদাতাদের তফসিলি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট	....	২৭৮
সারণি ৭.৫১	: রাখাইনদের পানির উৎস	....	২৭৯
সারণি ৭.৫২	: উত্তরদাতাদের শারিরীক সমস্যা	....	২৮০
সারণি ৭.৫৩	: রোগের চিকিৎসা গ্রহণ	....	২৮১
সারণি ৭.৫৪	: রোগের চিকিৎসাকরণ	....	২৮২
সারণি ৭.৫৫	: একনজরে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে পরিবর্তন	....	২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৭.৫৬ : গর্ভধারণকালে নারীদের ডাক্তারি পরামর্শ প্রদান ২৮৩

সারণি ৭.৫৭ : গর্ভধারণকালে মায়েদের চিকিৎসাকরণ ২৮৪

সারণি ৭.৫৮ : গর্ভধারণকালে মায়েদের বিশেষ ধরনের খাবার প্রদান ২৮৫

সারণি ৭.৫৯ : শিশুদের শারিরীক সমস্যা ২৮৬

সারণি ৭.৬০ : শিশুদের শারিরীক সমস্যায় চিকিৎসা প্রদান ২৮৭

সারণি ৭.৬১ : রোগাক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা মাধ্যম ২৮৭

সারণি ৭.৬২ : উত্তরদাতাদের শৌচাগার ব্যবহার ২৮৯

সারণি ৭.৬৩ : একনজরে উত্তরদাতাদের শৌচারগার ব্যবস্থার রূপান্তর ২৮৯

সারণি ৭.৬৪ : উত্তরদাতাদের এনজিও সম্পৃক্ততা ২৯০

সারণি ৭.৬৫ : এনজিও সম্পৃক্ততার কারণ ২৯১

সারণি ৭.৬৬ : উত্তরদাতাদের ঋণ গ্রহণ ২৯২

সারণি ৭.৬৭ : উত্তরদাতাদের গৃহীত ঋণের পরিমাণ ২৯৩

সারণি ৭.৬৮ : উত্তরদাতাদের গৃহীত ঋণের ধরন ২৯৪

সারণি ৭.৬৯ : এনজিও সহায়তায় জীবনের পরিবর্তন ২৯৬

সারণি ৭.৭০ : উত্তরদাতাদের সৌরবিদ্যুৎ ও পল্লিবিদ্যুৎ ব্যবহার ২৯৭

সারণি ৭.৭১ : উত্তরদাতাদের বিনোদনের মাধ্যম ২৯৮

সারণি ৭.৭২ : উত্তরদাতাদের অতীত তাঁত মালিকানা ৩০০

সারণি ৭.৭৩ : উত্তরদাতাদের তাঁতের বর্তমান অবস্থা ৩০০

সারণি ৭.৭৪ : রাখাইন গৃহস্থালীদের গবাদি পশুর মালিকানা ৩০৩

সারণি ৭.৭৫ : কৃষি যন্ত্রপাতির মালিকানা ৩০৪

সারণি ৭.৭৬ : আসবাবপত্রের মালিকানা ৩০৫

সারণি ৭.৭৭ : গৃহস্থালীদের ইলেকট্রনিক সামগ্রীর মালিকানা ৩০৬

সারণি ৭.৭৮ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডরে বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি ৩০৮

সারণি ৭.৭৯ : উত্তরদাতাদের বঞ্চনা অনুভব ৩০৯

সারণি ৭.৮০ : উত্তরদাতাদের বঞ্চনার ধরন ৩১০

সারণি ৭.৮১ : প্রতিবেশি বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গি ৩১১

সারণি ৭.৮২ : রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি ৩১৩

সারণি ৭.৮৩ : নারীদের চলাফেরা ও কাজকর্মে সমস্যায় উত্তরদাতাদের অভিমত ৩১৪

সারণি ৭.৮৪ : কাজকর্মে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা পালনে উত্তরদাতাদের অভিমত ৩১৬

সারণি ৭.৮৫ : পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালন ৩১৭

সারণি ৭.৮৬ : বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় উত্তরদাতাদের সন্তুষ্টি ৩১৯

সারণি ৭.৮৭ : ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়ছে কিনা ৩২০

সারণি ৭.৮৮ : জন্মভূমি পরিত্যাগের সম্ভাবনা ৩২১

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রের তালিকা

চিত্র ৩.১	:	আরাকানিদের বাংলায় আগমন	....	৮৬
চিত্র ৫.১	:	তিনটি গ্রামের গোত্রসমূহের বিন্যাস	....	১১৭
চিত্র ৫.২	:	তিনটি গ্রামের রাখাইনদের গোষ্ঠীর বিন্যাস	....	১২২
চিত্র ৫.৩	:	ক্রস-কাজিন ও প্যারালাল ক্যাজিন	....	১২৬
চিত্র ৫.৪	:	তিনটি গ্রামে বরের বিবাহ-উত্তর বাসস্থান	....	১৩০
চিত্র ৬.১	:	সামাজিক পরিবর্তনের মতবাদসমূহ	....	১৫০
চিত্র ৭.১	:	তিনটি গ্রামের রাখাইন ও বাঙালি গৃহস্থালী	....	১৮৬
চিত্র ৭.২	:	তিনটি গ্রামের রাখাইন ও বাঙালি জনসংখ্যা	....	১৮৮
চিত্র ৭.৩	:	বয়ঃশ্রেণিভিত্তিতে রাখাইন জনসংখ্যা	....	১৯৩
চিত্র ৭.৪	:	রাখাইন গৃহস্থালী প্রধানদের ভাষা-দক্ষতা	....	১৯৪
চিত্র ৭.৫	:	স্থানীয় টোল ব্যবস্থা চালু না থাকার বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমত	....	১৬৯
চিত্র ৭.৬	:	রাখাইন গৃহস্থালী প্রধান ও সদস্যদের শিক্ষাগত অবস্থা	....	২০০
চিত্র ৭.৭	:	মংওন মাতবরের বৃহৎ অনু পরিবার	....	২১০
চিত্র ৭.৮	:	মোমো মাতবরের যৌথ পরিবার	....	২১১
চিত্র ৭.৯	:	তিনটি গ্রামের রাখাইনদের পরিবারের আকার	....	২১২
চিত্র ৭.১০	:	রাখাইন ও বাঙালিদের মালিকানাধীন জমির বণ্টন	....	২৩৩
চিত্র ৭.১১	:	জমি মালিকানার ভিত্তিতে রাখাইন ও বাঙালি কৃষকদের শ্রেণিবিন্যাস	....	২৩৯
চিত্র ৭.১২	:	উত্তরদাতাদের জমি বন্ধক গ্রহণ ও প্রদান	....	২৪৫
চিত্র ৭.১৩	:	উত্তরদাতাদের জমি বর্গা প্রদান ও গ্রহণ	....	২৫১
চিত্র ৭.১৪	:	উত্তরদাতাদের পারিবারিক মাসিক আয়	....	২৭৩
চিত্র ৭.১৫	:	উত্তরদাতাদের পারিবারিক মাসিক ব্যয়	....	২৭৫
চিত্র ৭.১৬	:	উত্তরদাতাদের সঞ্চয়	....	২৭৬
চিত্র ৭.১৭	:	রোগের চিকিৎসা গ্রহণ	....	২৮১
চিত্র ৭.১৮	:	উত্তরদাতাদের এনজিও সম্পৃক্ততা	....	২৯০
চিত্র ৭.১৯	:	উত্তরদাতাদের ঋণ গ্রহণ	....	২৯৩
চিত্র ৭.২০	:	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত	....	৩০৮
চিত্র ৭.২১	:	উত্তরদাতাদের বঞ্চনা অনুভব	....	৩১০
চিত্র ৭.২২	:	রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি	....	৩১৩
চিত্র ৭.২৩	:	পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালন	....	৩১৮
চিত্র ৭.২৪	:	পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালনে সন্তুষ্টি	....	৩১৯
চিত্র ৭.২৫	:	জন্মভূমি পরিত্যাগের সম্ভাবনা	....	৩২২

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্রের তালিকা

মানচিত্র ১.১ : বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিন্যাস ৮

মানচিত্র ১.২ : বাংলাদেশের মানচিত্রে রাখাইন নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিন্যাস ১১

মানচিত্র ১.৩ : বাংলাদেশের মানচিত্রে হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ার অবস্থান ২৮

মানচিত্র ৩.১ : তৎকালীন আরাকান রাজ্য ৮৪

মানচিত্র ৩.২ : তৎকালীন আরাকান ও তার প্রতিবেশি রাজ্যসমূহ ৮৫

মানচিত্র ৪.১ : ছোট বালিয়াতলী মৌজা ম্যাপ ১০৩

মানচিত্র ৫.২ : ছোট বালিয়াতলী মৌজা ম্যাপে গ্রামসমূহ ১০৪

স্থিরচিত্রের তালিকা

স্থিরচিত্র ২.১ : দলগত আলোচনা, স্থান : হাড়িপাড়া ৬৩

স্থিরচিত্র ৭.১ : পাশাপাশি পুরাতন ও আধুনিক দুটো গৃহ ২১৫

স্থিরচিত্র পরিশিষ্টাংশ ৩৭৭

কেস স্টাডির তালিকা

কেস স্টাডি ১ : রাখাইন মেয়ে ও মুসলমান ছেলের বিয়ে ১৩২

কেস স্টাডি ২ : রাখাইন ছেলে ও মুসলমান মেয়ের বিয়ে ১৩২

কেস স্টাডি ৩ : তুলাতুলি পাড়ার স্কুলছাত্রীর রাখাইন ভাষা লিখতে পড়তে না পারা ১৯৭

কেস স্টাডি ৪ : হাড়িপাড়ার স্কুলছাত্রের রাখাইন ভাষা লিখতে পড়তে না পারা ১৯৭

কেস স্টাডি ৫ : মংওন মাতবরের বৃহৎ আধা-অনুপরিবার ২০৯

কেস স্টাডি ৬ : মোমো মাতবরের যৌথ পরিবার ২১১

কেস স্টাডি ৭ : জাল দলিল করে প্রতিবেশি রাখাইনের জমি বিক্রি ২৪৪

কেস-স্টাডি ৮ : মিশ্র পদ্ধতির সমন্বয়ক কৃষক মহেন চিং মাতবর ২৬২

কেস-স্টাডি ৯ : নিপু মাতবরের মাছ ধরার পেশা গ্রহণ ও এক্ষত্রে পুঁজির অনুপ্রবেশ ২৭০

কেস-স্টাডি ১০ : অং মাতবরের প্রবাসে মেবাইলে যোগাযোগ.... ....
৩০৭

কেস-স্টাডি ১১ : মুসলমান কলিমের প্রতিবেশি রাখাইনদের এড়িয়ে চলা ৩১২

সূচিপত্র

উৎসর্গ .... এক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার .... দুই

মুখবন্ধ .... চার

সারণির তালিকা .... সাত

চিত্রের তালিকা .... দশ

মানচিত্রের তালিকা .... এগার

স্থিরচিত্রের তালিকা .... এগার

কেস স্টাডির তালিকা .... এগার

সূচিপত্র .... বারো

এ্যাবস্ট্রাক্ট .... আঠার

প্রথম অধ্যায় **[১-৫৮]**

গবেষণা পরিচিতি

১. ভূমিকা ১

১.১ বাংলাদেশের ইতিহাস ও জনগোষ্ঠীর সাধারণ বর্ণনা ২

১.২ রাখাইন নৃগোষ্ঠীর পরিচয় ৯

১.৩ প্রত্যয় ১৪

১.৩.১ রাখাইন জনগোষ্ঠী ১৪

১.৩.২ আর্থ-সামাজিক রূপান্তর ১৫

১.৪. সংজ্ঞা ১৫

১.৪.১ নৃগোষ্ঠীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ১৯

১.৪.২ উপজাতি বনাম আদিবাসী বিতর্ক ২১

১.৫ পূর্বানুমান ২৬

১.৬ গবেষণা এলাকা ২৭

১.৭ গবেষণার যৌক্তিকতা ২৮

১.৮ গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নসমূহ ৩১

১.৮.১ উদ্দেশ্য ৩১

১.৮.২ প্রশ্নসমূহ ৩২

১.৯ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৩২

১.১০ গবেষণা পদ্ধতি ৩৩

১.১০.১ গবেষণা পর্যায়সমূহ ৩৪

১.১১ গবেষণা নৈতিকতা ৩৪

১.১২ তাত্ত্বিক কাঠামো ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

১.১৩ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা ৩৫
১.১৪ অধ্যায় বিন্যাস ৪৯
১.১৫ গবেষণার গুরুত্ব ৫১
১.১৬ উপসংহার ৫২

দ্বিতীয় অধ্যায় **[৫৯-৬৬]**

গবেষণা পদ্ধতি

২. গবেষণা পদ্ধতি ৫৯
২.১ গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি ৫৯
২.১.১ সামাজিক জরিপ ৫৯
২.১.২ সাক্ষাৎকার গ্রহণ ৬০
২.১.৩ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ৬১
২.১.৪ ঐতিহাসিক পদ্ধতি ৬২
২.২ দলগত আলোচনা ৬৩
২.৩ কেস স্টাডি ৬৩
২.৪ তথ্যের উৎস ৬৪
২.৪.১ প্রাথমিক উৎস ৬৪
২.৪.২ দ্বৈতীয়িক উৎস ৬৪
২.৫ গবেষণা সময়কাল ৬৪
২.৬ গবেষণা কৌশল ৬৫
২.৭ তথ্য বিশ্লেষণ ৬৫
২.৮ উপস্থাপন ৬৫

তৃতীয় অধ্যায় **[৬৭-১০০]**

রাখাইনদের নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৩.১ বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ৬৭
৩.১.১ ইউরেশীয় মহানৃগোষ্ঠী ৬৮
৩.১.২ মঙ্গোলয়েড মহানৃগোষ্ঠী ৬৮
৩.১.৩ নিগ্রোয়েড-অস্ট্রেলয়েড মহানৃগোষ্ঠী ৬৯
৩.২ বাংলাদেশের মানবগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ৬৯
৩.৩ রাখাইন নৃগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ৭১
৩.৪ রাখাইনদের ঐতিহাসিক পরিচয় ৭২
৩.৪.১ মগ পরিচিতি ৭৩
৩.৪.২ মারমা পরিচিতি ৭৭
৩.৪.৩ রাখাইন পরিচিতি ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫ বাংলাদেশে রাখাইন আরাকানি জনগোষ্ঠীর অভিবাসন ৮১
৩.৫.১ বাংলার সীমানা ৮১
৩.৫.২ বাংলায় আদিবাসীদের আগমন ৮২
৩.৫.৩ বাংলায় রাখাইনদের আগমন ৮২
৩.৫.৩.১ ১৪০৬ সাল : আরাকানিদের প্রথম দফায় বাংলায় আগমন ৮৬
৩.৫.৩.২ ১৬১৪ সাল : আরাকানিদের দ্বিতীয় দফায় বাংলায় আগমন ৮৮
৩.৫.৩.৩ আরাকানিদের তৃতীয় দফায় বাংলায় আগমন ৯০
- রামু-কক্সবাজার অঞ্চলে আগমন ৯০
- বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে আগমন ৯৩

চতুর্থ অধ্যায় **[১০১-১১৩]**

গবেষণা এলাকা : প্রতিবেশ ও সামাজিক পটভূমি

৪.১ অবস্থান ১০১
৪.২ গ্রাম বিন্যাস ১০৩
৪.৩ গবেষণা এলাকার ঐতিহাসিক পটভূমি ১০৬
৪.৪ জলবায়ু ১০৭
৪.৫ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা ১০৮
৪.৬ ঋতু পরিক্রমা ১১০

পঞ্চম অধ্যায় **[১১৪-১৪৭]**

গবেষণা এলাকার সামাজিক সংগঠন

৫. সামাজিক সংগঠন ১১৪
৫.১ রাখাইন সামাজিক সংগঠন ১১৪
৫.১.১ গোত্র ১১৫
৫.১.২ গোষ্ঠী ১১৯
৫.১.৩ পরিবার ১২৩
৫.১.৪ বিয়ে ১২৫
৫.১.৫ জ্ঞাতিসম্পর্ক ১৩৩
৫.১.৬ কাল্পনিক আত্মীয়তা ১৪০
৫.১.৭ সমাজ ১৪১

ষষ্ঠ অধ্যায় **[১৪৮-১৮৩]**

রাখাইন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন : তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণ

৬. সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজতত্ত্ব ১৪৮
৬.১ সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বসমূহ ১৪৯
- সামাজিক-ঐতিহাসিক তত্ত্ব ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

- কাঠামোগত-ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব ১৪৯
- দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব ১৪৯
- আধুনিকীকরণ তত্ত্ব ১৫০
- নির্ভরশীল তত্ত্ব ১৫০

৬.২ রাখাইন আর্থ-স্যাজিক পরিবর্তনের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ১৫১

৬.২.১ আধুনিকীকরণ বা উন্নয়ন তত্ত্ব ১৫১

৬.২.২ নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ১৫৪

৬.২.২.১ নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ও বাংলাদেশ ১৬১

৬.২.২.২ নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ও রাখাইন আর্থ-স্যাজিক পরিবর্তন ১৬৩

সপ্তম অধ্যায় **[১৮৪-৩৩১]**

রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন বিশ্লেষণ

৭.১ তিনটি গ্রামের গৃহস্থালী ১৮৫

৭.২ তিনটি গ্রামের জনসংখ্যা ১৮৭

৭.৩ লিঙ্গ ও বয়সভেদে রাখাইন জনগোষ্ঠীর বিন্যাস ১৯১

৭.৪ রাখাইনদের ভাষা-দক্ষতা ১৯৩

৭.৫ রাখাইনদের শিক্ষাগত অবস্থা ১৯৮

৭.৫.১ বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে উত্তরদাতাদের সন্তুষ্টি ২০২

৭.৫.২ বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতির সমস্যা দূরীকরণে উত্তরদাতাদের অভিমত ২০৩

৭.৬ রাখাইনদের বৈবাহিক অবস্থা ২০৫

৭.৭ রাখাইন পরিবারের ধরন ২০৭

৭.৭.১ রাখাইন পরিবারের আকার ২১২

৭.৮ উত্তরদাতাদের গৃহের ধরন ২১৩

৭.৮.১ উত্তরদাতাদের গৃহের কক্ষবিন্যাস ২১৫

৭.৯ রাখাইনদের জমি মালকানা ২১৬

৭.৯.১ গ্রামের ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থা ২১৬

৭.৯.২ গ্রামে জমির প্রকরণ ২২২

৭.৯.৩ গ্রামের ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা ২২৫

৭.৯.৪ তিনটি গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থা ২২৯

৭.৯.৫ রাখাইনদের জমি মালিকানা ২৩১

৭.৯.৬ জমি মালকানা ভিত্তিতে রাখাইন কৃষক শ্রেণি ২৩৫

৭.৯.৭ রাখাইনদের ভূমিহীনতা ২৪০

৭.৯.৮ রাখাইনদের খাসজমি প্রাপ্তি ২৪১

৭.৯.৯ রাখাইনদের বর্তমানে জমি নিয়ে বিরোধ ২৪২

৭.১০ রাখাইনদের জমি বন্ধক ব্যবস্থা ২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

৭.১১ রাখাইনদের জমি বর্গা ব্যবস্থা ২৫০

৭.১১.১ বর্গাজমি হাতছাড়া হওয়া ২৫৪

৭.১২ গ্রামের পরিবর্তমান মজুরি ব্যবস্থা ২৫৫

৭.১৩ গ্রামে কৃষি যান্ত্রিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উপকরণের প্রভাব ২৫৯

৭.১৪ রাখাইনদের পেশা ২৬৪

৭.১৫ রাখাইনদের উপার্জন ২৭২

৭.১৬ রাখাইনদের পারিবারিক মাসিক ব্যয় ২৭৪

৭.১৭ রাখাইনদের সঞ্চয় ২৭৫

৭.১৮ উত্তরদাতাদের তফসিলি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট ২৭৭

৭.১৯ পানির উৎস.... ....

২৭৮

৭.২০ উত্তরদাতাদের স্বাস্থ্য অবস্থা ২৭৯

৭.২০.১ উত্তরদাতাদের চিকিৎসা গ্রহণ ২৮০

৭.২১ গর্ভধারণকালে নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ২৮৩

৭.২১.১ গর্ভবতী নারীদের বিশেষ খাবার প্রদান ২৮৫

৭.২২ শিশুদের শারীরিক সমস্যা ২৮৬

৭.২২.১ শিশুদের শারিরীক সমস্যায় চিকিৎসা গ্রহণ ২৮৬

৭.২৩ শৌচাগার ব্যবস্থা ২৮৮

৭.২৪ এনজিও সম্পৃক্ততা ২৯০

৭.২৪.১ এনজিও সম্পৃক্ততার কারণ ২৯১

৭.২৪.২ এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ ২৯২

৭.২৪.৩ উত্তরদাতাদের গৃহীত ঋণের পরিমাণ ২৯৩

৭.২৪.৪ উত্তরদাতাদের গৃহীত ঋণের ধরন ২৯৪

৭.২৪.৫ এনজিও সহায়তায় জীবনের পরিবর্তন ২৯৫

৭.২৫ বিদ্যুৎ ব্যবহার ২৯৬

৭.২৬ চিত্তবিনোদনের মাধ্যম ২৯৭

৭.২৭ তাঁত মালিকানা ২৯৯

৭.২৮ গবাদি পশুর মালিকানা ৩০৩

৭.২৯ কৃষি যন্ত্রপাতির মালিকানা.... ....

৩০৪

৭.৩০ আসবাবপত্রের মালিকানা ৩০৫

৭.৩১ রাখাইন গৃহস্থালীদের ইলেকট্রনিক সামগ্রীর মালিকানা ৩০৬

৭.৩২ প্রাকৃতিক দুর্যোগে (সিডর) ক্ষতি ৩০৭

৭.৩৩ উত্তরদাতাদের বঞ্চনা অনুভব ৩০৯

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩৪ প্রতিবেশি বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গি ৩১১

৭.৩৫ রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি ৩১২

৭.৩৬ নারীদের চলাফেরা ও কাজকর্মে সমস্যা ৩১৪

৭.৩৬.১ নারীদের কর্ম সংযুক্তি ৩১৫

৭.৩৭ পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালন ৩১৬

৭.৩৮ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে সন্তুষ্টি ৩১৯

৭.৩৯ অভিবাসনের সম্ভাবনা ৩২০

৭.৪০ লোক-সংস্কৃতির বিলুপ্তি ৩২২

৭.৪১ রাজনৈতিক সংগঠনে পরিবর্তন ৩২৪

৭.৪২ জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব ৩২৫

৭.৪৩ নিরাপত্তার অভাববোধ ৩২৫

অষ্টম অধ্যায় [৩৩২-৩৪২]

সার–সংক্ষেপ ও উপসংহার

৮.১ সার-সংক্ষেপ ৩৩২

৮.২ উপসংহার ৩৩৮

৮.৩ সুপারিশসমূহ.... ....
৩৪০

গ্রন্থপঞ্জি [৩৪৩-৩৬৮]

পরিশিষ্ট [৩৬৯-৩৮০]

এক. রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর শুমারি জরিপ প্রশ্নমালা ৩৬৯

দুই. রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর প্রশ্নমালা ৩৭০

তিন. রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর বিশেষ সাক্ষাৎকার (প্রশ্নমালা) ৩৭৪

চার. তিনটি গ্রামের প্রধান তথ্যদাতাদের তালিকা ৩৭৫

পাঁচ. তিনটি গ্রামের বিশেষ সাক্ষাৎদাতাদের তালিকা ৩৭৬

ছয়. স্থিরচিত্র ৩৭৭

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম : 'বাংলাদেশে রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা'
পিএইচ ডি গবেষক : মোঃ সাহেব আলী
বিভাগ : সমাজবিজ্ঞান

এ্যাবস্ট্রাক্ট

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা পেতে সুদূর অতীতে রাখাইনরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথ ধরে পার্শ্ববর্তী বার্মা ও আরাকান থেকে অভিবাসিত হয়ে বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে। একদা দেশের সর্বত্র এরা মগ অভিধায় সাধারণ নামে পরিচিত ছিল। অর্থনৈতিকভাবে গত শতকের পঞ্চাশ দশকের পাদ পর্যন্ত এই রাখাইন পরিবারগুলো কৃষি ও অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে পুরো বছরের ভরণ-পোষণের চাহিদা মেটানোর মতো স্বাবলম্বী ও স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু ষাটের দশকের গোড়া থেকে প্রতিবেশি বাঙালির আগ্রাসী মনোভাব, ভূমি আত্মসাৎ, ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ, প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগহীনতা– নানা কারণে রাখাইনদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী জীবনে ছেদ পড়ে, যা ওই শতকের শেষ পাদে এসে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু ও বিপর্যস্ত করে তোলে। এ-অবস্থার প্রতিকারহীনতায় তারা জীবিকা অন্বেষণে পথহারা ও বেদনাক্রান্ত হয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী হবার প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, আগ্রহ ক্রমশ হারিয়ে ফেলে ভূমিহীন বেকারত্বকে তীব্রতর করে তোলে। বর্তমান যুগে বিশ্বায়নের প্রভাব, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ও প্রচার-প্রচারণার কারণে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, পয়ঃপ্রণালীর মতো আর্থ-সামাজিক কোন কোন ক্ষেত্রে গুণগত মান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সরকারি-বেসরকারি সহায়তানির্ভর। কিন্তু সার্বিক জীবনযাত্রায় ঘটেছে ক্রমাগত অবনতি। আর্থিক অসংগতির কারণে রাখাইনদের অর্ধেক জনগোষ্ঠী অশিক্ষিত রয়ে গেছে। রোগে-শোকে যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে না। তারা ঋণ পাওয়ার আশায় অধিকহারে এনজিওদের সাথে যুক্ত হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিতে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা জীবনের নানা ক্ষেত্রে বঞ্চনা অনুভব করেন। তাদের প্রতি দেশের রাজনৈতিক দল ও প্রতিবেশি বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক বলে তারা মনে করে না। তাদের প্রাচীন লোক-সংস্কৃতি বিলুপ্তপ্রায়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অধিক উষ্ণতায় তাদের কর্মস্পৃহা লোপ পাচ্ছে। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থায় তারা সন্তুষ্ট নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মুখে নিজেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ার ফলে যেভাবে তারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে, নিজেদের জমিজমা হারিয়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর অবস্থায় কৃষিবহির্ভূত নতুন নতুন পেশা গ্রহণ করেও বাজার অর্থনীতি ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যয়বহুল জীবননির্বাহে অসামর্থ্য হচ্ছে তাতে এ-এলাকায় তাদের জাতিসত্তা টিকে থাকার বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখে নিজেদের সামর্থ্য হারিয়ে তারা সরকারি-বেসরকারি সহায়তানির্ভর জীবনযাপন করছে। কিন্তু টিকে থাকাই তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ছে। শেষ অবধি অনেকেই পরিস্থিতির শিকার হয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করে মিয়ানমারে পাড়ি জমাচ্ছে এবং অনেকে ভবিষ্যতে বাব-দাদার ভিটে ছেড়ে মিয়ানমারে অভিবাসন করতে বাধ্য হবেন বলে শঙ্কিত আছেন। রাখাইনরা এভাবে একে একে নীরবে দেশ ত্যাগ করাকে নিয়তি ও পরিস্থিতির শিকার হিসেবে মেনে নিচ্ছে। পরিণতিতে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামগুলো হারাতে বসেছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সম্ভার ও গৌরব। এভাবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ হারাবে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ লালনের গৌরবময় ঐতিহ্য।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম : 'বাংলাদেশে রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা'
পিএইচ ডি গবেষক : মোঃ সাহেব আলী
বিভাগ : সমাজবিজ্ঞান

এ্যাবস্ট্রাক্ট

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা পেতে সুদূর অতীতে রাখাইনরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথ ধরে পার্শ্ববর্তী বার্মা ও আরাকান থেকে অভিবাসিত হয়ে বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে। একদা দেশের সর্বত্র এরা মগ অভিধায় সাধারণ নামে পরিচিত ছিল। অর্থনৈতিকভাবে গত শতকের পঞ্চাশ দশকের পাদ পর্যন্ত এই রাখাইন পরিবারগুলো কৃষি ও অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে পুরো বছরের ভরণ-পোষণের চাহিদা মেটানোর মতো স্বাবলম্বী ও স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু ষাটের দশকের গোড়া থেকে প্রতিবেশি বাঙালির আগ্রাসী মনোভাব, ভূমি আত্মসাৎ, ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ, প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগহীনতা– নানা কারণে রাখাইনদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী জীবনে ছেদ পড়ে, যা ওই শতকের শেষ পাদে এসে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু ও বিপর্যস্ত করে তোলে। এ-অবস্থার প্রতিকারহীনতায় তারা জীবিকা অন্বেষণে পথহারা ও বেদনাক্রান্ত হয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী হবার প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, আগ্রহ ক্রমশ হারিয়ে ফেলে ভূমিহীন বেকারত্বকে তীব্রতর করে তোলে। বর্তমান যুগে বিশ্বায়নের প্রভাব, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ও প্রচার-প্রচারণার কারণে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, পয়ঃপ্রণালীর মতো আর্থ-সামাজিক কোন কোন ক্ষেত্রে গুণগত মান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সরকারি-বেসরকারি সহায়তানির্ভর। কিন্তু সার্বিক জীবনযাত্রায় ঘটেছে ক্রমাগত অবনতি। আর্থিক অসংগতির কারণে রাখাইনদের অর্ধেক জনগোষ্ঠী অশিক্ষিত রয়ে গেছে। রোগে-শোকে যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে না। তারা ঋণ পাওয়ার আশায় অধিকহারে এনজিওদের সাথে যুক্ত হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিতে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা জীবনের নানা ক্ষেত্রে বঞ্চনা অনুভব করেন। তাদের প্রতি দেশের রাজনৈতিক দল ও প্রতিবেশি বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক বলে তারা মনে কওে না। তাদের প্রাচীন লোক-সংস্কৃতি বিলুপ্তপ্রায়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অধিক উষ্ণতায় তাদের কর্মস্পৃহা লোপ পাচ্ছে। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থায় তারা সন্তুষ্ট নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মুখে নিজেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ার ফলে যেভাবে তারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে, নিজেদের জমিজমা হারিয়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর অবস্থায় কৃষিবহির্ভূত নতুন নতুন পেশা গ্রহণ করেও বাজার অর্থনীতি ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যয়বহুল জীবননির্বাহে অসামর্থ্য হচ্ছে তাতে এ-এলাকায় তাদের জাতিসত্তা টিকে থাকার বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখে নিজেদের সামর্থ্য হারিয়ে তারা সরকারি-বেসরকারি সহায়তানির্ভর জীবনযাপন করছে। কিন্তু টিকে থাকাই তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ছে। শেষ অবধি অনেকেই পরিস্থিতির শিকার হয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করে মিয়ানমারে পাড়ি জমাচ্ছে এবং অনেকে ভবিষ্যতে বাব-দাদার ভিটে ছেড়ে মিয়ানমারে অভিবাসন করতে বাধ্য হবেন বলে শঙ্কিত আছেন। রাখাইনরা এভাবে একে একে নীরবে দেশ ত্যাগ করাকে নিয়তি ও পরিস্থিতির শিকার হিসেবে মেনে নিচ্ছে। পরিণতিতে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামগুলো হারাতে বসেছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সম্ভার ও গৌরব। এভাবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ হারাবে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ লালনের গৌরবময় ঐতিহ্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা পরিচিতি

১. ভূমিকা

বিশ্বের প্রায় সব দেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিয়ে কিছু মৌলিক সমস্যা বিদ্যমান। দৃশ্যত সকল দেশে অধিবাসীরা বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা দেশ শাসন করছে এবং তাদের ক্রমোন্নয়ন সাধিত হচ্ছে; অপরদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কেবল শাসিত ও শোষিত হচ্ছে এবং তাদের ক্রমাবনতি ঘটছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশীয় সম্পদ প্রাপ্যতায় সংখ্যালঘুদের নানান বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় (Ali, 1998:1)। প্রায় প্রত্যেক দেশেই জনগোষ্ঠীর মূলধারা বা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সংখ্যালঘু হিসেবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস। জনসংখ্যার দিক দিয়ে এরা প্রায় ৩৭০ মিলিয়ন বা তার অধিক, যা বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ৪ শতাংশ[১] (Watkins, 2015)। এদের বেশিরভাগেরই বসবাস এশিয়ায়, বিশেষ করে চীন, ভারত, মিয়ানমার, ফিলিপাইনস, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশে (Cooper, 1993)।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম উন্নয়নশীল একটি দেশ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জনসংখ্যা প্রশ্নে জনগোষ্ঠীর ভিন্নতাজনিত কিছু মৌলিক সমস্যা রয়ে গেছে। বাংলাদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর প্রধান ধারা বাঙালি। ধর্মীয় দিক থেকে বাঙালিরা দুটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত- মুসলমান ও হিন্দু। তবে বাঙালি ব্যতীত এখানে অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। এদের প্রত্যেকের রয়েছে সম্পূর্ণ পৃথক ও সমৃদ্ধ স্বতন্ত্র সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনধারা। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ একটি বহুজাতির, বহুভাষার ও বহু সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় দেশ (Barakat et al., 2009: 27)। দেশের আদিবাসীদের একটি সাধারণ চিত্র হলো তারা অর্থনৈতিকভাবে শোষিত, সম্পদে অধিকারহীন, ক্রমাগত ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ হারাচ্ছে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার; এবং বেঁচে থাকা ও পরিচিতির জন্য সংগ্রামরত। আদিবাসীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা প্রায় শূন্য (Gain et al., 2000)। এই

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় বাংলাদেশে বসবাসরত রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ও প্রভাবের স্বরূপ নিরূপণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.১ বাংলাদেশের ইতিহাস ও জনগোষ্ঠীর সাধারণ বর্ণনা

বিশ্বমানচিত্রে যে ভূখণ্ডটি আজ বাংলাদেশ, তার জন্ম একটি সশস্ত্র রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে (Karim, 1994: 2)। তবে এরও কিছুটা আগে ১৯৪৭ সালে এই ভূখণ্ডটি ব্রিটিশ ভারতে থেকে স্বাধীনতা লাভ করে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান নামে। সে যাত্রার স্থায়ীত্ব ছিল মাত্র ২৩ বছর। এদেশ গাঙ্গরাষ্ট্র বা গাঙ্গোপদ্বীপ। গঙ্গা অতি প্রাচীন নদী। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে বহু প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদেশ গঙ্গাজলবাহিত হিমালয়ের গাত্র ধৌত পলি থেকে উৎপন্ন (Schendel, 2009: 11)। সুপ্রাচীন 'বঙ্গীয় ব-দ্বীপ'-এর অংশবিশেষ বর্তমানের বাংলাদেশ (Majumdar, 1963: 557)। বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থেও বঙ্গের উল্লেখ আছে। *ঐতরেয় আরণ্যক*কে সর্বপ্রথম বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। *মহাভারত* থেকে জানা যায়, মহারাজ বলির পঞ্চপুত্রের অন্যতম বঙ্গ স্থাপিত ও শাসিত ভাগীরথী উভয় তীরবর্তী স্থান তথা মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, এবং সম্ভবত রাজশাহী-পাবনার কতকাংশ ও ঢাকা অঞ্চল বঙ্গদেশ (মুরশিদঃ ২০১২)। তবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশের চতুঃসীমার পরিবর্তন হয়েছে। সুপ্রাচীনকালে বঙ্গ বা বাঙ্গাল বলতে যে জায়গা বোঝাত তা আজকের পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার অংশমাত্র। ব্রিটিশ ভারতে বাংলাদেশের যে চতুঃসীমা তা তখন ছিল বিভিন্ন জনপদের সমষ্টি। সপ্তম-অষ্টম শতক থেকেই কখনো-বা পাল সাম্রাজ্যের আওতায়, আবার কখনো সেন রাজ্যের সীমানার মাঝে ধীরে ধীরে এই জনপদগুলি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল। আরও পরে পাঠান আমলে বঙ্গ নামেই বাংলার সবগুলো জনপদ ঐক্যবদ্ধ হয়। সেই থেকে এই ভূভাগের সবটুকুই বঙ্গ বা বাঙ্গাল নামে পরিচিত। আকবরের আমলে এর নাম ছিল সুবা বাংলা। তার আগে পর্যন্ত এই অঞ্চল একটি অখণ্ড এলাকা বা দেশ হিসেবে পরিচিত হয়নি। তখন এই অঞ্চল ছোট ছোট কয়েকটি দেশে বা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। তাদের নামও কালের পরিক্রমায় পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মোটামুটি প্রামাণ্য হিসেবে বারবার ঘুরেফিরে আসে গৌড়, রাঢ়, বঙ্গ, সুহ্ম, বরেন্দ্রী, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট প্রভৃতি নাম। এগুলোর মধ্যে আবার গৌড়, বরেন্দ্রী ও বঙ্গের নামই সবচেয়ে পুরানো এবং বহুল ব্যবহৃত। খ্রিস্টের জন্মের অন্তত পাঁচশ বছর আগে প্রণীত প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*তে গৌড়ের উল্লেখ আছে (রায়, ১৯৯৭)। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গবেষক অধ্যাপক আহমদ শরীফ (১৯৮৩)-এর মতে, "বাংলার রাঢ় বরেন্দ্রই প্রাচীন। পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ অর্বাচীন। রাঢ় ছিল অনুন্নত ও অজ্ঞাত, তাই বরেন্দ্র নিয়েই বাংলার ইতিহাসের শুরু।" সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক রংগ লাল সেন (১৯৮৫: ১৬) বলেন, "পূর্ববঙ্গই হচ্ছে 'বঙ্গ' কৌমের আবাস ভূমি।" *আইন-ই-আকবরী*'র লেখক আবুল ফজল (১৫৯০) মত দেন, 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল' (পূর্ববঙ্গীয় আইল) যুক্ত হয়ে 'বাংলা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নৃতাত্ত্বিক যুগবিচারে প্রত্ন-প্রস্তর যুগ থেকে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশে মানুষের বসবাসের শুরুর বিষয়ে অধিকাংশ গবেষক একমত পোষণ করেন। তবে তারও আগে হিমযুগের পর থেকে (আরম্ভ প্রায় ৪০ লক্ষ বছর আগে, শেষ প্রায় ১০ হাজার বছর পূর্বে) মানুষের বসবাসের খবর পাওয়া গেলেও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে প্রত্ন-প্রস্তর যুগ থেকে এই উপমহাদেশে নানা জনগোষ্ঠীর নানা জনস্রোত ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছে বারবার। সর্বপ্রথম আফ্রিকার মিশমিশে কালো নিগ্রোপ্রতিম মানুষ ও সর্বশেষ আধুনিক ইউরোপীয়– এ দুয়ের মাঝে এসেছে অনেকে, যেমন অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, পশ্চিমি চওড়া গোলমাথা জনধারা; প্রাক-ঐতিহাসিককালের আসিরীয় ও এলামাইট, পারসিক, মেসিডোনিয়া, গ্রিক, সিরীয়, ফিনিসীয়, শক, কুশান, পারসিক, (পরবর্তীকালের) হুন; প্রাক-ইসলামিক তুর্কি, আরবীয়, কুর্কি, ইরানি, আফগান ও মোগল। শেষোক্তরা ছাড়া সবাই এখানে বসবাস করেছে। প্রাক-ঐতিহাসিককালে জনগোষ্ঠীর স্রোত এখানে ধাক্কা মেরেছে ঐতিহাসিক কালের প্রারম্ভেই। মোটামুটি তাদের সংমিশ্রণেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল উপমহাদেশের মানুষের রক্তধারা, চেহারার আদল। পরবর্তীকালে এই চেহারা আর রক্তধারার সাথে অন্য জনগোষ্ঠীর মেলামেশা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ছাপ পড়েছে খুব কম। তাই আধুনিক বাঙালি জাতি একটি সমরূপী সমসত্ত্বা জন হিসেবে গড়ে ওঠে ইতিহাস ও সময়ের পথ ধরে যা শুরু হয়েছিল প্রত্ন-প্রস্তর যুগে। প্রত্ন-প্রস্তর যুগ থেকে যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বাংলার ভূখণ্ডে এসে বসবাস শুরু করে তারা সকলে বাংলার আদিম অধিবাসী (রায়: ১৯৯৭)। বাংলাদেশে বসবাসরত এসকল নৃগোষ্ঠীর বেশির ভাগই ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তিকালে ভারতে বসবাসকারী তাদের মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্পষ্টত তারা একদিকে সাংস্কৃতিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন, অপরদিকে তারা হিন্দু ও খ্রিস্টানদের সাথে মিলেমিশে বাস করে (Ali, 1998: 2)। এদের কেউ কেউ স্থানান্তরিত অভিবাসী। তবে স্থানান্তরের সময়ও বেশ প্রাচীন।

বাংলাদেশের ইতিহাস হলো নিপীড়ন আর শোষণের ইতিহাস। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০-এর মধ্যে আর্য অনুপ্রবেশকারীরা দ্রাবিড় ও আদিবাসীদেরকে ভারতবর্ষের উত্তর ও মধ্য এলাকা থেকে দক্ষিণ ও পূর্বদিকে হটিয়ে দেয়। ১২০১ খ্রিস্টাব্দে নিকট প্রাচ্য থেকে মুসলমানদের প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজবংশ যেমন মৌর্য, গুপ্ত, হর্ষ, পাল ও সেন এই দেশ শাসন করেছে। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৫৭ খিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করে বাংলা দখল করে এবং ১৮৫৮ খিস্টাব্দ থেকে ব্রিটিশ সরকার শাসনভার হাতে নিয়ে বাংলাকে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশে পরিণত করে (Timm, 1991: 2)। ১৯৪৭ সালে ভারত ব্রিটিশ সরকার থেকে স্বাধীনতা পেয়ে দুটি স্বাধীন দেশে বিভক্ত হয়ে পড়ে– ভারত ও পাকিস্তান। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের এবং পশ্চিম বাংলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর দীর্ঘ

২৩ বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামের পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শুরু হওয়া সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে ৩০ লক্ষ মানুষের প্রাণ, ২ লক্ষ নারীর সম্ভ্রম, ১ কোটি মানুষের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে শরণার্থী জীবনবরণ ও ইতিহাসে নজিরবিহীন অপরিমেয় ক্ষতিসাধনের বিনিময়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে ওই বছর ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে (মনিরুজ্জামান, ২০০৮)।

এদেশ মূলত নদী প্রধান নিচু এলাকা। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের মায়ানমারের সাথে ২৮৩ কিলোমিটার সীমান্ত বাদে এ-দেশের প্রায় সবদিকেই পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থান করছে তার ক্রমপরিবর্তনশীল উপকূল নিয়ে। বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদী। দেশের অধিকাংশ এলাকা সমুদ্রতট থেকে সামান্য উঁচু। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী স্বাভাবিক বর্ষাকালে এদেশে প্রায় ৩০ শতাংশ পানির নিচে থাকে। দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামেই শুধু পাহাড় আছে (Timm, 1991)। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার অধ্যুষিত এই দেশে জনসংখ্যা ১৬ কোটি। এই বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে ৮৯.৭% মুসলমান, ৯.২% হিন্দু। বাকিরা বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী (বিবিএস, ২০১১)।

তবে আদিবাসী জনসংখ্যার পরিসংখ্যান সম্পর্কিত পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য কোন উৎস নেই। সরকারি নির্ভরযোগ্য উৎস হলো বাংলাদেশ পপুলেশন সেন্সাস রিপোর্ট। বেসরকারি উৎসের মধ্যে আইন ও সালিশ কেন্দ্র রিপোর্ট, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে কোপেন ফাউন্ডেশন, বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা ইত্যাদি সর্বজন বিদিত। কিন্তু এসকল উৎস প্রদত্ত হিসেবের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। ১৯৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে আদিবাসীদের ২৭টি গোষ্ঠীর নামোল্লেখসহ মোট জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১২,০৫,৯৭৮ জন; ২০১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে আদিবাসীদের ২৯টি গোষ্ঠীর নামোল্লেখসহ মোট জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ২০,৪৬,০৫২ জন। তবে পপুলেশন সেন্সাস রিপোর্ট নিয়ে বিতর্ক আছে। দেশের বিভিন্ন পণ্ডিত গবেষক এবং সুশীল সমাজ-সংগঠনের মতানুসারে প্রকৃতপক্ষে রিপোর্টে আদিবাসী জনসংখ্যা কম দেখানো হয়েছে। বাস্তবে আদিবাসী জনসংখ্যা রিপোর্ট অপেক্ষা আরো বেশি (Barakat et al., 2009: 28)। গুগল প্রদত্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ২২,৭৮,০২৮ জন (সোলাইমান, ২০১৯: ১৫)। রহমানের মতে বর্তমানে আদিবাসী জনসংখ্যা প্রায় ৩ মিলিয়ন, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১.৫৪% (Rahaman, 2013:32)। ২০১১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে দেশের নৃগোষ্ঠী ও জনসংখ্যা ১.১ নং সারণিতে দেখানো হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি– ১.১

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নৃগোষ্ঠী ও জনসংখ্যা

ক্রম	আদিবাসী	জনসংখ্যা
১.	চাকমা	৮,৯৫,০০০
২.	সাঁওতাল	২,৩৬,৭৭৪
৩.	মারমা	১,৫৭,৩০২
৪.	ত্রিপুরা	১,২১,৯৮০
৫.	গারো	২,০১,২৮০
৬.	বনযোগী	৪৫,২৮৪
৭.	মণিপুরী	২৪,৮৮২
৮.	মুরং	২২,১৭৮
৯.	তঙচঙ্গ্যা	২১,৬৩৯
১০.	রাখাইন	১৬,৯৩২
১১.	কোচ	১৬,৫৮৭
১২.	বম	১৩,৪৭১
১৩.	খাসিয়া	১২,২৮০
১৪.	হাজং	১১,৫৪০
১৫.	ওঁরাও	৮,২১৬
১৬.	রাজবংশী	৭,৫৫৬
১৭.	বুনো (মুণ্ডরী)	৭২১
১৮.	লুসাই	৬৬২
১৯.	উরু	৫৬১
২০.	মাহাতো	৩৩৪
২১.	পাংখে	৩,২২৭
২২.	খিয়াং	২,৩৪৩
২৩.	মুণ্ডা	২,১৩২
২৪.	চাক	২,১২৭
২৫.	পাহাড়িয়া	১,৮৫৩
২৬.	খুমি	১,২৪১
২৭.	হরিজন	১,১৩২
২৮.	স্লো	১৩৬
২৯.	কিয়াং	২২৩
৩০.	অন্যান্য	২,১৬,৪৫৯
	মোট জনসংখ্যা	২০,৪৬,০৫২

Dhaka University Institutional Repository

উৎস : সোলাইমান, ২০১৯, পৃ. ১৪

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের হিসেব অনুযায়ী দেশে ৫৪টির[২] অধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ লক্ষাধিক লোকের বসবাস (Kapaeeng Foundation, 2012)। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, ভাষা, নামভ্রান্তির মতো সংখ্যা নিয়েও বিস্তর গোল রয়েছে। আলোচকরা এদের পার্থক্যের বিষয়ে খুব স্পষ্ট রেখা অঙ্কন করেননি (মনিরুজ্জামান, ২০১৮: ২৩)। খালেক (১৯৯৫) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও জনসংখ্যার পার্থক্য সংঘটনের কারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিদ্যায়তনিক প্রশিক্ষিত গবেষকের অভাব, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও জনসংখ্যা নিরূপণের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ায় ভিন্নতাজনিত তারতম্যকেই তিনি পার্থক্যের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৩]

এসব আদিবাসীরা দেশের সমতল ও পাহাড়ি উভয় এলাকায় বসবাস করে। তবে নদীবিধৌত শস্য-শ্যামল উর্বর অঞ্চলে তাদের তেমন দেখা যায় না। গিরিবহুল অরণ্য অঞ্চলের নিভৃত ক্রোড়ই সাধারণত বেশিরভাগ আদিবাসীদের আশ্রয়স্থল। বনের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও আত্মিক। বন ও বনের পরিবেশকে ঘিরেই আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও জীবন আবর্তিত হয়। পানি ছাড়া ডাঙায় যেমন মাছের জীবন বিপন্ন, তেমনি বন ছাড়া আদিবাসীদের জীবনও বিপন্ন। তাই তারা নিজেদের বনের সন্তান বলে মনে করে। এই বনের সন্তানদের সংস্কৃতি, জ্ঞান, ঐতিহ্য– সবকিছু বনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছু সংগ্রহের উৎস হলো বন। মূলত আদিবাসীরা একপ্রকার গুচ্ছভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করে। তাই ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করে দেশের আদিবাসীদের প্রধানত নিম্নোক্ত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা:

১. **পাহাড়ি আদিবাসী** : পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাসরত আদিবাসীরা পাহাড়ি আদিবাসী বলে বিবেচিত।

২. **সমতলের আদিবাসী** : দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন উত্তর-পশ্চিমের রাজশাহী ও দিনাজপুর, মধ্য-উত্তরের ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল, উত্তর-পূর্বের বৃহত্তর সিলেট, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বৃহত্তর বরিশাল জেলায় বসবাসরত আদিবাসীরা সমতলের আদিবাসী বলে গণ্য। (Rahaman, 2013:32)

দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সর্বাধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস। এই অঞ্চলে ১৩টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাস করে (ASK, 2007)।[৪] দেশের অন্য কোন অঞ্চলে এত অধিক সংখ্যক নৃগোষ্ঠীর

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের একত্রে বসবাসের নজির নেই। এক তথ্যানুযায়ী দেশের মোট আদিবাসীর ৫১.৬৯% ভাগ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে। অবশিষ্ট ৪৮.৩২% আদিবাসী মূলত দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। নিম্নের ১.২ নং সারণি ও ১.১ নং মানচিত্রে আদিবাসীদের ভৌগোলিক বিন্যাস তুলে ধরা হলো।

সারণি- ১.২

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিন্যাস

ক্রম	এলাকা	আদিবাসী
১.	বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, জামালপুর ও শেরপুর জেলা)	গারো, হাজং, কোচ, বর্মণ, ডালু, হুদি, বানাই ও রাজবংশী
২.	গাজীপুর	বর্মণ, কোচ ও গারো
৩.	উপকূলীয় এলাকা (পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার জেলা)	রাখাইন, হাজং,পাত্র, খরিয়া, সাঁওতাল ও ওঁরাও
৪.	বৃহত্তর সিলেট (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট ও হবিগঞ্জ জেলা)	মণিপুরী, খাসিয়া ও গারো
৫.	পার্বত্য চট্টগ্রাম (বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা)	চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, পাংখুয়া, লুসাই, তংঞ্চঙ্গ্যা, খিয়াং, ম্রো, চাক ও খুমি
৬.	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলা)	বাগদি (বুনো), রাজবংশী ও সাঁওতাল
৭.	উত্তরবঙ্গ (রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, নওগাঁ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর জেলা)	সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, বুনো, মালো, মাহালি, খন্দ, বেদে, ভূমিজ, কোল, তুরি, ভিল, কর্মকার, মাহাতো, মুরিয়ার, মুশোহর, পাহান, পাহাড়িয়া, রাজ ও সিং

Dhaka University Institutional Repository

উৎস : Rahman, 2013, p. 46

মানচিত্র– ১.১
বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিন্যাস

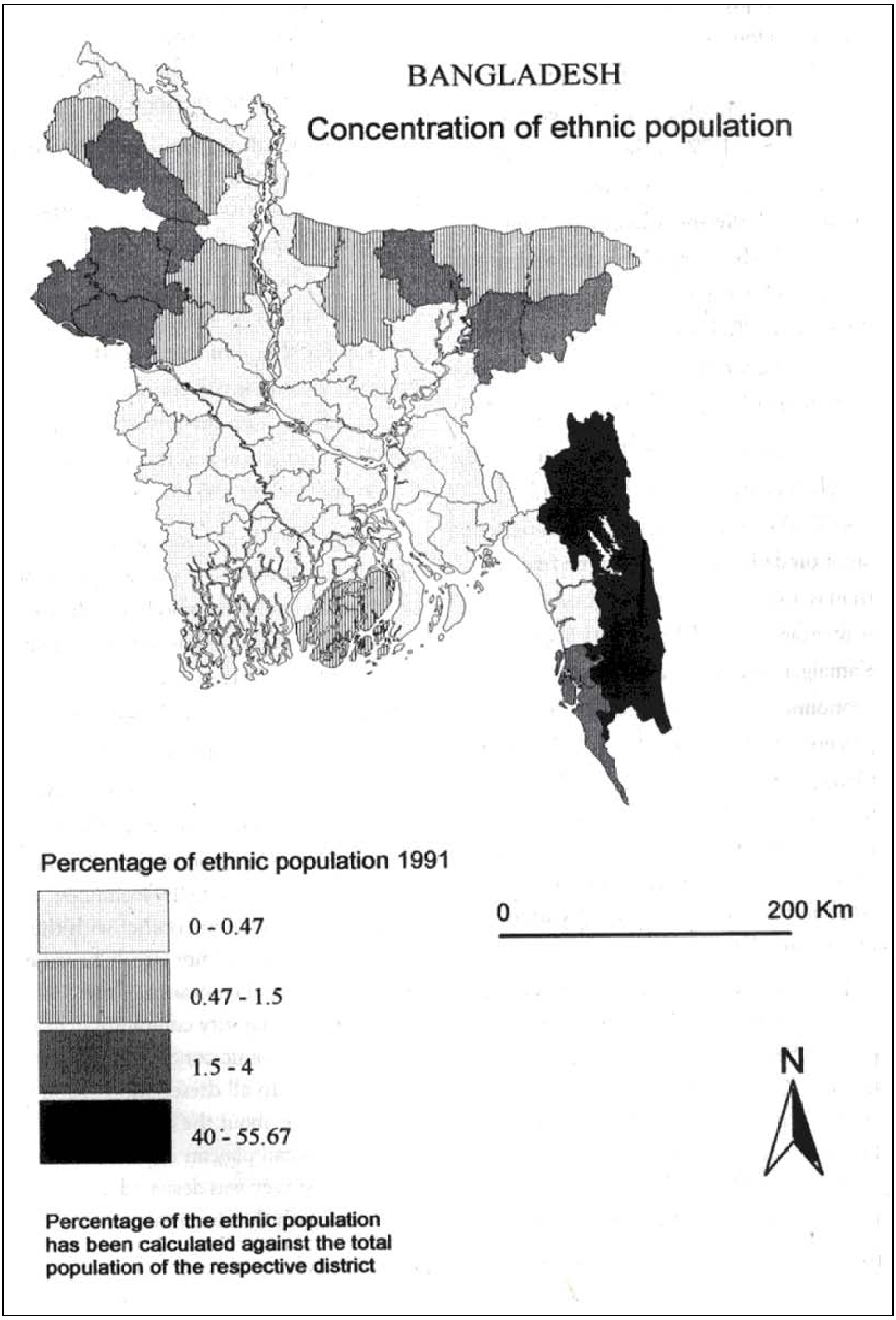

উৎস : Gain & Others (ed.), 2000, p. 4

Dhaka University Institutional Repository

১.২ রাখাইন নৃগোষ্ঠীর পরিচয়

বর্তমান গবেষণায় মূলত দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা পটুয়াখালী জেলার রাখাইনদের উপর মনোনিবেশ করা হয়েছে। দেশের কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরগুনা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্যচট্টগ্রাম জেলায় প্রধানত রাখাইনদের বাস। বাংলাদেশে সর্বাধিক জনবহুল আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো হলো চাকমা, সাঁওতাল, মারমা (রাখাইন) ও মান্দি (Sattar, 1975)। সুতরাং সর্বাধিক জনবহুল আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে রাখাইন অন্যতম। জনসংখ্যার দিক দিয়ে এরা তৃতীয় বৃহত্তম। পপুলেশন সেন্সাস রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী মারমা ও রাখাইন মিলে মোট জনসংখ্যা ১,৭৪,২৩৪ জন (মারমা ১,৫৭,৩০২ ও রাখাইন ১৬,৯৩২ জন)। এদের ৮০% এর বসবাস কক্সবাজার জেলায়। এই জেলার ৮টি উপজেলার মধ্যে পৌর এলাকা, সদর, রামু, উখিয়া, টেকনাফ, মহেশখালী, চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলায় রাখাইনদের বসতি (অং, ২০০৩: ৫৫)। এই জনগোষ্ঠীর এক অংশ সমতলে ও আরেক অংশ পাহাড়ি এলাকায় বাস করে। সমতলে বসবাসকারীরা রাখাইন ও পাহাড়ি এলাকায় বাসকারীরা মারমা নামে পরিচিত। সমতলের অধিবাসী হিসেবে কক্সবাজার, পটুয়াখালী জেলার আরাকানিরা রাখাইন এবং পাহাড়ি অধিবাসী হিসেবে বরগুনা, বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি অঞ্চলের আরাকানিরা নিজেদের মারমা বলে পরিচয় প্রদান করে। এদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস প্রায় একই রকম (মজিদ, ১৯৯২)। এরা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর লোক। এদের নাক কিছুটা চ্যাপ্টা, মুখমণ্ডল গোলাকার, দেহের রং ফর্সা তবে কারো কারো দেহের রং ঈষৎ শ্যামলা, চুল কালো কিন্তু সোজা, দেহের উচ্চতা প্রায় মাঝারি ধরনের (সিংহ, ২০০১: ১৭)। তবে মারমা ও রাখাইনদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও আচার-আচরণ এক হলেও তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচয় বহন করতেই পছন্দ করে। এ-ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঐকমত্য নেই। অভিবাসী হিসেবে আগমনের পটভূমি ও পূর্ব-পুরুষের পরিচয়ের ভিন্নতা দাবি করে এ-দু'গোষ্ঠীর মানুষেরা (মজিদ, ২০০৪: (ভূমিকা) ৯)। উল্লেখ্য যে, মোঘল ও ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি এই জনগোষ্ঠীকে 'মগ' নামে অভিহিত করে। বাঙালিদের কাছেও এরা দীর্ঘকাল ধরে মগ নামে পরিচিত ছিল। প্রসংগত গবেষক মুস্তাফা মজিদ বলেন–

> "'মারমা' এবং 'রাখাইন' এই দু'টি অভিধা বাদ দিলে বাংলাদেশে বসবাসরত পাহাড়ি ও সমতল ভূমির সকল আরাকানি জাতিগোষ্ঠীই দীর্ঘকাল থেকে সাধারণভাবে বাঙালিদের মাঝে 'মগ' নামে পরিচিত। যদিও আজকাল 'মগ' নামে অভিহিত করার প্রবণতা খুব একটা লক্ষণীয় নয়। সবাই মারমা ও রাখাইন নামেই অভিহিত করে থাকেন।" (মজিদ, ২০০৯: (ভূমিকা) ১০)

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারি এক হিসেবে দেশে রাখাইন আদিবাসী লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। এদের ৮০% ভূমিহীন, ৮৫% অশিক্ষিত ও ৩০% বাংলায় কথা বলতে পারে (Maung, 2000)। 'সম্বোধি' নামক মারমা বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত মুখপত্রে ১৯৯০ সালের শিক্ষিত মারমাদের একটি পরিসংখ্যান সারণি থেকে দেখা যায়, সমগ্র বাংলাদেশে শিক্ষিত মারমা ডাক্তারের সংখ্যা ১৩ জন, ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা ১৩ জন, কৃষিবিদ ৩ জন, স্নাতক ডিগ্রিধারী ৪০ জন, স্নাতকপ্রাপ্ত ১৪৭ জন । এরমধ্যে উচ্চ শিক্ষিত নারী ২৮ জন (নেভী, ২০০৪ : ৫৭)। নিম্নের ১.৩ নং সারণি ও ১.২ নং মানচিত্রে দেশের বিভিন্ন স্থানে রাখাইনদের বসবাসের চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি– ১.৩

বাংলাদেশে রাখাইন নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিন্যাস ও জনসংখ্যা

ক্রম	জেলা ও উপজেলার নাম	রাখাইন জনসংখ্যা
১.	কক্সবাজার জেলা	৮৫,০০০
	মহেশখালি উপজেলা	
	চকোরিয়া উপজেলা	
	রামু উপজেলা	
	টেকনাফ উপজেলা	
	কক্সবাজার সদর	
২.	বরগুনা জেলা	৬,০০০
	আমতলী উপজেলা	
	বরগুনা সদর	
৩.	পটুয়াখালী জেলা	৫,০০০
	গলাচিপা উপজেলা	
	খেপুপাড়া উপজেলা	
	পটুয়াখালী সদর	
৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা	৫০,০০০
৫.	অন্যান্য জেলা	৪,০০০
	সর্বমোট (আনুমানিক)	১,৫০,০০০

উৎস : রাখাইন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭; অং, ২০০৩, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র– ১.২

বাংলাদেশের মানচিত্রে রাখাইন নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিন্যাস

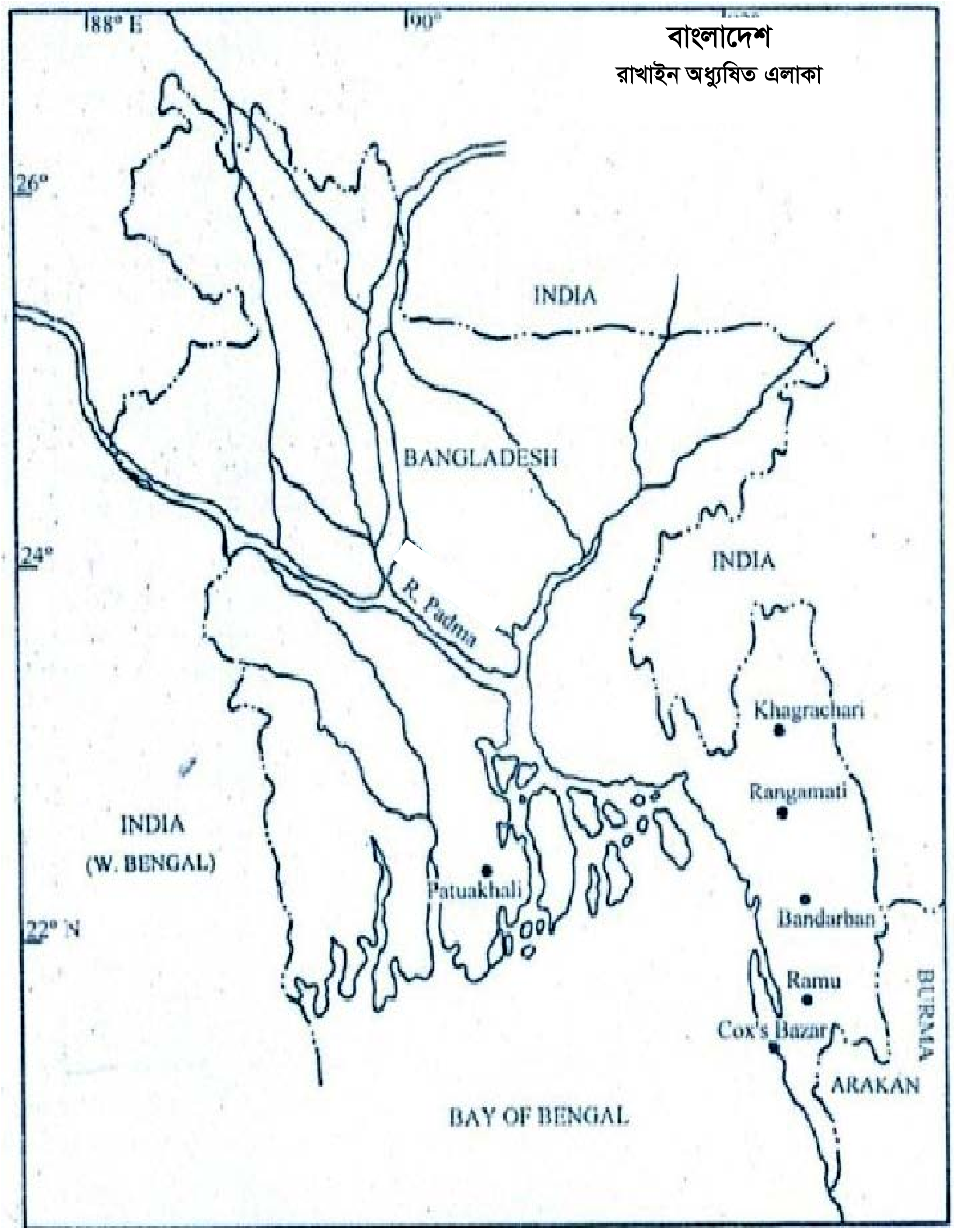

উৎসঃ khan, 1999

রাখাইন জনগোষ্ঠীর আদি নিবাস বার্মার আরাকান অঞ্চল। উইলিয়াম হার্ভে (১৯৬৭)-এর মতে, রাখাইনরা আঠার শতকের অষ্টম দশকে আরাকান থেকে অভিবাসী হয়ে পটুয়াখালীতে আগমন করে। ১৭৮৯ সালে বাংলায় ব্রিটিশরা মগ পরিবারদের সর্বদক্ষিণ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ বাখেরগঞ্জের সুন্দরবন

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলের উৎকৃষ্ট ধানী জমি দান করেন। সেই অনুসারে, রাখাইনরা প্রায় ২৫০ বছর ধরে এখানে বসবাস করছে। তখন বাখেরগঞ্জের এ-এলাকা (পটুয়াখালী-বরগুনা) ছিল জনবসতিহীন জলা ও বন। গ্রন্থকার মং বা অং (২০০৩: ২৫) বর্ণনা করেন যে, ১৭৮৪ সালে রাখাইনদের পিতৃভূমি আরাকান ভূখণ্ডটি কুরুক্ষেত্রে পরিণত হলে সদ্য স্বাধীনতালুপ্ত আরাকানের রেমব্রে, মেংঅং, সেনডোয়ে, ক্যাউ-ফ্রু অঞ্চল থেকে স্বাধীনচেতা জেনারেল প্যো অং, উ ঘং গ্রি, এবং উ অংক্য চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৫০টি রাখাইন পরিবার ৫০টি নৌকা করে পিতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ অতিক্রম করে দক্ষিণ বাংলার বাকেরগঞ্জ জেলার সর্বদক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র উপকূলবর্তী রাঙাবালী, মৌডুবি ও পরে বালিয়াতলী প্রভৃতি জনবসতিহীন বন্য অরণ্যময় দ্বীপাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এ-এলাকা তখন জনবসতিহীন ঘন জঙ্গলাবৃত ছিল। বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, কুমির ইত্যাদি ভয়ানক জীব-জন্তুতে ভরপুর ও বসবাসের অনুপযোগী ছিল। রাখাইনরা সব ভয়ানক জীবজন্তুর সাথে জীবন বাজি রেখে অসীম সাহসিকতায় লড়াই করে অনাবাদি পতিত এলাকাসমূহকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আবাদযোগ্য ভূমিতে পরিণত করে। রাখাইনদের আত্মত্যাগের মহিমায় এ অঞ্চল সোনালী ফসলের ক্ষেত, শস্য ভরা সবুজ মাঠ হয়ে ওঠে। অনাবাদী ভূমিকে আবাদি ভূমিতে রূপান্তর করে রাখাইনরা যুগান্তকারী পরিবর্তন করেছে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র কল্ললিত শেষ প্রান্তকে। কুয়াকাটা সংলগ্ন কেরানীপাড়ার প্রবীণ রাখাইন অংকুজা তালুকদার জানান, 'আমরা রাখাইন সম্প্রদায় দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকার আদিবাসী। সমুদ্র উপকূলবর্তী পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া, কুয়াকাটা, রাঙ্গাবালি, পার্শ্ববর্তী উপজেলার তালতলী এলাকায় প্রথম বসতি গড়েছি। তার আগে এলাকাটি ছিল দুর্গম গভীর বনজঙ্গলে ঘেরা। এই জঙ্গলে ছিল বাঘ, ভালুকসহ হিংস্র শ্বাপদকূলের অবাধ বিচরণ। বন্য হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের লেজা, সড়কি, ছেনা নিয়ে দিনরাত পাহারা দিতে হতো।' (হাওলাদার, ২০১১)

ব্রিটিশ ভারত সরকার রাখাইন সম্প্রদায়কে তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলায় 'মগ' অভিধায় উপজাতি সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করে ভূসম্পত্তি সংরক্ষণে এক নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করে যা 'ব্রিটিশ টিন্যান্সি অ্যাক্ট' (British Tenancy Act) নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে ভারতবিভক্তির পর পাকিস্তান সরকার ১৯৫০ সালে 'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন'-এ উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার্থে ভূমি হস্তান্তর বিষয়ে ৯৭ ধারা সন্নিবেশ করে। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে 'মগ' নামে কোন জাতিসত্তা না থাকলেও বরিশালের আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায় 'মগ' অভিধায় কয়েক শতাব্দী ধরে চিহ্নিত হতে হয়। ১৯৭৮ সালে "পটুয়খালী জিলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য" শীর্ষক সেমিনারে যুবনেতা তাহান কর্তৃক "বাংলাদেশের উপজাতি রাখাইন" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর থেকে রাখাইন নামটি দক্ষিণ অঞ্চলে পরিচিতি লাভ শুরু করে (অং, ২০০৩)।

Dhaka University Institutional Repository

রাখাইনরা তৎকালীন বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ জেলার জন্তু-জানোয়ার-শ্বাপদে ভরা জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ এলাকা বসবাস উপযোগী করে তোলে। তারা জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি জমি প্রস্তুত করে নিজেদের প্রয়োজনীয় ফসল চাষ করে গড়ে তোলে কৃষিভত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। রাখাইন অর্থনীতিতে গৃহস্থালীর কাজ ছাড়াও কৃষিতে ক্ষেতে-খামারের কাজে ও তাঁত বুননে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁত বুনন তাদের আদি ও বংশগত পেশা। তাঁতশিল্প কেন্দ্রিক তাতনৃত্য, লোকগীতি, লোককথা, গান, নাটক তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। মূলত তাদের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ বন ও ভূমির সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে রাখাইন সমাজের সার্বিক অর্থনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, আচার-অনুষ্ঠান ও জীবন দর্শন। ফসলাদি থেকে শুরু করে নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব, গোষ্ঠী জীবনের নানাবিধ অনুষ্ঠান, বিবাহ ব্যবস্থা, গোষ্ঠী ঐতিহ্য, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খ্যাদ্যাভ্যাস, ঘরবাড়ি, পেশা, স্বভাব ও আচার-আচরণ, লৌকিকতা ও সামাজিকতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, লোকশিল্প ইত্যাদি সবকিছু প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর।

সমাজ পরিবর্তনশীল। রাখাইন সমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন হয়েছে। তবে মাঠ গবেষণাকালে রাখাইনদের সাথে আলাপ-চারিতা থেকে জানা যায়, যতটা না স্বাভাবিক নিয়মে তারচেয়ে মানবসৃষ্ট হস্তক্ষেপ ও প্রভাবে তাদের জীবনব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী বৃহত্তর বাঙালি সমাজ ও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে তা ঘটেছে। বারংবার জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়, জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধির কবলে পড়েও রাখাইনরা কুসংস্কারবশত পেশা পরিবর্তনে বিমুখতা দেখিয়েছে। অন্যদিকে অনুপ্রবেশকারীদের ভূমি দখলসহ বিভিন্ন কারণে জমি হারিয়ে তারা ভূমিহীন হয়ে পড়েছে। যে ভূমির সাথে তাদের একধরনের আত্মিক সম্পর্ক ছিল, ভূমিহীন হয়ে পড়ায় ভূমির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে হাতাশাগ্রস্ত হয়েছে। উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা ও উর্ধ্বমূল্য, উৎপাদিত পণ্যের বাজারহীনতার কারণে তাঁতশিল্প বিলুপ্ত প্রায়। নির্যাতন ও বাঙালিদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীদের চলাফেরা সীমিত হয়ে গেছে। নিম্ন শিক্ষাহার, উন্নয়নবিমুখ নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের কারণে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট তাদের মধ্যে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য ব্যাপকতর করেছে। ভূমিহীনতা ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের কবলে পড়ে তারা উপায়হীন অন্তহীন নানামুখী সমস্যার মোকাবেলা করছে। এ-সমস্ত সমস্যা দিনকে দিন তাদেরকে প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকে ঠেলে দিচ্ছে। কৃষির সাথে ঐতিহ্যগত যোগের কারণে আপৎকালে রাখাইনরা পেশা পরিবর্তন না করে অনন্যোপায় হয়েছে (মজিদঃ ১৯৯২)। প্রাধান্যবিস্তারকারী বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভূমিগ্রাসের তৎপরতায়

তারা প্রতারিত ও বঞ্চিতের পরিণতি বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন তাদের সার্বিক জীবনব্যবস্থা পাল্টে দিয়েছে। পরিবর্তিত অবস্থায় তাদের জীবন বর্তমানে সংকটাপন্ন। সংকটাপন্ন জীবনে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যর্থতায় বাধ্য হয়ে তারা দেশ ত্যাগ করে বার্মায় চলে যাচ্ছে। এভাবে নির্গমন অব্যাহত থাকলে হয়তো একদিন বাংলাদেশে কোন রাখাইন জনগোষ্ঠীর মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই সমস্যার সঠিক উপলব্ধিতে রাখাইন জনগোষ্ঠীর অতীত ও বর্তমান জীবনব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ও প্রভাব সম্পর্কে জানা দরকার।

১.৩ প্রত্যয়

১.৩.১ রাখাইন জনগোষ্ঠী

এই গবেষণা শিরোনামের 'রাখাইন জনগোষ্ঠী' বলতে বাংলাদেশে বসবাসকারী 'রাখাইন আদিবাসী'দের বোঝানো হয়েছে। ইংরেজি 'Indigenous people'- এর বাংলা পরিভাষা 'আদিবাসী'। এটি এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। অবশ্য যাদের আদিবাসী বলছি বাংলাভাষায় তাদের বিভিন্ন পরিভাষা বা নাম-পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিসত্তার আদিবাসীদের বোঝাতে সরকারি এবং বেসরকারি মহলে পণ্ডিত এবং পেশাজীবীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে (Rahaman, 2013: 41)। এসব নাম-পরিচয় নিতান্ত কম নয়। যেমন উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, আদিম অধিবাসী (Aboriginals), অনগ্রসর আদিবাসী, গিরিবাসী আদিবাসী, বনবাসী, ক্ষুদ্র জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জনধারা, লঘু নৃগোষ্ঠী, অনুন্নত জাতি, খণ্ডজাতি, জনজাতি, অধস্তন জাতি, অনুন্নত জনগোষ্ঠী, জনজাতি গোষ্ঠী, জুমিয়া, পাহাড়িয়া, বনবাসী প্রভৃতি প্রত্যয়ের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। তবে স্পষ্টত এসব প্রত্যয় নিয়ে সরকার এবং আদিবাসীদের মধ্যে যেমন মতবিরোধ আছে, তেমনই গবেষক ও পণ্ডিত মহলেও মতপার্থক্য আছে। বিভিন্ন প্রত্যয়ের প্রায়োগিক তারতম্যই মতভেদের মূল কারণ (নাহার ও ত্রিপুরা, ২০১৪)। প্রত্যয়ের প্রায়োগিক তারতম্যের প্রভাবও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভেনাম ভাল সেন্দেল ও এলেন বল (১৯৯৮) মনে করেন, প্রচলিত প্রত্যয়গুলোর প্রায়োগিক তারতম্যই আদিবাসীদের জীবনযাত্রায় ভয়াবহ ফল এনেছে। তবে বলা যায়, আদিবাসী প্রত্যয়টি অপেক্ষাকৃত নতুন। সাধারণত যাদের আদিম অধিবাসী (Aboriginals) বলা হতো আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় তাদের আদিবাসী বলা হয়। নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে

Dhaka University Institutional Repository

নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী (Ethnic Community) হলো যথার্থ প্রত্যয়। তবে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এদের আদিবাসী অভিধায় অভিহিত করা হচ্ছে (বাস্কে, ১৯৮৭)।

অতীতে বাংলাদেশে সরকারিভাবে এই জনগোষ্ঠীসমূহকে কেবলই উপজাতি বলা হতো; যার চর্চা ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু হয়ে পাকিস্তানি আমল পেরিয়ে বাংলাদেশকালেও ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে উপজাতির পাশাপাশি নৃ-গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও সম্প্রদায় নামে ডাকা হচ্ছে। মূলত সরকার এদের উপজাতি, বড়জোর ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নামে পরিচয় দিতে অধিক আগ্রহী। তবে সরকার যাদের উপজাতি বলছে তারা নিজেদের উপজাতি পরিচয় প্রত্যাখ্যানপূর্বক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইংরেজি ‘Indigenous people’-এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে ‘আদিবাসী’ নামে পরিচয় দিতে অধিক আগ্রহী এবং এজন্য তারা দীর্ঘদন ধরে সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছে (রশিদ, ২০১২)। এছাড়া বিভিন্ন পণ্ডিত, গবেষক এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা তাদের আদিবাসী বলার পক্ষে। বর্তমান গবেষণায় রাখাইনসহ সকল ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পাশাপাশি আদিবাসী নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী’ বা ‘ক্ষুদ্র জাতিসত্তা’ শব্দ ব্যবহার করা হলেও তা মূলত ‘আদিবাসী’ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

১.৩.২ আর্থ-সামাজিক রূপান্তর

‘রূপান্তর’ প্রত্যয়টি দ্বারা সমাজের নানামাত্রিক পরিবর্তনের সংশ্লেষণ চিহ্নিত করা সম্ভব। বর্তমান গবেষণা শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত ‘আর্থ-সামাজিক রূপান্তর’ বলতে রাখাইনদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের, এবং সেই সঙ্গে অংশত সাংস্কৃতিক জীবনের সংঘটিত পরিবর্তনকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক পরিচয় সাধন, অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক ধারা কোন দিক থেকে বের হয়ে কোন দিকে বয়ে চলেছে।

১.৪. সংজ্ঞা

‘আদিবাসী’ প্রত্যয়টি এসেছে সংস্কৃত ‘আদি’ অর্থ ‘মূল’ এবং ‘বাসী’ অর্থ ‘অধিবাসী’ থেকে। ব্যুৎপত্তিগতভাবে প্রত্যয়টির অর্থ হলো কোন অঞ্চলের আদি অধিবাসী। প্রত্যয়টির সর্বসম্মত একক কোন সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। আদিবাসী সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদিবাসী প্রত্যয়টির একক সংজ্ঞার পরিবর্তে তাদের সাধারণ পরিচয় নিয়ে এই প্রত্যয় সম্পর্কে যেভাবে বলা হয়েছে সে পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রত্যয়ের উপর ধারণা লাভ করা যায়। বিশ্ব ব্যাংকের আদিবাসী বিষয়ক ‘পরিচালন নীতিমালা’র আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ‘সুরক্ষামূলক বিধান’

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী সমাজে আধিপত্যশীল গোষ্ঠী থেকে যারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী এবং জাতীয় উন্নয়নের ধারায় দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির উপর তাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার সামর্থ্য রাখতে পারে না, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও সুফল নেওয়ার সামর্থ্য যাদের থাকে না এমন সব দুর্বল জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক মনে করে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে এসব জনগোষ্ঠীকে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। বিশ্ব ব্যাংকের মতে–

> "The term 'indigenous people', 'indigenous ethnic minorities', and 'scheduled tribes' describe social groups with a social and cultural identity distinct from the dominant society that makes them vulnerable to being disadvantaged in the development process. For the purposes of this directive 'indigenous peoples' is the term that will be used to refer to these groups within their national constructions, status and relevant legislation, many of the Bank's borrower countries include specific definitional clauses and legal frameworks that provide & preliminary basis for identifying indigenous peoples…." (উদ্ধৃত: চাকমা, ২০০৯: ১৫৩)

আদিবাসী প্রত্যয় সম্পর্কে The World Council of Indigenous People প্রদত্ত প্রস্তাব হলো–

> "Indigenous people are such population groups as we are, who from old-age time have inhabited the lands where we live, who are aware of having a character of our own, with social traditions and means of expression that are linked to the country inherited from our ancestors with a language of our own and havings certain essential and unique characteristics which confer upon us the strong conviction of belonging to a people, who have an identity in ourselves and should be thus regarded by others." (উদ্ধৃত: Cooper, 1993:7)

এই প্রস্তাবটির মূল বক্তব্য হলো, ভূমির সাথে উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পর্ক, স্বতন্ত্রতার সম্মিলিত ধারণা, অন্য সাংস্কৃতিক দলসমূহ থেকে ভিন্নতা যা একই দেশে বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে এই স্বতন্ত্রতা ভাষা,

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্গত ধর্ম, আইন, নৈতিক মূল্যবোধ, দর্শন, শিল্পকলা, পোশাক, নাচ, খাদ্য, সংগীত, প্রযুক্তিবিদ্যা ও স্থাপত্য ছাড়াও সাংস্কৃতিক প্রতীকসমূহের একটা পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিসরকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই সংজ্ঞা থেকে এটাও পরিষ্কার যে, আদিবাসীদের মধ্যে মূল স্রোত থেকে শক্তিশালী ঐতিহাসিক পৃথকতার ভিত্তিতে ভিন্নতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার দৃঢ় ধারণা থাকে।

মানবাধিকার বিষয়ক ইউনেস্কো কমিশন আদিবাসীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে–

> "... The existing dependents of the people who inhabited the present territory of a country wholly partially at the time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world, overcame them and, by conquest, settlement or other means, reduced them to a non-dominant or colonial situation." (উদ্ধৃতঃ Cooper, 1993:7)

১৯৮৩ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন সাব-কমিশন আদিবাসীদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত 'ওয়ার্কিং ডেফিনেশন' গ্রহণ করে–

> "Indigenous communities, people and nations are those which, having a historical continuity with pre-invansion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural, social institutions and legal systems." (উদ্ধৃতঃ কামাল, ২০০৯: ১০০)

১৯৮৯ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর ১৬৯ নং কনভেনশনের ১(খ) নং অনুচ্ছেদে আদিবাসীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

> "Indigenous peoples" as being 'people's in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from populations

which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present states boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.” (উদ্ধৃত: Rahaman, 2013: 42)

জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরাম আদিবাসীর বিষয়ে বলেছে–

“...there does not seem to be one definitive definition of indigenous people, but generally indigenous people are those that have historically belonged to a particular region or country, before its colonization or transformation into a nation state, and may have different often unique- cultural, linguistic, traditional, and other characteristics to those of the dominant culture of that region or state.” (উদ্ধৃত: Rahaman, 2013: 42)

সুবোধ ঘোষ (১৩৫৫) বলেন, “আদিবাসী বলতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বরং বোঝায় বনিয়াদী অধিবাসী।”

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৩৭১) বলেন, “আদিবাসী বলতে মানবগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনগ্রসর আদিম সংস্কৃতিবিশিষ্ট গোষ্ঠী বুঝায়।”

মেসবাহ কামাল (২০০৯: ৯৮)-এর মতে, “আদিবাসী বলতে বুঝায় এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা মোটামুটিভাবে একটা অঞ্চলে সংগঠিত, যাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং যার দস্যরা মনে করেন যে, তারা একই সাংস্কৃতিক এককের অন্তর্ভুক্ত।”

প্রশান্ত ত্রিপুরা (২০১৫: ৩৫) বলেন, “কোন নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীকে indigenous বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, তারাই নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডের প্রাচীনতম অধিবাসীদের বংশধর। স্পষ্টতই এটি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। অর্থাৎ স্থান ও কালের সীমানা কীভাবে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে, তার ওপরই নির্ভর করছে কোন পরিপ্রেক্ষিতে কাদের আমরা indigenous বলতে পারি।”

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আদিবাসী প্রত্যয়কে একক ও সর্বজনীনভাবে সংজ্ঞায়িত না করে বরং বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থানরত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে। আদিবাসী শব্দের দ্বারা কেবল একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোন একটি জাতিগোষ্ঠীর প্রাচীনতাকেই নির্দেশ করে না, বরং তাদের

Dhaka University Institutional Repository

সভ্যতার প্রাচীনতা, সাংস্কৃতিক অনন্যতা, জীবনযাত্রা, উৎপাদনের ধরন ও জ্ঞান ইত্যাদিকেও নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, আদিবাসী বলতে কোনো ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল ধরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা আজঅব্দি নগরসভ্যতা থেকে নিজেদের পৃথক রেখে প্রাচীন স্বকীয় সংস্কৃতিমণ্ডিত জীবনযাত্রা বজায় রেখেছে।

১.৪.১ নৃগোষ্ঠীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি

১৯৭১ সালে অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। বাহাত্তরের সংবিধানে আদিবাসীরা স্বীকৃতি পায়নি। সদ্যস্বাধীন দেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়ের উন্মাদনার জোয়ারে ভেসে গেছে আদিবাসীদের স্বীকৃতির ন্যায্য দাবি (Mohsin, 2002)। গণপরিষদে ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নকালে পরিষদের একমাত্র আদিবাসী সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের পেক্ষাপটে সংবিধানে আদিবাসীদের জাতিগত স্বীকৃতি ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। এ-সত্ত্বেও তৎকালে সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, বরং জাতিগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের অমোছনীয় বৈচিত্র্যতাকে বেমালুম অস্বীকার করে ৬ নং অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয় যে, "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।" এই পরিপ্রেক্ষিতে গণপরিষদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেন-

> "পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের সঙ্গে বাস করে আসছি। বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরাও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সবদিক থেকে আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ কেউ বলেন নাই আমি বাঙালি।...একজন বাঙালি কোনোদিনই একজন চাকমা হতে পারে না, অনুরূপভাবে একজন চাকমাও কোনোক্রমেই একজন বাঙালি হতে পারে না।" (চাকমা, ১৯৮৩: ১০)

সশস্ত্র যুদ্ধের বিজয়ে প্রতিষ্ঠিত নব্য স্বাধীন দেশের সংবিধানে আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি না পেয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চাকমা জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে গঠিত হয় জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)। বাহাত্তরের সংবিধানে আদিবাসীদের দাবি উপেক্ষিত হওয়ার পরিণতিতে পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী তাদের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃতির বদলে অস্ত্রের সাহায্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের ভয়ংকর পথ গ্রহণ করে (চাকমা, ২০০৩)। দীর্ঘদিনের বাঙালি-আদিবাসী দ্বন্দ্ব-বিরোধ-সংঘাত ও রক্তক্ষয়ের পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় (Rahman, 2014)। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের শুরু থেকে আদিবাসীরা সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও অধিকারের দাবি ও আন্দোলন করে আসছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমবারের মতো আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি মেলে ৩০ জুন ২০১১ সালে গৃহীত পঞ্চদশ সংশোধনীতে। ইতিপূর্বে সংবিধান ১৫ বার সংশোধিত হলেও আদিবাসীদের স্বীকৃতি মেলেনি। তাই এক অর্থে ১৯৭২ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দুই শতকের প্রায় চার দশক ধরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে আদিবাসীদের বসবাস সংবিধানস্বীকৃত ছিল না। ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনীতে আদিবাসীরা বাঙালি হওয়া থেকে মুক্তি না পেলেও নতুন সংযুক্ত ২৩(ক) নং অনুচ্ছেদে তারা উপজাতি, নৃ-গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, সম্প্রদায় প্রভৃতি নামে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : "রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" এ অবস্থায় আদিবাসীদের সাংবিধানিক অবস্থান নিয়ে সৌরভ সিকদার (২০১২) মন্তব্য করেন যে–

> "বাংলাদেশের মহান সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পর এদেশে 'আদিবাসী' শব্দটি অনেকটা বিতাড়নের পথে। যদিও পঁচিশ-ত্রিশ লক্ষ আদিবাসীরা এদেশের মাটিতে বসবাস করছে এবং জলবায়ু ও আলোবাতাস অনেক বেদনা নিয়ে উপভোগ করে আসছে।... এদেশে বাঙালি ভিন্ন অন্য জাতির যারা আছে তারা সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, ইনডিজিনাস কিন্তু কোন ক্রমেই আদিবাসী নয়।"

পঞ্চদশ সংশোধনীতে তাদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা তো হয়ইনি, উপরন্তু তাদের আবারও বাঙালি অভিহিত করে ৬(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।" এজন্য অনেকে মনে করেন, এ উপধারা বলে এথনিসিটিকে সজ্ঞানে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

এছাড়াও, সরকার ২০১০ সালে দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিল, ২০১০' পাস করে। বিলটি প্রণয়নকালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত আমন্ত্রিত সুধীবৃন্দ বিলটি 'আদিবাসী প্রতিষ্ঠান বিল, ২০১০" নামকরণের প্রস্তাব যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করেন। তবে সরকার শেষ পর্যন্ত আদিবাসী শব্দটি গ্রহণ করেনি। উল্লেখ্য, এই বিলের মূল পাঠে বা ভিতরের বর্ণনায় 'আদিবাসী' শব্দটি স্থান পেয়েছে। যেমন, বিলের সংজ্ঞায়ন অধ্যায়ে ২ ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "এখানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অর্থ তফসিলে উল্লিখিত বিভিন্ন আদিবাসী তথা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শ্রেণীর জনগণ"। তবে পাঠে বা ভিতরের বর্ণনায় আদিবাসী শব্দের স্থান

মিললেও অনেক দাবি ও যুক্তি উপস্থাপনের পরও বিলের নামকরণে শব্দটি স্থান পায়নি (*প্রথম আলো*, ৩ জুলাই ২০১০)। এভাবে সরকার সাংবিধানিকভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকার না করলেও দেশে প্রচলিত অনেক আইনে যেমন- পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০, অর্থ আইন ১৯৯৫, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ প্রভৃতি আইনে তাদেরকে অ্যাবরজিন্যালস, ইনডিজিনাস হিলম্যান, ট্রাইব, আদিবাসী, উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

১.৪.২ উপজাতি বনাম আদিবাসী বিতর্ক

'উপজাতি' শব্দটি ইংরেজি 'ট্রাইব' বা 'ট্রাইবাল' শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ। যদিও অক্সফোর্ড অভিধান অনুসারে 'ট্রাইব' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এসেছে গ্রিক 'phylac' এবং ল্যাটিন শব্দ 'ট্রাইবাস' থেকে। মূলত রোম এবং গ্রিসে বিভাজন বোঝাতে ট্রাইব শব্দ ব্যবহৃত হতো, কিন্তু ঘৃণা বা অবজ্ঞার কোন আভাস ছিল না (সেন, ২০১৬)। উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ট্রাইবের সংজ্ঞার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক ও বিদেশি নৃতত্ত্ববিদদের রচনায় প্রথম ট্রাইব বা ট্রাইবাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তারপর থেকে বাংলা ভাষায় শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু আদিবাসীরা নিজেদের উপজাতি পরিচয়ে মোটেই সম্মত নয়। তারা মনে করে, উপজাতি শব্দটি দ্বারা আধুনিক সভ্য মানুষের বিপরীতে আদিম মানুষকে অসভ্য, নিকৃষ্ট ও অপূর্ণাঙ্গ জাতি (যারা পুরোপুরি জাতি হয়ে উঠতে পারেনি) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি একটি হীন শব্দ। উপজাতি হলো কেবল উপ-জাতি অর্থাৎ জাতির সদৃশ, জাতি নয়। তাই উপজাতি শব্দটির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তারা (মন্তাজ, ২০১৪: ১০৩)।

বাংলাদেশে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীর মানুষদের উপজাতি নাকি আদবিাসী বলা হবে তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক বিদ্যমান। তাদের উপজাতি, আদিবাসী কিংবা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অভিধার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি, তথ্য, গবেষণা, বিশ্লেষণ, তর্ক-বিতর্ক উপস্থাপিত হচ্ছে। এ-বিতর্কের অন্যতম কারণ হলো সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। সরকার মনে করে তারা কোনভাবেই আদিবাসী নয়। সরকার যে কারণে তাদের আদিবাসী মনে করে না, অনেকের মতে, বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ এ-দেশের ভূমিজ সন্তান নয়। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, গত শতকের নব্বই দশকের আগ পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল পর্যায়ে নৃগোষ্ঠীকে

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতি বলা হতো। এ-নিয়ে তেমন কোন বিতর্কও ছিল না। যেমন সমাজবিজ্ঞানী এ কে নাজমুল করিম (১৯৪৪) "পূর্ব সীমান্তের অধিবাসী" শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতের প্রধান প্রধান জনগোষ্ঠী ব্যতীত অন্য সকল জনগোষ্ঠীকে 'আদিম অধিবাসী', 'উপজাতি', 'অনুন্নত জাতি' প্রভৃতি বলে সম্বোধন করেছেন। আবার আদিবাসী নিয়ে রচিত গত শতকের আশির দশকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা মাহমুদ শাহ কোরেশী (১৯৮৪) সম্পাদিত *Tribal Cultures in Bangladesh* গ্রন্থ। এ-গ্রন্থে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট গবেষকদের মূল্যবান ৩২টি সেমিনার-প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির নামকরণ উপজাতি প্রত্যয়ের সাধারণ ব্যবহার নির্দেশ করে, যা সেসময়ে প্রচলিত ছিল। আদিবাসীরাও তখন উপজাতি নামে পরিচয় দিত। যেমন সুগত চাকমা (১৯৮৫) লিখেছেন *বাংলাদেশের উপজাতি* শীর্ষক গ্রন্থ। তবে ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ ৯ আগস্টকে 'বিশ্ব আদিবাসী দিবস' ঘোষণার পর থেকে বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর মানুষরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অনুসারে নিজেদের আদিবাসী হিসেবে পরিচিতি প্রদানের দাবি জানিয়ে আসছে। তারা নিজেদের উপজাতি নাম প্রত্যাখ্যান করে আদিবাসী নামে পরিচয় দিয়ে আসছে। দেশের বিদ্বৎসমাজ ও বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাও এই দাবির সাথে একমত। অবশ্য সরকার যেমন নৃগোষ্ঠীসমূহকে আদিবাসী না বলার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান বজায় রেখেছে, তেমন কোন কোন পণ্ডিত গবেষকও এমন ধারণা পোষণ করেন। উপজাতি এবং আদিবাসী প্রত্যয় নিয়ে যে বিতর্ক আছে এর প্রমাণস্বরূপ জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান-এর বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলো–

> "...নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের আদিবাসী বলার বিষয়ে আমাদের দেশে মতভেদ আছে। কে কখন দেশের কোন খণ্ডে প্রবেশ করেছে, তা হিসাব করতে গেলে দেখা যাবে, আদম ও হাওয়া ছাড়া আমরা সকলেই কোথাও না কোথাও থেকে এসেছি। এমনকি আদম-হাওয়াও পৃথিবীতে এসেছেন স্বর্গোদ্যান থেকে। আদিবাসী অর্থে কেবল বসতি স্থাপনের সন-তারিখ বোঝায় না, তাদের কতগুলো সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকে, জোর দেওয়া হয় তার ওপর।...আমাদের যে সমস্যা তার সমাধান খুঁজতে হবে সকলের সমান অধিকারের ভিত্তিতে, আলোচনার মাধ্যমে।" (উদ্ধৃত: ত্রিপুরা, ২০১৫: ১০২)

এই বিতর্কের কারণে অধুনা এসব জনগোষ্ঠীর নাম-অভিধার ক্ষেত্রে সতর্ক অবলম্বন লক্ষ্যণীয়, যা পূর্বে ছিল না। এ প্রসঙ্গে গবেষক অধ্যাপক মনিরুজ্জামান (২০১৮: ৫) বলেন–

> "...উপজাতি, নৃ-গোষ্ঠী, ভাষা-সম্প্রদায় প্রভৃতি অর্থবোধক যেসব পরিভাষার (যেমন ট্রাইব, রেস, এথনেসিটি প্রভৃতি ও অন্যান্য বিশেষ অর্থবোধক শব্দ) কথা আমরা জানি, তার ব্যবহার নিয়ে এখন

> সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব চট্টগ্রামের ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযুক্ত পূর্ববর্তী সাধারণ শব্দ 'মগ' এখন টাবু শব্দ।...এইরকম উদাহরণ বিস্তর আনা যেতে পারে। এর থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষ জাতিই হোক আর উপজাতিই হোক, তার বর্তমান অবস্থানের পেছনে ইতিহাসের অপর প্রবাহ চিরদিনই সক্রিয় থেকেছে; কিন্তু মানুষ চেয়েছে তার সম্মানজনক (prestigeous) পরিচিতি।"

পুনরুক্ত, ২০১১ সালের ৩০ জুন সংবিধানে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতির আগে তাদের সরকারিভাবে কেবল উপজাতি বলা হতো এবং অন্য কোন অভিধায় বিশেষ করে আদিবাসী বলার প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধে ছিল। যেমন ২০০৬ সালে মে মাসে সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত একপত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সরকারি নথিপত্রে 'আদিবাসী' শব্দের বদলে 'উপজাতি' শব্দ ব্যবহার করতে বলা হয় (মন্তাজ, ২০১৪: ১৫)। প্রশ্ন হলো- সরকার কেন আদিবাসী বলতে সম্মত নয়? সরকার মনে করে, এ-দেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বাইরে থেকে এসেছে। তাই তারা এদেশের ভূমিজ সন্তান নয়। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ২৬ জুলাই ২০১১ তারিখে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দিপু মনি প্রসঙ্গক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে বিবেচনা না করে বরং তার পরিবর্তে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, এথনিক মাইনরিটি হিসেবে অভিহিত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলায় কোনো আদিবাসী নেই। এ এলাকার অধিবাসীরা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। উক্ত অনুষ্ঠানে নানা যুক্তি উপস্থাপনসহ নরসিংদীর উয়ারী বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, বাঙালিরাই এ দেশের প্রকৃত আদিবাসী। চার হাজার বছরেরও আগে এ দেশে বাঙালিরা বসবাস শুরু করে যার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে উয়ারী বটেশ্বরে। উয়ারী বটেশ্বরের পোড়াতত্ত্ব অনুযায়ী এদেশের জনগণের চার হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে। প্রাচীন বঙ্গ ভূখণ্ডই আজ স্বাধীন বাংলাদেশ। এখানকার শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ এই অঞ্চলের পুরনো বাসিন্দা। যাদের ইতিহাস চার হাজার বছরের। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী আছে তারা ষোল থেকে উনিশ শতকে সুলতানি ও মোগল আমলে মিয়ানমার, কম্বোডিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আগমন করে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তাই তারা আদিবাসী নয়। সেজন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমির ফাস্ট নেশন হিসেবে তারা এ অঞ্চলের আদিবাসী হতে পারে না। বরং তারা ঐতিহাসিকভাবে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে অভিবাসনকারী জনগোষ্ঠী (*প্রথম আলো*, ২৭ জুলাই ২০১১)। ২০১২ সালের ১১ মার্চ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে জেলা

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসকদের কাছে প্রেরিত "আদিবাসী দিবস উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে" শীর্ষক পত্রে আদিবাসী বিরোধী বিভিন্ন বক্তব্য সহকারে আদিবাসী দিবস পালনে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়। ওই মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোঃ সারোয়ার বারী স্বাক্ষরিত পত্রটি দেশের সকল জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক হাত হয়ে তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত পৌঁছয়। উক্ত পত্রে যে-সকল নির্দেশনা দেওয়া হয় তা হলো- আদিবাসী দিবসের সময় সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যাতে আদিবাসী বিষয়ে সরকারি নীতির সাথে বিরোধাত্মক এমন কোনো বক্তব্য প্রদান না করে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা, আদিবাসী দিবসের কোনো কর্মসূচিতে সরকারের পক্ষ থেকে যাতে সহযোগিতা প্রদান করা না হয় সেজন্য গুরুত্বসহকারে তদারকি করা, এবং সবচেয়ে মারাত্মক, ক্ষতিকর ও নেতিবাচক যে নির্দেশনা দেওয়া হয় তা হলো– প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রদর্শনপূর্বক বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই এই প্রচারণার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা (মন্তাজ, ২০১৪: ১৫)।

দেখা গেছে, রাষ্ট্রীয় এই বিরুদ্ধাচরণ কেবল রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে জাতিসংঘ পর্যন্ত পৌঁছায়। ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘে আদিবাসীদের দশম আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দিপু মনি আদিবাসীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলেন, বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই, এ-দেশে এথনিক মাইনরিটির মানুষ বাস করে। এ-সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছু সরকার করছে। যেমন, নতুন মন্ত্রণালয় গঠন, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন প্রভৃতি। তবে অবশ্য ঐ ফোরামে সরকারি প্রতিনিধির উক্ত বক্তব্য খণ্ডন করে অপর এক বেসরকারি নারী প্রতিনিধি (ফেরদৌস, ২০১১)।

রাষ্ট্র ও রাজনীতির বাইরে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়েও অনেকে আদিবাসী অভিধার বিপক্ষে। যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক খুরশিদা বেগম (২০১৩)-এর বক্তব্য আদিবাসী অভিধার বিরোধিতার বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা দেয়। তাঁর মতে–

> "আদিবাসী পদটি একটি স্থানিক ও কালিক যোগসূত্রগত ভাষ্য। যে জনগোষ্ঠী আদিকাল থেকে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে আসছে, তারা সেই অঞ্চলের আদিবাসী (Indigenous people)। স্পষ্টত আদিম বা আদি মানুষ ও আদিবাসী সমার্থক নয়। কোনো অঞ্চলের বিশেষ নৃগোষ্ঠীভুক্ত আদিমানুষ ওই অঞ্চলের 'আদিবাসী' না-ও হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার আদি মানুষ বা গোত্রজ ব্যক্তি আমেরিকায় বসবাস শুরু করতে পারেন; কিন্তু তিনি আমেরিকার আদিবাসী নন। তা

> ছাড়া একটি দেশে একের অধিক নৃগোষ্ঠীর কার কতকালের অধিবাস, সেই ঐতিহাসিক তথ্য-রেকর্ডসূত্রেও প্রাচীনতম অধিবাসীই ‘আদিবাসী’। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে চাকমাসহ অন্য ছোট ছোট নৃগোষ্ঠীভুক্ত নাগরিকদের আগমন ও অধিবাস কয়েকশ বছরের মাত্র। এই ঐতিহাসিক সত্য নির্দেশ করে ছোট নৃগোষ্ঠীগুলোর ‘আদিবাসী’ পদ লাভ মূলত অসত্যে আসক্তি ও তাদের নেতৃত্বের অসততা ও অসচেতনতা।”

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন মনে করেন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলার দাবি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্ররোচিত বিশেষ অভিসন্ধিজাত। তিনি বলেন–

> “আমেরিকার পূর্ব উপকূলে ১৭ শতকের গোড়া থেকে ইউরোপীয় অভিবাসন শুরু হয়। তাহলে অভিবাসী মার্কিনদের আদিবাসী না বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীদের কেন আদিবাসী বলা হচ্ছে।...সব ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আর বড় জাতিসত্তা বাঙালি নিয়ে বাংলাদেশ। সুতরাং বাংলাদেশের মানচিত্রের ভেতর কোন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি যুক্তিযুক্ত হলেও তার আত্মঅধিকার প্রয়োগের প্ররোচণা অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রসূত।” (উদ্ধৃত: ত্রিপুরা, ২০১৫: ১০২)

তবে দেশের বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও গবেষকগণ নৃগোষ্ঠীর মানুষদের আদিবাসী বলার পক্ষে এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছে। এ বিষয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট আবুল মোমেন (১৯৯৬) “বাংলাদেশে কি সত্যিই আদিবাসী নেই?” শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন–

> “বাংলাদেশে আদিবাসী আছে। যদি গারো ও সাঁওতালরা এখন নিজেদের পরিচয় বাঙালি সমাজের সঙ্গে লীন করার পরিবর্তে স্বতন্ত্র পরিচয় তুলে ধরতে আগ্রহী হয় ও আদিবাসীরূপে স্বীকৃতি দাবি করে, তাহলে বাঙালি সমাজ ও সরকারকে তা দিতে হবে।”

তদ্রূপ, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ (১৯৯৩) বলেন–

> “বাংলাদেশ শুধুমাত্র বাঙালিদের আদি বাসভূমি নয়।...অনেক গোষ্ঠী আছে যারা বাঙালিদের তুলনায় কম গভীরভাবে এখানে প্রোথিত নেই।...কিন্তু এটি ভীষণ জরুরি যে, এরা বাঙালি নয় তা মনে

Dhaka University Institutional Repository

> রাখতে হবে।" এমনকি বাঙালি নিকটতম জ্ঞাতি সম্পর্কেও সচেতন নয়। বাঙালির নিকট জ্ঞাতি হচ্ছে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, নাগা, কুকি, তিব্বতি, কাছাড়ি, অহোম প্রভৃতি।"

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ক্ষমতাবহির্ভূত থাকাকালে সকল রাজনৈতিক দলই আদিবাসীদের দাবি ও অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার। কিন্তু নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করার পর তাদের অবস্থান পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন আর আদিবাসীদের দাবি স্বীকার করতে চায় না। বরং অদিবাসীদের দাবির বিরুদ্ধাচরণ করে। অথচ বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর তাদের নিজস্ব পরিচয়ে পরিচিত হবার অধিকার আছে। তাদের উপর রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া পরিচয় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মূলত রাষ্ট্র তার শক্তি ও সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে তাদের আদিবাসী পরিচয় অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু আদিবাসীরা নিজেদের 'উপজাতি' পরিচয় প্রত্যাখ্যানপূর্বক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইংরেজি 'Indigenous peoples'-এর বাংলা পরিভাষা 'আদিবাসী' হিসেবে পরিচয় দিতে ইচ্ছুক।

১.৫ পূর্বানুমান

যে কোন সামাজিক গবেষণা কর্মের শুরুতে গবেষণা বিষয় সম্পর্কিত একটি পূর্বানুমান গ্রহণ করতে হয় (বেগম, ১৯৯৭: ৫২)। পটুয়াখালীর রাখাইন নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে গবেষকের পূর্বানুমান অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। আদিবাসীদের প্রকৃতির সন্তান বলা হয়। ভূমি ও অরণ্যকে ঘিরেই তাদের জীবনযাত্রা। ব্রিটিশ আমলে রাখাইনরা নিজেদের কৃষি উৎপাদন দিয়ে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো। তারা বাণিজ্যের জন্য উৎপাদন করতো না। নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী মৌসুম ভিত্তিতে তারা ফসল ফলাতো। তাদের জীবনযাপনে কোন সমস্যা হতো না। তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাসাচ্ছাদন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্তির পরিণতিতে পরিবর্তিত আর্থ-রাজনৈতিক কারণে তারা ক্রমে ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। কৃষিকাজ তাদের একমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তি হলেও বিভিন্ন কারণে তাদের মালকানায় কৃষিজমি না থাকার ফলে তারা সনাতন ঐতিহ্য-বহির্ভূত নানান পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকতে না পেরে অনেকে দেশ ছেড়ে বার্মায় পাড়ি জমিয়েছে। অনেকে পাশ্ববর্তী বিভিন্ন মফস্বল শহর ও রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর করেছে। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের সম্মুখে এভাবে বহির্গমনের ফলে এ-সকল এলাকায় রাখাইন জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে তারা জীবন-জীবিকার জন্য মূলত সরকারি-বেসরকারি সহায়তা এবং বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দেশের পরিবর্তমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে না। সার্বিক বিবেচনায় গবেষক তাজরীন-এ-জাকিয়া (২০১৯: ২০) যথার্থ প্রশ্ন করেন, ম্যালথাসের তত্ত্বানুসারে যেখানে জনসংখ্যা স্বাভাবিক গতিতে বাড়ার কথা, সেখানে উল্টো জনসংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ার কারণ কী? তাঁর মতে, রাখাইনদের জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নাগরিকত্বের অসহায়ত্ব, অর্থনৈতিক সংকট, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের আনুকূল্যহীনতা, শিক্ষা, ভূমি, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ইত্যাদি। তাই এ গবেষণার পূর্বানুমান হলো, বৃহত্তর বাঙালি সমাজের উপর রাখাইনদের ক্রমবর্ধিত নির্ভরশীলতা এবং আর্থ-রাজনীতিক প্রভাবে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে তারা ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে স্থানান্তর করতে বাধ্য হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে গবেষণা এলাকায় কোন রাখাইন আদিবাসী পরিবারের অস্তিত্ব থাকবে না। এরফলে দূর-ভবিষ্যতে এ-সকল গ্রাম থেকে শত বছরের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতার গৌরব হারিয়ে যাবে।

১.৬ গবেষণা এলাকা

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলবর্তী পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার বালিয়াতলী ইউনিয়নের ৩টি গ্রাম গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। গ্রামগুলো হলো হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়া। বালিয়াতলী ইউনিয়নে মোট ২৪টি গ্রাম আছে। উল্লিখিত গ্রাম তিনটি পরস্পর পাশাপাশি অবস্থিত। স্মরণাতীত কাল থেকে প্রস্তাবিত তিনটি গ্রামসহ অত্র এলাকায় রাখাইনরা বসবাস করে আসছে। এরমধ্যে হাড়ি পাড়ায় ১৪টি, মধুপাড়ায় ৯টি ও তুলাতুলিপাড়ায় ৬টি অর্থাৎ সর্বমোট ২৯টি রাখাইন আদিবাসী পরিবার আছে। গ্রাম ৩টিতে অ-আদিবাসী বাঙালি পরিবার আছে যথাক্রমে ৯৪টি, ৫৬টি ও ১৪১টি অর্থাৎ সর্বমোট ২৯১টি। গ্রাম তিনটিতে মূলত আদিবাসীরা বসবাসের গোড়াপত্তন করলেও বর্তমানে তাদের ২৯টি পরিবার টিকে আছে। অবশিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ ২৯১টি পরিবার বাঙালিদের। অল্পকিছু জমি বাদে গ্রামগুলোর প্রায় সমুদয় জমির মালিক বর্তমানে

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালিরা। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবে আদিবাসীদের বেশিরভাগই ভূমিহীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাই রাখাইন আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর অবস্থা ও এর প্রভাব তুলে ধরার জন্য এই তিনটি গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত ৩টি গ্রাম কৃষি, বাজার-সম্পৃক্ততা, যোগাযোগ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে পটুয়াখালীর রাখাইন অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। ইতিপূর্বে এ গ্রামগুলোর উপর কোন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা সম্পাদিত হয়নি। নিম্নে বাংলাদেশের মানচিত্রে গবেষণা এলকার অবস্থান নির্দেশ করা হলো।

মানচিত্র– ১.৩

মানচিত্রে হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ার অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

উৎস : ইন্টারনেট

১.৭ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে আধিবিদ্যিক গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে বিপন্ন আদিবাসী সমাজজীবন অনুসন্ধান যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নিয়ে গবেষণার অন্যতম যৌক্তিকতা হলো এসব জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণার অভাব। আদিবাসী বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি পরীক্ষা করলে এই গবেষণার বিদ্যায়তনিক যৌক্তিকতা বোঝা যায়। আদিবাসীদের নিয়ে যে-সমস্ত গবেষণা পরিচালিত হয়েছে তারমধ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ প্রায় অনুপস্থিত। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশে অতীতের গবেষণার অভাববোধ অনুভব থেকে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান বলেন, ভারতে বা অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

দেশে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীর তথ্য, এমনকি তৎবিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি যেমন সুলভ, বাংলাদেশে উপজাতীয়দের ভাষা সম্পর্কে তেমনটি নয়। এদেশে গবেষণার অপ্রতুলতাই তার কারণ। সংখ্যালঘু জাতিগুলোর প্রকৃত পরিচিতি, যেমন নাম-উপনাম, শাখাসমূহের নাম-পরিচয় এবং অবস্থান বিষয়ক তথ্যাদি এখনও পূর্ণভাবে জানা যায়নি। অবশ্য এর বাস্তব কারণও তিনি উল্লেখ করে বলেন–

> "...এদেশের আদিম অধিবাসীদের স্বতন্ত্র্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পালন কখনো এক-রৈখিক ধারায় অব্যাহত থাকেনি; পেশায় ও পরিচয়ে এরা ছিল পরনির্ভর। ফলে, এদের জাতিসত্তার পূর্ণ বিবরণ ও যথাযথ বর্ণনার অভাব একটি বাস্তব সত্য।" (মনিরুজ্জামান, ২০১৮)

উল্লেখ্য, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণার তাগিদ সুদূর অতীতের। ব্রিটিশ প্রশাসক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার বাংলার আদিবাসীদেরকে গবেষণার নতুন ক্ষেত্র হিসেবে মনে করেন। তাদের বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি বলেন–

> "...কিন্তু অন্যান্য জাতির বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়েছে।...অনুসন্ধান করা হলে হয়তো আরো অধিক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হতো।...ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। সরকারও আদিম অধিবাসীদের উন্নতিলাভের উপযুক্ত মনে করতেন না।...সরকার মনে করতেন যে, মরে নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত তারা নীরবে নির্বিপদে থাকলেই মঙ্গল।" (হান্টার, ১৯৬৯: ২৩)

সরকারের জাতীয় সংস্কৃতি নীতিমালা ২০০৬-এ দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এমনকি উক্ত নীতিমালায় বিশেষ করে রাখাইনের নাম উল্লেখ করে ৫.৮(খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

> "বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার জেলার রাখাইন সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে গবেষণা, তাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণপূর্বক উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করার জন্য কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডকে জোরদার করা।" (*জাতীয় সংস্কৃতি নীতিমালা* ২০০৬, পৃ. ১৯)

সাম্প্রতিক কালের আগ্রহ আরও বিশুদ্ধতায়, তুল্যমূল্য মানদণ্ডে, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আদিবাসী সমাজের সংকটাপন্ন জীবনকে বুঝতে চাওয়া। আদিবাসীরা দেশের সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। সংখ্যালঘু হিসেবে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক জাতিগত নিধন ও গণহত্যার শিকার মিয়ানমারের প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার সাম্প্রতিক দেশত্যাগে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে শরণার্থীর আশ্রয়গ্রহণের বাধ্যতায় বিশ্বের ক্ষুদ্রজাতিগুলোর বিরাট অস্তিত্ব-সমস্যাকে নির্দেশ করে। ঠিক পুরোপুরি অভিন্ন না হলেও বাংলাদেশে আদিবাসীদের উপর হামলার ঘটনা বিরল নয়। প্রমাণস্বরূপ ২০১০ সালে

Dhaka University Institutional Repository

রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে হামলা, ২০১২ সালে কক্সবাজারের রামু ও উখিয়ায় এবং চট্টগ্রামের পটিয়ায় বৌদ্ধপল্লিতে আক্রমণ-নির্যাতন-লুটপাট-অগ্নিকাণ্ড ও ২০১৬ সালে গাইবান্ধার সাঁওতাল পল্লিতে সংঘটিত হামলা-অগ্নিসংযোগ-উৎখাত ঘটনার[৫] উল্লেখ করা যায়। মূলত ভূমি-বিরোধের জেরে বারবার ঘটে চলেছে বিভিন্ন আদিবাসীর উপর আক্রমণের ঘটনা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ নিজেদের ভূমির উপর অধিকার হারানো। এক গবেষণা ফলাফল তুলে ধরে গবেষক অধ্যাপক সাদেকা হালিম দেখিয়েছেন, দেশের সমতল ভূমির ১০টি আদিবাসী গোষ্ঠীর বেদখল হওয়া জমির পরিমাণ ২,০২,১৬৪ একর, যার বাজারমূল্য ৬৩০০ কোটি টাকা, যা দেশের মোট জিডিপির ২ শতাংশ। এই ভূমিহীনতা নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব মূল্যবোধজাত প্রচলিত সামগ্রিক জীবনব্যবস্থায় আঘাত এনেছে। এর পরিণতিতে তাদের প্রান্তিকীকিকরণ ঘটেছে, ক্রমান্বয়ে ভূমিহীন হয়ে কেবল জীবন-জীবিকা নয়, অস্তিত্বই সংকটের সম্মুখীন হয়ে উঠেছে (Halim, 2015)। আদিবাসীরা অধীনস্ততা, শোষণ, বঞ্চনা ও মর্যাদাহীনতার শিকার (Patam, 2003)। বিপদাপন্ন আদিবাসী সমাজের সমস্যাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে গেলে তাদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে হবে। বক্ষমান গবেষণাকর্ম সেদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অতীতে অন্যান্য আদিবাসীর ন্যায় রাখাইনদেরও নিজস্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক জীবনযাপনব্যবস্থা ছিল। বিপন্ন রাখাইন আদিবাসী সমাজ আধুনিক জীবনযাত্রার অন্তরালে যতদূর সম্ভব নৈসর্গিক পরিবেশে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রাখতে চাক না কেন, বর্তমানে নানাবিধ নতুন অবস্থার চাপে তাদের জীবন সংস্কৃতিতে নতুন চিন্তা ও প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। বাইরের থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা মানুষরা তাদের বাসভূমি, চাষভূমি জবরদখল করে, নিজেদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে প্রান্তবর্তী করেছে, সমাজের সবচেয়ে অনগ্রসর ও অধিকারহীন করে রেখেছে। এই প্রক্রিয়ায় কালের পরিক্রমায় বাজার অর্থনীতির মতো বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় কারণে তাদের জীবনাচরণে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যে এক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা রাখাইন সমাজের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ তা ভেঙে গিয়ে তাদের মধ্যে সামাজিক অনিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মুখে অনেকে দেশ ছেড়ে চলেও যাচ্ছে। পটুয়াখালীতে যেখানে ১৯৭০ সালে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার রাখাইন ছিল সেখানে রয়েছে মাত্র হাজার পাঁচেক (কামাল, ২০০৯: xxx)। এই অভিবাসন চলতে থাকলে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে রাখাইন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকবে না। বাংলাদেশ হারাবে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের গৌরবের অহংকার। উল্লেখ্য, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগের বিষয়টি একেবারে নতুন নয়। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নানাবিধ কারণে অনেক আগে থেকে এ-ধারা চলে

Dhaka University Institutional Repository

আসছে। বাংলাদেশে মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর হ্রাস প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক রংগলাল সেন বলেন–

> "পাকিস্তান আমলে পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা যেখানে ছিল শতকরা ৩৩ ভাগ...কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ১৯৭১ সনে জাতি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির সম্মিলিত আত্মত্যাগের বিনিময়ে যে লোকায়ত রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রায় আড়াই দশক পরে হিন্দুসহ সকল অমুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মাত্র শতকরা প্রায় ১২ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। অমুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস পাবার প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের অব্যাহত দেশত্যাগ, যা নীরবে ঘটছে এবং যার কোন সরকারি স্বীকৃতি অন্তত আদম শুমারিতে পাওয়া যায় না।" (সেন, ১৯৮৫: ১১৬-১৭)

সমাজবিজ্ঞানে যেকোন সমাজে পৃথকীকরণ, মেরুকরণ ও স্তরবিন্যাস সৃষ্টির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (সেন, ১৯৮৫: ১১৫)। এই গবেষণায় রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক জীবনের পরিবর্তন বিশ্লেষণ এবং পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে রাখাইনদের ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডলে জ্ঞানের বিস্তারে সহায়ক হবে, বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্নপ্রকারের সমস্যা সমাধানে প্রয়োগিত হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হবে যা সার্বিকভাবে বহুত্ববাদের নির্যাস ধরে রাখার সহায়ক হবে। এতদ্‌উদ্দেশ্যে এ-দেশে পূর্বে কোন সমীক্ষা পরিচালিত হয়নি। তবে কোন কোন সমীক্ষায় কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সমতুল্য কিছু উপাত্ত পাওয়া যায়। তাছাড়া, সমাজতাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে নৃগোষ্ঠীদের উপর কোন গবেষণা তেমন পাওয়া যায় না। সেদিক থেকেও নতুনত্ব আছে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই গবেষণার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

১.৮ গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নসমূহ

১.৮.১ উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পটুয়াখালী জেলায় বসবাসরত রাখাইন আদিবাসীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর সম্পর্কে জানা। প্রাপ্ততথ্য যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংকটাপন্ন রাখাইন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও প্রভাব নির্ণয়ই এই গবেষণাকর্মের মূল লক্ষ্য। গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

১. রাখাইন জনগোষ্ঠীর জনমিতিক তথ্য জানা;

২. রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা; ও

৩. রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন অনুসন্ধান করা; ও

৪. রাখাইনদের জীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব ও পরিণতি বিশ্লেষণ করা।

১.৮.২ প্রশ্নসমূহ

১. রাখাইন জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্তমানে কেমন?

২. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে কী পরিবর্তন ঘটেছে?

৩. আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন রাখাইনদের জীবনে কী প্রভাব ফেলেছে? ও

৪. পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাখাইন নৃগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ ও সম্ভবনা কী?

১.৯ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

মাঠ গবেষণায় আমাকে বড় ধরনের কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। তবে কোন একটি এলাকায় আগন্তুক হিসেবে প্রাথমিকভাবে অল্পস্বল্প সমস্যা পরিলক্ষিত হলেও তা গবেষণা কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বিশেষত হাড়িপাড়ার নিপু মাতবর, মহেন চিং মাতবর সর্বদা আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন, আমার সম্পর্কে গ্রাম তিনটির রাখাইনদের যথাসম্ভব অবগত করেছেন, একটি বিদ্যায়তনিক গবেষণাকর্ম হিসেবে গবেষণার বিষয়ে তাদের ভীতি দূরীকরণে ভূমিকা রেখেছেন যা মাঠগবেষণাকে সহজসাধ্য করে তোলে। মধুপড়ার এমং মাতবরও এ-বিষয়ে সহায়তা করেন। তবে অন্যান্য যে সীমাবদ্ধতার অনুভব করেছি সেগুলো হলো অসময়ে বর্ষার প্রকোপ, ভাষাগত সমস্যা, পানীয়জলের সমস্যা, সময়গত সমস্যা এবং আর্থিক সমস্যা ইত্যাদি।

মাঠ গবেষণার সময়কাল ছিল মার্চ থেকে মে মাস। পূর্ব ধারণা অনুযায়ী জুন মাসে বৃষ্টি শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু এ-বছর আগাম বৃষ্টিপাত শুরু হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টির প্রকোপও ছিল যথেষ্ট। যারফলে একদিকে বাসা থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে যেমন অসুবিধা হয়, তেমনি মধুপড়ার রাস্তা কিছুটা কাচা থাকায় সেখানে যাতায়াতে বেশ সমস্যা হয়।

রাখাইনরা সকলে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা বলতে পারে। তবে বয়স্কদের সঙ্গে পুরোপুরি যোগাযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছিলাম। সেক্ষেত্রে দোভাষী বিষয়টি পরিষ্কার করলে তারা সঠিকমতো উত্তর দিতে সক্ষম হন। তবে স্থানীয় বাঙালি প্রতিবেশীদের ব্যাপারে তাদের সতর্কতা সহজে বোঝা যাচ্ছিল। স্থানীয়দের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নোত্তর কিংবা অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার কিংবা গ্রুপ ডিসকাশনে তারা সাবধানী উত্তর প্রদান করে। এতে এক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা পরিলক্ষিত হয়। তুলাতুলি পাড়ায় আমরা গেলে প্রথমে গৃহস্থালী ইতস্তত বোধ করছিলেন, এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। আলাপ-চারিতার এক পর্যায়ে বিষয়টি খুলে বললে তিনি আশ্বস্ত হন।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা এলাকার পানি কিছুটা নোনা প্রকৃতির ও আয়রনযুক্ত লালচে। ফলে পানি পানের ক্ষেত্রে অল্প-একটু সমস্যা হয়েছে। এবং পেটের পিড়াদায়ক কোন শারীরিক সমস্যা যাতে না ঘটে সেজন্য সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়েছে।

আমার মনে হয়েছে এ-ধরনের গবেষণা নৃতাত্ত্বিক অংশগ্রহণমূলক গভীর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণে সম্পন্ন করলে অধিক ফলপ্রসূ হবে। কেননা কেবল সাক্ষাৎকার, আলোচনা করে জীবনের অপ্রকাশিত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না, যেগুলো সমাজের একজন সদস্য হতে পারলেই কেবল উদ্ধার করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা। এজন্য আরো প্রয়াজন পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা। এ-উভয় ক্ষেত্রে আমার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করছি।

১.১০. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা। উদ্দেশ্যাবলি সামনে রেখে প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মে সুনির্দিষ্ট একক একটি পদ্ধতি অনুসরণ না করে বরং মিশ্র পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে পদ্ধতিগত প্রধান অবলম্বন সামাজিক জরিপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি। গবেষণায় প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক– উভয় প্রকার উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রামগুলোর সামাজিক জরিপ ছাড়াও কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নসূচি নিয়ে সকল রাখাইন গৃহস্থালী প্রধানের আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও প্রত্যেক গ্রামের ২ জনের বিশেষ সাক্ষাৎ গ্রহণ করি। দরকারি তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক গ্রামে ২ জন করে প্রধান তথ্যদাতা নির্বাচন করি। প্রধান তথ্যদাতা থেকে তাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের তথ্য আহরণ করি। বয়স্ক তথ্যদাতার ক্ষেত্রে দোভাষীর সাহায্য নেওয়া হয়। এছাড়া, রাখাইন সমাজের বর্তমানের আর্থ-সামাজিক সমস্যাকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য সুদূর অতীতে ইতিহাসে ফেলে আসা জীবন, সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে তার শিকড় সন্ধান করার লক্ষ্যে তাদের জীবনযাত্রার অতীত ইতিহাস বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করার জন্য ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। উপরন্তু, গবেষণার প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রুপ ডিসকাসনসহ কয়েকটি কেস স্টাডি করা হয়েছে। মাঠকর্ম সম্পাদনের সময় চেকলিস্ট, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, ডায়রিতে নোট নেওয়ার কৌশল গ্রহণ করি। দ্বৈতীয়িক তথ্যের উৎস হলো পূর্ববর্তী গবেষণাকর্ম– গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিবেদন, পত্র-পত্রিকা ও ইন্টারনেটে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রভৃতি। মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের তথ্য-উপাত্তসমূহকে সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিবেশনের জন্য পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তা প্রয়োজনমাফিক সারণী ও লেখচিত্র সহকারে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.১০.১ গবেষণার পর্যায়সমূহ

প্রস্তাবিত গবেষণা নিম্নলিখিত পর্যায়সমূহে ক্রমান্বয়ে সম্পাদন করা হয়েছে:

পর্যায় ১ : এই পর্যায়ে নিবিড়ভাবে প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়। প্রস্তাবিত গবেষণা সুচারুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে রিসার্চ ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য একটি চেকলিস্টও তৈরি করা হয়।

পর্যায় ২ : দ্বিতীয় পর্যায়ে গবেষণা এলাকা থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

পর্যায় ৩ : সংগৃহীত তথ্যাদি গবেষণা প্রশ্নাবলির ভিত্তিতে বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করা হয়। এই পর্যায়ে একটি খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করে তত্ত্বাবধায়কের অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

পর্যায় ৪ : চতুর্থ পর্যায়ে এসে তত্ত্বাবধায়কের অভিমত ও নির্দেশনার ভিত্তিতে অভিসন্দর্ভ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

১.১১ গবেষণা নৈতিকতা

গবেষণায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নৈতিকতা বিবেচনা। সেজন্য গবেষণা নৈতিকতার প্রশ্নে মূল্যবোধ ও নীতিসমূহ কার্যকরভাবে অনুসৃত হয়েছে। বর্তমান গবেষণা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যায়তনিক জ্ঞান-অন্বেষণের লক্ষ্যে পরিচালিত। এর সঙ্গে রাজনৈতিক কিংবা অন্যকোন উদ্দেশ্যের সম্পৃক্ততা নেই। সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের অভিপ্রায়ে রাখাইন আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর ও এর প্রভাব তুলে ধরাই এ-গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এজন্য উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কোনরূপ ক্ষতি বা হুমকির সম্ভাবনা না থাকা, তাদের মর্যাদা ও সম্মানের অগ্রাধিকার, পূর্ণসম্মতি গ্রহণ, নিজস্বতা ও গোপনীয়তা রক্ষা, ছদ্মনাম ব্যবহার, পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্টতা স্পষ্টীকরণ, উদ্বিগ্নতা নিরসন, সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, সঠিকভাবে তথ্য উপস্থাপন এবং সর্বোপরি কুম্ভীলকবৃত্তি পরিহার প্রভৃতি নৈতিক বিষয় যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।

১.১২ তাত্ত্বিক কাঠামো

সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, মার্কসবাদ, নব্যমার্কসবাদ বা নির্ভরশীলতাতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ, সংখ্যালঘুতত্ত্ব, সাব-অলটার্ন তত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিশ্ববীক্ষার আলোকে গবেষকগণ আদিবাসী সমাজের প্রান্তিকীকরণকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। এই গবেষণায়

রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর তুলে ধরা হয়েছে নব্যমার্কসীয় নির্ভরশীলতা তত্ত্ব বা অনুন্নয়ন তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে।

রাখাইন সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল গোষ্ঠীগতভাবে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী। উৎপাদ পদ্ধতি প্রাচীন ও পারস্পরিক সহায়তাপুষ্ট। তাদের শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি ঐতিহ্যাশ্রয়ী, গণমুখী এবং যৌথ অংশগ্রহণমূলক। কিন্তু বাঙালি আধিপত্যের কবলে পড়ে ভূমিহীনতার কারণে ভূমির সাথে সম্পর্ক পরিবর্তন এবং কৃষির আধুনিকায়নের ফলে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে। এরফলে তাদের চিরাচরিত আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, সামাজিক সম্পর্ক, সংস্কৃতিতে পরিবর্তন হয়েছে। এসবই ঘটেছে উন্নয়নের নামে; প্রকারান্তরে নির্ভরশীলতা তৈরি করে। এই নির্ভরশীলতার চর্চা শুরু করা হয় ব্রিটিশ আমলে, যা পরবর্তীকালে অব্যাহত থাকে ও বেগবান হয়। পরিণামে রাখাইনরা প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর হয়েছে। নির্ভরশীলতত্ত্ব অনুসারে বর্তমান গবেষণার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে– রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক অনুন্নয়ন বিশ্লেষণ এবং অনুন্নয়নের কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ। গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো ষষ্ঠ অধ্যায়ে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.১৩ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশের আদিবাসী সম্পর্কিত তথ্যের প্রাথমিক উৎস উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে বিশ শতকের তিন দশক পর্যন্ত কয়েকজন ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তার লেখা বই (Khaleque, 1995)। তাদের এ প্রচেষ্টা ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সায় জ্ঞানান্বেষণের প্রয়াস। আদিবাসীদের (ট্রাইব) পূর্ব অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। এ বিষয়ে ব্রিটিশরা ফুকো-এর 'পাওয়ার-নলেজ তত্ত্ব'-এর অনেক আগে থেকেই যে যথেষ্ট সজাগ ছিল শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রমাণস্বরূপ ওয়ারেন হেস্টিংকে উদ্ধৃতি করেছেন। ১৭৮৫ সালে ওয়ারেন হেস্টিং বলেন,

> "Every accumulation of knowledge is useful to the state… it attracts and conciliates distant affection; it lessens the weight of chain by which the natives are held in subjection, and it imprints on the hearts of our own countrymen the sense and obligation of benevolence." (উদ্ধৃতঃ Bandopadhya, 2004: 681)

ব্রিটিশ সরকারি আমলাদের ওই অভীপ্সার সাথে যুক্ত হয় খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টা ও ধর্মান্তকরণ। তবে এ-কথাও স্বীকার্য যে, তাদেরই আহৃত জ্ঞানভাণ্ডার আদিবাসী ইতিহাসচর্চাকে অনেক সাহায্য ও সমৃদ্ধ করেছে। সেজন্য অনেকে মনে করেন, পি ও বোডিং-এর মতো মিশনারি এবং হান্টারের মতো

Dhaka University Institutional Repository

আমলাদের রচনা ব্যতীত সাঁওতাল ইতিহাসই বাঙালিদের কাছে অজানা থাকতো (সেন, ২০১৬)। ব্রিটিশ এই ধ্রুপদী উৎসের মধ্যে লুইন (১৮৬৯)- এর *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein- With Comparative Vocabularies of the Hill Dialects*, ডালটন (১৮৭২) -এর *Descriptive Ethnology of Bengal*, বেভারেজ (১৮৭৬)-এর *The District of Bakergong: Its History and Statistics*, হান্টার (১৮৭৬)-এর *A Statistical Account of Bengal*, ওয়াইজ (১৮৮৩)- এর *Notes on Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, রিবেক (১৮৮৫)-এর *The Chittagong Hill Tribes*, রিজলে (১৮৮৭)-এর *Peoples of India*, গ্রিয়ারসন (১৯০৩)-এর *linguistic Survey of India*, হাচিনসন (১৯০৬)-এর *Eastern Bengal and Assam District Gazetter*, প্লেফেয়ার (১৯০৯)-এর *The Garos*, মলিয়ে (১৯১০)-এর *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, হাডসন (১৯১১)-এর *The Naga Tribes of Manipur* প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তারা আদিবাসীদের শাসন করার সহজ উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে তাদের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতেন। সংগৃহীত সেসব তথ্য বিভিন্ন সরকারি প্রকাশনায় এবং বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। যদিও একাডেমিক উদ্দেশ্যের বাইরে এ-সকল তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছিল, তবুও এগুলো সমৃদ্ধ জাতিতাত্ত্বিক বর্ণনা এবং অদ্যাবধি এ-গুলোই প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য। ব্রিটিশ সরকারের সেন্সাস রিপোর্ট ও ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে আদিবাসীদের সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ব্রিটিশ রাজত্বের পরে পাকিস্তান আমলে সরকারি উদ্যোগে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় *পাকিস্তানের উপজাতি* গ্রন্থটি। এখানে আদিবাসীদের উপর সংগৃহীত তথ্য গতানুগতিক। মূলত পুরাতন তথ্যের আলোকে এ-গ্রন্থ রচনা করা হয়। ব্রিটিশ আমলের সংগৃহীত তথ্যের বাইরে নতুন কোন তথ্য-উপাদান সেখানে দেখা যায় না।

বিশ শতকের মাঝামাঝিতে আদিবাসীদের নিয়ে বিদেশি নৃবিজ্ঞানীদের বেশকিছু নতুন বই ও প্রবন্ধ পাই। এ-সকল কাজের মধ্যে হান্টার ১৯৪৮, বার্নেট (১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬৪), বেসেইনে (১৯৫৮-৬০), ব্রাউন্স (১৯৭৩), কাফম্যান (১৯৬২), লেভি-স্ট্রস (১৯৫২), সোফার (১৯৬৩, ১৯৬৪) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। স্বধীনতা-উত্তরকালে গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে সাত্তার (১৯৭১), খালেক (১৯৭৯), আহসান (১৯৯৩), গোমেজ (১৯৮৬, ১৯৮৮), আলী (১৯৮৭), ইসলাম (১৯৮৪), মজিদ (১৯৯২), কোরেশি (১৯৮৪), আলী (১৯৯৮), বিশ্বাস (১৯৮৬), খান (১৯৯৯, ২০০৬) প্রমুখ স্মর্তব্য। সাম্প্রতিককালে কিছু গবেষণায় বাংলাদেশের আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি

সম্পর্কে জানা যায়। গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে বড়ুয়া (২০০১), কামাল (২০০৯), বারাকাত (২০০৯), হালিম (২০১২), গাইন (২০০০, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫), অং (২০০৩), টিম (১৯৯১), জলিল (১৯৯১), ত্রিপুরা (২০০৭, ২০১৫), চক্রবর্ত্তী (১৯৯৮), খান (১৯৯৯), রাহমান (২০১৩), ইসলাম (২০১৭), মন্তাজ (২০১৪), বিশ্বাস (২০০৫), শাহরিয়ার (২০১৪), সেন্দেল (১৯৯৮), ব্লে (২২৫), দ্রং (২০০৪), মহসিন (২০০২), সামাদ (২০০৬), খাতুন ও সুমন (২০১৪), মহসিন (২০০২), সিংহ (২০০২), রব্বানী (২০১৩), তাজরীন-এ-জাকিয়া (২০১৯), আদনান (২০০৪), সোলাইমান (২০১৯) প্রমুখ স্মর্তব্য। তবে অধিকাংশ রচনাই পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের উপর এবং অল্প কিছু ময়মনসিংহের গারো, রাজশাহীর সাঁওতালদের, সিলেটের ত্রিপুরাদের উপর সম্পাদিত। অন্যান্য আদিবাসীদের উপর গবেষণা নগণ্য। এরমধ্যে রাখাইনদের নিয়ে গবেষণা খুবই সীমিত। বিশেষ করে রাখাইন আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে এখনো কোনো সুনির্দিষ্ট গবেষণা হয়নি।

পটুয়াখালীর রাখাইনদের বা মগদের বাংলায় আগমন, পরিচয় ও জীবনাচরণের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায় হেনরি বেভারেজের (১৮৭৬)-এর *The District of Bakergong: Its History and Statistics* গ্রন্থের বর্ণনা থেকে। বেভারেজ ১৮৫৯ সালের ২৪ জানুয়ারি ব্রিটিশ সরকারের এসিস্ট্যান্ট ম্যাজিট্রেট এন্ড কালেক্টরেট হিসেবে ময়মনসিংহে যোগ দেন। ঐ শতকের সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে চাকরিসূত্রে তিনি ৫ বছর তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলায় ছিলেন। উক্ত বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, ১৭৮৭ সালে যুদ্ধে বিতাড়িত হয়ে ৩০ হাজার আরাকানি চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের কিছুসংখ্যক বাকেরগঞ্জের চাপালিতে আসে এবং পরবর্তীকালে চাপালি, নিশানবাড়ি ও মাধবিতে বহুসংখ্যক মগ বসতি স্থাপন করে। তাদের প্রধান আবাসস্থল হচ্ছে গুলশাখালি থানা এলাকার চাপালির নিকটস্থ খাপরাভাঙ্গায়। গ্রন্থে উল্লিখিত ১৮৭২ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী বাকেরগঞ্জে মগদের সংখ্যা ছিল ৪,০৪৯ জন; এরমধ্যে পুরুষ ২,১৪০ জন ও নারী ১,৯০৯ জন। বেভারেজ ১৮৭৪ সালের অক্টোবরে এ-এলাকা পরিদর্শন করেন। তখন খাপরাভাঙ্গায় একজন ধর্মগুরু ও একটি ছোট কাইয়োং বা ধর্মীয় শিক্ষালয় দেখতে পান। তিনি জানান, মগদের জঙ্গল পরিষ্কারকারী হিসেবে সুখ্যাতি থাকলেও স্বভাবজাত অলসতার কারণে কর্মশক্তিতে ছেদ পড়ে। তাঁর চাকরির পাঁচ বছরে মগদের কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারণের উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি দেখতে পাননি। তাঁর মতে, এজন্য ইতোমধ্যে তাদের অনেকেই আরাকানে ফিরে গেছে এবং যারা আছে তাদের চারপাশের বিশাল জঙ্গল পরিষ্কার করার মতো পর্যাপ্ত লোকবল ও দৈহিক শক্তি তাদের নেই। তাঁর মতে, বাঙালিরা তাদের সত্যবাদী ও শান্তিপ্রিয় বলে মনে করলেও তাদের অনেকে ডাকাতিসহ অন্যান্য অপরাধ সংঘটন করেছে। তিনি দেখতে পান যে, মগরা নোংরা, তারা নিজেদের ঘরগুলো

Dhaka University Institutional Repository

আরামদায়ক বা সুন্দর করে তৈরি করতে পারে না। তারা কেবল জানে কিভাবে জঙ্গল পরিষ্কার করে ধান লাগাতে হয়। তবে তারা ধুলাট বা শীতকালীন ফসলের জন্য তাদের মুসলিম প্রজা ও প্রতিবেশীদের উপর নির্ভরশীল। চর কুকরি মুকরির মগরা ইঁদুরের অত্যাচারে চাষের ধান না পেয়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বলে তিনি জানতে পারেন। তিনি জানান, তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলতে ও লিখতে জানে। তবে তারা বাংলা কথ্যভাষা সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করছে। তিনি উল্লেখ করেন, বাঙালিরা তাদের চৌধুরী হিসেবে সম্বোধন করে। এই চৌধুরী সম্বোধনের প্রচলন চিলা চৌধুরী থেকে। তিনি অনেক অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছিলেন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। বেভারেজ আরো জানান, মগরা মাটির উঁচু ঢিবিতে তৈরি বাড়িতে বসবাস করে। আর গোলপাতা দিয়ে ঘর ছায়। আঁশ জাতীয় একটি দ্রব্য ও বনপাট থেকে দড়ি তৈরি করে। মগ নারীরা বস্ত্র বুনন করে। তারা আফিম সেবন করে নেশা করে। তারা পুরোপুরি সর্বভুক। চর-এলাকা থেকে সংগৃহীত কচ্ছপের ডিম তাদের কাছে সুস্বাদু ও প্রিয় খাদ্য। তাঁর বর্ণনা থেকে আরো জানা যায়, খাজনা পরিশোধের ব্যাপারে মগদের যারপরনেই আপত্তি। এমন কি খাজনা চাওয়া হলে অনেক সময় তারা নিজেদের বসতভিটে ছেড়ে জঙ্গলের অন্যত্র বসতি গড়ে তোলে।

জেমস ওয়াইজ (১৮৮৩) রচনা করেন *Notes on Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*। গ্রন্থটি উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের বিশেষ করে ঢাকার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান উপকরণ। লেখক মুসলমান, হিন্দুদের পাশাপশি অন্যান্য অনেক জাতি-বর্ণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে খাসিয়া, সাঁওতাল, বেদিয়া, চণ্ডাল, কোচ, মালো প্রভৃতি আদিবাসীর আচার-আচরণ-ধর্মবিশ্বাস-সংস্কার-সংস্কৃতির বিবরণ পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ প্রশাসক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার (১৯৪৮) ভারতীয় জনসাধারণের উপর লিখিত ইতিহাসের অভাব কিছুটা পূরণের লক্ষ্যে রচনা করেন *The Annals of Rural Bengal*। এই গ্রন্থে ভারতের জাতিগত ইতিহাস, পল্লির ইতিহাসের অভাব, ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার সময়কার অবস্থা, বাংলাদেশের নিম্নভূমির অধিবাসীদের জাতিগত উপাদান, বীরভূমের পাহাড়ি সাঁওতাল জাতির সমাজ-সংস্কৃতি, পল্লি প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রচেষ্টা (১৭৬৫-১৭৯০), পল্লি অঞ্চলে পণ্য প্রস্তুতকারী হিসেবে কোম্পানির ভূমিকা ইত্যাদি নানান দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। হান্টার বাংলার অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত, লোকচক্ষুর অন্তরালের অনেক বিষয়কে মানুষের সামনে তুলে ধরেন, যা ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বীরভূমের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ভাষা, কিংবদন্তি, জন্মকাহিনি, প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি, গ্রাম দেবতা, পুরোহিত, জাতিচ্যুতি, বিয়ে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শিকার, কৃষি, প্রশাসন, পতিত জমি উদ্ধার, দিনমজুর, দেশত্যাগ, হিন্দু মহাজনদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রবঞ্চনা, আদালতের বিচারহীনতা, সাঁওতাল বিদ্রোহ, চা বাগানে কাজ, সামরিক অবস্থা জারি, বিদ্রোহ দমন, সামরিক শাস্তি প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন।

অধ্যাপক মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া (২০০৯) সম্পাদনা করেছেন *বিপন্ন ভূমিজ: অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ : বাংলাদেশ ও পূর্বভারতের প্রতিচিত্র* গ্রন্থটি। মূলত বাংলাদেশ ও পূর্বভারতের আদিবাসী বিষয়ক গবেষকবৃন্দের বহু প্রবন্ধের মূল্যবান সংকলন এটি। এ গ্রন্থ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অর্থনীতি ও সামাজিক দাপটে ক্রমাগত আদিবাসীদের ভূমিহীন হওয়া, সামজিক বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় আদিবাসীদের নিম্নশ্রেণির জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হওয়া, সকল ক্ষেত্রে সমমর্যাদার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, যথাযথ সাংবিধানিক স্বীকৃতির অভাবের পরিণতিতে নানান সংকট উদ্ভূত হওয়া, তৃণমূলের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় যথাযথ গুরুত্ব না পাওয়া, আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তর আইন সঠিকভাবে অনুসৃত না হওয়া, ভূমি বেদখলে প্রশাসনের সহযোগী ভূমিকা পালন ইত্যাদি নানান দিক উঠে এসেছে। গ্রন্থটি আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থা জানতে অনেক সহায়ক নিঃসন্দেহে।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের উপর গবেষণা করেছেন আর ডব্লিউ টিম (১৯৯১)। গ্রন্থের নাম *The Adivasis of Bangladesh*। তিনি দেশের প্রধান কয়েকটি আদিবাসীর ভূমি-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখান, দখলকারীদের অত্যাচারে জমি হারিয়ে আদিবাসীরা ভূমিহীন নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। সরকারি-বেসরকারি নানাভাবে বনভূমির অধিকার দিন দিন সংকুচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে আদিবাসীদের প্রচলিত ভূমি অধিকার ও সময়ে সময়ে সরকার প্রবর্তিত ভূমি আইন ও বন আইনসমূহ এবং এর প্রভাব-পরিণতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী স্বপন আদনান (২০০৪) *Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh* গ্রন্থে পার্বত্য এলাকার মানুষের স্থানান্তর, ভূমিহীনতা ও জাতিগত সংঘাত প্রভৃতির আলোকে তাদের দারিদ্র্য অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি পার্বত্য এলাকার আদিবাসীদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা উপস্থাপনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তিনি কয়েকটি সাধারণ কর্ম-পরিকল্পনার সুপারিশ করেছেন। যেমন, আদিবাসী ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার সামগ্রিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এ গ্রন্থে মূলত পার্বত্য এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনধারণে কতিপয় সমস্যাসহ অর্থনৈতিক অবস্থার উপর জোর দেওয়া

হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্যাবলির বিশ্লেষণ তেমন স্থান পায়নি।

ফিলিপ গাইন (২০০০) তাঁর সম্পাদিত *The Chittagong Hill Tracts: Life and Nature at Risk* গ্রন্থে মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের ১২টি আদিবাসী নিয়ে কাজ করেছেন। এ গ্রন্থে আদিবাসীদের বৈধ কর্তৃত্ব, আদিবাসীদের এলাকার রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা ও প্রান্তিকীকরণ, পার্বত্য এলাকায় শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, আদিবাসীদের বৈধ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার অনন্যতা, পার্বত্য এলাকার নারীদের নাজুকতা ও ভোগান্তি এবং ধর্ষণের শিকার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতি ও পরিচিতির গতিশীলতা অনুধাবনের গুরুত্বসহ পার্বত্য এলাকার জন্য পরিপূরক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সম্পাদনা গ্রন্থের সকল বর্ণনায় এ-এলাকার আদিবাসীদের সমস্যাবলিকে তুলে ধরা হয়েছে। তবে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের সুনির্দিষ্ট আলোচনা যেমন নেই, তেমন তাদের জীবনের পরিবর্তন-প্রক্রিয়া এবং নির্দিষ্ট কোন সমস্যার সুনির্দিষ্ট কোন সমাধানের নির্দেশনাও নেই।

বিপি বড়ুয়া (২০০১) *Ethnicity and National Integration in Bangladesh: A Study of the Chittagong Hill Tracts* গ্রন্থে পার্বত্য এলাকার আদিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক এবং জাতীয় একীভূতকরণের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, অ-আদিবাসীদের বসতি স্থাপন, সেনাবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও ভীতি সঞ্চার, রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানে অস্বীকৃতি, ধর্ম-সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি হুমকি এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পার্বত্য এলাকাকে তিনটি প্রশাসনিক জেলায় বিভক্তিকরণের মতো বিবিধ কারণ পার্বত্যচট্টগ্রামে আদিবাসীদের জাতীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে। এ সকল পদক্ষেপকে তিনি পার্বত্য এলাকার আদিবাসীদেরকে আত্মীকরণের প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি সুপারিশ করেন, আদিবাসীদের প্রচলিত জীবনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি প্রদান এবং একইসাথে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়েই তাদের জাতীয়ভাবে একীভূতকরণের সফলতা নিশ্চিত করা যেতে পারে। তিনি এ গবেষণা-কাজে পার্বত্য আদিবাসীদের আর্থ-রাজনীতিক জীবনের সমস্যাবলি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

আদিবাসী নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকাজ করেছেন অধ্যাপক আমেনা মহসীন (২০০২)। *The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts* গ্রন্থে তিনি বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

করে পার্বত্য এলাকায় আদিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তা নির্মাণের প্রক্রিয়াকে বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তার ধারণা তৈরির প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, কিভাবে পার্বত্য এলাকার এসকল আদিবাসীদের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি আরো দেখিয়েছেন, যদিও পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেই নিজেদের পৃথক "জম্মু" জাতি হিসেবে দাবি করে, তথাপি পাহাড়িদের জন্য এটা কোন সুরাহা নয়। কেননা পার্বত্য এলকায় আদিবাসীদের মধ্যকার সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর দলগত বিবেচনায় 'জম্মু জাতীয়তাবাদ' বৈশিষ্ট্যগতভাবে কর্তত্বপরায়ণ হয়ে উঠবে। এই গবেষণায় তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রান্তিকীকরণ ও বিচ্ছিন্নতাকরণকে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে এসকল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন কিভাবে সম্ভব হবে কিংবা তারা দেশের মূলধারার জনগোষ্ঠী বাঙালিদের সাথে কিভাবে একীভূত হবে সে বিষয়ে কোনরূপ ধারণা লাভ করা যায় না। গুরুত্বপূর্ণ এ গবেষণাকর্মে মূলত দেশের চর্চিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। তবে বিশেষভাবে এ-সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সমস্যাবলি ও পরিবর্তন নিয়ে কোন বিশ্লেষণ করা হয়নি।

রামাকান্ত সিংহ (২০০২) *বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী* গ্রন্থে দেশের ২১টি আদিবাসী (মারমা ও রাখাইন পৃথক) নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনসহ তাদের সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আলোচনায় আদিবাসীদের নামকরণ, উৎপত্তির ইতিহাস, বসবাসের স্থান, গোষ্ঠী বিভক্তি, আদিবাসীদের দেহাকৃতি, সমাজ-কাঠামো, পারিবারিক জীবন, ধর্ম-কর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, বাড়িঘর, সংস্কারপ্রিয়তা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তিনি আদিবাসীদের জন্য প্রচলিত বিভিন্ন আইন-কাঠামো, তাদের উত্থাপিত বিভিন্ন দাবি, প্রতিবেদন স্মারকলিপিসমূহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

শোভা ত্রিপুরা (২০০৭) *ত্রিপুরা জাতি পরিচয়* গ্রন্থে ত্রিপুরা জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সমাজব্যবস্থা, সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মাচার ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। গবেষক উল্লেখ করেন, ত্রিপুরারা জাতিগতভাবে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তারা আনন্দ-উৎসবে মেতে থাকতে ভালোবাসে। তবে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ত্রিপুরা জাতি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে এবং খ্রিস্টীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করছে।

সমতল এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী নিয়ে অধ্যাপক আহসান আলীর (১৯৯৮) গবেষণাকর্ম *Santals of Bangladesh*। তাঁর গবেষণাকর্ম প্রধানত বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমের বরেন্দ্র অঞ্চল ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে বসবাসরত সাঁওতাল আদিবাসীর একটি জাতিতাত্ত্বিক বর্ণনা। এ গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন, বাংলাদেশে সাঁওতালরা সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন। তারা দেশের প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালিদের থেকে স্বতন্ত্য আর্থ-সামাজিক জীবনযাপন বজায় রেখেছে। মূলত অর্থনৈতিক শোষণ এবং অন্যান্য আর্থ-রাজনৈতিক কারণে সাঁওতালরা সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তারা বর্তমানে দেশের সবচেয়ে অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীতে পর্যবসিত হয়েছে। আহসানের মতে, যখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে বসবাসকারী সাঁওতালরা নিজেদের স্বতন্ত্য ঐতিহ্য বজায় রেখে আধুনিক হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে ভারতের প্রধান জনগোষ্ঠীর সাথে একীভূত হচ্ছে তখন বাংলাদেশে সাঁওতালরা প্রধান জনগোষ্ঠী থেকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাঁর গবেষণা বস্তুতপক্ষে জাতিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পাদিত এবং তিনি সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক জীবনের সমস্যাকে নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের আদিবাসী গবেষণায় তাঁর অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে বরেন্দ্র অঞ্চলের সাঁওতালদের সমস্যাকে সুনির্দিষ্ট করে কিভাবে সমাধান করা যায় এবং উন্নয়ন ঘটানো যায় সে দিক-নির্দেশনা এ গবেষণায় নেই।

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম এলাকায় বাসকারী আদিবাসীদের উপর গবেষণা করেছেন টনি ব্রে (২০০৫)। *Tribal Peoples, Nationalism and the Human Rights Challenge: The Adivasis of Bangladesh* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি বলেন, বাংলাদেশের আদিবাসীদের জীবন ও কর্মে পরিবর্তন ঘটেছে। সময় ও ইতিহাসের পথপরিক্রমায় রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে এই পরিবর্তন হয়েছে। দেশের প্রধান জনগোষ্ঠীর সাথে আদিবাসীদের আত্মীকরণ প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধিত মুসলিম সাম্প্রদায়িক আধিপত্যের প্রভাবে আদিবাসীদের রাজনীতিকরণ ঘটেছে এবং তাদের দরিদ্রতা তৈরি করেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, আদিবাসীদের আইনগত সাহায্য, জামানত, বেদখলি ও অবৈধভাবে বিক্রিত জমি পুনরুদ্ধার, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিকরণ, শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, সাংবিধানিক অধিকার বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় ও জাতীয় বেসরকারি সংগঠনগুলোর (এনজিও) প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ব্রে-এর গবেষণা বাংলাদেশের আদিবাসীদের সমস্যা অনুধাবনে সহায়তা করে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে তাদের আর্থ-সামাজিক সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়নি। তাদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়ে যেমন সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করে না, তেমনি সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা বা কৌশল সুপারিশ করা হয়নি।

অধ্যাপক আবুল বারাকাত ও অন্যান্য (২০০৯) সম্পাদিত *Life and Land of Adibashis: Dispossession and Alienation of Adibashis in the Plain Districts of Bangladesh* গ্রন্থটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, গবেষকগণ বিশেষত বাংলাদেশের সমতল ভূমির আদিবাসীদের জমি বেদখল হওয়া ও তাদের বিচ্ছিন্নতাকরণ বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষকদের মতে, সমতল এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীরা সর্বাধিক রাজনৈতিক প্রান্তিকীকরণের শিকার এবং আর্থ-সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। এমনকি সমতলের আদিবাসীদের জমি বেদখল হয়ে যাওয়ার ঘটনা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের থেকে অধিকতর ভয়াবহ। গবেষকবৃন্দ সমতল এলাকার আদিবাসীদের জমি মালিকানার পরিবর্তিত অবস্থার বিশদ চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এই গবেষণায় সমতলের আদিবাসীদের জমি হাতছাড়া হওয়ার ঘটনা তুলে ধরার নিমিত্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এ বিষয়ে সুগভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অল্প। তদুপরি তাদের গবেষণা সমতলের আদিবাসীদের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক জীবন অনুধাবনে আমাদের অনেক সাহায্য করে।

গবেষক মোঃ রাফিউল ইসলামের (২০১৭) গবেষণাগ্রন্থ *Santals and Oraons of Bangladesh: A Study of Changing Economic Life of Ethnic Communities in the Barind Region*। গবেষক বরেন্দ্র অঞ্চল জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট সদর উপজেলার সুন্দরপুর ও চাকগোপাল গ্রামে সাঁওতাল ও ওঁরাও আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তনকে তুলে ধরেছেন। ওই গবেষণা থেকে দেখা যায়, আদিবাসীরা বিভিন্নভাবে জমি হারিয়ে ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে। চাষের কোন জমি না থাকার ফলে তারা দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কেউ কেউ বাঙালিদের সাথে মিশে রিক্সা চালানো, গাড়ি চালানো, নির্মাণকাজ, বিক্রয়কর্মীর মতো নানা কাজ করে দিন পার করছে। কিন্তু এ-সকল ক্ষেত্রে তারা শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। বাঙালি শ্রমিকদের চেয়ে তারা কম পারিশ্রমিক পায়। তারা যে মজুরি উপার্জন করে তা দিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পয়োনিষ্কাশন, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও অন্যান্য চাহিদা মেটাতে পারে না। তারা তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও দরিদ্রতার সম্মুখীন। তাদের এই সমস্যা বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থা থেকে অধিকতর খারাপ। গবেষক দেখিয়েছেন, জীবন-জীবিকার তাগিদে আদিবাসীরা বাধ্য হয়ে বাঙালিদের সাথে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বাড়াচ্ছে। কিন্তু তারা সঠিক ও ন্যায্য আচরণ পায় না। বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলায় তাদের স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্মরণাপন্ন হতে হচ্ছে। এরফলে তাদের একাত্মতা ও সামাজিক সংহতির প্রতীক সনাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে। পরিবর্তিত

অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অর্থাভাবে অনেক উৎসব-অনুষ্ঠান পালন বন্ধ হয়ে গেছে। জীবন-জীবিকার বিকল্প নির্ধারণে তারা আইনি, চিকিৎসা, শিক্ষা, আবাস, স্বাস্থ্য প্রভৃতির সহায়তার জন্য খ্রিস্টান মিশনারিজ থেকে সাহায্য গ্রহণ করছে। এমনকি আদিবাসীরা সামাজিক নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির জন্য ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হচ্ছে। এভাবে সাঁওতাল ও ওঁরাওদের অর্থনৈতিক পরিবর্তন তাদের জীবন ও সত্তায় প্রভাব ফেলছে। হিন্দুয়ানা ও খ্রিস্টায়ানা পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় তাদের সত্তা হারিয়ে ফেলছে। বস্তুত তারা কিছু মৌল প্রথা চর্চা করছে এবং পরিবতর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করছে। গবেষক আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও টেকসই উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। সেজন্য উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নকালে যেমন ভূমি পুনর্বণ্টন ইস্যু, স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণ, শিক্ষা ও নিয়মিত আয়বর্ধক কার্যক্রম প্রভৃতিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মত দিয়েছেন। এছাড়াও পরিবেশগত অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ, আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, আদিবাসীদের সমস্যা নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি, সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন, আদিবাসীদের সমস্যা গুরুত্ব দিয়ে সরকার ও উন্নয়ন সংস্থার কৌশল প্রণয়নকারীদের তাদের জন্য পৃথক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে এগিয়ে আসা দরকার। গবেষক মূলত সাঁওতাল ও ওঁরাওদের অর্থনৈতিক কার্যপ্রণালীর উপর জোর দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক বিষয় আলোচিত হয়নি। তবে তাঁর গবেষণা আদিবাসীদের জীবনব্যবস্থার পরিবর্তন বুঝতে যথেষ্ট সহায়ক।

গবেষক আব্দুস সাত্তার (১৯৭১) *In The Sylvan Shadows* গ্রন্থে দেশের বিভিন্ন আদিবাসী নিয়ে আলোচনা করেছেন। পটুয়াখালীর রাখাইনদের উপর আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন, তাদের মগ নামটি বাঙালিদের প্রদত্ত। তারা মূলত আরাকান থেকে আগত। শিক্ষিত মগরা মনে করে, মগ নামটি দিয়ে তাদের তাচ্ছিল্য করা হয়। তিনি মগদের ধর্মাচার, বিবাহ ব্যবস্থা, চিকিৎসাপদ্ধতি, উৎপাদনব্যবস্থা, মৃত্যু অনুষ্ঠান, লোকসাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক জীবনের খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন।

সমতলের আদিবাসীদের উপর গবেষণা করেছেন মো. মোস্তাফিজুর রহমান (২০১৩)। তিনি দিনাজপুর ও নওগাঁ জেলার ৪টি উপজেলার ৯টি গ্রাম নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম *Plain Land Indigenous People of Bangladesh : Development Toward Ending Poverty*। গবেষক দেখিয়েছেন যে, সমতলের আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মারাত্মক

অবনতি ঘটেছে। গবেষিত জনগোষ্ঠীর ৬০% দরিদ্র, চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে ২৭.৬% যা দেশের জাতীয় দারিদ্র্য হিসেবের চেয়ে অনেক বেশি। তাদের এক-তৃতীয়াংশ (৩৩.৭%) জীবনধারণের ন্যূনতম খাদ্য সংগ্রহের সামর্থ্য রাখে না। গবেষণায় দেখা গেছে, বছরে ৩৪% লোক রাতে না খেয়ে নিদ্রায় গেছে। তাঁর মতে, আদিবাসীরা সর্বাধিক প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। তারা প্রথা-সংস্কৃতি হারাচ্ছে। তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই, নিজেদের জমা-জমির উপর নিয়ন্ত্রণ নেই এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কার্যকরী অংশগ্রহণ নেই। এমনকি নিজেদের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের কোনরকম সম্পৃক্ততা থাকে না। এ ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাদের জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি।

অধ্যাপক মাহমুদ শাহ কোরেশী (১৯৮৪) সম্পাদনা করেছেন *Tribal Cultures in Bangladesh* গ্রন্থটি। দেশের আদিবাসী বিষয়ক অন্যতম মূল্যবান গ্রন্থ এটি। দেশ-বিদেশের লেখকদের নানান দৃষ্টিভঙ্গির গবেষণা-প্রবন্ধ এখানে স্থান পেয়েছে। লেখকগণ আদিবাসীদের ইতিহাস, তাদের জীবনে নেমে আসা নানা দুর্যোগের কারণ, তাদের স্বকীয় স্বাভাবিক জীবন বজায় রাখার পন্থা, সরকারি-বেসরকারি করণীয় ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেছেন।

রাখাইন সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন মং বা অং (২০০৩)– *বাংলাদেশের রাখাইন সম্প্রদায়: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা*। লেখক রাখাইন জাতির উৎপত্তির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস ও রাজত্বকাল, ধর্ম, জীবনাচরণ, সাহিত্য, লোকসংস্কার ও লৌকিক চিকিৎসা, ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান, সংগঠন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থটি পদ্ধতিগত গবেষণা অনুসরণে প্রণীত নয়। তবে এ গ্রন্থটি রাখাইন সমাজব্যবস্থাকে বোঝার জন্য অনেক সহায়ক হবে।

গবেষক অধ্যাপক আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস (১৯৮৬) পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার বেলকাটা গ্রামে পর্যায়ক্রমে দুই বছর নৃতাত্ত্বিক গবেষণা চালিয়ে রাখাইনদের জাতিতাত্ত্বিক বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন “Ethnography of a Coastal People in Bangladesh” শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভে (অপ্রকাশিত)। গবেষক রাখাইন সমাজের জনতাত্ত্বিক চিত্র, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক সংগঠন, জীবন-সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান, রাখাইন সমাজের জীবনাচরণ পদ্ধতি এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাধারণ বর্ণনা ও সাদামাটা কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছেন। গবেষকের মতে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর সমতলের অধিবাসীরা

Dhaka University Institutional Repository

রাখাইদের কাছ থেকে জমি কেনার জন্য এখানে বসতি শুরু করে। অনেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় মাছ ধরতে ও ফার্মে চাকুরির জন্য এখানে আসে। এরা পর্যায়ক্রমে রাখাইনদের বেশিরভাগ জমি দখল করেছে। তাঁর মতে, আধুনিক প্রযুক্তি, যোগাযোগ মাধ্যম ও উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য উপকূলীয় এলাকায় অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং রাখাইনরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামগ্রিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। বিশ্বাসের গবেষণা থেকে বেলকাটা রাখাইন সমাজের একটা সাধারণ চিত্র পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সুগভীর কোনো পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না। এ গবেষণা থেকে তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গতি-প্রকৃতির স্বচ্ছ ধারণা লাভ সম্ভব নয়।

গবেষক মুস্তাফা মজিদ (১৯৯২)-এর *পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি* গ্রন্থে মূলত পটুয়াখালী জেলার পরিপ্রেক্ষিতে রাখাইনদের ভূমি সমস্যা এবং এ-বিষয়ে প্রশাসনের ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষক উল্লেখ করেন, রাখাইনরা এ-অঞ্চলের আদি অধিবাসী এবং প্রথাগত অধিকারে ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনাহূত আগন্তুক বলে চিহ্নিত হওয়ার কারণে কেউ কেউ নীরবে দেশ ত্যাগ করছে। অনুপ্রবেশকারী বাঙালিরা জোরপূর্বক রাখাইনদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের নীরব এবং কখনও স্বল্প ভূমিকা পালনের চিত্র তুলে ধরেছেন। গবেষকের মতে, এভাবে রাখাইনদের শতকরা ৩৩ ভাগ পরিবার ভূমিহীন ও ২০ ভাগ প্রান্তিক কৃষকে পরিণত হয়েছে। পরিবারগুলো পঞ্চাশের দশকের শুরু পর্যন্ত মোটামুটি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ছিল। পঞ্চাশের দশকে বাঙালি মুসলমানদের আগমন, রাখাইন জমির উপর এক শ্রেণির চক্রান্তকারী ও সুযোগ সন্ধানী বাঙালিদের আগ্রাসী মনোভাব, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, অনাবৃষ্টি, মহামারী ইত্যাদি কারণে তাদের স্বাবলম্বী অর্থনৈতিক জীবনে ছেদ পড়ে। পরবর্তীকালে সত্তরের দশকে সরকার উপকূলবর্তী এলাকায় ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করে মিঠে পানি ধরে রেখে সেচ সুবিধার বন্দোব্যবস্থা করলেও পর্যাপ্ত কৃষি উপকরণ ও কৃষি সরঞ্জামের অভাব, সর্বোপরি রক্ষণশীল ও আধুনিকায়নে অনাগ্রহী রাখাইনদের উন্নয়নে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সরকার ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, প্রশাসনের ভূমিকার কারণে এই জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের স্বাবলম্বী করার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং ক্রমাগত প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন ও বেকারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মজিদ বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার পরিপ্রেক্ষিতে রাখাইনদের ভূমি সমস্যা ও কতিপয় সাংস্কৃতিক-আচরণ তুলে ধরেছেন। তবে এখানে সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপান্তর নিয়ে কোন অনুসন্ধান নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সেলিনা আহসান (১৯৯৩)-এর *The Marmas of Bangladesh* গ্রন্থটি বান্দরবান জেলার মারমা আদিবাসীদের উপর গবেষণাকর্ম। তাঁর গবেষণায় মারমা জীবনব্যবস্থার পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। মারমাদের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক জীবন, সংগঠন ব্যবস্থা যথা–পরিবার, বিয়ে, ধর্ম, পেশা, গোষ্ঠী, উত্তরাধিকার প্রথা ও বিশ্বাস, সমাজ কাঠামো ও সাংস্কৃতিক জীবনযাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন এবং সেইসাথে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর কিছুটা আলোকপাত করেছেন। গবেষকের মতে, মারমারা যেহেতু বনের অধিবাসী সেজন্য মারমা অর্থনীতি মূলত বনকেন্দ্রিক। তারা খুব সাধারণ পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাদের প্রধান অর্থনৈতিক কার্যক্রম বন সম্পদের ব্যবহার ও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার শর্তাধীন। বনকেন্দ্রিক কার্যক্রম হলো–জুমচাষ, খাদ্য সংগ্রহ, বাঁশ ও সানগ্রাস সংগ্রহ এবং বাঁশ ও ঘাস দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি। তবে সমতল ভূমির অ-আদিবাসী লোকদের সাথে মেলামেশা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের (ক্রস কালচারাল কন্ট্রাক্ট) দরুন তাদের মৌল অর্থনৈতিক কাঠামো ও কার্যক্রম পরিবর্তনমুখী। গবেষক মারমাদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্ট শ্রেণি বিভাজন দেখতে পান। বিশেষ করে লিঙ্গ বিভাজন। সাধারণত মহিলারা সব ধরনের গৃহিণীর কাজ করে আর পুরুষরা কঠিন কায়িক শ্রমের কাজ করে। তবে মহিলারাও কঠিন শ্রমের কাজ করে। যেমন, জঙ্গল থেকে সানগ্রাস কেটে বাড়িতে নিয়ে আসা। মারমারা জুম চাষ করে তবে জমির মালিক তারা নয়। জমি সরকারের সম্পত্তি। আদিবাসী প্রধান বোমাং সার্কেলের রাজা রাজস্ব সংগ্রহ করে। মারমারা জুম চাষের পাশাপাশি সমতল ভূমিও চাষ করে। সমতল ভূমি চাষের জন্য মারমারা হয়তো ভাগ চাষ করে নতুবা জমি লিজ নেয় যা আমলনামা নামে পরিচিত। এ-ব্যবস্থা চালু হয় ১৯৬৮ সালে। গবেষক মারমাদের মধ্যে শ্রম-বিনিময় কিংবা নগদ অর্থের বিনিময়ে শ্রম প্রদান ব্যবস্থা সচরাচর দেখতে পান। ব্যতিক্রমী কাজ হিসেবে তিনি কয়েকজনকে শিক্ষকতা, হাসপাতালে আয়া, মহাজনী ব্যবসা, দর্জির কাজ ও দোকানদারি করতে দেখেছেন। মারমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম মূলত জীবিকানির্বাহমূলক বা ভোগের জন্য উৎপাদন। প্রতিযোগিতা ও মুনাফা লাভের অনুপস্থিতির জন্য প্রকৃত অর্থনৈতিক অর্থে আয় বলতে যা বোঝায় তা তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয় না। আহসানের গবেষণায় মারমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়, তবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্য ও পরিবর্তন জানা যায় না।

অধ্যাপক আবদুল মাবুদ খান (1999) *The Maghs: A Buddist Community in Bangladesh* গ্রন্থে বাংলাদেশে রাখাইনদের আগমন ও বসতি স্থাপনের ইতিহাস, আরাকানের ইতিহাস, আরাকানের জনগন, রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক জীবন, ধর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতির

বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মগ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করে তারা মারমা এবং যারা সমতল ভূমিতে বাস করে তারা রাখাইন নামে পরিচিত। সমতল ভূমির রাখাইনদের অর্থনীতির ভিত্তি কৃষি। তিনি কৃষকদের তিনভাগে ভাগ করেছেন : (১) ধনী কৃষক, (২) মধ্য কৃষক, (৩) ভূমিহীন কৃষক। এই তিন শ্রেণির মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলে লোক বেশি এবং প্রকৃত কৃষক বিবেচনায় তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্তি সর্বাধিক। গবেষকের মতে, বিস্ময়কর যে, বৃহত্তর পটুয়াখালীতে মাত্র কয়েকজন ব্যবসা কাজে জড়িত। পটুয়াখালীর কলাপাড়ার তালতলীর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রে তারা নিজেদের ট্রেডার্স ও ব্যবসায়ী হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। তা সত্ত্বেও শিক্ষা রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন সূচিত করেছে। তারা বর্তমানে টাকার মূল্য বোঝে, সেজন্য তারা টাকা উপার্জনে সচেষ্ট। এদের সংখ্যা কম হলেও এ-উদ্যোগ মূলত সমাজ আধুনিকায়নের প্রচেষ্টা। এদের কোনো কোনো পুরুষ ও নারী বিভিন্ন অফিসে চাকুরি পেতে আগ্রহী। খান মূলত রাখাইনদের ঐতিহাসিক পরিচয়ের সূত্র সন্ধানের উপর জোর অনুসন্ধান চালিয়েছেন। তিনি রাখাইন ও মারমাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে মিল-অমিল আছে তাও অল্প-বিস্তর তুলে ধরেছেন এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের উপর জোর দিয়েছেন। গভীর সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এখানে পাওয়া যায় না। আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোনরূপ তথ্য তিনি সংগ্রহ করেননি। তাই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের চিত্রও তাঁর গবেষণায় অনুপস্থিত।

Muhammad Samad (2006) রচিত "The Rakhainnes in Bangladesh : Ethnic Origin, Life Livelihood" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে বাংলাদেশে রাখাইনদের আগমনের প্রেক্ষাপট, দৈনন্দিন জীবনাচরণসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধ রাখাইনদের অভিবাসিত জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা জানতে সহায়তা করে।

তাজরীন-এ-জাকিয়া (২০১৯) রচনা করেছেন গবেষণা প্রবন্ধ “বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা”। এ-প্রবন্ধে গবেষক রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা অর্থাৎ তাদের অভিবাসনের প্রেক্ষাপট, দৈনন্দিন জীবনের সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পেশা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তাঁর গবেষণা এলাকা কক্সবাজার পৌরসভার অধীন দুটি রাখাইন পাড়া। তথ্য পর্যালোচনায় তিনি দেখান, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকে নিজস্ব সংস্কৃতির গণ্ডি ছেড়ে তারাও নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। নিজেদের সম্প্রদায়গত বৃত্তি ধরে রাখছে না। ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব, উন্নত

প্রযুক্তি ও শিক্ষার কারণে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জীবনযাত্রার গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে প্রাত্যহিক জীবনাচরণে। তারা নিজেদের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের চেষ্টা করে যাচ্ছে। গবেষক মনে করেন, রাখাইনদের ভূমি, শিক্ষা ও ভাষা, সংস্কৃতির বিস্তার, ঐতিহ্যবাহী শিল্পের মান ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিপণন প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, মৎস্য শিকারিদের ভীতি দূরীকরণ, শ্মশানভূমির অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে রাষ্ট্র ও সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এ গবেণায় খুবই স্বল্প পরিসরে আর্থ-সামাজিক অবস্থার মাত্র কয়েকটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা এলাকা কক্সবাজার পৌরসভা হওয়ায় পটুয়াখালী এলাকার রাখাইনদের থেকে জীবনধারণের অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে।

অধ্যাপক Mahmudul Sumon (2003) রচিত "Adibasi land law, anthropology and historical reconstructions : Binding upon the Adibasis?" শীর্ষক প্রবন্ধে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে বসবাসকারী আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকারে যেভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষক আদিবাসীদের কিভাবে ব্রিটিশ যুগে উপজাতিকরণ করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। নৃগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার ও সমস্যার স্বরূপ অনুসন্ধানে প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান।

অধ্যাপক গোলাম রব্বানী রচনা করেছেন “ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন” শীর্ষক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে গবেষক ত্রিপুরাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার চিত্র তুলে ধরেছেন। গবেষক দেখিয়েছেন, আগের মতো জুমের ফলন না থাকায় কৃষিজীবী ত্রিপুরা জুমিয়া পরিবারগুলোতে রয়েছে চরম আর্থিক দুর্দিন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। সঠিকভাবে চর্চা এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে, মাতৃভাষাসহ লোকজ সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস, ইহিতাস-ঐতিহ্য, প্রথা-পদ্ধতি, ইত্যাদি মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের জীবন-জীবিকার সংকট, ভূমি থেকে উচ্ছেদ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের উদাসীনতা ও বৈষম্য, ধর্ষণ ইত্যাদি বিষয়াবলি উদ্বিগ্ন করছে। গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ও সরকারি সেবা-সুবিধার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারা ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, হেপাটাইটিস ও এনেমিয়া রোগে আক্রান্ত। তাদের জীবনে ভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদসহ নানান সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।

মনিরুজ্জামান রাখাইনদের নিয়ে সর্বাধিক সংখ্যক বিদ্যায়তনিক গবেষণা-প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তবে তিনি মূলত রাখাইন-মারমাদের ভাষা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। “প্রান্তিক

Dhaka University Institutional Repository

সীমায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার অবস্থান ও সংযোগ প্রকৃতি : রাখাইন প্রসঙ্গ” (১৩৯৪) শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন রাখাইনদের বিভিন্ন গোত্রের ভাষা পার্থক্য স্পষ্ট। বাংলা ভাষার সঙ্গে তার আমূল পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্কহীনতাকেও তিনি তুলে ধরেছেন। ভাষার ব্যবহার থেকে রাখাইনদের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের অভিন্ন বা সমনৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পার্থক্যকেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

উল্লিখিত সাহিত্য পর্যালোচনা বর্তমান গবেষণা গবেষণা সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রভূত কাজে এসেছে।

১.১৪ অধ্যায় বিন্যাস

গবেষণাকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্ত অভিসন্দর্ভের অধ্যায়সমূহ নিম্নরূপ ৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে :

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকাসম্বলিত এই অধ্যায়ে গবেষণা-সমস্যার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সাধারণ বর্ণনা, গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি ও প্রশ্নসমূহ, রাখাইনদের পরিচয়, সাংবিধানিক অধিকার ও বিতর্ক, গবেষণার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা এবং প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা প্রভৃতি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি ও কৌশল বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে রাখাইন জনগোষ্ঠীর নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং বাংলাদেশে তাদের আগমনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এই অধ্যায়ে গবেষণা এলাকার প্রতিবেশ ও সামাজিক পটভূমি উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে গবেষণা এলাকার অবস্থান, গ্রাম বিন্যাস, ঐতিহাসিক পটভূমি, জলবায়ু, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা, ঋতু পরিক্রমা প্রভৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: এ অধ্যায়ে গবেষণা এলাকার সামাজিক সংগঠনসমূহ যেমন গোত্র, গোষ্ঠী, পরিবার, বিয়ে, জ্ঞাতিসম্পর্ক, সমাজ প্রভৃতির পরিবর্তন ও বর্তমান অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়: রাখাইন সমাজে কেন পরিবর্তন ঘটেছে, কিভাবে পরিবর্তন এসেছে, সংঘটিত পরিবর্তন সমাজে কি প্রভাব ফেলেছে ইত্যাদি বিশ্লেষণের জন্য সমাজবিজ্ঞানের নির্ভরশীলতা তত্ত্ব প্রয়োগ করে গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

সপ্তম অধ্যায় : গবেষণা এলাকার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ-অধ্যায়ে। প্রধান বিষয়গুলো হলো জনসংখ্যা, জনগোষ্ঠীর বয়ঃবিন্যাস, শিক্ষা, ভাষা দক্ষতা, পরিবার ধরন ও আকার, বৈবাহিক অবস্থা, জমি মালিকানা, পেশা, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, এনজিও সম্পৃক্ততা, ঋণ গ্রহণ, নারীদের কর্ম সংযুক্তি, গৃহের ধরন, পানীয় জলের উৎস ও মালিকানা, বিভিন্ন সম্পদের মালিকানা, জমি বন্ধক, পত্তন বা বর্গা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, বিনোদন, তাঁত শিল্প, লোক-সংস্কৃতির বিলুপ্তি, জলবায়ুর পরিবর্তন, অভিবাসনের সম্ভাবনা, প্রতিবেশি বাঙালিদের আচরণ, রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি, জমি হারানো, জমি বিক্রি, মামলা, সাম্প্রদায়িক ভীতি প্রভৃতি বিষয়ের সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়: সর্বশেষ এ-অধ্যায়টিতে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তসমূহ একত্র করে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং রখাইন আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের বহুমুখী বিশ্লেষণের সমন্বিত ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ সামগ্রিক গবেষণার একটি সার-সংক্ষেপ ও উপসংহার উপস্থাপন করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

এছাড়া সবশেষে কয়কটি পরিশিষ্ট, বিভিন্ন প্রশ্নমালাসমূহ যার অন্তর্ভুক্ত, এবং একটি গ্রন্থপঞ্জি ও কিছু স্থিরচিত্র প্রদান করা হয়েছে।

১.১৫ গবেষণার গুরুত্ব

বাংলাদেশে নৃগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা খুব প্রাচীন নয়। যেজন্য হান্টার অবাক হয়ে মন্তব্য করেন, 'প্রায় তিন কোটি মানুষ একশো বছর যাবৎ ব্রিটিশ শাসনাধীনে বাস করলেও এখনো তাদের উৎপত্তি, ভাষা ও জীবনপদ্ধতি সভ্য জগতের কাছে অপরিচিত রয়েছে, বিষয়টি সত্যিই বিস্ময়কর।' (১৯৬৯:১২২) বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ও সামাজিক মনোবিজ্ঞান চর্চার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ফরাসি সমাজ গবেষক লেভি-স্ট্রস ১৯৫০ সালে ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শন করেন এবং বাংলাদেশকে সামাজিক নৃবিজ্ঞানের স্বর্গ বলে অভিহিত করেন। কার্যত কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। কিন্তু সামাজিক নৃবিজ্ঞানের এই স্বর্গভূমিতে আদিবাসীদের নিয়ে খুব বেশি গবেষণা এখনো

সম্পন্ন হয়নি। অথচ এ-দেশের প্রত্যেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যময় জীবনাচরণ পদ্ধতি রয়েছে।

বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলায় বসবাসকারী আদিবাসী রাখাইনদেরও রয়েছে পৃথক এবং স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও জীবনাচরণ পদ্ধতি। বর্তমান গবেষণাটি রাখাইনদের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক জীবনকে জানার একটি প্রচেষ্টা। বলা হয়, দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি সমস্যা সম্পর্কে যত গবেষণা হয়েছে বাংলাদেশ হচ্ছে এদের মধ্যে সবচেয়ে কম গবেষণালব্ধ এলাকা। এ এলাকার নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কেও এ কথাটি প্রযোজ্য (আরেফিন, ১৯৯৪: ১১)। আর সমতল ভূমির আদিবাসীদের উপর উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা নেই। যৎসামান্যের অধিকাংশই পাহাড়ি বনাঞ্চলের আদিবাসীদের উপর। স্মরণাতীতকাল থেকে এই বঙ্গ সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদকে লালন করেছে। রাখাইনরা তার অন্যতম সাক্ষী। অথচ এই জনগোষ্ঠী বিলীয়মানতার গহ্বরে ক্রম অগ্রসরসরমান। রাখাইনদের উপর পরিচালিত বিদ্যায়তনিক মাঠভিত্তিক গবেষণাকর্ম যথেষ্ট নয়। তাই এ গবেষণা গুরুত্বের দাবিদার। এ গবেষণার মাধ্যমে রাখাইনদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-প্রণালীর ধরন ও পরিবর্তন এবং সামর্থ্য সম্পর্কে যা কিছু জানতে পেরেছি তা তুলে ধরা হয়েছে। এরফলে রাখাইনদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে, তেমনি বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক অন্তর্দৃষ্টি লাভ সম্ভব হবে। বিশেষ করে এ-গবেষণা অনুসন্ধিৎসু গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের কাজে আসবে। এ-ছাড়া এই গবেষণার বাস্তব গুরুত্ব এই যে, এ গবেষণা বাংলাদেশের আদিবাসীদের গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক পরিকল্পনাবিদ ও নীতি নির্ধারকদের ব্যবহারিক কাজে লাগবে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে রাখাইনদের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সরকারি বা বেসরকারি গৃহীতব্য যে-কোনো প্রকল্পকে বাস্তবমুখীকরণে সহায়তা করবে। অধিকন্তু, প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যৎ গবেষকদের সহায়ক হবে এবং রাখাইনসহ অন্যান্য নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে আরো গবেষণায় ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবে।

১.১৬ উপসংহার

বঙ্গীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ গড়ে তোলার পিছনে শ্রমজীবী আদিবাসী সমাজের দান অপরিসীম। বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী সুদীর্ঘকাল ধরে বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছে। বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, জাতিগত ঐতিহ্য, শিল্প আর ললিতকলা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে (রায়, ২০০৭)। তাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি, প্রথা, অভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, আচার-অনুষ্ঠান, দৈহিক-

Dhaka University Institutional Repository

মানসিক গঠন, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাঙালিদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। তাদের জীবন-সংস্কৃতি প্রকৃতি নির্ভর– ভূমি, পানি ও গাছপালার গুরুত্ব অপরিসীম। সেজন্য আদিবাসীদের ভূমি অধিকারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে (ডি'সুজা, ২০০৭)। কিন্তু বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে এসব নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতিতে ঘটেছে পরিবর্তন, জীবন হয়ে পড়েছে দুর্বিসহ। গবেষণা এলাকার প্রায় সকল রাখাইন পরিবারই অসচ্ছল। তারা অত্যন্ত অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। কৃষিভিত্তিক রাখাইন সমাজের অধিকাংশ পরিবারের কৃষি জমি দরিদ্র্যতা ও ভূমিদস্যুদের জবরদখলের কবলে পড়ে বেহাত হয়ে গেছে। অনন্যোপায় হয়ে তারা ভাগচাষী, দিনমজুর বা অন্য কোন উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। অনেকে অনিচ্ছায় ভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণে তাদের সমাজ ও সাংস্কতিক জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে। প্রায় অর্ধ শতকেরও বেশি সময় ধরে একটি সম্পূর্ণ গ্রাসাচ্ছাদন অর্থনীতি থেকে বাজারভিত্তিক অর্থনীতিতে রাখাইন আদিবাসীর ট্রানজিশন চলছে। এসবই ঘটছে উন্নয়নের নামে– তাদেরকে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে অনুন্নয়নের চক্রে আবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। নির্ভরশীলতার অবয়বে আচ্ছাদিত পরিবর্তিত জীবনব্যবস্থায় বহু কষ্টশিস্টে টিকে থাকার চেষ্টা করলেও অনেক পরিবার খাপ খাওয়াতে না পেরে ক্রমাবনতির মুখে দেশ ত্যাগ করে আদি ভূমি মিয়ানমারে পাড়ি জমিয়েছে। রাখাইনদের উপর পরিচালিত এই গবেষণা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তথা আদিবাসীসমাজ পরিবর্তনের গবেষণায় কিছুটা অভাব মেটাতে সক্ষম হবে। এই গবেষণা রাখাইনদের আদি সমাজব্যবস্থার ধরন, পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রকৃতি, সমাজ পরিবর্তনের প্রধান কারণ এবং প্রভাব এবং পরিবর্তিত জীবনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান আদিবাসীদের সমাজ পরিবর্তনের এক নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করবে।

টিকা

১. সম্প্রতি *দৈনিক যুগান্তর*-এর ৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখের সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বর্তমানে পৃথিবীতে ৭০ টিরও বেশি দেশে প্রায় ৩৫ কোটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ।

২. এঁরা হলো : গারো, খাং, ম্রো, বন, চাকমা, চাক, পাঙ্খুয়া, লুসাই, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চ্যাঙ্গা, রাখাইন, খাসিয়া, মণিপুরি, কুকি, উসাই, লুয়া, খামি, হাজং, বানাই, কোচ, ডালু, সাঁওতাল, পাহাড়ি, মুন্ডা, মাহাতো, সিং, খড়িয়া, খন্দ, গোর্খা, পাহান, রুইয়ার, মুসার, হদি, পাল, মিকির, রাজ, বেদে, বাগদি, কোল, রাজবংশি, পাত্র, মুরির, তুরি, মাহালি, মালো, ক্ষত্রিয় ব্রাক্ষ্মণ, গন্দ ও কাছারি (দেখুন : ASK, 2007)। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামও দেশে ৫৪টির অধিক নৃগোষ্ঠী আছে বলে দাবি কওে (দেখুন : চাকমা, মঙ্গল কুমার, ২০১৬: ৭)।

৩. খালেকের মতে, কোন কোন গবেষক দুটি সম্প্রদায়কে একটি হিসেবে গণনা করেছেন, আবার কেউ কেউ পৃথকভাবে গণনা করেছেন। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও পদ্ধতি না থাকার কারণে এ-বিভ্রান্তি পরিহার করা সম্ভব হচ্ছে না (দেখুনঃ Khaleque, 1995)।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১৩টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী হলো : চাকমা, চাক, কুকি, খিয়াং, খুমি, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, পাঙ্খোয়া, বম, মারমা, মুরং, ম্রো ও লুসাই।

৫. উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে সংঘটিত গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতাল পল্লিতে হামলার ঘটনায় গত ২৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে সুগারমিলের জিএম (অর্থ), ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যসহ ৯০ জনকে অভিযুক্ত করে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)-এর গাইবান্ধার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবদুল হাই সরকার (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৯.০৭.২০১৯)।

তথ্য নির্দেশ

Adnan, S. (2004). *Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Cause of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, Rearch and Advisory Service, Dhaka

Ahsan, S. (1993). *The Marmas of Bangladesh*, HRDP, BARC, Dhaka

Ali, A. (1998). *Santals of Bangladesh*, Mindnapur (India): Institute of Ssocial Research and Applied Anthropology, India

ASK Research Unit (Ain O Salish Kendra). (2007). “Rights of the Adibashis” in *Human Rights in Bangladesh 2006* by Hameeda Hossain & Sara Hossain,

ASK, *Dhaka Journal of Sociology*, Vol. 5, Issue 2, January-June 2013, Nazmul Karim Study Centre, Dhaka University, Dhaka

Bandopadhya , S. (2004). *From Palashi to Partition*, Orient Longman

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (1991). *The 1991 Population Census Report*, BBS, Dhaka

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2011). *The 2011 Population Census Report*, BBS, Dhaka

Barkat, A., Hoque, M., Halim, S. and Osman, A. (2009). *Life and Land of Adibashis, Land Dispossession and Alienation of Adibashis in the Plain Districts of Bangladesh*, Pathak Shamabesh, Dhaka

Barua, B. P. (2001). *Ethnicity and National Integration in Bangladesh: A Study of the Chittagong Hill Tracts*, Har Anand Publications Pvt. Ltd., New Delhi

Beveridge, H. (1876). *The District of Bakergong: Its History and Statistics*, London

Biswas, A. A. (1986). 'Ethnography of a Coastal People of Bangladesh' (Unpublished Ph. D. Thesis), Department of Sociology, University of Dhaka

Bleie, T. (2005). *Tribal Peoples, Nationalism and the Human Rights Challenges: The Adivasis of Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka

Cooper, J. (1993). "What is an Indigenous People?", in Gain. P. (ed.) *Year of the Indigenous People, 1993,* SEHD, Report 2, Dhaka

Gain, P. (2000). *Discrepancies in Census, Socio-economic Status of Ethnic Communities*, SHED, Dhaka

.... (ed.) (2000). *The Chittagong Hill Tracts: Life and Nature at Risk*, SHED, Dhaka

Halim, S. (2015). "Land Loss and Implications on the plan land Adivasis" in Drong, S. (ed.) *Solidarity 2015,* Bangladesh Adivasi Forum, Dhaka

Harvey, G. E. (1967). *History of Burma,* London

Islam, M. R. (2017). *Santals and Oraons of Bangladesh: A Study of Changing Economic Life of Ethnic Communities in the Barind Region*, Hawlader Prakashani, Dhaka

Kapaeeng Foundation, (2015). “Human Rights Report 2014 on Indigenous Peoples in Bangladesh”. Available at: http://unpo.org/article/13718

Karim, N. (1994). *Exploitation Domination and Alienation: The Genesis of Bangladesh*, Osmania Library, Dhaka.

Khaleque, K. (1995). “Ethnic Communities of Bangladesh” in Gain, P. (ed.), *Bangladesh Land Forest and Forest People*, SHED, Dhaka

.... (1982). “Social Change Among Garo: A Study of Plain Vollage in Bangladesh” (M.A. Thesis), Dhaka University, Dhaka

Khan, A. M., (1999). *The Maghs A Buddhist Community in Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka

Majumdar, R. C. (1963). *The History of Bengal*, vol. I, Reprinted Edition, Second Impression, University of Dhaka, Dhaka

Maung, U. (2000). “Status Report on Rakhaing Community Bangladesh”, in *The Rakhain Review*, Vol. III, Coxbazar

Mohsin, A. (2002). *The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts*, University Press Limited, Dhaka

Moniruzzaman, T. (1975). *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh,* Bangladesh Book International Ltd., Dhaka

Montaz, S. (2014). “Constitutional Recognition of the Indigenous Peoples of Bangladesh”, in *Research Journali’s Journal of Sociology*, Balasore, Odisha, India.

Pakistan Government. (1963). *Pakistaner Upajati*, Pakistan Government Publication Department, Dhaka

Patam, R. (2003). “Tribalization of Ethnic Peoples: Ethnic Identity at Stake”, in Drong, S. (ed.) *Solidarity 2003*, BIPF, Dhaka

Qureshi, M. S. (ed.) (1984). *Tribal Cultures in Bangladesh*, IBS, Rajshahi University, Rajshahi

Rahaman, M. M. (2013). *Plain Land Indigenous People of Bangladesh Development Toward Ending Poverty*, Shrabon Prokashani, Dhaka

Rahman, S. S. (2014). “Going Back to Suuare One”, *First News*, March, Dhaka

Samad, M. (2006). “The Rakhainnes in Bangladesh: Ethnic Origin, Life Livelihood”, in Islam, Z. and Shafie, H. (ed.) *Anthropology on the Move: Contextualizing Culture Studies in Bangladesh,* Dhaka University Press, Dhaka

Sattar, A. (1971). *In The Sylvan Shadows,* Squib Brothers, Dhaka

.... (1975). *Tribal Culture in Bangladesh*. Muktadhara, Dhaka

Schendel, V. (2009). *A History of Bangladesh,* Cambridge University Press India Pvt. Ltd. India

Sumon, M. (2003). "Adibasi land law, anthropology and historical reconstructions: Binding upon the Adibasis?", NRIBIGGAN PATRIKA 8, Jangirnagar University, Saver, Dhaka

Timm, R. W. (1991). *The Adivasis of Bangladesh,* London

Watkins, R. D. (2015). “International Day of the World’s Indigenous Peoples 2015, Message from the UN Resident Coordinator”, in Drong, S. (ed.) *Solidarity 2015,* BIPF, Dhaka

Wise, J. (1883). *Notes on Races, Castes and Trades of Eastern Bengal,* Her Magesty’s printer Harison and Son, London

অং, মং বা, (২০০৩), *বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা*, চট্টগ্রাম

আরেফিন, হেলালউদ্দিন খান, (১৯৯৪), *শিমুলিয়া বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল কৃষি কাঠামো*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

আহমেদ, সিরাজ উদ্‌দীন (সম্পা.), (১৯৯০), *বাকেরগঞ্জের ইতিহাস*, ঢাকা

করিম, এ কে নাজমুল, (১৯৪৪), “পূর্ব সীমান্তের অধিবাসী”, দ্র. উদদীন, মুহাম্মদ আফসার (সম্পা.), (২০০০), *এ. কে. নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কামাল, মেসবাহ ও কিবরিয়া, আরিফাতুল (সম্পা.), (২০০৯), *বিপন্ন ভূমিজ: অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ: বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (২০০৬), *জাতীয় সংস্কৃতি নীতিমালা ২০০৬,* সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ঘোষ, সুবোধ, (১৩৫৫), *ভারতের আদিবাসী*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা

চাকমা, মঙ্গল কুমার, (২০০৩), “গণতন্ত্র, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং নাগরিক সমাজ: পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রেক্ষিত”, দ্র. দ্রং, সঞ্জিব (সম্পা.), *সংহতি ২০০৩*, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

..............., (২০০৯), "আদিবাসী জনগণ ও বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রে তাদের অবস্থান", দ্র. কামাল, মেসবাহ ও কিবরিয়া, আরিফাতুল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

..............., (২০১৬), *বাংলাদেশের আদিবাসী সংক্রান্ত রিসোর্স বই*, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা

চাকমা, সুগত, (১৯৮৫), *বাংলাদেশের উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

চাকমা, হিমাদ্রী উদয়ন, (১৯৮৩), *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও সংগ্রাম*, জনসংহতি সমিতি, চট্টগ্রাম

টিম, ফাদার আর ডব্লিউ, (১৯৯২), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, ঢাকা

ডি'সুজা, ব্রাদার জার্লাদ, (২০০৭), "আদিবাসীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম", দ্র. গাইন, ফিলিপ ও সাহা, পার্থ শঙ্কর, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি*, সেড, ঢাকা

তাজরীন-এ-জাকিয়া, (২০১৯), "বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা", দ্র. *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, খণ্ড ৩৬, বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৫, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা

ত্রিপুরা, প্রশান্ত, (২০১৫), *বহুজাতির বাংলাদেশঃ স্বরূপ অন্বেষণ ও অস্বীকৃতির ইতিহাস*, সংবেদ, ঢাকা

ত্রিপুরা, শোভা, (২০০৭), *ত্রিপুরা জাতি*, উত্তরণ প্রকাশনা, ঢাকা

নাহার, আইনুন ও ত্রিপুরা, প্রশান্ত, (২০১৪), "ক্ষুদ্ররা নগণ্য থাকবে, না অগ্রগণ্য হবে?", দ্র. খাতুন, সায়েমা ও সুমন, মাহমুদুল (সম্পা.), *আদিবাসী আছে?...আছে! আদিবাসী নাম বিতর্কের প্রবন্ধ সংকলন*, সংবেদ, ঢাকা

নেভী, মং ক্য শোয়ে নু, (২০০৪), "মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ", দ্র. মজিদ, মুস্তাফা, (২০০৪), *মারমা জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

প্রথম আলো, (২০১০), ৩ জুলাই, ঢাকা

..............., (২০১১), ২৭ জুলাই, ঢাকা

ফজল, আবুল, (১৮৭৭), *আইন-ই-আকবরী*, বিবলিয়োথিকা (অনু.)

..............., (১৯৪৮), *আইন-ই-আকবরী*, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা (অনুবাদঃ জারেট, এইচ এস)

ফেরদৌস, হাসান, (২০১১), "আদিবাসী আমাদের প্রথম মানব", *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৩ জুন

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, (১৯৮৭), *পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসী সমাজ*, কলকাতা

বেগম, খুরশিদা, (২০১৩), "বাংলাদেশে তথাকথিত 'আদিবাসী' প্রচারণা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রশ্নসাপেক্ষ", *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ২৮, ২৯ ও ৩০ জুলাই

বেগম, নাজমির নূর, (১৯৯৭), "সামাজিক গবেষণা পরিচিতি", সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মজিদ, মুস্তাফা, (১৯৯২), *পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

..............., (২০০৪), *মারমা জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

মনিরুজ্জামান, (১৩৯৪), "প্রান্তিক সীমায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার অবস্থান ও সংযোগ প্রকৃতি : রাখাইন প্রসঙ্গ", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৩১ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

..............., (২০১৮), "মারমা শব্দরূপ : ভূমিকা", *The Dhaka University Journal of Linguistics*, Vol. 10, No. 19, Dhaka University, Dhaka

মনিরুজ্জামান, তালুকদার, (২০০৮), *বামপন্থী রাজনীতি ও বাংলাদেশের রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (অনূ. আলী মোঃ সাহেব ও কুতুবউদ্দিন, এ. কে. এম)

মন্তাজ, সাহেদ, (২০১৪), *বাংলাদেশের আদিবাসী: পূর্বাপর*, দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা

মুহাম্মদ, আনু, (১৯৯৩), "বাংলাদেশের জাতিগত সমস্যা : পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিপ্রেক্ষিত"

মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু, (১৩৭১), *ভারত কোষ*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা

মুরশিদ, গোলাম, (২০১২), *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

মোমেন, আবুল, (১৯৯৬), *সংস্কৃতির সংকট ও সাম্প্রদায়িকতা*, সন্দেশ, ঢাকা

রশিদ, হারুন, (২০১২), "আদিবাসী সংস্কৃতিঃ বহুমাত্রিকতা ও বহুত্ববাদ", *ভোরের কাগজ*, ঢাকা, ২৭ মার্চ

রব্বানী, গোলাম, (২০১৩), "ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন", দ্র. *Journal of Sociology*, Vol. 5, Issue 2, June 2013, Nazmul Karim Study Center, University of Dhaka, Dhaka

রায়, অজয়, (১৯৯৭), *আদি বাঙালি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশেষণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রায়, রাজা দেবাশীষ, (২০০৭), "আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অধিকার ও বাঙালি সংস্কৃতির শেকড় সন্ধান", দ্র. গাইন, ফিলিপ ও সাহা, পার্থ শঙ্কর, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি*, সেড, ঢাকা

শরীফ, আহমদ, (১৯৮৩), *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সিকদার, সৌরভ, (২০১২), *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সিংহ, রামকান্ত, (২০০২), *বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী*, এএইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ঢাকা

সেন, রংগ লাল, (১৯৮৫), *সামাজিক স্তরবিন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা*

সেন, শুচিব্রত, (২০১৬), "ট্রাইব-এর কথকতা", খাসনবিশ, রতন ও অন্যান্য (সম্পা.), *অনীক*, ৫৩ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা

সেন্দেল, ভেলাম ভান ও বল, এলেন (সম্পা.), (১৯৯৮), *বাংলার বহুজাতি : বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ*, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, দিল্লি

সোলাইমান, আবেদ ইবনে, (২০১৯), *আদিবাসীদের জীবনধারা*, রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

হাওলাদার, উত্তম কুমার, (২০১১), "রাখাইনদের বৌদ্ধ মন্দির", *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি

হান্টার, ডব্লিউ ডব্লিউ, (১৯৬৯), পল্লী বাংলার ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

২. গবেষণা পদ্ধতি

কোন বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিযুক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত কর্মপ্রচেষ্টাই গবেষণা। আর গবেষণার মূলভিত্তি হচ্ছে পদ্ধতি (Kothari, 1994)। সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত দিক এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। গবেষণা পদ্ধতি সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। পদ্ধতি গবেষণার যথার্থতা নির্ধারণের অন্যতম নিয়ামক। তাই এ-গবেষণায় পদ্ধতিগত কলা-কৌশলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি মূলত একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা। এই গবেষণায় প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক– উভয় প্রকার উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২.১ গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি

ক্রমক্ষয়িষ্ণু রাখাইন আদিবাসী সমাজের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে মৌখিক তথ্যের উপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হতে হয়েছে। এর প্রধান কারণ রাখাইন আদিবাসী সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। রাখাইন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা ও পরিবর্তন সম্পর্কিত উদ্দেশ্যাবলি সামনে রেখে প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মে সুনির্দিষ্ট একক একটি পদ্ধতি অনুস্মরণ না করে বরং মিশ্র পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে পদ্ধতিগত প্রধান অবলম্বন হলো–

(ক) সামাজিক জরিপ,

(খ) সাক্ষাৎকার গ্রহণ,

(গ) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, ও

(ঘ) ঐতিহাসিক পদ্ধতি।

গবেষণায় উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বনের যৌক্তিকতা নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

২.১.১ সামাজিক জরিপ

তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সামাজিক গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি একটি অতি প্রাচীন, সুপ্রতিষ্ঠিত, জনপ্রিয়, ব্যাপক প্রচলিত ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। জরিপের সাহায্যে কোন এলাকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়ের সঠিক অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ

ছাড়াও সেই এলাকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাহিদা, অবস্থা, সমস্যা ও সমস্যার কারণ ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ তথ্য-সম্বলিত জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। যেজন্য বিদ্যাধর অগ্নিহোত্রী বলেন,

> "Social survey is broadly defined as comprehensive fact finding into numerous aspects of problems concerning social behaviour and social organizations." (উদ্ধৃতঃ Dasgupta, 1967: 119)

এই গবেষণায় প্রাথমিক উৎসের তথ্যের জন্য গবেষণাধীন তিনটি গ্রামের বাঙালি ও রাখাইন নৃগোষ্ঠীর ১০০% গৃহস্থালীর উপর সামাজিক জরিপ পরিচালনা করে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালা নিয়ে জনসংখ্যা, শিক্ষা, পেশা, স্বাস্থ্য, জমিমালিকানা, সম্পদ সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যাতে করে গ্রাম তিনটির সামগ্রিক চিত্র পেতে পারি।

২.১.২ সাক্ষাৎকার গ্রহণ

প্রাথমিকতথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে সরাসরি সাক্ষাৎকার একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য হতে জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি, রীতি-নীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ সম্ভব। গবেষণায় সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয়তার দিক-নির্দেশ করে জি. ডব্লিউ আলপোর্ট বলেন,

> "If you want to know how people feel, what they experience and what they remember, what their emotions and motives are like, and they reason for acting as they do− why not ask them?" (উদ্ধৃতঃ Lindzey, 1975: 528)

গবেষণাধীন তিনটি গ্রামে বর্তমানে সর্বমোট ২৯টি রাখাইন পরিবারের বসবাস। এই ২৯টি পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নসূচি নিয়ে ১০০% গৃহস্থালী প্রধানের আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ইতিপূর্বে প্রকাশিত আদিবাসীদের ওপর পুস্তকাদি ও প্রতিবেদনসমূহ অধ্যয়ন, পিএইচডি প্রোগ্রামের শর্ত-বিশেষ উপস্থাপিত প্রথম সেমিনারে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর পরামর্শ এবং সর্বোপরি তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনা অগাধিকারে প্রণীত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নসূচি নিয়ে, যাতে অনেকগুলো উন্মুক্ত প্রশ্ন ছিল, প্রত্যেক বাড়ি গিয়ে ২৯ জন রাখাইন গৃহস্থালী প্রধানের আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করা হয়। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে জবাব শুনে তাৎক্ষণিকভাবে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করি। যেহেতু উত্তরদাতাদের কেউ কেউ বাংলা লিখতে পারে না, সেহেতু তাদের দ্বারা প্রশ্নমালা পূরণের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এ আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার, বিয়ে, সদস্যদের বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, পেশা, আয়, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, জমি মালিকানা, বর্গাচাষ, গবাদি পশু ও অন্যান্য সম্পদ, ঋণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমিস্বত্ব, উত্তরাধিকার, উৎপাদনের ধরন, ভূমি সমস্যা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য যাবতীয় তথ্য আহরণ করি। মূলত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে সম্পূরক প্রশ্ন সহকারেও উত্তর নোট করি, যা গবেষণা পর্যালোচনা কাজে লাগানো হয়। বয়স্ক প্রবীণ তথ্যদাতার ক্ষেত্রে নবীন দোভাষীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। দোভাষী হিসেবে নিপু মাতবর, মহেনচিং মাতবর ও এমং মাতবর সহায়তা প্রদান করেন।

গৃহস্থালী প্রধানদের আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা ছাড়াও দরকারি তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক গ্রাম থেকে প্রবীণ ও নবীন সমন্বয়ে ২ জন করে মোট ৬ জন প্রধান তথ্যদাতা (Key informant)নির্বাচন করি। তাদের থেকে আনুষ্ঠানিক বিশেষ সাক্ষাৎকার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে তথ্য আহরণ করি।

২.১.৩ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

সমাজ গবেষণায় মৌলিক তথ্য-সংগ্রহ কৌশল হিসেবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বিশেষভাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ সামাজিক বিজ্ঞানের উন্মেষ ও বিকাশে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালনকারী কৌশল। Concise Oxford Dictionary অনুসারে পর্যবেক্ষণ হলো−

> "Acurate watching, noting of phenomena as they occure in nature with regard to cause and effect and mutual relationship." (উদ্ধৃত : রহমান ও শওকতুজ্জামান, ১৯৯২: ১৪২)

পর্যবেক্ষণের সুবিধা হলো, সরেজমিনে পরিদর্শন করে স্বাভাবিক ও বাস্তব পরিবেশে প্রত্যক্ষ তথ্য বা সংঘটিত ঘটনাকে হুবহু ধারণ করা সম্ভব হয়; দৃশ্যমান ঘটনা বা বিষয়কে সুশৃঙ্খলভাবে নিরীক্ষা করা যায়। যেমন লুইস হেনরি মর্গান (১৮৭৭) ইরোকোয়া সম্প্রদায়ের উপর পর্যবেক্ষণমূলক অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করে রচনা করেন বিখ্যাত *Ancient Society* গ্রন্থটি। এই গবেষণায় আমি সরাসরি অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও তথ্য আহরণ করি। গবেষক হিসেবে তিনটি গ্রামের রাখাইন নৃগোষ্ঠীর মানুষের পূর্ণ বিশ্বস্ততা অর্জন করি। আমার উপস্থিতি জনগোষ্ঠীর সাধারণ কর্মতৎপরতায় কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করেনি। তারা আমার যে-কোন কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এমনকি তারা আমাকে দেখে তাদের কোন তৎপরতা গোপন করার চেষ্টাও করেননি। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমি রাখাইনদের ভাষা, শিক্ষা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও

মনেবৃত্তি, গৃহায়ন, বিবাহ, পরিবার, লোকাচার, ধর্ম-সংস্কার, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করি।

২.১.৪ ঐতিহাসিক পদ্ধতি

গতিশীল সত্তা হিসেবে সমাজ-সংগঠন ও কার্যকলাপ তথা দল, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ভূমিকা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি কার্যকলাপের অতীত ইতিহাস বর্তমান অবস্থার সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা যায় বলে ঐতিহাসিক পদ্ধতি সমাজ গবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে বেশ প্রসিদ্ধ। সাামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের সূত্র ধরেই কার্ল মার্কস ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থার রূপরেখা অংকন করেন এবং বিবর্তনের ধারাকে তিনি 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' নামে অভিহিত করেন। আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানী টিলি (১৯৯৪: ৫৬-৭২), যিনি বেশ কিছু ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য সম্পন্ন করেছেন, ঐতিহাসিক পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে বলেন,

> "…Historical enquiry sensitises us to the fact that boundaries of social units are porous, structures keep changing, sequences never quite repeat themselves, what has happened before affects the character of the next structure, sequence or process."(Tilly, 1994;উদ্ধৃত: Rajivlochan, 2014)

এই গবেষণায় রাখাইন সমাজের বর্তমানের আর্থ-সামাজিক সমস্যাকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য সুদূর অতীতে ইতিহাসে ফেলে আসা জীবন, সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে তার শিকড় সন্ধান করার লক্ষ্যে তাদের জীবনযাত্রার অতীত ইতিহাস বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করার জন্য ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উভয় প্রকার উৎসের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নথিপত্র ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে বালিয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ, বালিয়াতলী তহশিল অফিস, কলাপাড়া উপজেলা ভূমি অফিস, কলাপাড়া উপজেলা কৃষি অফিস, ঢাকার তেজগাঁওস্থ সরকারি ভূমি অফিস প্রভৃতি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন এনজিও, যেমন : আশা, গ্রামীণ, কারিতাস, কটেক, আরডিএফ, স্পিড ট্রাস্ট, গ্রামীণ শক্তি, ব্রাক, সংকল্প, রুরাল সার্ভিস ও উপকূল প্রভৃতি।

২.২ দলগত আলোচনা

তথ্য সংগ্রহের অন্যতম কৌশল হিসেবে দলগত বা গোষ্ঠীভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক গ্রামে দলগত আলোচনাকালে ৫-৬ জন করে অংশগ্রহণ করেন। তবে প্রবীণদের সাথে আলোচনার সময় দোভাষী হিসেবে নবীনদের সাহায্য গ্রহণ করি। এক্ষেত্রে তিনটি গ্রামের বিশিষ্ট ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছ থেকে গ্রামের ইতিহাস, রাজনীতি, ভূমি-ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছি।

স্থিরচিত্র ২.১ : দলগত আলোচনা। স্থান : হাড়িপাড়ার নিপু মাতবরের বাড়ির প্রাঙ্গণ

২.৩ কেস স্টাডি

সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ও বিকাশের ধারা জানা-বোঝার জন্য কেস স্টাডি একটি বিশেষ উপযোগী পদ্ধতি (বেগম, ১৯৯৭ : ৭২)। সমাজবিজ্ঞানী পলিন ইয়াং (১৯৭৭: ২৯৯)-এর মতে, "Case study is a method of exploring and analysis the life of a social unit be that unit a person, a family, an institution, cultural group, events or even entire community." এই গবেষণার তাৎপর্য বিবেচনায় রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকটি বিষয়কে কেস স্টাডির জন্য নির্বাচন করে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ তথ্যের উৎস

আগেই বলা হয়েছে, গবেষণায় প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উভয় প্রকার উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৪.১ প্রাথমিক উৎস

প্রশ্নমালাসমূহের ভিত্তিতে সামাজিক জরিপ, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা এবং কেস স্টাডির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এই গবেষণার প্রাথমিক উৎসের উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। শুমারি জরিপের মাধ্যমে তিনটি গ্রামের জনমিতি, জমিজমা প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশ্নমালার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক সকল রাখাইন গৃহস্থালী প্রধানের কাছ থেকে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন সমস্যার অবস্থা ও সমাধানের বিষয়ে ৭-৮ জন মিলে দলগত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও তিনিটি গ্রামের ছয়জন প্রধান তথ্যদাতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গ্রাম তিনটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথেও বিভিন্ন বিষয়ে দফায় দফায় আলোচনা করা হয়েছে। উপরন্তু সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমেও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪.২ দ্বৈতীয়িক উৎস

গবেষণায় দ্বৈতীয়িক তথ্যের উৎস হলো বর্তমান গবেষণা-সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী গবেষণাকর্ম– গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, জার্নাল, সরকারি গেজেটিয়ার, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদন, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, স্যুভেনির, আদমশুমারি রিপোর্ট, পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ইন্টারনেটে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রভৃতি। গবেষণার প্রয়োজনে বিশেষভাবে সহায়তা নেওয়া হয়েছে কোপেন ফাউন্ডেশন রিপোর্ট, সেড রিপোর্ট, জার্নাল অব সোসিওলজি, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা পত্রিকা প্রভৃতির।

২.৫ গবেষণা সময়কাল

অংশগ্রহণমূলক নিবিড় পর্যবেক্ষণপূর্বক ২রা মার্চ থেকে ৩রা জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩ মাস ৪ দিন হাড়িপাড়ার নিপু মাতবরের বাড়িতে থেকে মাঠ গবেষণার কাজ সম্পন্ন করি। এখানে উল্লেখ্য যে, গবেষণার প্রয়োজনে আমি হাড়িপাড়ার নিপু মাতবর ও মহেন চিং মাতবর, মধুপাড়ার এমং মাতবরের সাথে এক ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং তুলাতুলিপাড়ার থয়মো মাতবরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলি।[১] তাঁদের সঙ্গে আমার এ-ধরনের সম্পর্কের কারণে তিনটি রাখাইন গ্রামবাসী সহজে আমাকে গ্রহণ করে। এজন্য শ্রেণি নির্বিশেষে গ্রামবাসীদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক হয়। তাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ হয় এবং স্বাধীনভাবে মেলামেশা করতে সক্ষম হই। গ্রামগুলোর বাঙালি প্রতিবেশীরাও আমাকে সহজভাবে গ্রহণ করে।[২]

উল্লেখ্য, অতীতে ২০০৯ ও ২০১১ সালে আমি গ্রাম ৩টি পরিদর্শন করেছি। এই পরিদর্শন প্রায় এক দশকের ব্যবধানে জীবনযাত্রার নানাদিকের পরিবর্তন অনুধাবনেও সহায়ক হয়েছে।

২.৬ গবেষণা কৌশল

মাঠকর্ম সম্পাদনকালে চেকলিস্ট, ক্যামেরা, ভয়েস রেকর্ডার, ডায়রিতে নোট নেওয়ার কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করি। তথ্য যাচাইয়ের জন্য ক্রস চেকিং পন্থা অবলম্বন করা হয়।

২.৭ তথ্য বিশ্লেষণ

প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎসের তথ্যসমূহ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। শ্রেণিকৃত এই তথ্য থেকে তুলনামূলক ও পারস্পরিক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার ও সরেজমিন অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ক্রস চেকিং করা হয়েছে।

২.৮ উপস্থাপন

প্রধানত ধারাবাহিক বিবরণের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের তথ্য-উপাত্তসমূহকে সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিবেশনের জন্য পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তা প্রয়োজনমাফিক সারণি ও লেখচিত্র সহকারে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সহজ ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গির জন্য বাংলা ভাষার চলিত রীতিতে অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়েছে। ভাষিক উপস্থাপনকে অধিকতর তথ্যনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য করার জন্য ধারাবাহিকভাবে সারণি সংযুক্ত করা হয়েছে। বর্ণিত তথ্য-উপাত্তসমূহকে দৃশ্যমান ও প্রামাণ্য করার জন্য বিভিন্ন স্থানে মানচিত্র, ম্যাপ ও আলোকচিত্র সংযোজন করা হয়েছে।

টিকা

১. তাঁদের সাথে আমার সম্পর্ক পরবর্তীকালে পারিবারিক পর্যায়ে গড়ায়। যার ফলে হাড়িপাড়ার নিপু মাতবর তার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে; হাড়িপাড়ার মহেন মাতবর উলাতেন মাতবরকে সাথে নিয়ে আমার ঢাকার শেওড়াপাড়ার বাসা থেকে বেড়িয়ে গেছেন। এ-ছাড়া নিপু মাতবর তুলাতুলিপাড়ার লিবা, তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েকে নিয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে আমার বাসায় উঠেছিলেন কয়েকদিনের জন্য। মধুপাড়ার এমং মাতবরও একজন সঙ্গীসহ আমার বাসায় দুই তারিখ এসেছেন।

২. এক্ষেত্রে সুবিধাভোগী সাম্প্রদায়িক মানসিকতাপুষ্ট কোন কোন বাঙালি প্রতিবেশীর তীর্যক দৃষ্টি ও কটাক্ষমূলক কথা আমার মনোযোগ এড়ায়নি। যেমন জনৈক প্রতিবেশী একদিন স্থানীয় বালিয়াতলী বাজারে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, 'কি তথ্য পেলেন? রাখাইনরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন?' প্রশ্ন দুটি খুব সাধারণ হলেও তার কথা বলার মধ্যে এক ধরনের হাস্যাত্মক তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল– যেন রাখাইনরা দেশ ছেড়ে গেলেই তাদের ভালো হয়। অবশ্য আমি গবেষণার স্বার্থে তার সাথে অযথা তর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকি।

তথ্যনির্দেশ

Dasgupta, S. (ed.) (1967). *Methodology of Social Science Research*, Impex India, New Delhi

Kothari, C. R. (1994). *Research Methodology*, New Age International Limited, India

Lindzey, G. & Elliot, A. (ed.), (1975). *The Handbook of Social Psychology*, Vol. 2, Research Methods, Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi

Young, P. (1977). *Scientific Survey and Research*, Prentice-Half of India Pvt. Ltd. New Delhi

Rajivlochan, M. (2014). *Historical Method in Sociological Research*, available at: http://www.researchgate.net/publication/274963527_Historical_Method_in_Sociological_Research

Tilly, C. (1994). "History of Sociological Imagining", *The Tocqueville Review 15*, no. 1

ছিদ্দিকী, রহমত আলী, (২০০২), *সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বেগম, নাজমির নূর, (১৯৯২), *সমাজ গবেষণা পরিচিতি*, বুক হাউস, ঢাকা

......................, (১৯৯৭), "সামাজিক গবেষণা পরিচিতি", সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

রহমান, এএসএম আতিকুর, ও শওকতুজ্জামান, সৈয়দ, (১৯৯২), *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

তৃতীয় অধ্যায়

রাখাইনদের নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৩.১বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

প্রাণীবিদদের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী প্রাণী জগতের প্রাথমিক ভাগ প্রজাতি। প্রজাতির বৈশিষ্ট্য হলো প্রজনন ক্ষমতা। পণ্ডিতরা মনে করেন, আধুনিক মানবজাতি একটি মাত্র প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। যদিও কেউ কেউ রেসের (Race)বিভাজনের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অনেকে মনে করেন, রেস বিভাজন জীববিদ্যার দৃষ্টিতে প্রজাতি বা উপপ্রজাতি সদৃশ কিছু নয়– এই বিভাজন কৃত্রিম। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বর্তমান মানব জাতি একটি মাত্র প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত যার নাম হোমেসেপিয়েন্স (Homosapienes)। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, অতি আদিমকালে নৃগোষ্ঠীর উদ্ভবের পশ্চাতে তিনটি মূল উপাদান বা প্রক্রিয়া সক্রিয় ছিল। যথা :

(১) প্রাকৃতিক নির্বাচন,

(২) ভৌগোলিক এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও প্রতিবন্ধকতা, ও

(৩) অন্তর্মিলন।

এই ত্রয়ীর অব্যাহত প্রক্রিয়ায় অসংখ্য নৃজাতিরূপের সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে পৃথিবীতে ৩২টিরও বেশি নৃজাতিরূপের অস্তিত্ব রয়েছে। মানবজাতি প্রকৃত অর্থে একটি একক মহানৃগোষ্ঠী (সামাদ, ১৯৬৭: ১৭-২০)।

উল্লিখিত প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলে যে নানান নৃগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে তাদের শ্রেণীকরণে কোনো একক পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। ডারউইন (১৮৭১) *Decent of Man* গ্রন্থে বোঝাতে চেয়েছেন, কোনো লুপ্ত বনমানুষ জাতীয় জীব থেকে আমাদের উদ্ভব হয়েছে। এ পর্যন্ত একাধিক লুপ্ত মানুষের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে নিয়ানডারথাল, ত্রিনিল ও পিকিং মানব বিশেষভাবে পরিচিত। এসব মানুষের চুল, চামড়ার রং, মাথার খুলির আকৃতি, মুখের বৈশিষ্ট্য, দেহের উচ্চতা, রক্তের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য অনুসারে মানুষকে প্রথমত তিনটি মূল মহানৃগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোর একাধিক উপবিভাগও আছে, যেমন :

১. ইউরেশীয় মহানৃগোষ্ঠী,

২. মঙ্গোলয়েড মহানৃগোষ্ঠী, ও

৩. নিগ্রোয়েড-অস্ট্রেলয়েড মহানৃগোষ্ঠী। (রায়, ১৯৯৭: ৮৩-৮৪; সামাদ: ১৯৬৭: ১৮-১৯)

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.১ ইউরেশীয় মহানৃগোষ্ঠী

(ক) **উত্তর ইউরোপবাসী, অতলান্তো-বালটিক বা নর্ডিক নৃগোষ্ঠী :** এই নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য– দীর্ঘদেহ, শ্বেত বা ঈষৎ গোলাপি আভাযুক্ত গাত্রবর্ণ, ধূসর বা নীল চোখ, সোনালি বা হালকা রঙের মসৃণ সোজা বা সামান্য তরঙ্গায়িত কেশ, দীর্ঘ সরল নাক, শিরাকার মুখ্যত দীর্ঘাকার তবে মধ্যম ও প্রশস্ত শিরাকারও দৃষ্ট হয়। এই নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হলো সুইডেন ও নরওয়েবাসী, এবং উত্তর জার্মান, ইংল্যান্ড ও রুশ দেশের কিছু লোক।

(খ) **ইন্দোভূমধ্য নৃগোষ্ঠী :** এই নৃগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে রয়েছে অসংখ্য জাতিরূপ। সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো– শিরাকার দীর্ঘ, মধ্যম ও বিস্তৃত, গাত্রবর্ণ শ্বেত থেকে গাঢ় বাদামী, কেশ মসৃণ তরঙ্গায়িত বা সরল এবং রং কালো থেকে বাদামী, চোখ কালো থেকে বাদামী, তবে নীল চোখও দুর্লক্ষ্য নয়, দেহ দীর্ঘ থেকে মধ্যম। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয় জন, মধ্য এশিয়ার তাজিক, পামিরীয় জন, আরব ও মধ্যপ্রাচ্যবাসী জন, ইরান ও ভারতীয় উপমহাদেশের জনের একটি বিরাট অংশ এই নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীর মত দ্রাবিড় নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীও এই নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

৩.১.২ মঙ্গোলয়েড মহানৃগোষ্ঠী

(ক) **মহাদেশীয় বা উত্তর মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠী :** সাধারণ বৈশিষ্ট্য– প্রকট গণ্ডাস্থি ও চওড়া সমতল মুখমণ্ডল, চোখ বাদামী বা কালো, চোখের উপরের পাতায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এপিকানথাস ভাঁজ; মাথার আকার দীর্ঘ থেকে প্রশস্ত সব আকারের হতে পারে; নাকের দৈর্ঘ্য মধ্যম, তবে নাসা সেতু চাপা। এস্কিমো এবং উত্তর চিন ও কোরিয়ার উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী এই নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

(খ) **যুক্তরাষ্ট্রীয় মঙ্গোলয়েড :** উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার তথাকথিত রেড ইন্ডিয়ান জাতিরূপের জনগণ এই নৃগোষ্ঠীর সর্বোত্তম প্রতিনিধি।

(গ) **দক্ষিণ মঙ্গোলয়েড বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় :** অসংখ্য জাতিরূপ এই নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরমধ্যে প্রধান ভাগ হলো দক্ষিণ এশীয় ও পলিনেশীয়। দক্ষিণ এশীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত হলো দক্ষিণ চিন, তিব্বত, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোচিন প্রভৃতি দেশের অসংখ্য জন ও উপজাতি। সাধারণভাবে দেহ দৈর্ঘ্যে মাঝারি বা খাটো, অক্ষিপত্রে

Dhaka University Institutional Repository

এপিকানথাস ভাঁজ লক্ষ্যণীয়, তবে সব সময় প্রকট নয়। গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ বাদামী থেকে কালো। দাড়ি গোঁফ সাধারণত দুর্লভ। কেশ কালো অমসৃণ ও খাড়া।

৩.১.৩ নিগ্রোয়েড-অস্ট্রেলয়েড মহানৃগোষ্ঠী

(ক) **নিগ্রোয়েড বা আফ্রিকাবাসী** : প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–গাত্রবর্ণ গাঢ় বাদামী থেকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; চুল কালো, কুণ্ডলীকৃত অমসৃণ; নাকের আকার প্রশস্ত, শিরাকার দীর্ঘ থেকে প্রশস্ত, দাড়ি গোঁফ স্বল্প। সুদানবাসী নিগ্রোজাতি এই নৃগোষ্ঠীর উত্তম প্রতিনিধি।

(খ) **অস্ট্রেলয়েড নৃগোষ্ঠী** : এই নৃগোষ্ঠীর নানা জাতিরূপ ভারতের দক্ষিণাঞ্চল, সিংহল থেকে মালয় ইন্দোনেশিয়া হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপ ও অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে। এদের দেহ দৈর্ঘ্যে খাটো বা মধ্যম, কেশ বেশ তরঙ্গায়িত, কালো ও অমসৃণ। অনেক ক্ষেত্রে কপাল ঢালু ও ভ্রু-অস্থি বেশ প্রকট। দেহবর্ণ গাঢ় বাদামী থেকে ঘন কালো। কোনো কোনো জাতিরূপের রয়েছে দাড়ি গোঁফের প্রাচুর্য। ভেড্ডা, সুন্দা, সেমাং, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী এই নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্থানীয়।

উল্লিখিত শ্রেণিবিন্যাস যেমন একমাত্র শ্রেণিকরণ নয়, বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী নানাভাবে মানবজাতিকে বিভক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন; তেমনি উল্লিখিত প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু নৃজাতিরূপ, এবং মহানৃগোষ্ঠীর মধ্যে সংযোজী বা পরিবৃত্তি জাতিরূপেরও অস্তিত্ব রয়েছে। এইসব সংযোজী জাতিরূপের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, মানবজাতি আদিতে নৃগোষ্ঠীকভাবে এক ও অভিন্ন ছিল।

৩.২ বাংলাদেশের মানবগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

ভারত উপমহাদেশের মানুষের মধ্যে মূল নৃগোষ্ঠী ও নানা জাতিরূপের উপাদানসমূহকে চিহ্নিত ও সনাক্তকরণের জন্য হার্বার্ট রিজলি (১৯৩১) প্রথম নৃপরিমাপবিদ্যাকে ভারতীয় মানুষের উপর প্রয়োগ করেন। এই পদ্ধতি প্রয়োগের পিছনে রিজলির দুটি 'অনুকল্প' কার্যকর ছিল। যথা:

(১) ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, ও

(২) সামাজিক বিচ্ছিন্নতা।

রিজলির মতে, ভারতীয় উপমহাদেশ ভৌগোলিকভাবে অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং ভারতের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন অঞ্চল, অরণ্য, পর্বত, মরু ও নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ফলে ভারতের মানুষ কেবল বহির্বিশ্ব থেকে নয়, দেশাভ্যন্তরেও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। আর

জাতিভেদ প্রথা, ধর্ম এবং সংগঠন প্রভৃতি সামাজিক প্রতিবন্ধকতার দ্বারাও ভারতীয় জনসমষ্টি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে ভারতের মানুষের মধ্যে আন্তর্মিলন কম ঘটেছে। তাই মানুষের নৃগোষ্ঠীক উপাদানসমূহের বিশুদ্ধতাও বহুলাংশে সংরক্ষিত হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণে রিজলি ভারতীয় উপমহাদেশের জনকে সাতটি মূল শ্রেণিতে বিভক্ত করেন:

(১) তুর্কো-ইরানীয়,

(২)ইন্দো-আর্য,

(৩)শক-দ্রাবিড়ীয়,

(৪)আর্য-দ্রাবিড়ীয় বা হিন্দুস্থানি,

(৫) মঙ্গোল-দ্রাবিড়ীয়,

(৬)মঙ্গোলীয়, ও

(৭) দ্রাবিড়ীয়।

তবে রিজলির এ বিশ্লেষণে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি সমালোচকরা লক্ষ করেছেন (রায়, ১৯৯৭: ৮৯)।ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বাংলাদেশে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীসমূহকে নৃবিজ্ঞানী অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা :

ক. টিবোটো-বার্মন :

১. কুকি-চীন: এ ভাষাভাষীরা বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে আর ভাষাগত দিক থেকে তাদের নিকটতম যোগ ব্রহ্মদেশে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে।

২. বরো : বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব কোণের গারো এবং কাছাড়ি ত্রিপুরীদের মধ্যে এ ভাষা প্রচলিত।

খ. অস্ট্রো এশিয়াটিক অথবা মনখেমার :

৩. খাসি ভাষা : এদের বাস বাংলাদেশের সিলেট জেলায় এবং ভারতীয় অঙ্গরাজ্য মেঘালয়ে।

৪. মুণ্ডা : মধ্য পূর্ব ভারতে মুণ্ডা ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা প্রায় এক কোটির মতো। উনবিংশ শতাব্দীতে তাদের কেউ কেউ বর্তমান বাংলাদেশে এসে বসবাস স্থাপন করে।

গ. দ্রাবিড় :

৫. দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্যে এবং মধ্যভারতের কোন কোন উপজাতির মধ্যে এই দ্রাবিড় ভাষা প্রচলিত। জনসংখ্যার দিক থেকে প্রায় ষোল কোটি লোক দ্রাবিড় ভাষাভাষী। উনবিংশ শতাব্দীতে এই দ্রাবিড় ভাষাভাষীর কিছু লোকও বর্তমান বাংলাদেশে এসে বসবাস করে।

ঘ. ভারতীয় আর্য :

Dhaka University Institutional Repository

৬. বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত বাংলা ভাষার যে উপভাষাগুলো তা এবং বিভিন্ন উপজাতীয় গোত্রের লোকেরা এই ভারতীয় আর্য ভাষাভাষী। (ইসলাম, ১৯৮৭: ১৩৫)

৩.৩ রাখাইন নৃগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

নৃগোষ্ঠী বিচারে বাংলাদেশের আরাকানি জনগোষ্ঠী রাখাইন মঙ্গোলীয় মহাজাতিভুক্ত নরগোষ্ঠীর মানব। পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসী মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। চিন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, তিব্বত, নেপাল, ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্য ও সাইবেরিয়া অঞ্চল, কানাডার এস্কিমোরা, লাতিন আমেরিকা ও আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা মঙ্গোলীয় মহামানবগোষ্ঠীভুক্ত (মজিদ, ২০০৫)।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল বিশেষ করে বান্দরবান, রাঙামাটি ও বরগুনা জেলার মারমা এবং কক্সবাজার ও পটুয়াখালী জেলার রাখাইনরা মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর মানুষদের চুল সোজা, পরিমাণে কম, খড়খড়ে ও কালো। মাথার আকার সাধারণত গোল। নাক মাঝারি হতে চ্যাপ্টা, তবে নিগ্রোয়েডদের মতো মাংসল নয়। চোখের উপরের পল্লব ঝুলে থাকে সামনের দিকে। চোখের পাতায় থাকে বিশেষ ধরনের ভাঁজ।

জাতিগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও উৎপত্তি সম্পর্কে জানার জন্য অনেকে একটি জনগোষ্ঠীর ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে তাদের আদি উৎস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন। এই বিবেচনায় ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রিয়ারসন (১৯০৬) বলেন যে, মগ কথাটি ইন্দোচিন ভাষায় জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মগরা আসলে ইন্দোচিন জাতির অন্তর্ভুক্ত।

পিয়ের বেসেইনে (১৯৯৭) বলেন, মগরা তিব্বতীয় বর্মি পরিবারের বর্মি দলের একটি শাখা। তাদের ভাষা হলো 'মাঘী'। এটা বর্মীয়দের বর্মীয় হরফে লেখা বিকৃত আঞ্চলিক আরাকানি ভাষা। আমিনুল ইসলাম (১৯৮৭) বলেন, 'তাদের ভাষা ব্রহ্ম অক্ষরে লিখিত হয়।'

মগ সম্বন্ধে ডি.জি.ই. হল (১৯৫৫) মন্তব্য করেন যে, মগ কথাটির উদ্ভব ঘটেছে মঙ্গোলীয় বা মাঙ্গাল থেকে। কেননা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানবদেহের সঙ্গে মগদের চেহারাগত বৈশিষ্ট্যে প্রভূত মিল রয়েছে।

মগদের (রাখাইনদের) চেহারাগত বৈশিষ্ট্য বিচার করে রিজলি (১৯৩১: ৭৯) বলেন, এদের মধ্যে শতকরা ৮৪.৫ জন মঙ্গোলীয় আকৃতির লোক দৃষ্ট হয়। রিজলির মন্তব্যকে অনেকেই সঠিক বলে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রিজলির বক্তব্যকে সমর্থন করে আব্দুস সাত্তার (১৯৭১) বলেন, ‘এই মন্তব্যটিই সঠিক বলে মনে হয় এবং এরা যে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাতে সন্দেহ নেই।’ আব্দুল আওয়াল বিশ্বাস, মাবুদ খান, মুস্তাফা মজিদ, সেলিনা আহসান প্রমুখ গবেষক রাখাইনদের মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত জন বলে মনে করেন।

মং বা অং (২০০৩: ১২) পণ্ডিতমহলের এই মতকে তুলে ধরেছেন যে, ৫০০০ ও ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বে যথাক্রমে নিগ্রিতা ও দ্রাবিদিয়ান জনগোষ্ঠীর আবাস ভূমি ছিল। পরবর্তীকালে আর্য ও মঙ্গোলীয়রা বসবাস শুরু করে। আগন্তুক দ্রাবিদিয়ানরা প্রথম জনগোষ্ঠী নিগ্রিতাকে বিতাড়ন করে। পরবর্তীকালে দ্রাবিদিয়ানদের আবার সভ্য আর্য ও মঙ্গোলীয়রা বিতাড়ন করে। পরবর্তীকালে সভ্য জনগোষ্ঠী আর্য ও মঙ্গোলীয়দের সংমিশ্রণে রাখাইন জাতির সৃষ্টি হয়।

৩.৪রাখাইনদের ঐতিহাসিক পরিচয়

রাখাইনরা বার্মার আরাকান অঞ্চল থেকে আগত জনগোষ্ঠী (মজিদ, ২০০৫)। আরাকানের এই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী যারা পটুয়াখালী ও কক্সবাজার জেলায় সমতলে বসবাস করে তারা রাখাইন এবং বরগুনা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় যারা বাস করে তারা মারমা নামে পরিচিত হলেও অতীতে বাঙালিদের কাছে এরা সকলে সাধারণত ‘মগ’ নামে পরিচিত ছিল। মগধের অধিবাসী অর্থে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন লেখক, গবেষক ও ঐতিহাসিকের বিবরণীতে তাদের সাধারণভাবে মগ নামে অভিহিত করা হয়েছে। মোগল ও ব্রিটিশ শাসকগণও তাদের মগ নামে অভিহিত করেন। তাদের এই দ্বৈত পরিচিতির ক্ষেত্রে কে. এন. শাহীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনিবলেন,

> "In dealing with etymology of tribes names, it may be noted that several tribes have two sets of names a popular name by which the tribe is known by its neighbors and a name which the tribe uses to identify itself. Both types of names generally refer to certain characteristics or qualities of a given tribe. There are same appllations which are resented by the tribes as uncomplimentory."(Shahy, 1977: 9)

Dhaka University Institutional Repository

শাহীর এই বিশ্লেষণ বাংলাদেশে বসবাসরত আরাকান বংশোদ্ভূত এই মগ জনগোষ্ঠীর বেলায়ও প্রযোজ্য। কেননা এরা সাধারণভাবে বাংলাদেশিদের কাছে মগ নামে পরিচিত। কিন্তু এরা নিজেরা 'মারমা' ও 'রাখাইন' নামে পরিচয় দিয়ে থাকে এবং মগ নামটি পছন্দ করে না, এমনকি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। এ-বিতর্ক কেবল মগ-মারমা-রাখাইন নিয়ে নয়, অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর বেলায় প্রযোজ্য, যেমন– তঞ্চঙ্গ্যা না-কি দৈংনাক– তা নিয়ে। এভাবে তৈরি হয়েছে জটিলতা। তবে নাম নিয়ে বিতর্কে কেবল লেখক-গবেষকরাই ঘুরপাক খান তা নয়, এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর সদস্য নিজেরাও পুরোপুরি পরিষ্কার নন। যেজন্য মনিরুজ্জামান (২০১৮) বলেন,

> "যে নৃ-গোষ্ঠী নিজেদের একটা বিশেষ নামে, ধরা যাক 'ম্রো' বলেই পরিচয় দেয় বা দিতে চায়, তারা এই নামের উৎপত্তি ও বিবর্তন বিষয়ে নিজেরাই গোলযোগের মধ্যে বাস করে। এইভাবে নামের বিপত্তি ঘটে– তারা ম্রো না মুরং, রাখাইন না মারমা ইত্যাদি। আবার জাতীয় পরিচিতিতেও সমস্যা আছে। যেমন তারা তঞ্চঙ্গ্যা না দৈংনাক নাকি চাকমাদের উপশাখা, ইত্যাদি।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বাংলাদেশে আগমনের ইতিহাস পর্যালোচনার পূর্বে 'মগ', 'মারমা' ও 'রাখাইন' নাম-পরিচয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

৩.৪.১ মগ পরিচিতি

'মগ' পরিচিতির ক্ষেত্রে গবেষকদের মধ্যে একাধিক মতামত পরিলক্ষিত হয়। মগদের পরিচয় তুলে ধরে মনিরুজ্জামান (২০১৮) বলেন,

> "চট্টগ্রামে যারা মগধেশ্বরীর পূজা প্রচলন করেছিলেন (আরাধনা বা প্রার্থনা : "আয়রে মা মঘিনী মগধ রাজার ঝি"), তারা ছিলেন মহাযানী বৌদ্ধ। তাদের ধারণা তারা মগধ-বংশজাত। তাদের নামের মাঝে অনেক সময় প্রু ব্যবহৃত হতো, এবং তাদের বসতি অঞ্চল ও খাল-নদী ইত্যাদিতে মগধাঞ্চলের নাম বা মগধ-নামের অংশ যুক্ত হতো। যথা– মগদাইর খাল। কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল থেকে শুরু করে আরাকান-সীমান্ত পর্যন্ত এলাকার আভ্যন্তরীণ বা প্রত্যন্ত নানা অঞ্চলে এদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই সম্প্রদায় এবং আরাকানবাসীগণ যৌথভাবে অনেক ক্ষেত্রে 'মগ' বলে পরিচিত হয়ে এসেছে।"

'মগ' শব্দের উৎপত্তি ও অভিধা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। এন ইলিয়াস (১৮৭৬) *হিস্টরি অব শানস্ অব বার্মা* গ্রন্থে মত দেন, 'মগ' একটি ইন্দোচীন শব্দ, অর্থ 'জাতি'। কোন বিশেষ নৃগোষ্ঠীকে এই শব্দ দ্বারা চিহ্নিতকরণ পরবর্তী ঘটনা। (মনিরুজ্জামান, ২০১৮)

Dhaka University Institutional Repository

সতীশচন্দ্র ঘোষ (১৯১৬) মনে করেন, মগরা মোগল বংশজাত। চাকমাদের মতো মগদেরও মুসলমান নাম থাকতো। তাদের 'মঘী'-ভাষা আরাকানি ভাষার সদৃশ। এনামুল হক (১৯৬৫: ৮৯) দেখিয়েছেন, ফারসি 'মুঘ' (অগ্নি উপাসক) শব্দ থেকে মগ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে; কারণ আরাকানের অধিবাসীগণ প্রাচীনকালে সকলেই জড়-উপাসক ছিলেন।সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল মনে করেন, সংস্কৃত 'মগদু'(জলচর পক্ষী ও জলদস্যু) থেকে মগ শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে।[১] ডিজিই হল (১৯৬৮: ৩৮৮) মনে করেন, 'মগ' শব্দটি 'মঙ্গাল' বা 'মঙ্গোলীয়' শব্দের বিকৃতি রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আরাকানের অধিবাসীদের চেহারাগত দিক দিয়ে অনেকখানি মিল লক্ষ্য করা যায়। হলের এই মতকে গ্রিয়ারসন (১৯০৬: ৩৪১) সমর্থন করে বলেন, মগ শব্দটি ইন্দোচিন জনগোষ্ঠী থেকে গৃহীত। আরাকানিরা হলো ইন্দোচিন জনগোষ্ঠীর একটি শাখা। সুতরাং বাংলাদেশে বসবাসকারী আরাকানিরা মগ পদবাচ্য।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ (১৯৮৩: ৪৪২)-এর মতে, 'মাঙ' (রাজা) শব্দ থেকে 'মগ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। পায়ার প্রমুখ মগ শব্দটির ওপর শ্রেষ্ঠার্থ আরোপের পক্ষপাতি। তাদের ধারণা, অতি প্রাচীনকালে (খ্রিস্টপূর্ব ২২০০–খ্রিস্টাব্দ ২০০) মগধ থেকে অনেক হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন বঙ্গে, আরাকানে ও বার্মায় ধর্ম প্রচার ও উপনিবেশ স্থাপন করতে আসে। পরবর্তীকালে আরাকানে ও বার্মায় বৌদ্ধ ধর্মই টিকে যায়, অন্যগুলো লোপ পায়।

মগধ থেকে আগত এবং স্থানীয় যারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে কালক্রমে তারা সবাই অভিজাত প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের 'মাগধী' বলে পরিচয় দিতে থাকে। এই মনোভাব আরাকানের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজবংশ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। এ কারণেই আরাকানের রাজা এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা চিরকাল নিজেদের মগধ রাজ বংশোদ্ভূত ও ব্রাহ্মণ গোত্রীয় বলে দাবি করেন।[২]এই উদ্দেশ্যেই আরাকানের রাজারা নিজেদের নাম সংস্কৃত ভাষায় রেখেছেন। যেমন– মহৎচন্দ্র, সুলতচন্দ্র, নরপতিগী, রাজগী, শ্রীসূর্য, বড় ধর্মরাজা, মুনি ধর্মরাজা, চন্দ্রসূর্য ধর্ম, শ্রীসুধর্মা, শ্রীচন্দ্র সুধর্মা ইত্যাদি। রাজধানীর নামও সংস্কৃত ভাষায়– বৈশালী, ধন্যবতী, চম্পাবতী ইত্যাদি (শরীফ, ১৯৮৩: ৪৪২)।কালে কালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ ও মাগধী একার্থবোধক হয়ে ওঠে। একটি অপরটির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার হতে থাকে। চট্টগ্রামে আজো সাধারণার্থে বৌদ্ধ অর্থে মগ এবং মগ অর্থে বৌদ্ধ নির্দেশিত হয় (চৌধুরী, ১৯৯৫: ১১৫)।তবে মগ শব্দটি মগধ শব্দজাত বলে শ্রেষ্ঠার্থে যে প্রয়োগ হতো সপ্তদশ শতাব্দীর চট্টগ্রাম এলাকায় এবং রোসাঙ্গ রাজসভার কোনো কোনো কবির লেখনি থেকেও তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ-রকম কয়েকজন কবির উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা হলো।

যেমন 'আরাকান রাজ' অর্থে 'মগধের পতি' ব্যবহার করেছেন সপ্তদশ শতাব্দীর চট্টগ্রামের কবি মুহম্মদ খান (১৯৫৯: ১০০) তার *মক্তুল হোসেন* নামক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থে : 'যাহাকে প্রশংসা কৈল্য মগধির পতি।'

কবি এতিম কাসেম রচিত 'আওরাজ্য বারোজ প্রশস্তি'তে উল্লেখিত হয়েছে–

"আধার মানিক মৌজে কদম রসুল।

ফাজিল সে অধিকারী মগধ বহুল।"(উদ্ধৃত : শরীফ, ১৩৬৫: ৩৯)

মগ যে মগধ শব্দজাত এবং বৌদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত কবি অন্য প্রসঙ্গে আবারো তা উল্লেখ করেছেন–

"হাড়ি ডোম মগধ জাতি আর যে কুলান

তোমার কল্যাণ হেতু মাগে সর্বকাল।" (উদ্ধৃত : শরীফ, ১৩৫৬: ৪০)

একইরূপ ধারণা ব্যক্ত করেছেন রোসাঙ্গ রাজসভা কবি দৌলত কাজী তার পৃষ্ঠপোষক রোসাঙ্গরাজের প্রশস্তি প্রসঙ্গে–

"কর্ণফুল নদী পূর্বে আছে এক পুরী

রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারি।।

তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার

নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।।" (উদ্ধৃত : ইসলাম ও হাফিজ, ১৯৬৯: ৫০)

আরাকানে প্রচলিত মঘীসন থেকেই চট্টগ্রাম এলাকায় এই সনের ব্যবহার চালু হয়। রোসাঙ্গ রাজসভা কবি সৈয়দ আলাওল 'সপ্তপয়কর' কাব্যের একস্থানে বলেছেন–

"নানা শাস্ত্র পারগ বিদ্বান বিদগ্ধ

আরবি, ফারসি আর হিন্দুয়ানি মাগধ।।" (উদ্ধৃত : শরীফ, ১৯৮৩: ৪৪২)

আলাওল এখানে মাগধ অর্থে আরাকানি ভাষা বোঝাতে চেয়েছেন। দৌলত কাজীর 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যের আলাওল রচিত অংশে কবি পুনরায় একস্থানে মঘীসনের কথা উল্লেখ করেছেন–'মগধের সনের শুনহ বিবরণ।'(উদ্ধৃত : শরীফ, ১৯৮৩: ৪৪২)

অধ্যাপক আহমদ শরীফ বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি থেকে মঘ (মগ) শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা অনেকের কাছেই যথার্থ মনে হয়েছে। তিনি বলেন, "মঘী প্রত্যক্ষ আরাকানি অর্থে এবং পরোক্ষ মগধ সম্ভূত আরাকানি 'বৌদ্ধ রাজকীয়' অর্থে ব্যবহৃত।"(শরীফ, ১৯৮৩: ৪৪৩)

গবেষক আবদুল হক চৌধুরী (১৯৯৫: ১১৫-১১৬) বলেন, মগ নামটি 'মগধ' শব্দজাত। মগধ > মগহ > মগ বা মঘ। মগধের ধর্মের অনুসারী অর্থেই মগ নামটি প্রচলিত। এক সময় সাধারণ

আরাকানিরাও নিজেদের মগধাগতদের বংশধর বলে পরিচয় দিত। এর প্রমাণ হলো, ১৭৮৫ সালে চট্টগ্রামের আরাকানি শরণার্থীদের অন্যতম প্রধান মুখপাত্র কিংবেরিং ভারতের গভর্নর জেনারেলের কাছে লিখিত চিঠিতে নিজেদের মগ বলে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া ১৭৮৭ সালের ২৪ জুন ব্রহ্মদেশের রাজা কর্তৃক চট্টগ্রামের তৎকালীন ইংরেজ শাসনকর্তার কাছে লিখিত চিঠিতে আরাকান থেকে মগদের চট্টগ্রামে পালিয়ে যাবার কথা উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশের আরাকানি অধিবাসীরা যে নিজেদের মগ নামে পরিচয় দিতে মোটেই ইচ্ছুক নয় এর কারণ মগ শব্দের অর্থান্তর। সেই অর্থান্তর কী? ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে মগ শব্দের এই অর্থান্তর ঘটে। পর্তুগিজ জলদস্যুদের সঙ্গে যখন থেকে আরাকানি যোদ্ধারা হাত মিলিয়ে বাংলার উপকূলীয় এলাকায় ধর্ষণ-লুণ্ঠন-হত্যার মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হয় তখন থেকেই 'মগ' ও 'মগের মুলুক' শব্দ দুটি অরাজকতার নামান্তর হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। বাংলায় মগ-ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার ও তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে শিহাবুদ্দিন তালিশ, মির্জা নাথান, বার্নিয়ের, ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার, হ্যামিলটন, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সতীশচন্দ্র মিত্র, নসর মালুম, আলাওল, ফিচ্, লিন্সটেন, ফ্রেডারিক, ডু-জারিক, যদুনাথ সরকার, ম্যানরিক প্রমুখ তথ্য উপস্থাপন করেছেন।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, কলিম শাহের শাসনকালে আরাকান বাহিনী ১৪৬৯ সালে চট্টগ্রাম দখল করে। এ দেশে তাদের অধিকার ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত বজায় থাকে। ইতোমধ্যে পর্তুগিজ হার্মাদগণ ভারত মহাসাগরের বুকে বিচরণ করতে শুরু করে। তাদের কোনো কোনো জাহাজ চট্টগ্রাম ও আরাকানের সমুদ্রোপকূলে হানা দেয়। এ সময় আরাকানের একদল জলদস্যু গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত লুট-তরাজ করত। প্রথমে হার্মাদগণ তাদের হাতে নাজেহাল হয়। পরবর্তীকালে মগ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ এই জলদস্যু পর্তুগিজদের সঙ্গে মিশে দস্যুবৃত্তি শুরু করে। এই মিলিত বাহিনী ১৬০৯ সালে সন্দ্বীপ দ্বীপটি অধিকার করে। পরে সন্দ্বীপ তাদের অভিযানের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করে। আরাকান ও পর্তুগিজ–এই উভয় জাতির সম্মিলিত দস্যুদল সন্দ্বীপ, নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, সুন্দরবনের দক্ষিণাঞ্চল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত লুণ্ঠন অভিযান চালাত। রেনেল কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গদেশের মানচিত্রে বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ ভাগকে মগ দস্যুদের ভয়াবহ আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে জনহীন অঞ্চলরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে(Karim, 1964: 58)।

মোগল সেনাপতি মির্জা নাথান-এর বর্ণনায়ও বাংলায় মগদের আক্রমণের উল্লেখ আছে। তাঁর এক বিবরণ থেকে জানা যায়, রাখাঙ্গা থেকে পরাজিত মগরাজ বাংলার পরগণাসমূহের উপর আক্রমণ করে কয়েকটি গ্রাম লুট ও গ্রামবাসীদের বন্দী করে নিয়ে যায়। এদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ইব্রাহিম খাঁ বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন। তার আগেই রাতে সাতশ' ঘোরাব (কামানবাহী নৌকা) ও চার হাজার জালিয়া নৌকা নিয়ে মগরাজের বাঘাচর আক্রমণের খবর আসলে খাঁ ফতেজঙ্গ তখনই ফটকের

Dhaka University Institutional Repository

সামনের ত্রিশটি দ্রুতগামী নৌকা নিয়ে রাতের শেষ প্রহরে রওনা দিয়ে শত্রু থেকে তিন কোশ দূরে অবস্থান নেন। একদিন একরাত পর সমস্ত ওমরাহ, মস্‌নবদার ও অনুগত জমিদারগণ বহু অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে একের পর এক সেখানে উপস্থিত হন। টের পেয়ে দুই হাজার জালিয়া নৌকা ফেলে রেখে মগরাজ রাখাঙ্গ ফিরে যায় (নাথান, ১৯৮৯: ১৬৩-১৬৫)। হার্ভে (১৯২৫: ১৪২)- এর বর্ণনায়ও একই মত পোষণ করা হয়েছে।

সেজন্য দেখা যাচ্ছে যে, একদা মগ শব্দটি বাঙালিদের কাছে দস্যুর নামান্তরে পরিণত হয়। সেজন্য বাংলাদেশে বসবাসকারী আরাকানিরা এই নিন্দাবাচক শব্দ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। তবে চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে আরাকানিরা কেউ জলদস্যুবৃত্তি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে এরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি ১৭২৭ সালের পর আরাকানি দস্যুদের উপদ্রুপের আর কোনো তথ্যও পাওয়া যায় না।তবে একথা স্বীকার করতে হয় যে, ঐতিহাসিক, শাসক কিংবা বাঙালি যেমন আরাকানিদের মগ বলতো, তেমনি তারাও কিছুটা আগ্রহ এবং কিছুটা অভ্যস্ততায় নিজেদের মগ নামে পরিচয় গ্রহণ ও বহন করেছে। এ-প্রসঙ্গে ক্য শৈ প্রু (২০০৪)-এর মতামত হলো–

> "মগ নামে কোন সম্প্রদায় বা জাতি নেই। মামরাদের প্রতিবেশী অ-মারমাগণই মারমাদেরকে মগ আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপভাবে রাখাইনদের প্রতিবেশী অ-রাখাইনগণই রাখাইনদেরকে মগ আখ্যায়িত করেছে। ...ব্রিটিশ শাসনামলে বৃহত্তর পার্বত্য জেলাবাসী অশিক্ষিত মারমা ভাষী প্রজা জনগোষ্ঠীকে ব্রিটিশ সরকারের দেশী আমলাগণও তথা ব্রিটিশ সাহেবগণও 'মগ' শব্দটিকে মামলার নথিপত্রে এবং জায়গা জমির দলিলে প্রতিস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ মগ শব্দটি স্বজাতি কর্তৃক পরিচালিত নয়, একটি পরজাতি প্রদত্ত শব্দ বিশেষ। দলিলে পুরুষ হলে মগ এবং মহিলা হলে মগিনী লিপিবদ্ধ করে ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার চেষ্ট করা হয়েছে।...এমতাবস্থায় সঠিক ইতিহাসকে না জানা কিছু কিছু মারমা ভাষী পরজাতি কর্তৃক প্রদত্ত মগ শব্দটিকে একান্ত নিজস্ব সম্পদ ও খঁাটি কথা হিসেবে ধারণা করেছেন।"

এ-বিষয়ে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান (২০১৮) অধিকাংশ লেখক-গবেষকের মতামতকে তুলে ধরে বলেন, এই মতটি সর্বজন স্বীকৃত যে, মগধ থেকে প্রচারিত ধর্ম ও মগধ থেকে আগতদের সংস্পর্শেজাত ব্যক্তিগণের সাথে 'মগ' কথাটি চিহ্নিত হয়ে পড়ে এবং আরাকানে এদের মাতৃভূমি স্থাপিত হলেও পরে ঐতিহাসিক কারণে এরা নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ও নানা গোত্রে বিভক্ত হয়। এদের সাথে কখনও জলদস্যু পর্তুগিজদের কোন সম্পর্ক হয়েছে কিনা সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। তবে মগ কথাটি যে বহু অনুমান এবং বহু উৎস-সম্ভব একটি রূপান্তরিত গঠন, আবদুস সাত্তারের বিস্তারিত আলোচনা থেকেও তা বোঝা যায়। এ বিষয়ে সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪.২ মারমা পরিচিতি

বাংলাদেশের পার্বত্যভূমিতে বসবাসকারী আরাকানিদের একাংশ নিজেদের মারমা পরিচয় দিয়ে থাকেন। এরা দেশের দ্বিতীয় গরিষ্ঠ সংখ্যক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী। মারমাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের একাধিক প্রশাসনিক ভাগে ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বসবাস করলেও এরা মূলত বান্দরবান জেলাতেই কেন্দ্রীভূত। অন্যান্য শাখা, যেমন রাখাইন, বাদেই ১৯৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে মারমা পরিবার ও ঘরবাড়ির সংখ্যা ৩০০০৪ টি এবং লোকসংখ্যা ১৫৪২১৬ জন দেখানো হয়েছে। তবে 'মারমা' নামকরণে আপত্তি তুলে আব্দুল হক চৌধুরী (১৯৯৫: ১১৫) বলেন, আরাকানে কোন মারমা জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব নেই। জি ই হার্ভে (১৯২৫: ৩)- এর মতে, 'মারমা' শব্দটি বর্মি 'মায়াম্মা' (Mayamma)শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। অতঃপর মায়াম্মা থেকে ম্রাম্মা এবং তা থেকে মারমা শব্দের উৎপত্তি (Mayamma>Mramma>Marma)। বর্মি জনগোষ্ঠী মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর একটি শাখা। তিব্বত থেকে সুদূর ইন্দোচিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই নরগোষ্ঠী ছড়িয়ে রয়েছে। অতি প্রাচীনকালে চিনের ইয়াং সিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর অববাহিকা থেকে বর্মিদের পূর্ব পুরুষ আরাকানে আসে। প্রথমদিকে এরা 'পিউ', 'তলাইং', 'মুন' ও 'শান' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে সকল জাতি 'বারমন' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। একাদশ শতাব্দীর একটি তলাইং মুদ্রা থেকে জানা যায় যে, বর্মিদের জাতীয় নাম 'মায়াম্মা'। কালক্রমে মায়াম্মা শব্দটি 'বা-মা' শব্দে রূপান্তরিত হয় এবং 'বা-মা' শব্দ থেকে ব্রহ্মদেশের ইংরেজি নামকরণ বার্মা (Burma)হয়েছে বলে অনুমিত। অর্থাৎ মায়াম্মা>বা-মা>বার্মা (Burma)।

এ ফেয়ার (১৮৬৪)-এর মতে, 'মায়াম্মা' শব্দটি চিনা 'মিঙ' এবং 'মিরমা' শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। মিঙ ও মিরমা অর্থ বর্মি জাতি। অং সুই মারমা (২০০৪) প্রচলিত আরো কয়েকটি ধারণার উল্লেখ করেছেন। যেমন কারো মতে, মারমা শব্দটি ব্রহ্মদেশের তেলেইং ভাষায় 'মেয়ামা' শব্দের বিবর্তিত রূপ। অনেকে মনে করেন, মা-রা-মা (বর্তমান মায়ানমার) শব্দ হতে মারমা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'ম্রাইমা' হতে 'মারমা' শব্দের উৎপত্তি এমন ধারণাও পাওয়া যায় বিশিষ্ট লেখকদের তথ্য থেকে।

মং ক্য শোয়ে নু নেভী (২০০৪)-এর মতে, মারমা শব্দটি 'মারমাজা' বা 'ম্রাইমাচা' নামক উপমহাদেশীয় প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত। তবে, ম্রাইমা নামের একটি জনজাতির অস্তিত্ব প্রাচীনকালেও ছিল বলে জানিয়েছেন প্রভাতাংশু মাইতি (১৯৮৮)।

আবদুল মাবুদ খান (২০০৭: ২১) এই জনগোষ্ঠী নিজেদের মারমা নামে পরিচয় দেওয়ার পেছনে তিনটি কারণকে চিহ্নিত করেছেন। যথা : ১. নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে মারমা জনগোষ্ঠী বর্মি

জাতির একটি শাখা; সুতরাং তারা বর্মি জাতির নাম দ্বারা পরিচিত হতে চায়। ২. বর্তমানে আরাকান ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত একটি প্রদেশ এবং আরাকানের অধিবাসীরা বর্মিদের জাতীয় নাম 'মায়াম্মা' দ্বারা পরিচিত। তাই এরা 'মারমা' (বার্মিজ) বলে পরিচয় দিয়ে ব্রহ্মদেশের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে নিজেদেরকে গৌরাবান্বিত মনে করে। ৩. বোমাং রাজ পরিবার ও তাদের অনুসারীরা ব্রহ্মদেশের পেগু রাজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদিও 'বোমেঙ' ও 'বোমেঙগ্রি' পদ দুটি আরাকানি সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত। উল্লেখ্য, মারমা জাতির প্রধান বোমাঙ রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী ১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রতি নিজেদের মগ আখ্যা দেওয়ার আপত্তি তোলেন এবং ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে তাদের প্রকৃত জাতি পরিচয় 'মারমা' তালিকাভুক্ত করার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন (মারমা, ২০০৪)।

মনিরুজ্জামান (২০১৮) বলেন, মিয়ানমারের জাতিসত্তা ম্রাম্‌মা। তারই অর্বাচীন উচ্চারণ বারমা। বুদ্ধের কালে বার্মা-কে বলা হতো মারাম্মা-প্রাই অর্থাৎ মারাম্মাদের দেশ। দেশবাসীরা ছিল মারাম্মা বা ম্রাম-মা। এই শব্দই লৌকিক উচ্চারণে হয়ে পড়ে বামা (BA-MA)। বার্মা (বারমা) ও বর্মন প্রভৃতি সম-উৎসক বলে মনে হয়। সপ্তদশ দশকের শেষে বাংলাদেশে যে মারমাদের কথা জানা যায় তারা এই ইতিহাস ও নামশব্দের সাথে যুক্ত। অন্যত্র তিনি বলেন, মারমা শব্দটি 'বার্মিজ' শব্দ থেকে উৎপন্ন; এর অর্থ বার্মাবাসী। মারমাদের পূর্বপুরুষ পেগুতে বসবাস করত। ১৫৯৯ সালে তারা সেনাধিপতি মহাপিন্নাগের নেতৃত্বে পরিকল্পিত অভিযানে বঙ্গীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। এরা চীনা অঞ্চলে তাই (Tai) বা মহাটাই-এর স্থানীয় অধিবাসী। বঙ্গীয় বৌদ্ধ মারমা (মগধীয়) পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করে থাকলেও আদতে তারা সেই 'তাই' বা 'টাইলুয়াং' গোষ্ঠীরই নৃ-জন।

৩.৪.৩ রাখাইন পরিচিতি

পুনরুক্ত যে, দেশের কক্সবাজার ও বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলায় বসবাসকারী আরাকানি জনগোষ্ঠী নিজেদের রাখাইন নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। অতীতে এরাও নিজেদের মারমা নামে পরিচয় দিত বলে জানা যায়। এমনকি একদা এরাও মারমাদের মতো নিজেদের মগ উপাধি মেনে নিয়েছিল।

রাখাইন কারা?– তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান (১৯৮৭) বলেন, বাংলাদেশের একসময় নাম হয়ে পড়ে মগের মুল্লুক। এরদ্বারা কেবল আধিপত্যই নয়, নিয়ম-শৃঙ্খলার পতনকেও নির্দেশ করা হতো। তখন এই নামে যারাই পরিচিত হোক না কেন, ক্রমে কিছু ভিনদেশি ও ভিন্নধর্মী লোকও এই নামের সাথে জড়িয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতকে দক্ষিণবঙ্গে সুন্দরবনে ও সমুদ্রে মগদের কালো ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। তখন মগ ও জলদস্যু শব্দদ্বয় সমার্থক হয়ে ওঠে। উৎস পর্তুগিজ ছদ্মনাবিকরা। এরা উড়িষ্যা, দক্ষিবঙ্গের সমুদ্র উপকূল ও বার্মা অঞ্চলে প্রভাব অক্ষণ্ন রাখতে

নানান অত্যাচার ও লুণ্ঠন কাজে নিয়োজিত ছিল। পরবর্তীকালে আর যারা মগ বা মঘী বলে খ্যাত হয়েছে তাদের অধিকাংশই বার্মা থেকে আসা সাধারণ মানুষ। ১৭৮৪-সালে বিতাড়িত আরাকানিদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানিকছড়ি ও বান্দরবান এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামের রামুর মারমা জাতি অন্যতম। এদের একটি শাখা বরিশালের ছোট ছোট খাড়ি ও দ্বীপাঞ্চলে এসে ঐতিহাসিক কারণে বসতি গড়ে তোলে। তারা এবং রামু অঞ্চলের সকল মারমারাই বৃহত্তর গোষ্ঠীর দেওয়া 'মগ' নাম পরিত্যাগ করে নিজেদের 'রক্ষণশীল' এবং পালিশব্দ রাক্ষাইন, রক্ষতুঙ্গ্য প্রভৃতি দৃষ্টে ব্রহ্মদেশীয় রক্ষপুরের আত্মরক্ষাকারী প্রাচীন জাতি বলে অভিহিত করছে। গবেষক সেলিনা আহসানের মতে, 'The Maghs of Payuakhali, on the other, do not have any complex in identifying them as either Marma or Rakhain'. (Ahsan, 1993: 7)

রাখাইন শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। ফেয়ার (১৮৬৪)-এর মতে, 'রাখাইন' শব্দটি 'রখইঙ্গতঙ্গি' বা 'রখইঙ্গপি' থেকে গৃহীত হয়েছে। এই 'রখইঙ্গ' শব্দটি সংস্কৃত 'রক্ষ' এবং পালি 'সক্খো' থেকে উদ্ভূত। 'রখইঙ্গ' শব্দের অর্থ হলো দৈত্য বা রাক্ষস (হক ও করিম, ১৯৩৫: ১-২)। প্রাচীকালে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম প্রচারকেরা আরাকানের জনসমষ্টিকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করার আগে আরাকানকে উল্লিখিত নামে সম্বোধন করত বলে জানা যায়। কেননা আরাকানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার হওয়ার পূর্বে স্থানীয় জনসমষ্টির কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম-বিশ্বাস ছিল না। জড় উপাসনা ছিল তাদের প্রধান ধর্ম (Bennison, 1993: 230)।এই পটভূমিতে আরাকানের অধিবাসীরা তাদের মাতৃভূমিকে 'রখইঙ্গত' (রাক্ষসপুরী) বলে পরিচয় দিত। তাহান (১৯৭৮) বলেন, রাখাইন নামটি জাতিগত কিংবা বস্তুগত নয়, এটি চরিত্রগত। এর মানে রক্ষণশীল জাতি। ফেয়ার (১৮৪৪) বলেন, আরাকানে বসবাসরত রাখাইন উপজাতির নাম থেকে রাখাইন শব্দটি এসেছে। পেগু অঞ্চলে রাখাইন নামে একটি উপজাতি ছিল। এরা নিজেদেরকে 'রাখাইঙ্গি' (Rakhaingi) নামে এবং দেশকে 'রাখাইং' (Rakhaing) নামে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। এরা সম্ভবত এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরাকানে বসবাসরত মুসলমানরা নিজেদের 'রোহিঙ্গা' (রোয়াইঙ্গ্যা) বলে পরিচয় দেয়। বর্তমানে এই জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮ লক্ষ মানুষ মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর গণহত্যা, গণধর্ষণ, জোরপূর্বক বিতাড়ন ও সাম্প্রতিক ইতিহাসের নজিরবিহীন বর্বরোচিত নির্যাতনের মুখে দেশ ত্যাগ করে শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। এরা নিজেদের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইন থেকে পৃথক মনে করে। মুহম্মদ এনামুল হক (১৯৬৫) মনে করেন, 'রোয়াইঙ্গ্যা' শব্দটি এসেছে 'রোয়াং' শব্দ থেকে। রোয়াং শব্দটি তিব্বতি-বর্মি

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ যার অর্থ আরাকান। কালের পরিক্রমায় 'রোয়াং' শব্দটি 'রোয়াইঙ্গ্যা'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। ভাষাবিদদের মতে, 'রোয়াং' শব্দটি 'রাখাইন' শব্দ থেকে এসেছে। রোয়াং অর্থ আরাকান। এই আরাকানই রাখাইন ও রোয়াইঙ্গ্যা উভয় জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল। সমসাময়িককালেও চট্টগ্রাম জেলায় রোহাং ও রোয়াইঙ্গ্যা শব্দ দ্বারা যথাক্রমে আরাকান ও আরাকানি মুসলমানদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 'রোয়াং', 'রোসাঙ্গ' ও 'রোকাম' প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টিগোচর হয়। এই শব্দগুলি যথাক্রমে আরাকান ও আরাকানের প্রাচীন রাজধানী ম্রোহ্ড্-কে বোঝায় বলে পণ্ডিতদের অভিমত। তবে রোহাংয়ের চেয়ে প্রাচীন নাম রাখাইন প্রি। আর রাখাইন প্রি আরাকানের আদি নাম। মাবুদ খানের মতে, রাখাইন শব্দের রূপান্তর থেকে আধুনিক আরাকান নামের উৎপত্তি (Rakhaine>Arkhang>Araccan>Arakan)। তিনি বলেন,

> "মারমাদের ইতিহাস ব্রহ্মদেশ ও আরাকানের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। বস্তুত মারমা জনসমষ্টির তিন-চতুর্থাংশ যে আরাকান থেকে এসেছে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। সঙ্গত কারণেই রাখাইন নামে পরিচিত হওয়ার দাবি খুব উপেক্ষা করার বস্তু নয়। মারমা জনগোষ্ঠীর মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনই বর্মি নামে পরিচিত হওয়ার দাবি রাখে। এ কথা সত্য যে, মারমাদের বৃহত্তর অংশের ইতিহাস ও বোমেঙ রাজ-পরিবারের ইতিহাস এক নয়। ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।" (খান, ২০০৭: ২২)

৩.৫ বাংলাদেশে রাখাইন আরাকানি জনগোষ্ঠীর অভিবাসন

৩.৫.১ বাংলার সীমানা

দেশ হিসেবে বঙ্গ নামের প্রাচীনতম ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এ। পাণিনির (খ্রি. পূ. ৫০০) রচনাতে গৌড় ও বঙ্গ নামের স্বীকৃতি রয়েছে। পাণিনির পরে পতঞ্জলি (খ্রি. পূ. ১৫০) স্বীয় রচনায় বঙ্গাদি দেশের উল্লেখ করেছেন। তাই দেখা যায়, অন্তত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেরও বহু পূর্বে এটা বঙ্গ বা বাংলাদেশ নামে পরিচিত ছিল (কাসেম, ১৯৮৪: ১২)। বঙ্গদেশের অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় (১৯৪১) বলেন, "বাংলাদেশের নদনদী পাহাড় পর্বত-প্রান্তের জনপদ আশ্রয় করিয়া ঐতিহাসিককালের পূর্বেই যে সমস্ত বিভিন্ন 'কৌম' একসঙ্গে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল তাদের বন্ধন সূত্র ছিল পূর্ব ভারতের ভাগীরথী-করতোয়া-লৌহিত্য বিধৌত বিন্ধ্য-হিমালয়ের বহু বিধৃত ভূ-ভাগ।" বাংলার মোগল সুবার সীমানা মোটামুটিভাবে মোগল-পূর্ব আমলের বাংলাদেশের সীমানা ও বাংলার ভৌগোলিক সীমানার সাথে এক। তৎকালীন দুজন খ্যাতনামা ব্যক্তির বর্ণনায় এই প্রদেশের আঞ্চলিক সীমানা প্রায় একই পাওয়া যায়। এঁরা হলেন আবুল ফজল ও জাহাঙ্গীর (রহিম, ১৯৮২: ১)। আবুল ফজল (২০০৩) বলেন, বাঙ্গালাহ দ্বিতীয় আবহাওয়া (ইকলীমে) অবস্থিত এবং চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

থেকে গর্হি (তেলিয়াগর্হি) পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ৪০০ কোশ। এ দেশ প্রস্থে উত্তরের পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে মান্দারাম সরকার পর্যন্ত ২০০ কোশ। এর পূর্ব ও উত্তরে পাহাড়ি অঞ্চল এবং দক্ষিণে সমুদ্র ও পশ্চিমে বিহার প্রদেশ। এ প্রদেশের সীমান্তে রয়েছে কামরূপ ও আসাম। জাহাঙ্গীর (১৮৬৪: ২০৯) বলেন, এটি (বাঙ্গালাহ) একটি বিস্তীর্ণ দেশ, দ্বিতীয় ইকলীমে অবস্থিত। চট্টগ্রাম থেকে গর্হি পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ৪৫০ কোশ। এর প্রস্থ উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে মান্দারাম অঞ্চল পর্যন্ত ২২০ কোশ। অতএব দেখা যাচ্ছে, এই দুইজনের বিবরণে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যথাক্রমে ৫০ কোশ ও ২০ কোশ পার্থক্য আছে। তবে বেভারেজ (১৮৭২) এ দুজনের মতকে মেনে নিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, তারা এই সুবার যে ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করেছেন এর সাথে বাংলার সীমানার মিল রয়েছে। আকবরের সময় বাংলার আয়তন ছিল ২,৪৫,০০০ বর্গমাইল (রহিম, ১৯৮২: ২৫)। বর্তমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তম অংশ এবং পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপগুলোর অন্যতম (সেন, ১৯৮৫: ১৬)।

৩.৫.২ বাংলায় আদিবাসীদের আগমন

আর্য আগমনের বহু পূর্বে অনার্যরা বাংলায় প্রস্তর সভ্যতার প্রথম বেদিকা রচনা করেছিল। আর্যরা আসার পর পঞ্চসিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা, নর্মদা, কাবেরীর উর্বর উপত্যকার বসতি অনার্যরা আর্য-অভিযাত্রীদের কাছে ছেড়ে দিয়ে দুর্গম গিরিকন্দরে ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। নৃতাত্ত্বিক মতে তারাও বহিরাগত। সেদিক থেকে বাংলার খাঁটি ভূমিজ (Autochthones) সন্তান যে কে তা বলা দুষ্কর (ঘোষ, ১৩৫৫: ৪-৫)। তবুও বঙ্গাঞ্চলে যেসকল অনার্যরা বসবাস করতো তারাই এতদ-এলাকার আদি বাসিন্দা। আর্যরা আসার পরেও অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাংলায় আগমন ঘটেছে। এমনকি বাংলাদেশে অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আগমনের ইতিহাস ৪০০-৫০০ বছরের বেশি নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু আদিবাসী সমাজ বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছে। এক একটি অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠী বিশিষ্ট এক এক ধরনের সংস্কৃতির অধিকারী। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে বাংলার বাইরে কোন কোন অঞ্চল থেকে আদিবাসীরা এসেছে? এর জবাবে সুবোধ ঘোষ (১৩৫৫: ৩১৫) বাংলার এই আদিবাসী সমাজকে প্রধানত ৪টি আঞ্চলিক সংস্কৃতির অন্তর্গত মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যথা : ১. তিব্বতীয় হিমালয় অঞ্চল থেকে আগত; ২. উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর অঞ্চল থেকে আগত;৩.আরাকান ও বার্মা অঞ্চল থেকে আগত; ও ৪. আসাম অঞ্চল থেকে আগত।

৩.৫.৩ বাংলায় রাখাইনদের আগমন

বাংলাদেশে বসবাসকারী আরাকানবাসীর নাম পরিচয় নিয়ে যেমন ভিন্ন মত আছে, তেমনি এই জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমন নিয়েও নানা মত আছে। দেখা যাচ্ছে, গবেষকদের কেউ কেউ বলছেন মগ খ্যাত মারমা বা রাখাইন পৃথক জাতিগোষ্ঠী এবং তারা বার্মা ও আরাকান থেকে আগত। যেমন ক্য শৈ প্রু (২০০৪)-এর মতে,

> "মার্মা এবং রাখাইন বর্মা থেকে আগত দু'টি পৃথক সম্প্রদায়; যদিওবা উভয় সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং মাতৃভাষাগত পার্থক্য বলতে তেমন কিছু নেই। শাক্যবংশের জনগোষ্ঠী রাক্ষাপুরা রাখাইন এবং মোয়েই ম্রাইমা জনগোষ্ঠীর পাগাইং এলাকার তলইং বংশের লোকই মারমা।"

আবার অনেকের মতে, যে নামই দেওয়া হোক, তারা এক জাতি এবং আরাকান থেকে বাংলাদেশে আগত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন সেলিনা আহসান বলেন,

> "This implies that the Marmas, the Maghs, and the Rakhains have the same origin, although they came at different times and following different routes and eventually settled in different places." (Ahsan, 1993: 8)

তবে আরাকান ও বাংলার ভৌগোলিক নৈকট্যই আরাকানিদের বাংলায় আগমনের অন্যতম কারণ। ভৌগোলিক দিক থেকে আরাকান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত মায়ানমার অন্তর্গত রাখাইন স্টেট নামে পরিচিত একটি প্রদেশ। প্রদেশটি সাগর, নদী ও পাহাড় ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এর রাজধানী চাই-তোয়ে যার পূর্বনাম আকিয়াব। আরাকানের দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে চিন পাহাড় ও ভারত, উত্তর-পশ্চিমে নাফ নদী আরাকান ও বাংলাদেশের সীমানা বরাবর বয়ে গেছে। কক্সবাজার ও পার্বত্য বান্দরবান জেলার প্রায় ২৫০ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যকার স্থল সীমানা। চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার হয়ে টেকনাফ পর্যন্ত সড়কটি ব্রিটিশ আমল থেকে আরাকান সড়ক নামে খ্যাত (অং, ২০০৩: ১৩)। সতীশ চন্দ্র মিত্র ১৯২২ সালে আরাকানের বর্ণনায় বলেন,

> "আরাকান বর্তমান চট্টগ্রামের দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। একটি পর্ব্বতমালা এই রাজ্যের পূর্ব্বসীমা জুড়ে বসে ইহাকে সমগ্র ব্রহ্মদেশ হতে পৃথক করেছে। পশ্চিমসীমার সর্ব্বত্রই বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গমালায় প্রতিহত। অধিবাসীরা নাববিদ্যায় দক্ষ। জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই দুর্গম। পরদেশির পক্ষে এ-রাজ্য জয় করা বড় কঠিন। এজন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রায় ৪ হাজার বছর ধরে এই ক্ষুদ্রজাতি তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল।" (মিত্র, ২০০১: ১০৯)

Dhaka University Institutional Repository

আরাকানিদের বাংলায় আগমনের ক্ষেত্রে আরাকান ও বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে অবস্থিত চট্টগ্রামের সঙ্গে ভৌগোলিকভাবে আরাকানের নিবিড় সম্পর্কের কারণে প্রাকৃতিকভাবে অনুকূল হওয়ায় আরাকানের অধিবাসী রাখাইন ও মারমারা অনায়াসে বঙ্গভূমিতে এসে বসতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। বাংলার বাণিজ্য বন্দর হিসেবে চট্টগ্রামের খ্যাতি অনেক প্রাচীনকাল থেকেই। আরব দেশীয় বণিকেরা বাণিজ্য সম্ভার কেনার জন্য অষ্টম শতাব্দী থেকেই চট্টগ্রামে আগমন ও বসতি স্থাপন শুরু করে। আরাকান-রাজ ১৫৬০ সালে চট্টগ্রাম দখলের পর আরাকান থেকে অনেক বণিকও ব্যবসার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আসে। এ সময় কিছু আরাকান দস্যু বাংলায় এসে ধন-সম্পদ লুট করত এবং বাঙালি নর-নারীকে অপহরণ করে দেশ-বিদেশের বাজারে দাস-দাসী হিসেবে বিক্রি করত। পরবর্তীকালে আফগান মোগল শাসকদের দ্বারা চট্টগ্রাম কখনো কখনো বিজিত হলেও সে বিজয়ের সুফল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ আফগান ও মোগল আমলে বাংলার রাজধানী গৌড় অতঃপর ঢাকা ছিল চট্টগ্রাম থেকে বহুদূরে। ছিল পথের দুর্গমতা; আর নৌ শক্তিতে আফগান মোগল শাসকদের থেকে মগরা পারদর্শী ছিল। আহমদ শরীফ (১৩৭৬)-এর মতে, সোনার গাঁর শাসনকর্তা ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ সর্বপ্রথম দেব-বংশীয় কোনো রাজার থেকে চট্টগ্রাম দখল করেন। দামোদার দেব-বংশীয়গণ স্বাধীনভাবে কিংবা আরাকান অথবা ত্রিপুরার সামন্ত হিসেবে চট্টগ্রাম শাসন করতেন। মুবারক শাহ চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। চট্টগ্রামের বহু মসজিদ ও সমাধি তার আমলে নির্মিত (মজুমদার, ১৩৮৫: ৩০)।

মানচিত্র- ৩.১
তৎকালীন আরাকান রাজ্য

Dhaka University Institutional Repository

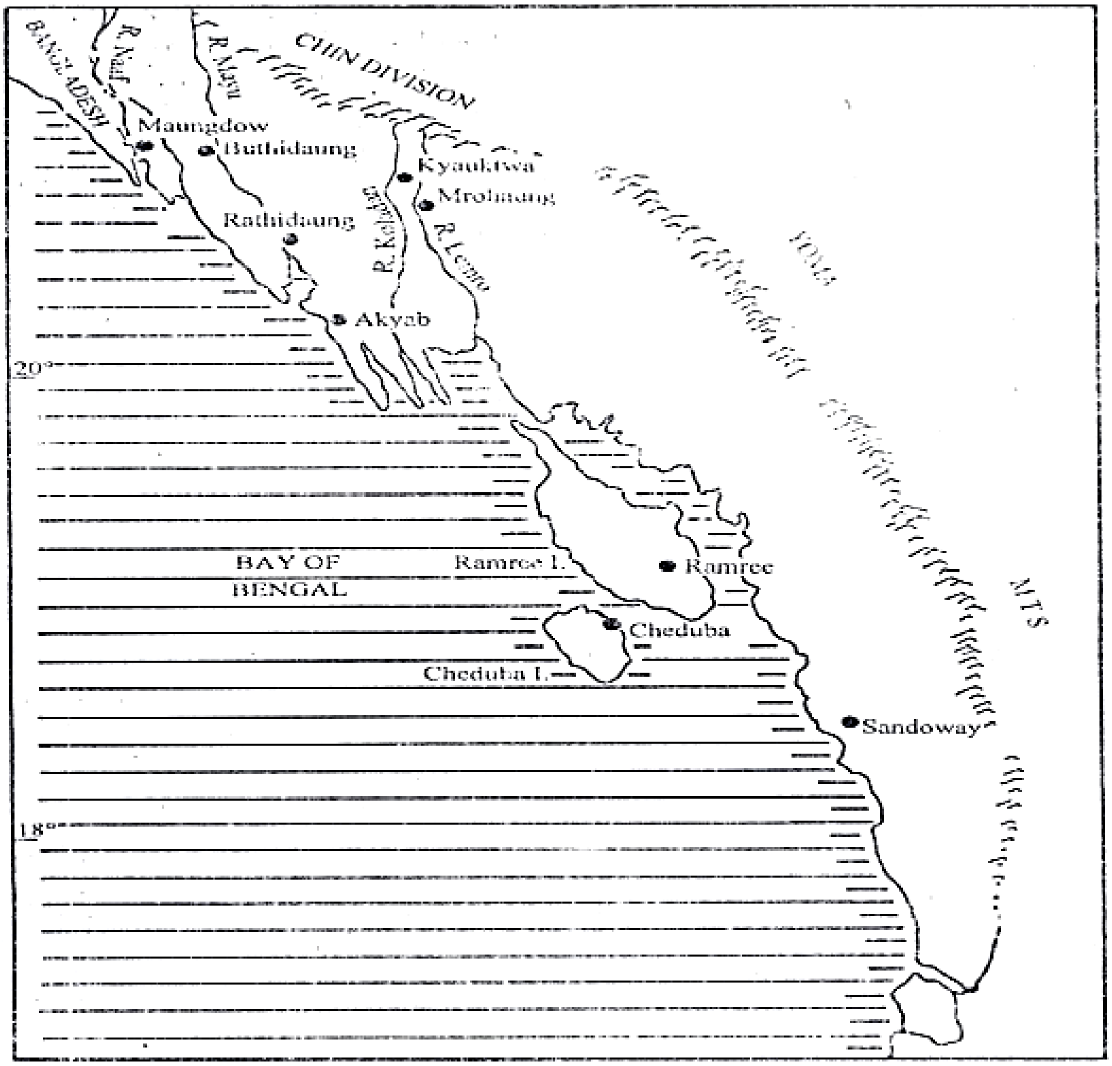

উৎস :Khan, 1999

আরাকানিদের অভিবাসন সম্পর্কে যে-সব তথ্য পাওয়া যায় তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা মূলত রাজনৈতিক কারণে আরাকান থেকে শরণার্থী হয়ে চট্টগ্রামের পাবর্ত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তবে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আরাকানিদের বসবাস একসময়ে শুরু হয়নি। বিভিন্ন যুগে আরাকান থেকে লোক এসে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায় বসতি গড়ে তোলে। মোগল আমলে এই আরাকানিদের উপর 'মগজমা' নামে মাথাপিছু বার্ষিক ৮ ১,৩৫৮ টাকা করে একটি কর ধার্য করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার উক্ত কর উঠিয়ে দেয় এ কারণে যে ঐ কর আরাকানি বসতি গড়ে তোলার অনুকূলে ছিল না। আরাকানিরা কয়েক দফায় বাংলাদেশে এসেছে। আব্দুল হক চৌধুরী (১৯৯৫) বলেন, 'মগ বা মার্মা উপজাতি রাজনৈতিক কারণে শরণার্থী হয়ে দু'বারে প্রথমে চট্টগ্রামে পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে।' চৌধুরী রাখাইনদের স্বতন্ত্রভাবে বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে আগমনের কোন ইতিহাস উল্লেখ করেননি।

মানচিত্র ৩.২

তৎকালীন আরাকান ও তার প্রতিবেশি রাজ্যসমূহ

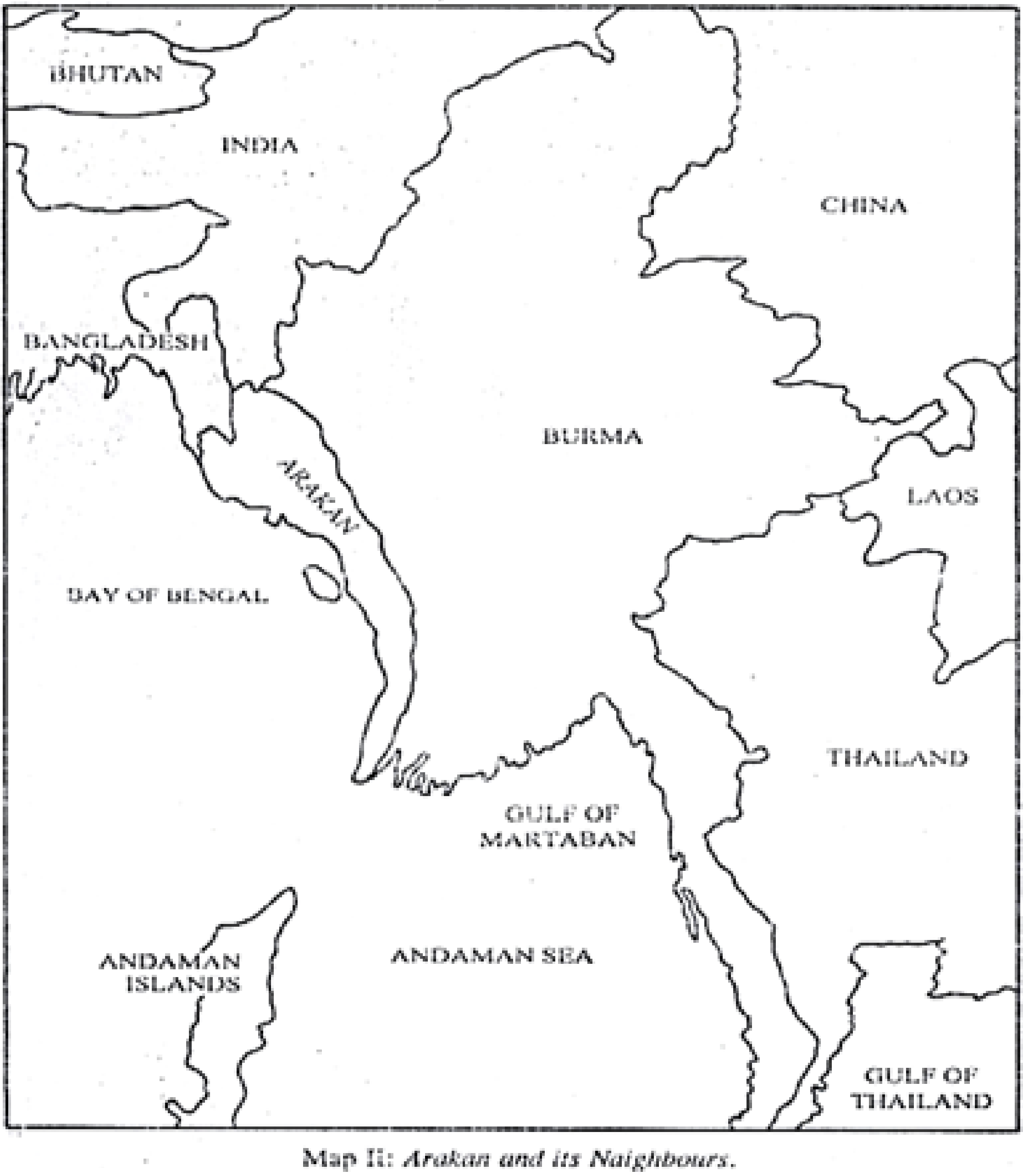

Map II: *Arakan and its Naighbours.*

উৎস :Khan, 1999: 36

উল্লেখ্য, রাখাইনদের বাংলাদেশে আগমনের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় তাদের আগমনের সাথে মারমাদের আগমনের ইতিহাস সম্পৃক্ত। তাই রাখাইনদের আগমনকে পৃথকভাবে না দেখে বরং সামগ্রিকভাবে দেখা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে আরাকানিদের বঙ্গদেশে বসতি স্থাপনের ইতিহাস পর্যালোচনায় যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায় সেসব মতকে তিনটি বড়দাগে চিহ্নিত করে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র : ৩. ১

আরাকানিদের বাংলায় আগমন

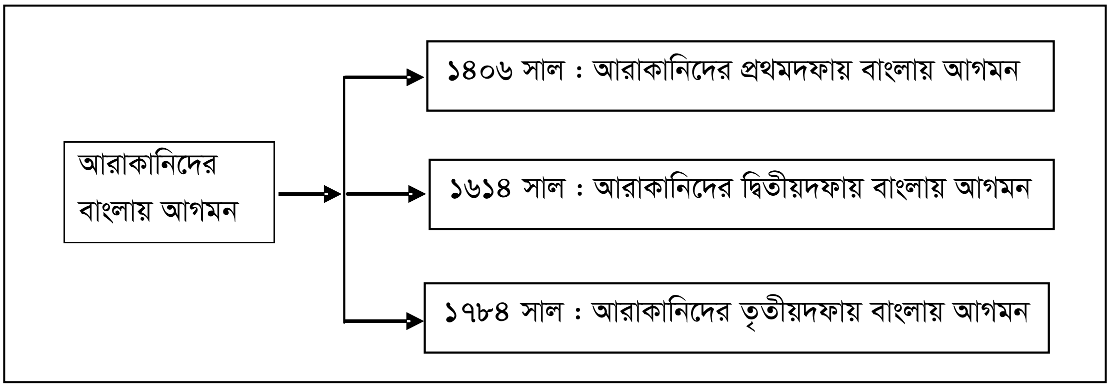

উৎস : গবেষক কর্তৃক প্রণীত

৩.৫.৩.১১৪০৬ সাল : আরাকানিদের প্রথম দফায় বাংলায় আগমন

রাখাইনের ঐতিহাসিক রাজত্বকালের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২৫–খ্রিস্টাব্দ ১৭৮৪) ৯টি রাজবংশের ৬ষ্ঠ হলো লেম্রু রাজবংশ (১০১৮-১৪০৬)। এই রাজবংশের শেষ রাজা নরমিখলা (১৪০৩–১৪৩৩ খ্রি.) ১৪০৪ সালে সিংহাসনে আরোহন করেন। তার গৃহীত মুসলমানি নাম সোলায়মান খান। বছর দুইয়ের মাথায় বর্মিরাজ মেং শোয়েই (১৪০১-১৪২২) ১৪০৬ সালে আরাকান দখল করেন। নরমিখলা পালিয়ে বাংলার রাজধানী গৌড়ের রাজদরবারে আশ্রয় নেন। বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯) তাকে সসম্মানে আশ্রয় দেন। এর ২৪ বছর পর সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪২৬-১৪৫৯)-এর সহায়তায় ১৪৩০ সালে নরমিখলা আরাকান রাজ পুনরুদ্ধার করেন এবং ভবিষ্যৎ বর্মি আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে লাউংগ্রেটের পরিবর্তে আকিয়াব অঞ্চলের লেম্রু নদীর তীরবর্তী 'ম্রাউক উ' নগরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৪৩৩–১৭৮৫ সাল পর্যন্ত ৩৫২ বছর ধরে ম্রাউক উ আরাকানের রাজধানী ছিল। ১৭৮৫ সালে স্বাধীন আরাকান বার্মাসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে ম্রাউক উ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় (অং, ২০০৩: ১৪)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আরাকান রাজ

Dhaka University Institutional Repository

নরমিখলা ১৪০৬ সালে যখন তার সৈন্যদের নিয়ে বাংলায় আশ্রয় নেন তখনও কিছু আরাকানি বাংলায় বসতি শুরু করে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৩৮৫: ৩০) বলেন, আরাকান রাজ মেং সোয়ামউন (নামান্তরে নরমেইখ্‌লা) বার্মা রাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গৌড়রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন; গৌড়রাজের সাহায্যে পুনরায় আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। পরিণামে আরাকান গৌড়ের সামন্তরাজ্যে পরিণত হয়।কিন্তু নরমেইখ্‌লার মৃত্যুর পর আরাকানের উত্তরাধিকারী মেংখরি (১৪৩৪-৫৯ খ্রিস্টাব্দ) গৌড়ের সঙ্গে আরাকানের পূর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করে আগ্রাসী নীতির অবলম্বনে চট্টগ্রামের রামু ও তার দক্ষিণস্থ সমস্ত অঞ্চল দখল করে। চৌধুরীর (১৯৭৬: ২৯) মতে, ১৫১২ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকান অধিকারভুক্ত থাকে। এর মধ্যবর্তী কোনো এক সময় গৌড়ের সুলতান বারবাক শাহ চট্টগ্রাম পুনঃঅধিকার করেন। ১৪৭৪ সালে উৎকীর্ণ চট্টগ্রামের একটি শিলালিপিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নানা উত্থান-পতনের পর গৌড়েশ্বর নসরৎ শাহ ১৫১৮ সালে হৃত চট্টগ্রামকে ১৫২৫ সালে পুনরায় জয় করে শহরের আট মাইল উত্তরে হাট হাজারী থানার ফতেয়াবাদে রাজধানী স্থাপন করে চট্টগ্রামের নতুন নামকরণ করেন ফতেয়াবাদ। চট্টগ্রামের কবি দৌলত উজির খানের 'লায়লী মজনু' কাব্যে এই ফতেয়াবাদের বর্ণনা পাওয়া যায়–

'নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পুর-এ সাধ
চট্টগ্রাম সুনাম প্রকাশ।' (শরীফ, ১৯৬৬: ২)

১৬২৫ সালে বাংলার সুবেদারের প্ররোচনায় চট্টগ্রামে আরাকানের বিরুদ্ধে সামন্ত বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য স্বয়ং রাজা সুধর্মন এগিয়ে আসেন এবং তিনি চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের শাস্তি দিয়ে ভুলুয়ায় হানা দেন এবং ঢাকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে লুণ্ঠন করে ও অনেককে বন্দি করে নিয়ে যান (শরীফ, ১৩৭৬)। তখন চট্টগ্রামের উপর আরাকানিদের নিরঙ্কুশ অধিকারে অনেকটা সহায়তা করে পর্তুগিজ জলদস্যুরা। মগদের প্রথম দিককার বঙ্গে বসতির বিবরণ পাওয়া যায় সতীশ চন্দ্র মিত্রের (১৯২২) 'যশোহর খুলনার ইতিহা'-এ। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ভারত হতে পর্তুগিজরা এসে আরাকান ও নিকটবর্তী নানাস্থানে সমুদ্রতীরে বাস করে। কারণ তারা উৎকৃষ্ট নাবিক ও দস্যু ব্যবসার উপযুক্ত সহচর। বিশেষত বঙ্গে এসে দস্যুতা করার জন্য বঙ্গের পাঠান, মোগল সকলেই মগের প্রতি রুষ্ট ছিলেন। মগরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বিশেষ সাহায্য পাওয়ার আশায় পর্তুগিজদের আশ্রয় দেয়। মিত্রের মতানুসারে

Dhaka University Institutional Repository

পর্তুগিজরা ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে প্রথম বঙ্গে আসে। ১৫১৭ সালে সর্বপ্রথম কোয়েলহো চট্টগ্রামে ও পরের বছর সিলভিরা আরাকানে দেখা দেন।

৩.৫.৩.২ ১৬১৪ সাল : আরাকানিদের দ্বিতীয় দফায় বাংলায় আগমন

চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকায় পর্তুগিজ দৌরাত্ম্য দমনের জন্য ১৬২০ সালে আরাকান রাজ মিনয়াজাগীর (মুসলমান নাম সলীম শাহ, রাজত্বকাল ১৫৯৩-১৬১২ খ্রি.) পুত্র মেংখা মৌং (মুসলমানি নাম উশঙ্গ শাহ উরফে হোসেন শাহ, রাজত্বকাল ১৬১২-১৬২২ খ্রি.) আরাকান রাজবন্দী তেলেইং রাজকুমার মেং শোয়েপ্রু-কে, যাকে ১৫৯৯ সালে পেগু থেকে বন্দী করে আনা হয়েছিল, চট্টগ্রামের শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত করে পাঠান। তিনি তেলেইং বাহিনীসহ চট্টগ্রামে আসার পর পর্তুগিজ দৌরাত্ম্য দমন করে আরাকান রাজের প্রশংসা অর্জন করেন এবং 'বোমাঙ' উপাধি লাভ করেন(Harvey, 1925: 35)। পরবর্তীকালে তার উত্তর পুরুষরাই আরাকান অধিকৃত দক্ষিণ চট্টগ্রামের শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেন।

মেং শোয়ে প্রু'র মৃত্যুর পর তদীয় চার উত্তর পুরুষ মেং রাই প্রু (১৬৩০-১৬৬৫), হারি প্রু (১৬৬৫-১৬৮৭), হারিও (১৬৮৭-১৭২৭) ও কংলা প্রু (১৭২৭-১৭৫৬), তাদের অনুগত তেলেইং বাহিনীসহ বংশপরম্পরায় আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রামের শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করে (ত্রিপুরা, ১৯৮৪: ৫৩-৫৪)। উল্লেখ্য, হারি প্রুর শাসনকালে ১৬৬৬ সালের ২৭ জানুয়ারি মোগল সেনাপতি বুজর্গ উম্মেদ খাঁ আরাকানি বাহিনীকে পরাজিত করে শংখ নদীর উত্তর তীর অবধি চট্টগ্রামের বৃহদাংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। দক্ষিণ চট্টগ্রাম আরাকান অধিকারে থাকে। আঠার শতকে যখন কামানচি বিদ্রোহীরা আরাকানে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল তখন সেনাপতি মহাদন্ডায়ু কামানচি বিদ্রোহ দমনে তৎপর হন। এ সময় দক্ষিণ চট্টগ্রামের আরাকানি শাসনকর্তা হারিও মহাদন্ডায়ুক সান দাইজায়া (San Dawizaya)নাম গ্রহণ করে আরাকানের রাজা হন (১৭১০-১৭৩০)। তিনি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হারিও-কে বোমাংগ্রি (শ্রেষ্ঠ বোমাং) উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন (Harvey, 1925 : 35)। তার মৃত্যুর পর পৌত্র কংলা প্রু দক্ষিণ চট্টগ্রামের আরাকানি শাসনকর্তা হন। তিনি দোহাজারি দুর্গের মোগল সেনাপতি আধু খাঁ ও তার পুত্র শের জামান খাঁর আক্রমণের চাপের মুখে ক্রমশ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে সরে যেতে থাকেন এবং একে একে রামু, ইদগড়, ইয়াংছা, মাতামুহুরি প্রভৃতি অবস্থান ছেড়ে দেওয়ার পর শেষ পর্যন্ত লামায় তার অধিকার সংকুচিত হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৭৫৬ সালে দোহাজারি দুর্গের অধ্যক্ষ শের জামাল খাঁর আক্রমণের মুখে দক্ষিণ চট্টগ্রামের শেষ আরাকানি শাসনকর্তা বোমাঙ কংলা প্রু অনুসারীদের নিয়ে তার শেষ অবস্থান তেলেইং লামা থেকে আরাকানে পালিয়ে যান। দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকেও চিরদিনের জন্য আরাকানি শাসনের অবসান ঘটে। সুবা বাংলা

মুসলমান শাসনভুক্ত হয় (মাহবুব-উল-আলম, ১৯৬৯: ৬০)। তবে কংলা প্রু পুনরায় চট্টগ্রামে ফিরে আসেন।

তার চট্টগ্রামে ফিরে আসা সম্পর্কে দুটি মত প্রচলিত। এক. আরাকানে ফিরে যাওয়ার পর আরাকান রাজা কোনো সহানুভূতি দেখাননি বলে তিনি ফিরে আসেন এবং মোগল আনুগত্য স্বীকার করে প্রথমে চট্টগ্রামে ও পরে বান্দরবানে বসতি গড়ে তোলেন। দুই. ১৭৫৬ সাল থেকে আঠার বছর আরাকানে অবস্থান করেন। অতঃপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকারভুক্ত হওয়ার পর ১৭৭৪ সালে তিনি চট্টগ্রামে চলে আসেন এবং পর্যায়ক্রমে রামু, ইদগাহ, মাতামুহুরি নদীর তীরে, মহেশখালিতে বসবাস করেন। ১৭৮৯ সালে কর আদায় সংক্রান্ত ব্যাপারে ইংরেজরা সরাসরি তার সাথে যোগাযোগ করে (চৌধুরী, ১৯৯৫)।পরবর্তীকালে ১৩১ বছর বয়সে ১৮৯৯ সালে কংলা প্রু মারা গেলে তার উত্তর পুরুষগণ বংশানুক্রমিক বোমাঙ নিযুক্ত হন। আব্দুল হক চৌধুরী চট্টগ্রামের বংশানুক্রমিক শাসনকর্তা ও বোমাঙগণের তালিকা তৈরি করেন, যা নিম্নেউপস্থাপন করা হলো :

ছক: ৩.২
চট্টগ্রামের বংশানুক্রমিক শাসনকর্তা ও বোমাঙগণের তালিকা

মেং শোয়ে প্রু ↓	১৬৩০-১৬৬৫	ভূতপূর্ব পেগু রাজকুমার ও আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা
মেং রাই প্রু বা পালাই প্রু (পুত্র) ↓	১৬৬৫-১৬৮৭	
হাবিঞো (ভাতুষ্পুত্র অথবা ভাগিনা) ↓	১৬৮৭-১৭২৭	
কংলা প্রু (পৌত্র) ↓	১৭২৭-১৮১৯	
সা থাং প্রু (পুত্র) ↓	১৮১৯-১৮৪০	বান্দরবানের বোমাং
অং প্রু (ভ্রাতা) [ভিন্নমত আছে] ↓	১৮৪৬-১৮৬৬	
মং প্রু (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ↓	১৮৬৬-১৮৭৫	
সানাইঞো (ভ্রাতা) ↓	১৮৭৫-১৯০১	
চোলা প্রু (ভ্রাতুষ্পুত্র) ↓	১৯০১-১৯১৬	
মং সাঞো (জেঠতুতো ভাই) ↓	১৯১৬-১৯২৩	
কাজেন প্রু (ভ্রাতুষ্পুত্র) ↓	১৯২৩-১৯৩৩	
ক্যজ সেইং (পুত্র) ↓	১৯৩৩-১৯৫৯	
মং শোয়ে প্রু চৌধুরী (ভ্রাতা) ↓	১৯৫৯-	

উৎস : চৌধুরী, ১৯৯৫

আব্দুল হক চৌধুরী (১৯৯৫)-এর মতে, ভূতপূর্ব পেগু রাজকুমার, চট্টগ্রামের আরাকানি শাসনকর্তা মং শোয়ে প্রুর (১৬১৪-১৬৩০) মগ নামে খ্যাত বান্দরবান পার্বত্য জেলার বোমাঙ পরিবার ও তাদের অনুগামীরা ইংরেজ আমলে নিজেদের তেলেং বংশধর বলে দাবি করতেন। পাকিস্তান আমলে তারা নিজেদের মারমা নামে খ্যাত করতেন। অথচ আরাকানে মারমা নামে কোনো জাতি বা উপজাতি বা গোত্র নেই। আবার বান্দরবানের এ প্রজন্মের কিছু কিছু অধিবাসী সেখানকার তেলেইং বা মারমা জাতিকে তেলেং বাহিনীর উত্তর পুরুষ বলে স্বীকার করে না এই যুক্তিতে যে, বোমাঙ পরিবার ও বান্দরবানের মগ বা মারমাদের ভাষা আরাকানি উপভাষা, তেলেইং ভাষা নয় কেন (মং-চ-উ-চৌধুরী, ১৯৭৬) ? সংগত কারণে চৌধুরী (১৯৯৫) মন্তব্য করেন, এ হিসেবে বলা যায়, বিগত চারশ বছরে পেগু থেকে বিছিন্ন হয়ে আরাকান, চট্টগ্রাম ও বান্দরবানে বসবাসকালে আরাকানি মেয়েদের বিয়ে ও পরিণামে বর্ণসংকার এবং কালক্রমে আরাকানি ভাষাভাষি।

হার্ভে বান্দরবান পার্বত্য জেলার মগ বা মারমা উপজাতিকে ব্রহ্মদেশের মোন উপজাতির দূরবর্তী উত্তর পুরুষ বলে মত প্রকাশ করেছেন। ষোল শতকে ইরাবতী এলাকায় বিদ্রোহ ও অরাজকতার দরুন সেখানকার মোনরা আরাকানে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিত। তাদের অধিকাংশ আরাকান রাজের সৈন্যবাহিনীতে চাকুরি নিত (চৌধুরী, ১৯৯৫)।উল্লেখ্য, পর্তুগিজ ধর্মযাজক এস ম্যানরিক ১৬৩০ সালের ২ জুলাই দিয়াং ত্যাগ করে নৌপথে রামু হয়ে পার্বত্য পথে আরাকানের রাজধানী ম্রোহং পৌঁছান। তার বিবরণী থেকে জানা যায়, আরাকান যাবার কালে পথিমধ্যে রামুতে পৌঁছলে রামুর গভর্নর তাকে অনেক যত্ন-আত্মি করেন এবং আরাকানে যেতে সাহায্য করেন। ম্যানরিক রামুর শাসনকর্তাকে 'পমাজা' বলে উল্লেখ করেন (অং, ২০০৩: ১৬)।

৩.৫.৩.৩ আরাকানিদের তৃতীয় দফায় বাংলায় আগমন

রামু-কক্সবাজার অঞ্চলে আগমন

১৭৮৫ সালে ব্রহ্মদেশের রাজা বোধপায়া স্বাধীন আরাকান আক্রমণ করে বিশ হাজার সৈন্যসহ রাজা থামাদাকে বন্দী করে। থামাদার শিরচ্ছেদ, সৈন্যদের নির্মমভাবে হত্যা এবং প্রত্যন্ত এলাকার নিরীহ জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর হত্যা-নির্যাতন-অত্যাচারের মুখে আরাকানের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রাণরক্ষার্থে তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজার মহকুমায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্মী অত্যাচার প্রসঙ্গে এম সিদ্দিক খান উল্লেখ করেন, কর্নেল এরিকসন আরাকানে বর্মি প্রশাসনের অত্যাচার সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে একটি রিপোর্ট দেন। এ রিপোর্ট থেকে বর্মি অত্যাচারের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় (চৌধুরী, ১৯৯৫)। তখন মহামারীর কবলে পড়ে প্রায় দুই লাখ শরণার্থীর

মৃত্যু হয়। হ্যামিলটনের বিবরণ অনুযায়ী টেকনাফ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রাস্তাটি ওই শবদেহ দিয়ে ঢেকে দেওয়া যেত। ইংরেজ সরকার তাদের আরাকানে ফিরে যেতে বললে তারা অস্বীকার করে। তখন ইংরেজ সরকার তাদের চট্টগ্রামের বোমাঙ সার্কেল, কক্সবাজার মহকুমা ও পটুয়াখালীতে পুনর্বাসন করে। পরবর্তীকালে কক্সবাজার মহকুমার আরাকানিদের বৃহদাংশ সীতাকুণ্ড পর্বতমালায় এবং শেষে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে মং সার্কেলে বসতি স্থাপন করে। এই তৃতীয়বারের মতো আরাকানিদের চট্টগ্রামে আসার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭৮৭ সালে ২৪ জুন চট্টগ্রামের তৎকালীন ইংরেজ শাসনকর্তার কাছে লেখা বর্মরাজের পূর্বোল্লিখিত চিঠির বিবরণ থেকে। (চৌধুরী, ২০০৪)

ঐতিহাসিক অধ্যাপক আবদুল করিম (১৯৬৯)-এর মতে, ১৭৮৫ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত আরাকানিদের চট্টগ্রাম আগমন অব্যাহত ছিল। ১৮০১ সালে রামুর আরাকানি শিবিরে লক্ষাধিক শরণার্থী ছিল। আব্দুল হক চৌধুরী (১৯৯৫)-এর মতে, এই সময়ে ১৭৮৫ সালে আরাকানের প্যালাইংস্যা নদীর উপত্যকায় বসবাসকারী প্যালাইংসা মগ বা মারমা গোত্র প্রধান ম্রাচাই দাহবং তার অনুগামীসহ আরাকান ত্যাগ করে চট্টগ্রামে শরণার্থী হয়ে আসে। তারা ইংরেজ সরকারকে কার্পাস তুলা কর হিসেবে দেওয়ার চুক্তিবদ্ধ হয়ে মাতামুহুরি নদীর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। তিনি প্যালাইংসা মগ বা মারমা গোত্র প্রধান ও মং চিফদের হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করেন যা নিম্নে দেখানো হলো।

ছক : ৩.৩
প্যালাইংসা মগ বা মারমা গোত্র প্রধান ও মং চিফদের হালনাগাদ তালিকা

ম্রাচাই দাহবইং ↓	১৭৮৫-১৭৮৭
সাইলেং (পৌত্র) ↓	১৭৮৭-১৭৯৩
খেদু (ভাতুস্পুত্র) ↓	১৭৯৩-১৮০০
ক্যাংজাই (পুত্র) ↓	১৮০০-১৮২৬
ক্যজসেঁই (পুত্র) ↓	১৮২৬-১৮৭০
নরবদি (পুত্র) ↓	১৮৭০-১৮৭৯
ক্যজ প্রু (ভ্রাতা) ↓	১৮৭৯–১৮৮৩
নেপ্রু সেঁই (ভাগিনা) ↓	১৮৮৩-১৯৩৬

নাইউমা চৌধুরানি (কন্যা) ↓	১৯৩৬-১৯৫৩
মং প্রু সেঁই (পুত্র) ↓	১৯৫৩-১৯৮৪
নীহার দেবি (স্ত্রী) ↓	১৯৮৪-১৯৯১
পাইলা প্রু চৌধুরী (অস্থায়ী)	১৯৯১-

সূত্র : চৌধুরী, ১৯৯৫

আব্দুল হক চৌধুরী উল্লেখ করেন, প্যালাইংসা মগ বা মারমাদের চট্টগ্রামে আগমণের বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা যায় ১৭৮৭ সালের ২৪ জুন চট্টগ্রামের তৎকালীন ইংরেজ শাসনকর্তার কাছে লেখা বর্মরাজের একটি চিঠির বিবরণ থেকে। ঐ চিঠিতে উল্লেখ আছে যে :

> "... আমরা পরস্পরে এতদিন বন্ধুর সূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। দু'দেশের অধিবাসীরা অবাধে মেলামেশা করতে পারত। সম্প্রতি ক্রুটি নামক এক ব্যক্তি আমার সাম্রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে আপনার সাম্রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। তাকে জোরপূর্বক আনার ইচ্ছা আমাদের ছিল না বলে তাকে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করে আমরা আপনাদের কাছে বিনয় সহকারে চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু আপনারা তাকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন। আমাদের সাম্রাজ্যের পরিধি নেহাৎ কম নয় এবং ক্রুটি তার অবাধ্য আচরণে আমাদের রাজশক্তির অবমাননা ও শান্তি ভঙ্গ করেছে। ডোমকান, চাকমা, কিরুপা, লেইস, মুরুং ও অন্যান্য জাতির লোকও আরাকান থেকে পালিয়ে গিয়েছে ও আপনাদের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে।... বর্তমানে ডাকাতি বৃত্তি গ্রহণ করেছে বলে তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া আপনাদের পক্ষে মোটেই সমীচীন নয়। যে সব মগ আরাকান থেকে পালিয়ে গেছে তাদেরকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। তাতে আমাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব আরো সুদৃঢ় হবে।..." (চৌধুরী, ১৯৯৫ঃ ১২৫)

এই চিঠিতে আরাকানত্যাগী ৬টি উপজাতির নাম আছে। কিন্তু মারমা বলে কোনো নাম নেই। এদের মগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আরাকানের সমস্ত অধিবাসী তখন মগ নামে খ্যাত ছিল। কেবল বাঙালিরা নয়, ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরাও আরাকানের সমস্ত অধিবাসীকে মগ নামে খ্যাত করত। যেজন্য চ্যেধুরী প্রশ্ন রেখেছেন, স্বাধীন আরাকান রাজ্যের বিলুপ্তিকালে আরাকানি শরণার্থীদের একটি অংশ কক্সবাজারে বসবাসকারীরা নিজেদের রাখাইন নামে খ্যাত করে; অপর অংশ চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলা তিনটিতে বসবাসকারীরা নিজেদের মারমা নামে খ্যাত করে– এক যাত্রায় পৃথক ফল হলো কেন? আরাকানে মারমা উপজাতির অস্তিত্ব নেই, চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাগুলোতে মারমা এলো কোথা থেকে। (চৌধুরী, ১৯৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী আরকানিরা বিভিন্ন সময়ে হৃতভূমি পুনরুদ্ধারে অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হয়। এ সম্পর্কে খান (১৯৭৮: ৬) উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী আরাকানি শরণার্থীরা আরাকানকে বর্মি শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য ম্রাউ রাজবংশের বংশধর আরাকানের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী ন্যা সিন পিয় (কিংবেরিং নামে সমধিক পরিচিত)- এর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে চট্টগ্রাম থেকে কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন। এরমধ্যে ১৮১১, ১৮১৩, ১৮১৪ সালের অভিযানগুলি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নানান সীমাবদ্ধতার কারণে এসব অভিযান ব্যর্থ হয়। এ সকল অভিযান নিয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ ও বর্মি সরকারের মধ্যে দারুন তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে উভয় দেশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষ ইতিহাসে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮২৪-২৫) নামে পরিচিত ।

১৮২৬ সালে আন্দাবুর সন্ধি অনুযায়ী আরাকান ও টেনাসেরিম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পরে ১৮৫২ সালের যুদ্ধের পর ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ শাসন পাকাপোক্ত হয়। ১৯৩৬ সালে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের একটি প্রদেশ হিসেবে শাসিত হয়। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করা হয়। ১৯৪২ সালে জাপানিরা সমগ্র ব্রহ্মদেশ দখল করে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধার করে। ১৯৪৭ সালের লন্ডন চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু অতীতের শাসনের জের হিসেবে (১৭৮৫-১৮২৫) আরাকান ব্রহ্মদেশের অধীনে থেকে যায় (ইসলাম, ১৯৯৮: ৭১-১০৩)।

আরাকানে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পরও শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে যায়নি। এ সময় উভয় দেশের শাসনক্ষমতা একই শাসক অর্থাৎ ব্রিটিশের হাতে থাকায় এ দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধাগুলো দূরীভূত হয়। আরাকানিরা আর দেশে ফিরে না গিয়ে ব্রিটিশ ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ও চট্টগ্রাম জেলার হারবাং, রামু, কক্সবাজার, উখিয়া, নীলা ও টেকনাফ প্রভৃতি এলাকায় আরাকানি বসতি গড়ে ওঠে (খান, ১৯৭৮: ১৫)।

বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে আগমন

১৭৮৫ সালে আরাকানের পতনের পর আরাকানিদের একাংশ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এলাকায় আশ্রয় নেয়, এবং পরবর্তীকালে পটুয়াখালী এলাকায় পুনর্বাসিত করা হয়- এ সম্পর্কে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে অপর একটি অংশ সরাসরি আরাকান থেকে গভীর বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

বাকেরগঞ্জ অঞ্চলের সমুদ্র-উপকূলবর্তী এলাকায় আশ্রয় নেয় বলে অনেকে মত দিয়েছেন। এ সম্পর্কে মুস্তাফা মজিদ (১৯৯২: ৫৯) বলেন,

> "যে কারণে আরাকানীরা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেশান্তরী হয়ে বসতি গড়তে পেরেছে তা হচ্ছে এ অঞ্চলে সে সময় অধিষ্ঠিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসকবর্গের আরাকানীদের বসতিদানের নীতি। সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় এ পর্যায়ে আহার্যসহ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসিত করার। পিছনে মানবতাবাদ থাকলেও এতদঞ্চলের পতিত জমিকে জনবহুল আবাদী করে তোলার অভিপ্রায়ও কোম্পানীর ছিল। সরকারী পৃষ্টপোষকতার এই নীতির বিস্তরণ থেকেই রাখাইনদের একটি দল সরাসরি আরাকান, বর্মা অথবা চট্টগ্রাম থেকে পটুয়াখালীতে আশ্রয় লাভ করে।" (মজিদ, ১৯৯২: ৫৯)

উথুন অং জা (১৯৯২)-এর বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৭৮৪ সালে (বাংলা ১১৯১ সন, রাখাইন অব্দ ১১৪৬, বুদ্ধাব্দ ২৩৩০)বর্তমান আরাকান প্রদেশ একটি স্বাধীন দেশ ছিল। রাজধানী ছিল 'ম্রহং' বা মাউ শহর। বার্মার রাজা বোদেফায়া আরাকান বা রাখাইন প্রে'র রাজাকে পরাজিত করে বিশ্ববিখ্যাত মহামুনি ফয়া বা বুদ্ধমূর্তি মান্দালয়ে স্থানান্তরিত করে নিয়ে যান। তাতে আরাকানবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং বর্মি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বর্মিবাহিনী বিদ্রোহীদের নির্মমভাবে দমন করে। তারা নারী-পুরুষ নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। এ সময় আরাকান রাজের কয়েকজন সেনাধ্যক্ষ যেমন ব্রিগেডিয়ার পিউ উ অং, ক্যাপ্টেন মংগ্রি, ক্যাপ্টেন উম্রাবো প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় বিদ্রোহীগণ ৩ খানা বড় নৌকা করে সপরিবারে পশ্চিম-দক্ষিণ তীরে অবস্থিত মচনেতং গ্রাম থেকে সোজাসুজি পশ্চিমে সাগর পাড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় পশ্চিমতীরে অবস্থিত রাঙাবালি দ্বীপে নোঙর করে। ঐ সময় ইংরেজরা বাংলার ইজারা নিয়েছে এবং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা তথা সমগ্র ভারত ও পার্শ্ববর্তী আরাকান ও বাংলা দখল করে নেওয়ার স্বপ্ন দেখছিল এবং তা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা করছিল। তাই আরাকানি বিদ্রোহীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে তাদের প্রতি বদান্যতা প্রকাশ করে। এরপর নেভাল অফিসারের সহায়তায় তারা ঐ দ্বীপ ছেড়ে বড় বাইজদিয়া নামক স্থানে এসে বসতি স্থাপন করে। সে সময় ঐ নেভাল অফিসার কিছু আগ্নেয় অস্ত্র দিয়েও সাহায্য করে। পরবর্তীকালে শীতের মৌসুমে সাগর শান্ত থাকাকালে পারাপারে নিরাপদ বলে দেশে ফেলে আসা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য আগ্রহীদের এ দেশে আসতে সাহায্য করে। এভাবে নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে,নতুন একটি জনপদ গড়ে ওঠে। প্রায় দুই যুগের মধ্যে অর্থাৎ তাদের

আগমনের ৫০ বছর যেতে না যেতে গলাচিপা, আমতলী, বরগুনা এলাকার বিভিন্ন স্থানে তাদের বসতি ছড়িয়ে পড়ে।

তাহান (১৯৭৮)-এর মতে, ১৭৮৪ সালে গাঢ় কুয়াশাচ্ছন্ন হিম শীতল রাতে আরাকানের মেঘাবতীর সান্ধ্যে জিলার কোন এক নির্জন স্থান থেকে একশ' পঞ্চাশটি রাখাইন পরিবার বর্মিজদের নাগপাশ হতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় পঞ্চাশটি নৌযান যোগে তিনদিন তিনরাত ধরে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে গলাচিপা থানাধীন রাঙাবালি দ্বীপে উপস্থিত হয়। পরে মৌডুবিতে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। ক্রমান্বয়ে তাদের বসতি বিস্তার লাভ করে এবং বরগুনা থানার বালিয়াতলী, আমতলী থানার বগী, কলাপাড়া থানার টিয়াখালী ও কুয়াকাটা রাখাইন জনগোষ্ঠীতে পূর্ণ হয়ে যায়।

মাবুদ খান (২০০৬: ১৫) পটুয়াখালীর রাখাইনদের দুটি ধারায় বিকাশ লাভ করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। পটুয়াখালী জেলায় আরাকানীদের বসতি স্থাপন সম্পর্কে তিনি বলেন, এ জেলার আরাকানি উপনিবেশ দুটি স্রোতধারায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছে– (১) রামু-কক্সবাজার, ও (২) আরাকানি। বিভিন্ন ইংরেজ কর্মকর্তা ও পর্যটকদের বিবরণী থেকে এ এলাকার বসতি সম্পর্কে জানা যায়। ১৬৪১ সালে ফ্রেডারিক ম্যানরিক শাহবাজপুর এসেছিলেন। তিনি তখন ঐ অঞ্চলে কোনো জনবসতি দেখেননি। এ থেকে বোঝা যায় ওই সময়কালে (১৬৪১) এ অঞ্চলে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস ছিল না। রাখাইন মাস্টার থং অং-কে উদ্ধৃতি করে খান তিনি বলেন, অং তাকে জানান যে, সুইলং চৌধুরী ছিলেন প্রথম আরাকানি বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে অন্যতম। তার পুত্র অকিউ চৌধুরী খাপড়াভাঙ্গায় প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তার পুত্র মায়াচা চৌধুরী ঐ গ্রামে প্যাগোডা নির্মাণ করেন। এই প্যাগোডা খাপড়ার জাদি নামে আজও পরিচিত।

বেভারিজ (১৮৭২: ১৪৭) এ এলাকায় আরাকানি বসতি সম্পর্কে বলেন, "তাদের কেউ সত্তর বছরের বেশি আগে এখানে বসতি গড়ে তুলেনি।" ব্যাটে কর্তৃক ১৮১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নিকট লিখিত একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "রামু থেকে আগত কয়েকজন আরাকানি শরণার্থীকে তিনি কিং বেরিং-এর অনুসারী সন্দেহে গ্রেফতার করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ সকল শরণার্থীর সাহায্যের জন্য তৎকালীন সরকার ৩২৬ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। তিনি ১৮৭৪ সালে চর কুকুরি-মুকুরি দ্বীপের আরাকানি বসতি সম্পর্কে বলেন, আমরা হেডম্যান থেকে জানতে পেরেছি এই দ্বীপে কেবল কতিপয় মগ বা বার্মিজ বসতি গড়ে তুলেছে। চর কুকুরি-মুকুরিতে তিনি সাতটি ঘর দেখতে পান এবং জানতে পারেন যে, আরাকানিরা চার বছর যাবত ঐ এলাকায় বসবাস করছে। উল্লেখ্য, চর কুকুরি-মুকুরিতে বর্তমানে কোনো আরাকানি বসতি নেই। হতে পারে তারা অন্যত্র স্থানান্তর করেছেন। হেনরি বেভারিজ আরো উল্লেখ করেন–

Dhaka University Institutional Repository

> "১৮২৪ সালের ২৪ মার্চ ঠুংগি মগ বোর্ড অব রেভিনিউ-এর কাছে এই বলে আবেদন করে যে, তিনি চট্টগ্রাম ও রামু থেকে ২৩০টি পরিবারকে এখানে বসবাসের জন্য নিয়ে এসেছেন। তিনি আরাকানের অধিবাসী ছিলেন। তার সম্রাটের পতনের পর তিনি দেশ ত্যাগ করে ব্রিটিশ সরকারের শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছেন।"(বেভারিজ, ১৮৭২: ১৪৭)

হান্টার (১৮৭৫: ১৮৮) খাপড়াভাঙ্গা ও লতাচাপলি ইউনিয়নে ১৮৭২ সালে কয়েকজন সত্তর কোঠার বয়সি আরাকানি মহিলাকে দেখেছিলেন যারা তাকে জানিয়েছিল যে তারা শৈশবকাল থেকে ঐ এলাকায় বসবাস করছে। অর্থাৎ তারা ৬৫-৭০ বছর আগে থেকে খাপড়াভাঙা ও লতাচাপলি এলাকায় বসবাস করে আসছে। সে অনুযায়ী ১৮০০ সালের আগে থেকে এ-সব এলাকায় রাখাইনদের বসতি ছিল। পটুয়াখালির রাখাইন সম্পর্কে হান্টার বলেছেন, বর্তমান মগরা আদি আরাকানি দস্যুদের উত্তরসূরি নয়। কোম্পানি সরকার জঙ্গল পরিষ্কার ও ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য ১৮ শতকের শেষ পাদের শুরুতে এদের পূর্ব পুরুষদের চট্টগ্রাম ও রামু অঞ্চল থেকে এ অঞ্চলে নিয়ে আসে। হার্ভের বক্তব্যে হান্টারের তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। হার্ভে (১৯৬১: ৪২) বলেন, ব্রিটিশ সরকার ১৭৮৯ সালে বাংলায় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সর্ব দক্ষিণে সুন্দরবনের বাকেরগঞ্জে মগ পরিবারদের উৎকৃষ্ট ধানী জমি দান করেছিলেন। তখন এ অঞ্চল ছিল জনহীন, জলা ও বন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বৃহত্তর পটুয়াখালি জেলার আরাকানি বসতি রামু ও কক্সবাজারের স্রোতধারা। উল্লেখ্য, রামু ও কক্সবাজারে বসবাসকারী আরাকানি বংশধরগণ নিজেদের রাখাইন নামে পরিচয় দেয়।

অবশ্য আরাকানিদের একাংশের সরাসরি পটুয়াখালীতে অভিবাসনের ইঙ্গিত দিয়েছেন মনিরুজ্জামান ও মউদুদ-উর-রশীদ সফদার। তাঁদের মতে, পটুয়াখালীতে দুটি পর্যায়ে রাখাইনরা বসতি স্থাপন করে। ভাষাগত তারতম্যের সূত্রে তাদের একাংশের যোগ কক্সবাজার ও রামু অঞ্চলের রাখাইনদের সাথে এবং অন্য অংশের যোগ আরাকান-বার্মার রাখাইনদের সাথে। তাঁদের মতে, কক্সবাজার ও রামু অঞ্চলের রাখাইনদের উপভাষা মারাও (Marow)এবং বার্মার নিম্নাঞ্চল বিশেষত রেঙ্গুনের রাখাইনদের উপভাষা 'রামরেহ' (Ramerhy)পটুয়াখালীর রাখাইন ভাষা ব্যবহারকে দ্বিধা-বিভক্ত করেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, ব্রিটিশ ভূমি উদ্ধার নীতির অধীনে পুনর্বাসনপ্রাপ্ত রাখাইনদের স্রোতধারা ছাড়াও পটুয়াখালীতে নির্বাসিত রাখাইনদের আরেকটি স্রোতধারা কর্তৃক বসতি গড়ে তোলার সত্যতা আছে (মজিদ, ২০০৭)।আব্দুস সাত্তার (১৯৭১) বলেন, পটুয়াখালীর মগরাও ১৭৮৯ সালে রেঙ্গুন থেকে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে এসে পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, অষ্টাদশ শতকের রাখাইন বসতি ছাড়াও তৎপূর্বে দক্ষিণবঙ্গে আরাকানের মগদের প্রথমদিকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উপস্থিতি ছিল। মিত্র (১৯২২) দেখিয়েছেন, ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিম ভারত হতে পর্তুগিজরা এসে আরাকান ও নিকটবর্তী নানাস্থানে সমুদ্রতীরে বাস করে। প্রথমত মগরা এদের বন্ধুভাবে লুফে নেয় দক্ষ নাবিক ও দস্যুব্যবসার উপযুক্ত সহচর হিসেবে। বঙ্গে এসে দস্যুতার জন্য বঙ্গের পাঠান-মোগল সকল শাসকই মগদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। মগরা বঙ্গীয় শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য বিশেষ সাহায্য পাওয়ার আশায় পর্তুগিজদের আশ্রয় দেয়। উভয়ের সম্পর্কের উঠানামায় বঙ্গের ভাগ্যও পরিবর্তিত হতো। ১৫১৭ সালে সর্বপ্রথম কোয়েলহো (Coelho) চট্টগ্রামে আসেন। পরের বছর ১৫১৮ সালে সিলভিরা (Silveira)- কে আরাকানে দেখা যায় (মিত্রঃ ১৯২২)। এই মগ-ফিরিঙ্গি দোস্তি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গের দক্ষিণ দিক থেকে নদীপথে দেশের যত্রতত্র প্রবেশ করে লুণ্ঠন, গৃহদাহ, জাতিনাশ করে বঙ্গের শান্তপল্লিকে শ্মশানে পরিণত করার উপক্রম করে। বিদেশি অহেশ ভ্রমণকারী এর জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন। ফ্রান্সিস বার্নিয়ের, শিহাবউদ্দীন মহম্মদ তালিশ প্রমুখ বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার-লুণ্ঠনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। পাদ্রি ম্যানরিক-এর আরাকান রাজের কাছে প্রদত্ত নিবেদনে এই লুণ্ঠনের চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রত্যেকেই জানেন এই পর্তুগিজগণ কিরূপে প্রতিবছর বাকলা, সলিমানাবাদ, যশোর, জিলি, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের উপর আক্রমণ করে শত্রুর (মোগল) শক্তি নাশ এবং আপনার শক্তি বৃদ্ধি করেছে। সম্পূর্ণ নগরী ও গ্রামগুলি পর্যন্ত আপনার রাজ্যভুক্ত করা হইয়াছে। মগ-ফিরিঙ্গি অত্যাচার প্রসঙ্গে সরকার (১৯০৭: ৪২২) বলেন, তাদের লুণ্ঠন ও মনুষ্যাপহরণের জন্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত সকল স্থানে মনুষ্যবাসের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছিল। পথের পাশে কোন স্থানে লোক বাস করতো না, প্রদীপের বাতি জ্বলতো না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যথা :

১. আরাকানিরা তিন দফায় বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এর অন্যতম কারণ রাজনৈতিক।

২. চট্টগ্রাম থেকে স্থানান্তর করে পটুয়াখালীতে গমন ছাড়াও সরাসরি কিছু আরাকানি আরাকান থেকে পটুয়াখালীতে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

৩. পটুয়াখালী অঞ্চলে রাখাইনদের আগমন ঘটেছে দুই দফায়।

৪. পটুয়াখালী জেলার রাখাইনরা মগ বা আরাকানি জলদস্যুর উপদ্রুপ বন্ধ হওয়ার প্রায় ৫০ বছর পরে এ অঞ্চলে আসে। তাই তারা মগদস্যুদের কোন উত্তরসূরি নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আরাকানিদের বসতি গড়ে তোলার পূর্বে পটুয়াখালীর এ-সব অঞ্চলে তেমন কোনো জনবসতি ছিল না। অঞ্চলটি বন-জঙ্গলে আবৃত ছিল।

৬. উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পটুয়াখালীর উপকূলীয় বনাঞ্চলে আরাকানি বসতি গড়ে ওঠে এবং আরাকানিরাই বৃহত্তর পটুয়াখালীর আদিম অধিবাসী।

Dhaka University Institutional Repository

টিকা

১. বিস্তারিত দেখুন, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী*, পৃ. ৫

২. আরও দেখুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

তথ্য নির্দেশ

Ahsan, S. (1993). *The Marmas of Bangladesh*, Bangladesh Agricultural Research Coucil, Dhaka

Bennison, J. S. (ed.). (1993). *Census of India*, vol. xi, Burma, Part ii, Rangoon

Beveridge, H. (1876). *The District of Bakergonj : Its History Statistics*, London.

Darwin, C. R. (1871). *Decent of Man*, London: John Murray

Grierson, G. A. (1906). *Linguistic Survey of India*, vol. iii, Part iii, Calcutta

Hall, D. G. E. (1955). *A History of South East Asia*, Macmillan and Co. Ltd. London

Hall, D. G. E. (1968). *History of South-East Asia*, London

Harvey, G. E. (1961). "Bayinnaury Living Descendent : The Magh Bohmong", *Journal of the Burma Research Society*, vol. XLIV, Part I

Harvey, G. E. (1925). *History of Burma*, London,

Hunter, W.W. (1875). *A Statistical Account of Bengal,* vol. v, London

Jack, J. C. (1918). *Bengal District Gazetteers : Bakerganj*, Calcutta

Karim, A. (1964). *Murshid Qudi Khan and His Times*, Dacca

Khan M. S,... *Political Proceedings (1797-1825)*, vol. I

Phayre, A. (1844). "On the History of Arakan", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol. xiii, Part I

Phayre, A. (1864). "On the History of Burmah Race", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol. 33

Risely, H. H. (1931). *The Tribes and Castes of Bengal*, Routledge, London

Sarkar, J. A. (1907). *The Feringht Pirates of Chaatgaon*, Calcutta

Shahy, K. N. (1977). "Tribal Self-Image and Indentity", in *Tribal Heritage of India* (ed. S. B. Dube), Delhi

Dhaka University Institutional Repository

আলাওল, (১৩৪৭), *সপ্তপয়কর*, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা

ইসলাম, এ. কে. এম. আমিনুল, (১৯৮৭), *এই পৃথিবীর মানুষ*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ইসলাম, মযহারুল ও হাফিজ, আবদুল (সম্পা.), (১৯৬৯), *সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

ইসলাম, মোঃ সিরাজুল, (১৯৯৮), *ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

করিম, আবদুল, (১৯৯০), *কক্সবাজারের ইতিহাস*, কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার

কাসেম, মোহাম্মদ, (১৯৮৪), *বাংলাদেশ : জাতি ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

খান, আবদুল মাবুদ, (১৯৭৮), "আরাকানে মুসলমান সম্প্রদায়", *দৈনিক আজাদী*, চট্টগ্রাম, ২২-২৭ আগস্ট

.... (১৯৭৮), *বাংলাদেশে আরাকানী শরণার্থী আগমনের পটভূমি* (পুস্তিকা), চট্টগ্রাম

.... (২০০৬), *পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

.... (২০০৭), *বান্দরবান জেলার মারমা সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

খান, মুহম্মদ, (১৯৫৯), *সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ সংবাদ*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সম্পা. শরীফ, আহমদ)

ঘোষ, সুবোধ, (১৩৫৫), *ভারতের আদিবাসী*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা

চৌধুরী, আব্দুল হক, (১৯৭৬), *চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, ১ম সংস্করণ, চট্টগ্রাম

.... (১৯৯৫), "বৃহত্তর চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহের মঘ বা মারমা উপজাতি", দ্র.*প্রবন্ধ বিচিত্রা : ইতিহাস ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

জাহাঙ্গীর, (১৮৬৪), *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী*, আলীগড়, ভারত

জাঁ, উথুন অং, (১৯৯২), "বাংলাদেশের উপকূলীয় রাক্ষাইনদের জীবন সংগ্রাম", *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২১ বর্ষ : ৪ সংখ্যা, ঢাকা

তাহান, (১৯৭৮), *বাংলাদেশের উপজাতি : রাখাইন*, পটুয়াখালী জেলা বৌদ্ধ যুব সংস্থা, পটুয়াখালী

ত্রিপুরা, সুরেন্দ্রলাল, (১৯৮৪), "পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজস্বের ইতিহাস", *উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, ২য় সংখ্যা, রাঙামাটি

নাথান, মির্জা, (১৯৮৯), *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (অনুবাদঃ খালেকদাদা চৌধুরী)

নেভী, মং ক্য শোয়ে নু, (২০০৪), "মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ", দ্র. মজিদ, মুস্তাফা, *মারমা জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

ফজল, আবুল, (১৮৭৭), *আইন-ই-আকবরী*, বিবলিয়োথিকো, (পু. মু. ২০০৩ : বাংলা একাডেমী, ঢাকা)

বেভারজ, এইচ., (১৮৭২), *সেন্সাস অব বেঙ্গল*, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

বেসেইনে, পিয়ের, (১৯৯৭), *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (অনুবাদঃ সুফিয়া খান)

মজিদ, মুস্তাফা, (২০০৭), "বাংলাদেশে রাখাইন জাতির ইতিবৃত্ত ও অভিবাসন", *প্রাঙ্গণ*, ৪র্থ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা, ঢাকা

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, (১৩৮৫), *বাংলাদেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা

মং-চ-উ-চৌধুরী, (১৯৭৬), "পার্বত্য চট্টগ্রামের বোমাং সার্কেল", *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ নভেম্বর, ঢাকা

মনিরুজ্জামান, (২০১৮), "মারমা শব্দরূপ : ভূমিকা", *The Dhaka University Journal of Linguistics*, Vol. 10, No. 19, Dhaka University,

.... (১৯৮৭), "সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু ভাষার সংযোগ, মিশ্রণ ও সমবিন্দুক পরিবর্তনঃ রাখাইন পরিস্থিতি", *পূর্বকোণ*, ৩০ জানুয়ারি

.... (১৩৯৪), "প্রান্তিক সীমায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার অবস্থান ও সংযোগ প্রকৃতি : রাখাইন প্রসঙ্গ", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, *বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মাইতি, প্রভাতাংশু, (১৯৮৮), *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা

মারমা, অং সুই, (২০০৪), "মারমা ইতিহাসের উপর একটি অনুপুঙ্খ আলোচনা", দ্র. মজিদ, মুস্তাফা, *মারমা জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মাহবুব-উল-আলম, (১৯৬৯), *চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী আমল*, চট্টগ্রাম

মিত্র, সতীশ চন্দ্র, (২০০১), *যশোর খুলনার ইতিহাস*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা (১ম মুদ্রণ কলকাতা, ১৯২২)

রহিম, এম এ, (১৯৯৬), *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (১ম প্রকাশ ১৯৮৪)

রায়, অজয়, (১৯৯৭), *আদি বাঙালি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রায়, নীহার রঞ্জন, (১৯৪১), *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, কলিকাতা

শরীফ, আহমদ, (১৯৮৩), *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

.... (১৯৬৬), *লায়লী মজনু*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

.... (১৩৫৬), "ধাওরজ্য বারোজ প্রশস্তি", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ভাদ্র-চৈত্র সংখ্যা, ঢাকা

.... (১৩৭৬), "চট্টগ্রামের ইতিহাস", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, তৃতীয় বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ঢাকা

সাত্তার, আবদুস, (১৯৭১), *আরণ্য জনপদে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সামাদ, এবনে গোলাম, (১৯৬৭), *নৃতত্ত্ব*, কেন্দ্রীয় বাঙ্‌লা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

হক, মুহম্মদ এনামুল, (১৯৬৫), *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা

হক, মুহম্মদ এনামুল ও করিম, আবদুল, (১৯৩৫), *আরাকান রাজ সভায় বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণা এলাকার প্রতিবেশ ও সামাজিক পটভূমি

৪.১ অবস্থান

বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূলে পটুয়াখালী জেলা অবস্থিত। দেশের উপকূলবর্তী জেলাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। পটুয়াখালীকে সাগরকন্যা বলা হয়। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী বিধৌত এলাকা এটি। এ-জেলা মেঘনা নদীর পলল ভূমি ও ছোট ছোট কয়েকটি চরাঞ্চল নিয়ে গঠিত।

আটটি উপজেলা নিয়ে পটুয়াখালী জেলা গঠিত, যথা : পটুয়াখালী সদর, গলাচিপা, দশমিনা, দুমকি, মির্জাগঞ্জ, কলাপাড়া, বাউফল ও রাঙ্গাবালি উপজেলা। এ জেলায় ৫টি পৌরসভা, ৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৫৭১টি মৌজা ও ৮৭৮টি গ্রাম রয়েছে। ১৯৬৯ সালে ডিসেম্বর মাসে পটুয়াখালী জেলা গঠিত হয়। জেলা গঠিত হওয়ার পূর্বে পটুয়াখালী সাবেক বাকেরগঞ্জ জেলার একটি মহকুমা ছিল। পটুয়াখালী মহকুমা সৃষ্টি হয় ১৮৭১ সালে। এই জেলা ৯০° ০৮´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯০° ৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২১° ৪৮´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২২° ৩৬´ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্র সমতল থেকে এর সাধারণ উচ্চতা গড়ে প্রায় ১০ ফুট। এটি বর্তমানে বরিশাল বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই জেলার আয়তন প্রায় ৩২২১.৩১ বর্গকিলোমিটার। এরমধ্যে বনভূমি প্রায় ৭৬৮.১১ বর্গকিলোমিটার। (Bangladesh Bureau of Statistics, 2011)

গবেষণাধীন গ্রাম তিনটি কলাপাড়া উপজেলায় অবস্থিত। কলাপাড়া থানা গঠিত হয় ১৯০৬ সালে। ১৯৮৩ সালে এই থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। স্থানীয়ভাবে কলাপাড়া উপজেলার আয়তন ৪৮৩.২৭ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলা, পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ রাবনাবাদ চ্যানেল ও গলাচিপা উপজেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে আন্ধারমানিক নদী ও বরগুনার আমতলী উপজেলা। উপজেলাটি নিম্নভূমি অঞ্চল ও মৃত্তিকা লবণাক্ত। প্রধান নদী আন্ধারমানিক, নীলগঞ্জ ও ধানখালী। এ উপজেলায় ১০টি ইউনিয়ন, ৫৭টি মৌজা ও ২৪৭টি গ্রাম আছে। উপজেলার নাম কলাপাড়া হলেও উপজেলা সদর খেপুপাড়া নামে পরিচিত। কথিত আছে, উপজেলার প্রায় মধ্যদিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত একটি খালের দুই পাড়ে দুইজন প্রভাবশালী রাখাইন বাস করত, পূর্বপাড়ে কলাউ মগ ও পশ্চিমপাড়ে খেপু মগ। কলাউ মগের নামানুসারে পূর্বপাড়ের বসতির নামকরণ হয় কলাপাড়া এবং খেপু মগের নামানুসারে পশ্চিমপাড়ের গ্রামের নাম হয় খেপুপাড়া (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩: ২০৯)।[১]

Dhaka University Institutional Repository

কলাপাড়া উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৭৪৯২১ জন। এরমধ্যে পুরুষ ৫০.৮৯%, নারী ৪৯.১১%; মুসলমান ৮৯.৬৬%, হিন্দু ৮.৬৮%, বৌদ্ধ ১.৫%, খ্রিস্টান ০.১৪% ও অন্যান্য ০.০২%। আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের ৪৮৬ পরিবারের মোট জনসংখ্যা ২৬২৫ জন।

জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩২৬ জন (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩: ২০৯)। উপজেলার প্রধান কৃষি ফসল ধান, ডাল, ইক্ষু, তরমুজ, ফুটি ও শাকসবজি। প্রধান ফসলাদির মধ্যে কলা, পেঁপে, নারকেল, পেয়ারা ও কুল উল্লেখযোগ্য।

ভূমি ব্যবহারে উপজেলার চাষযোগ্য জমি ৪৫৩২৮ হেক্টর, পতিত জমি ৯৩ হেক্টর ; উঁচু জমি ৮৫%, নিচু জমি ১৫%, এক-ফসলি ৮৬.২২%, দো-ফসলি ১০.৫৯%, তিন-ফসলি ৩.১৯%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ১.৭৫%। ভূমি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দেখা যায় এ উপজেলার ভূমিহীন কৃষক ৪১.৫৩%, ক্ষুদ্র চাষি ৩৫.০৬%, মাঝারি চাষি ১৫.০৪% ও বড় চাষি ৮.৩৭%। মাথাপিছু আবাদি জমি ০.২৬ হেক্টর (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩: ২০৯)।

কলাপাড়া উপজেলার ৯টিইউনিয়নের একটি বলিয়াতলী ইউনিয়ন। গবেষণাধীন হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়া গ্রাম তিনটিসহ মোট ২৪টি গ্রাম নিয়ে বালিয়াতলী ইউনিয়ন।[২] কলাপাড়া উপজেলা সদর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বরাবর পিচঢালা পাকারাস্তা দিয়ে প্রায় ৬ কিলোমিটার যাওয়ার পর বালিয়াতলী লঞ্চঘাট। এই ঘাটে যানবাহন পারাপারের জন্য অতীতে একটি ফেরি ছিল। সেজন্য এটি ফেরিঘাট হিসেবেও এলাকায় পরিচিত। তবে বর্তমানে ফেরিটি অচল। এই রাস্তায় টেম্পু, ইজিবাইক ও রিক্সা চলাচল করে। ফেরি বা নৌকাযোগে আন্ধারমানিক নদী পার হওয়ার পর নদীর দক্ষিণ পাড়ে বালিয়াতলী বাজার। এই বাজারটি বালিয়াতলী ইউনিয়নের গবেষণাধীন হাড়িপাড়া গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। আগে বাজারটি প্রায় অর্ধ কিলোমিটার পশ্চিমে পুরনো লঞ্চস্টেশন সংলগ্ন ছিল। ১৯৭৯ সালে লঞ্চস্টেশনসহ বাজারটি স্থানান্তর করে বালিয়াতলীতে স্থাপন করা হয়।[৩] এই বাজারটি প্রতিদিন সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত জমজমাট থাকে। বাজারে প্রতিদিন এলাকাবাসী তাদের নিত্যদিনের সওদা যেমন চাল-ডাল, তরিতরকারি, শাক-সবজি, মাছ প্রভৃতি ক্রয় করে। বাজারে বিভিন্ন ধরনের দোকান যেমন জামা-কাপড়, ইলেকট্রনিক্স, মনোহারি, টেইলার, মোবাইল, জুতা, স্টেশনারি, ফল, সেলুন, ওষুধ, সার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের একশ'র মতো কাঁচা-পাকা দোকান আছে।

বাজারের পরপরই দক্ষিণ বরাবর হাড়িপাড়া গ্রামের বসতি। লঞ্চঘাট থেকে বাজার হয়ে হাড়িপাড়া গ্রামের মাঝদিয়ে দক্ষিণদিকে পিচঢালা পাকারাস্তা বরাবর প্রায় পৌনে এক কিলোমিটারের মাথায় রাস্তার পশ্চিমপার্শ্বে হাড়িপাড়া গ্রামের রাখাইন বসতি। হাড়িপাড়া গ্রামের পরপরই দক্ষিণ বরাবর কানকুনিপাড়া।[৪] কানকুনিপাড়ার পরে পাকা রাস্তার পূর্বপার্শ্বে মধুপাড়া। মধুপাড়ার পূর্বনাম কোম্পানিপাড়া। এখনো অনেকে কোম্পানিপাড়া নামে ডাকে। মধুপাড়ার পরে দক্ষিণ বরাবর বৈদ্যপাড়া। বৈদ্যপাড়ার পরেই তুলাতুলিপাড়া (গ্রামের মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ গ্রাম বিন্যাস

হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়া গ্রাম তিনটি বালিয়াতলী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছোট বালিয়াতলী মৌজাধীন। এই মৌজার আয়তন ২৫২৮ একর। মৌজাধীন জনসংখ্যা ৩১০০০ জন। ছোট বালিয়াতলী মৌজার উত্তরে চর নজির মৌজা, দক্ষিণে লেমুপাড়া মৌজা, পশ্চিমে সানাখালী মৌজা, পূর্বে লালুয়া ইউনিয়নের বানাতিপাড়া ও চান্দুপাড়া মৌজা।

হাড়িপাড়া ও তুলাতুলিপাড়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত, মধুপাড়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। হাড়িপাড়ার রাখাইনদের বসতি অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে। কিন্তু মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ার রাখাইন বসতি তুলনামূলকভাবে নিচু জমিতে। গবেষণাধীন তিনটি গ্রামের নিকট প্রতিবেশী গ্রামগুলো হলো আইমপাড়া, কানকুনিপাড়া, করমজাপাড়া ও বৈদ্যপাড়া। ৪.১ নং মানচিত্রে ছোট বালিয়াতলী মৌজার অবস্থান ও ৪.২ নং মানচিত্রে গবেষণাধীন তিনটি গ্রামের অবস্থান নির্দেশ করা হলো।

মানচিত্র-৪.১

ছোট বালিয়াতলী মৌজা ম্যাপ

উৎস :পার্শ্ববর্তী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নস্থ তহসিল অফিস থেকে ২০১১ সালে প্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র- ৪.২
ছোট বালিয়াতলী মৌজা ম্যাপে গ্রামসমূহ

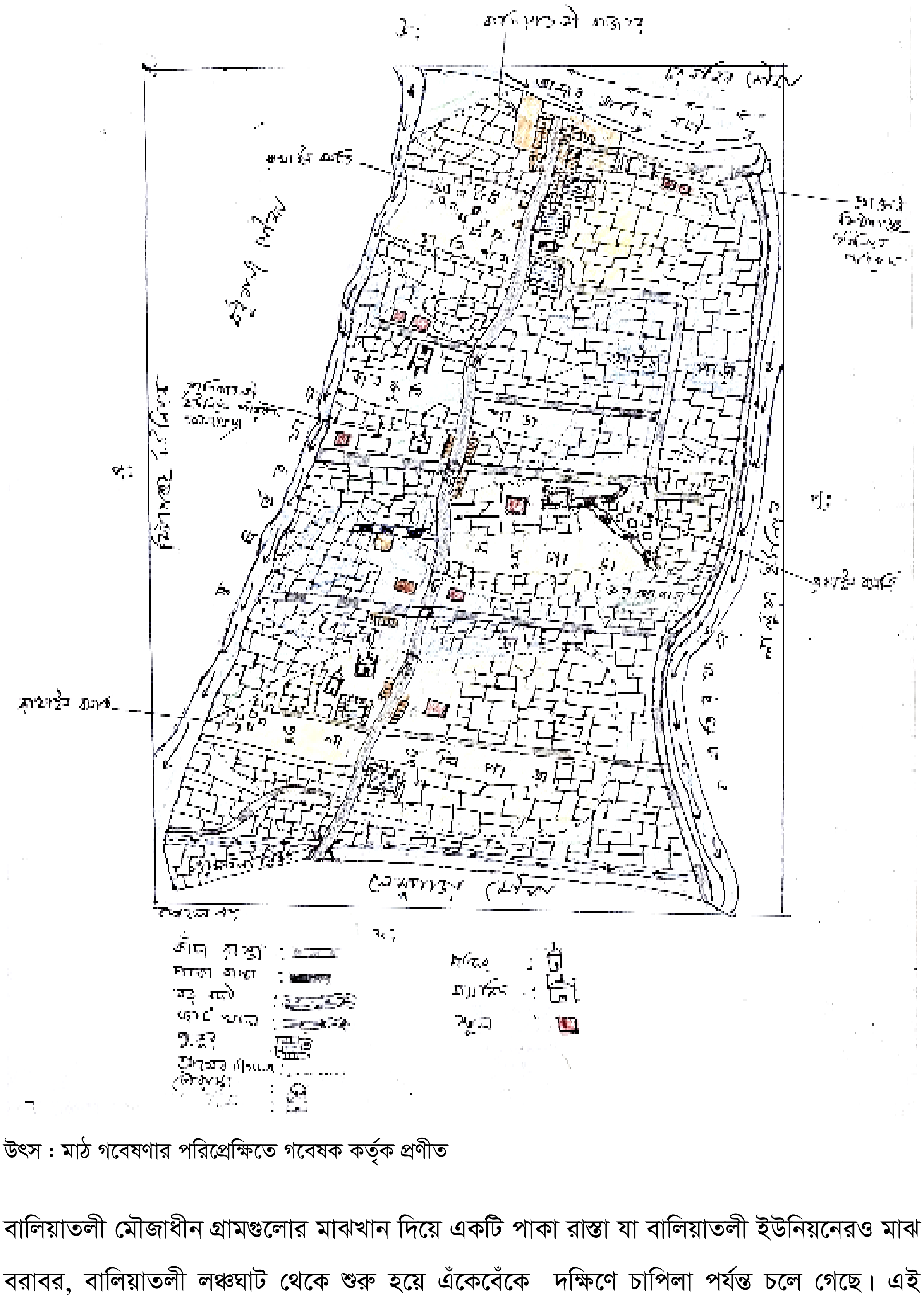

উৎস : মাঠ গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষক কর্তৃক প্রণীত

বালিয়াতলী মৌজাধীন গ্রামগুলোর মাঝখান দিয়ে একটি পাকা রাস্তা যা বালিয়াতলী ইউনিয়নেরও মাঝ বরাবর, বালিয়াতলী লঞ্চঘাট থেকে শুরু হয়ে এঁকেবেঁকে দক্ষিণে চাপিলা পর্যন্ত চলে গেছে। এই পাকা রাস্তা থেকে কয়েকটি ছোট পরিসরের কাঁচা/পাকা রাস্তা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে চলে গেছে। এই পাকা রাস্তাটি অত্র এলাকার প্রধান সড়ক হিসেবে এলাকাবাসীর যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

পালন করে। এমনকি এই পাকা রাস্তাটি এতদ্ অঞ্চলের মানুষের উপজেলা শহর কলাপাড়া ও জেলা শহর পটুয়াখালীতে যাওয়ার ক্ষেত্রে মুখ্য সহায়ক। উল্লেখ্য, এই পাকা রাস্তা দিয়ে দক্ষিণ বরাবর দেশের অন্যতম সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা পর্যন্ত যাওয়া যায়।

হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ায় জনবসতির ঘনত্ব পাড়ায় পাড়ায় ভিন্ন। আবার পাড়াগুলোর রাখাইন বসতি পাড়ার কোনো একটি জায়গায় গড়ে উঠলেও বাঙালি মুসলমানদের বসতি বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠেছে। হাড়িপাড়ায় ১৩টি বাঙালি হিন্দু পরিবার আছে যারা বালিয়াতলী বাজার সংলগ্ন বসতি গড়ে তুলেছে। তবে তুলাতুলিপাড়া ও মধুপাড়ায় কোনো হিন্দু বসতি নেই। অতীতে বালিয়াতলী মৌজাধীন সকল গ্রামে রাখাইন বসতি ছিল। এদের অধিকাংশ পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মায় চলে গেছে। অবশিষ্ট দুই একটি পরিবার যারা ছির তারা নিরাপত্তার অভাববোধ এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে হাড়িপাড়া ও অন্যান্য গ্রামের রাখাইনদের সাথে বসত গড়ে বসবাস করে। ১৯৪০-৪২ এবং ১৯৪৫-৫০ সালের সরকারের সেটেলমেন্ট অফিস এন্ড সুপারিন্ডেন্ট অব সার্ভে কর্তৃক প্রণীত বালিয়াতলী মৌজা ম্যাপে হাড়িপাড়ায় ৪৫টি রাখাইন পরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে ১৪টি পরিবার আছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, রাখাইন কমেছে এবং বাঙালি মুসলমানদের অভিভাসন উত্তরোত্তর বেড়েছে। এছাড়া গ্রাম তিনটির রাখাইন বসতির ঘনত্ব একটি থেকে অন্যটি ভিন্ন। যেমন হাড়িপাড়ার রাখাইন বসতি বেশি। মধুপাড়ার রাখাইন বসতি হাড়িপাড়ার চেয়ে কম, তবে তুলাতুলিপাড়ার থেকে বেশি। তুলাতুলিপাড়ার রাখাইন বসতি একেবারেই কম। অবশ্য পার্শ্ববর্তী বৈলীপাড়া, আইমপাড়া, কানকুনিপাড়া যেভাবে রাখাইনশূন্য হয়েছে সে অনুযায়ী তুলাতুলিপাড়ার রাখাইন আশাব্যঞ্জক। অন্যদিকে গ্রাম তিনটিতে বাঙালি মুসলমান বসতির ঘনত্বও ভিন্ন।

হাড়িপাড়ায় ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মসজিদ, ১টি বাজার ১টি লঞ্চ স্টেশন, ১টি মন্দির ও ৩টি প্রাচীন পুকুর আছে। এই ৩টি পুকুরই পাকা রাস্তার পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত। এর একটি রাখাইনরা ব্যবহার করে থাকে। তবে নিয়ম মেনে অন্যরাও ব্যবহার করতে পারে। যেমন পুকুরে নেমে গোসল কিংবা ধোয়াপোচার কাজ করা যায় না। পুকুর থেকে পাত্র করে ডাঙায় পানি তুলে ব্যবহার করতে হয়। সাবেক মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় হাড়িপাড়ায় অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে এই ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপন করা হয়েছে উক্ত ইউনিয়নাধীন তেগাছিয়া গ্রামে।

মধুপাড়ায় ১টি প্রাচীন পুকুর (রাখাইনদের) ও ১টি ঠাকুর ঘর আছে। তুলাতুলিপাড়ায় ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মসজিদ, ১টি মন্দির ও ২টি প্রাচীন পুকুর আছে। বালিয়াতলী মৌজার মধ্যে ১টি হাইস্কুল কানকুনি পাড়ায় অবস্থিত। এর পার্শ্বেই নবনির্মিত বালিয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স। আশেপাশের গ্রামের ছেলে-মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ করে কানকুনি পাড়াস্থ হাইস্কুলে ভর্তি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ গবেষণা এলাকার ঐতিহাসিক পটভূমি

পটুয়াখালী জেলাধীন অঞ্চলসমূহ প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাউফল উপজেলার কচুয়া এক সময় এ রাজ্যের রাজধানী ছিল। সমুদ্র উপকূলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের ঘনঘন হামলার কারণে পরবর্তীকালে রাজধানী এ স্থান থেকে বরিশালের মাধবপাশায় স্থানান্তরিত হয়। ১৫৯৯ সালে সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী রাজা টোডরমল রাজস্ব জরিপের জন্য কানুনগো জিম্মক খাঁ-কে চন্দ্রদ্বীপে প্রেরণ করেন। এই সময় চন্দ্রদ্বীপের অরণ্যাঞ্চলকে চন্দ্রদ্বীপ থেকে পৃথক করে 'বাজুহ' বা সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই অঞ্চলে তখন সৃষ্টি হয় সেলিমাবাদ, বুজুর্গ উমেদপুর, ঔরঙ্গপুর পরগণা। বার্মার রাজার অত্যাচারে বিতাড়িত আরাকানের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বহু সংখ্যক রাখাইন পরিবার অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে এই জেলার গলাচিপা উপজেলার রাঙ্গাবালী দ্বীপ এবং বর্তমান কলাপাড়া উপজেলার খেপুপাড়া ও কুয়াকাটায় বসতি স্থাপন করে। তখন থেকেই এ-সব এলাকায় আবাদ শুরু হয়। (আজাদ, ২০০৬)

১৮৭১ সালে পটুয়াখালী মহাকুমা হিসেবে স্থাপিত হয় এবং বাউফলের মুন্সেফি পটুয়াখালীতে স্থানান্তরিত হয়। এ-সময় কোটেরহাটের মুন্সেফি বিলুপ্ত হয়ে যায় (চক্রবর্তী ও বাশার, ২০০৪)। পটুয়াখালী বরিশাল সদর হতে প্রায় ৩৮ মাইল দক্ষিণে তৎকালীন সুন্দরবন বিভাগে অবস্থিত।

রোহিণীকুমার সেন, ঈশ্বরচন্দ্র রায়, বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড, খোসলালচন্দ্র রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ পটুয়াখালীর ঐতিহাসিক বিবরণ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সামগ্রিক পটুয়াখালীর ঐতিহাসিক পেক্ষাপট তুলে ধরার জন্য রোহিণীকুমার সেনের গ্রন্থ থেকে নাতিদীর্ঘ বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> "পূর্ববঙ্গে, ঢাকা বিভাগের দক্ষিণ অংশে বাকলা অথবা বাকরগঞ্জ অবস্থিত। এই ভূখণ্ড মহাবিষুব রেখার উত্তর ভাগে ২১°৪৮'০" হইতে ২৩°১৪" এবং ২৭" অক্ষাংশের মধ্যে, এবং গ্রীন্‌উইচ পূর্বভাগে ৮৯°৫৫'১০" হইতে ৯৯°০' এবং ৫০" দ্রাঘিমার মধ্যে রহিয়াছে। ইহার পূর্ব সীমা মেঘনা নদী, বঙ্গোপসাগরের কতক অংশ এবং নোয়াখালী ও ত্রিপুরার কতক ভাগ; পশ্চিমে বলেশ্বর, খুলনা এবং ফরিদপুরের কতকাংশ; উত্তরে ঢাকা, ফরিদপুরের কিয়দংশ ও পদ্মা নদী; এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ইহার বিস্তৃতি ৪০৬৬ বর্গমাইল, উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ৮৯ মাইল, এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত প্রায় ৬০ মাইল হইবে। এই গেল বর্তমান অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ লেখকগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমানা। একটু প্রাচীন কালের দিকে অগ্রসর হইলে দেখিতে পাই যে, বঙ্গীয় ১১৬০ সালে, ইংরেজি ১৭৫৪ খ্রিঃ অব্দে যখন আগা বাখর খাঁ এই সমস্ত দেশের সর্বময় কর্তা ছিলেন; তখন বাকরগঞ্জের সীমা উত্তরে জাহাঙ্গীরনগর অথবা জাহাঙ্গীরাবাদ, দক্ষিণে সুন্দরবন এবং বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ভূষণা, যশোহর এবং আরাকান,

Dhaka University Institutional Repository

তারপর ব্রিটিশ-রাজ্য পত্তন হইবার কিছুকাল পরে (অর্থাৎ ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ) বাকরগঞ্জের এলাকা ঢাকা বিভাগঅন্তর্গত পদ্মা, এবং কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম, এবং মেঘনা ও চাঁদপুর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম প্রান্তে ভূষণা ও যশোহরের পূর্ব সীমান্তবর্তী স্থানগুলিও বাকরগঞ্জের অন্তর্গত ছিল। কেবল সন্দ্বীপ তখন এই এলাকাভুক্ত ছিল না।

আগা বাখর খাঁর অনেক পূর্বে, এমন কি মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবারও পূর্বে প্রবল পরাক্রান্ত পাঠান নরপতিগণ দোর্দণ্ড প্রতাপে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন। সুবর্ণগ্রাম নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। ইলাইস শাহের বংশধর সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহ, এবং তৎপুত্রপৌত্রগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের রাজত্ব সময় ১৪২৬ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১৪৮০ খিঃ অব্দ পর্যন্ত। ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জ, জেলালাবাদ এবং ফতিয়াবাদ নামে অভিহিত হইত। বর্তমান ঢাকা এবং ফরিদপুরের কতকাংশ জেলালাবাদ এবং বাকি অংশ ফতিয়াবাদ বলিয়াই দেশ প্রসিদ্ধ প্রবাদ রহিয়াছে। অনেক প্রাচীন দলিলে আমাদের বর্তমান বাকরগঞ্জ "ফতিয়াবাদ" বলিয়া উল্লিখিত আছে। এরূপ একখানি কীটদৃষ্ট বহু প্রাচীন দলিল আমার একজন বিশ্বাসী বন্ধু স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। দেশ প্রসিদ্ধ "বার ভুঁইয়াগণের" অন্যতম কয়েস্থবংশোদ্ভূত রাজা কন্দর্পনারায়ণ এবং তৎবংশধরগণ যখন এই দেশে রাজত্ব করিতেন তখন বর্তমান বাকরগঞ্জের অধিকাংশ "সরকার বাকলা" নামে অভিহিত হইত। তখন তাহার সীমা পূর্বে সমুদ্রোপকূলস্থিত মগ রাজ্য, পশ্চিমে রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের পূর্ব সীমাব্যাপী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যমুনা নদী, দক্ষিণে সমুদ্র এবং উত্তরে ত্রিপুরা রাজ্য ও ভাওয়ালের কতকাংশ। বর্তমান সময়ে আমাদের জিলা যতটুকু, পূর্বে বাকলা ইহার দ্বিগুণ অথবা ততোধিক ছিল। আজ আর সেই বাকলা নাই, এবং কন্দর্পনারায়ণের সেই অতুল কীর্তি ও দিধীতিও নাই; যাহা আছে তাহা অনন্তকালসাগর-হৃদয়স্থ একটি ক্ষুদ্র বুদবুদমাত্র।" (সেন, ১৯১৫)

রোহিণীকুমার সেনের এই বর্ণনা থেকে প্রাচীন বাকলার অন্তর্গত বর্তমান পটুয়াখালী জেলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ঐতিহ্য অনুধাবন করা যায়। এই বর্ণনায় রাখাইনদের বসতি এলাকাকে "সমুদ্রোপকূলস্থিত মগ রাজ্য" নামে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং সমুদ্র উপকূল বরাবর মগ অর্থাৎ রাখাইনদেরই যে বসবাস ছিল তার বর্ণনা থেকে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

৪.৪ জলবায়ু

গবেষণা এলাকার আবহাওয়া ও জলবায়ু ঢাকা শহরের মতোই স্বাভাবিক। বছরের বেশিরভাগ সময় উচ্চ তাপমাত্রা ও আদ্র আবহাওয়া লক্ষ করা যায়। বছরের অধিক সময় জুড়ে বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে পটুয়াখালীর উপর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়। পটুয়াখালী জেলার সর্বোচ্চ বার্ষিক গড় তাপমাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

৩৩.৩° সেলসিয়াস; সর্বনিম্ন ১২.১° সেলসিয়াস; বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫০৬ মিলিমিটার (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩: ২০৯)। প্রাকৃতিক কারণ ও সমুদ্র সান্নিধ্যহেতু এ অঞ্চল ঘনঘন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের শিকার হয়।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় বাতাসের জন্য এখানে শীতকাল খুব কম সময়ের জন্য অবস্থান করে। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্তমোটামুটি শীত থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রীস্মকাল শুরু হয়, অক্টোবর পর্যন্ত বজায় থাকে। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় জুন মাসে। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে কোনো বৃষ্টিপাত দেখা যায় না। সর্বোচ্চ আদ্রতা দেখা যায় আগস্ট মাসে ৯৭% এবং সর্বনিম্ন মার্চ মাসে ৬৪%। বেভারেজ (১৮৬৮) পটুয়াখালী জেলায় ১৮৭২ ও ১৮৭৩ সালের গড় বৃষ্টিপাতের রেকর্ড দেখিয়েছেন যথাক্রমে ৯০.৭৩" ও ৯১.৭৩"। জেলার ২০২০ সালের গড় বৃষ্টিপাত ২৫.০৬ মি. মি.।

৪.৫ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা

বর্ষাকালে এই এলাকায় ঘনঘন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও বিভিন্ন উপনদীর প্রবাহে সৃষ্ট পললভূমি পটুয়াখালী পরস্পর বিচ্ছিন্ন অসংখ্য জলস্রোত ও নদী প্রবাহে বিভক্ত। বর্ষাকালে ক্ষিপ্রগতি জলস্রোত এবং বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ ও পশ্চিম হতে আগত বাত্যা-বাহিত জলপ্রবাহ জলোচ্ছ্বাস বয়ে আনে। এতে অসংখ্য মানুষ যেমন প্রাণ হারায় তেমনি গৃহপালিত পশু, গাছপালা ব্যাপকভাবে বিনষ্ট হয়। উল্লেখ্য, দেশের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পটুয়াখালী জেলা সর্বাধিক ঘূর্ণিঝড় প্রবণ অঞ্চল। এক অনুসন্ধানে আবদুল হক চৌধুরী বাংলাদেশের এ-সকল সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় ১৯৬৮-১৯৮৫ সালের মধ্যে সংঘটিত ৩৫টি বৃহৎ ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য দিয়েছেন। (Biswas, 1996)

সাধারণত মে এবং অক্টোবর মাসে সাইক্লোন দেখা দেয়। তবে মার্চ থেকে জুন এবং সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্তসাইক্লোন হয়। ঐতিহাসিক প্রবর আবুল ফজল প্রণীত বিখ্যাত *আইন-ই-আকবার গ্রন্থে* পটুয়াখালী অঞ্চলে সংঘটিত ভীষণ খণ্ড প্রলয়ের উল্লেখ আছে। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই খণ্ড প্রলয় সংঘটিত হয়। ব্লক ম্যান ঐ সময়কে চিহ্নিত করেছেন ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ (সেন, ১৯১৫)।স্যার উইলিয়াম হান্টার বলেন যে,

> "ইংরেজি ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬ সালে) বঙ্গদেশে তুমুল ঝড়বৃষ্টি ও তৎসহ সমুদ্রের জল উদ্বেলিত হইয়া অনেক স্থান প্রায় উৎসাদিত করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গেরও স্থানে স্থানে প্রবল ভূমিকম্প হওয়ায় অনেক স্থান একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। তাহার চিহ্ন এখনো বিরল নহে, সমুদ্রের তীরবর্তী অনেক লোকালয় সেই সময় জনপ্রাণী শূন্য

হইয়াছিল, বর্তমান সময়ে সুন্দরবনের মধ্যে অনেক দিঘি, পুষ্করিণী এবং অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।” (সেন, ১৯১৫)

বাকেরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার (১৯৮৪, পৃ. ১৭)-এর বর্ণনা অনুসারে, ১৮৭৬ সালে বাকরগঞ্জ জেলায় ঘূর্ণিঝড় প্রচণ্ড আঘাত হানে। সে বছর পটুয়াখালী ও বাকরগঞ্জের বেশিরভাগ এলাকা সমুদ্রের প্লাবণে ৩-৫ মিটার পানিতে ডুবে যায়। এ অঞ্চলে তখন প্রায় ১ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এ-জেলায় ১৫৫৮ সালে সামুদ্রিক ঝড় ও বন্যা, ১৭৮৭ সালে নদী প্লাবণ, ১৮২২ সালে সামুদ্রিক ঝড়, ১৮৬৯, ১৯১০ ও ১৯১৯ সালে সামুদ্রিক ঝড় ও প্লাবণ, ১৯৬৫ ও ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবণ মহাদুর্যোগ নিয়ে আসে (চক্রবর্তী ও বাশার, ২০০৪: ৩৯৫-৯৭)। বেভারেজের (১৮৭৬: ২৭৪, ২৭৮) বর্ণনা মতে, ১৮২২ এর ৬-৯ জুনের বন্যায় নারী ১৯,৮১৫ ও পুরুষ ২০,১২৫ জন মিলে সর্বমোট ৩৯,৯৪০ জনের মৃত্যু হয়। গবাদিপশু মারা যায় ৮৮,৮৩৪টি এবং ১,৩২৬,৬৯১-১১-৮ রুপি মূল্যের সম্পত্তি ধ্বংস হয়। তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেন যে, কলকাতার একজন ভদ্রলোকের কর্মচারী যার পরিবার হাতিয়ায় বাস করতো, তার ৪ ভাই ও তাদের পরিবারবর্গের মধ্যে কেবল একজন ভাইকে ঝড় ও বন্যার পর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তিনি একটি ঘরের চালের উপর ছিলেন। নদীর স্রোত তাকে বহন করা চালটিকে উত্তর দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় (বেভারেজ, ১৮৭৬ : ২৭৮) ।নিম্নের সারণীতে ১৮২৮ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত মধ্যবর্তী বিভিন্ন সময়ে উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়জনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে সংঘটিত মৃত্যুর পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

সারণি- ৪.১

১৮২৮-১৯৯১ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়জনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর পরিসংখ্যান

বছর	মৃত্যু (জন)
১৮২৮	৪০,০০০
১৮৭৬	১,০০,০০০
১৮৯৭	১,৭৫,০০০
১৯৬০	৫,১৪৯
১৯৬১	১১,৪৬৮
১৯৬৩	১১,৫২০
১৯৬৫	১৯,২৭৯
১৯৭০	৫০,০০০
১৯৮৫	১১,০৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১	১,৩৮,০০০

সূত্র :Biswas, 1996: 41

এই এলাকার মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে নিজেদের উপযোজন করে নেয়। সাধারণত অতীতে জুন ও অক্টোবর মাসে যে প্লাবণ দেখা যেত তাতে কৃষি জমি, বসত ভিটে তলিয়ে যেত। গৃহপালিত পশু, শস্য, আসবাবপত্র বিনষ্ট হতো, রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে যেত। স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হতো। তবে প্লাবণের পানি একদিনের বেশি থাকে না। বিশ শতকের সত্তরের দশকের ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবণে রাখাইনদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। এসময় প্লাবণের পানিতে রাখাইনদের জমির দলিল পর্যন্ত অন্যান্য জিনিসের মতো ভেসে যায়।

৪.৬ ঋতু পরিক্রমা

গবেষণা এলাকার জনগোষ্ঠী বাংলা বর্ষ পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা পঞ্জিকা অনুসরণ করে। ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ : গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। প্রত্যেক ঋতুর স্থায়িত্ব দুই মাস।

বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে প্রথম ঋতু গ্রীষ্ম। বাংলা মাস অনুযায়ী বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস মিলে গ্রীষ্মকাল। ইংরেজি মাস অনুসারে ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এই সময়ে প্রচণ্ডরকম গরম পড়ে। আবহাওয়া আদ্রতাপূর্ণ থাকে। কখনো কখনো তাপমাত্রা ১০০°-এর উপরে উঠে যায়। মাঝে মাঝে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে বৃষ্টিসহ প্রবল ঘূর্ণিবর্তা দেখা দেয় যা কালবৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত। এই বৃষ্টিপাত ও ঘূর্ণিবর্তার ফলে মানুষ কিছুটা হলেও অসহ্য গরমের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি ও স্বস্তিপায়। এ সময় রাখাইনরা আউশ ধান রোপণের জন্য জমি প্রস্তুতের কাজেও ব্যস্ত থাকে। এ সময় অনেকে আউশ ধান রোপণ করে। এছাড়া তারা শশা, বেণ্ডি, পুইশাক প্রভৃতি রোপণ করে।

গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষাকাল। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস মিলে এবং ইংরেজি মাসের ১৫ জুন থেকে ১৫ আগস্ট বর্ষাকাল। এ ঋতুতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে ও অবিরাম বৃষ্টিপাত হয়। ফলে রাস্তাঘাট কদমাক্ত থাকে। গ্রামগুলোর প্রধান পাকা সড়কটি ব্যতীত সকল রাস্তাঘাট কাঁচা হওয়ার কারণে আন্তঃযোগাযোগ ও যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে সমগ্র এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ সজিব হয়ে ওঠে এবং নদ-নদীবেষ্টিত এলাকা বিধায় আশেপাশের নদ-নদী পানিতে টলমল করে। এ সময় তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকে, তবে বাতাসে আদ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে। কৃষকরা এ সময়

Dhaka University Institutional Repository

আমন ধানের বীজতলা প্রস্তুতের জন্য খুব ব্যস্ত থাকে। শ্রাবণ মাসে আমন ধান রোপণের কাজ শুরু হয়।

এরপর আসে শরৎকাল। বাংলা ভাদ্র ও আশ্বিন এবং ইংরেজি আগস্টের মাঝামাঝি থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত শরৎকাল। শরৎকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে। এ সময় কখনো কখনো কিছুটা বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ভাদ্র মাসে আউশ ধান কাটা হয়। কৃষকরা ধান কাটার পাশাপাশি আমন ধান রোপণের কাজে ব্যস্ত থাকে। এই ব্যস্ততা ভাদ্র মাসব্যাপী চলে। এ সময় কৃষক ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে কীটনাশক ও সার দেয়। গৃহিণীরা বাড়ির আশেপাশে আশ্বিন মাসে লালশাক, পালনশাক, পুইশাক, বেগুন, টমেটো, মুলা, করল্লা প্রভৃতি সবজির চাষ করে।

শরৎকাল বিদায় দিয়ে শুরু হয় হেমন্তকাল। বাংলা কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এবং ইংরেজি মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ঋতুটি স্থায়ী হয়। এ সময় তাপমাত্রা কম থাকে। কিছুটা ঠাণ্ডা বিরাজ করে। খুব সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। আবহাওয়া শুষ্ক থাকে। বর্ষার কদমাক্ত রাস্তাঘাট এ ঋতুতে এসে পুরোপুরি শুকিয়ে ওঠে, কোথাও কাদা দেখা যায় না। এ সময় কৃষক উঁচু জমির বিশেষ করে রাজাসাইল (আমন), বামবু ও ইরি ধান কাটা শুরু করে এবং এই মাসে কৃষকরা সরিষা, তিল, সূর্যমুখী, গোলআলু, ছোলা, বুট, মাসকলাই, খেসারি ইত্যাদি চাষ করে।

হেমন্তের অবসানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দেশের অন্যতম প্রভাবশালী ঋতু শীতকাল। এ সময় মানুষের জীবন ও প্রকৃতির পুরো দৃশ্যপট পাল্টে যায়। শীতকাল হচ্ছে বছরের সবচেয়ে শুকনো ও ঠাণ্ডা সময়। বাংলা পৌষ ও মাঘ এবং ইংরেজি মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকাল। এ সময় গড় তাপমাত্রা থাকে ৩৫° সেলসিয়াস। এ সময় আমন ধান কাটা, ধান শুকানো ও মাড়ানো প্রভৃতি কাজে কৃষকরা অতিমাত্রায় ব্যস্ত দিন কাটায়। কৃষকদের মনেও খুব আনন্দভাব বিরাজ করে। ভাদ্র-আশ্বিন মাসের রোপণকৃত শাকসবজির ফলনও এ সময় উঠতে থাকে। তবে শীতকালে কোনো বৃষ্টিপাত হয় না এবং খালের পানিতে প্রচুর লবণ থাকে, ফলে কৃষকরা কোনো চাষ করতে পারে না। এ অঞ্চলের মাটি ময়না প্রকৃতির (এঁটেল দোঁয়াশ)। ফলে পানির স্তর অনেক নীচে নেমে যায়। এ কারণে সেচের মাধ্যমে চাষ করা সম্ভব হয় না। তবে ধান কাটার পর কলাপাড়া থানার কোথাও কোথাও তরমুজের চাষ শুরু হয়। কিন্তু গবেষণা এলাকার তিনটি গ্রামে তরমুজের চাষ দেখা যায় না। কেননা তরমুজ চাষের জন্য প্রচুর পানির দরকার হয়। লবণ পানিতে তরমুজ হয় না। সাধারণত বান্দা (বদ্ধ) খালের মিষ্টি পানির পর্যাপ্ত সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকলে তরমুজ চাষ করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

শীতের সমাপ্তিতে বসন্ত ঋতুর আগমন ঘটে। বসন্তকে ঋতুরাজ বলা হয়। বাংলা ফাল্গুন ও চৈত্র এবং ইংরেজি মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত বসন্তকাল। বসন্তের আগমনের সাথে সাথে দেশের অন্যান্য সকল এলাকার মতো গবেষণা এলাকার তাপমাত্রাও বাড়তে থাকে। এ সময় কৃষকরা অলস সময় কাটায়। কেননা, প্রকৃতিতে বৃষ্টিপাত না থাকায় খাল-বিল শুকিয়ে যায়। কৃষকরা চাষ করতে পারে না। নদীর লবণাক্ত পানি দিয়ে কোনো ফসল চাষ করা যায় না। তবে ফাল্গুন মাসে বিভিন্ন ডালের ফলন উঠতে থাকে।

টিকা

১. কলাপাড়া ও খেপুপাড়ার উক্ত নামকরণ সরকারিভাবেও গৃহীত হয়েছে। সরকারিভাবে পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন তিনরাস্তার মোড়ে যে পরিচিতিমূলক সাইনবোর্ড টাঙানো আছে সেখানে গবেষক মুস্তাফা মজিদকে উদ্ধৃতি করে বর্ণিত নামকরণের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

২. বালিয়াতলী গ্রামটি ২০ মার্চ ২০১০ পর্যন্ত মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকারের ২১.০৩.২০১০ তারিখের এক প্রজ্ঞাপনে মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নকে ভেঙে ২টি ইউনিয়নে বিভক্ত করা হয়– মিঠাগঞ্জ ও বালিয়াতলী। এই বিভক্তিকরণের বিষয়ে কলাপাড়া উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোঃ লিয়াকত আলী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় : "স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ১২ ধারা মোতাবেক জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে এবং প্রসাশনিক সুবিধার্থে দুইটি ইউনিয়নে বিভক্তিকরণের জন্য এবং বিভক্তিকৃত ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে পুনঃবিভক্তিকরণের জন্য...।" গবেষণাধীন হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়া ব্যতীত বালিয়াতলী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রামগুলো হলো : চর নজিব, বলিপাড়া, আইমপাড়া, ছোট বালিয়াতলী, কানকুনিপাড়া, করঞ্জাপাড়া, বৈদ্যপাড়া, লেমুপাড়া, রিফুজিপাড়া, আদর্শগ্রাম, আমতলীপাড়া, সোনাপাড়া, পবীয়াপাড়া, মাঝেরপাড়া, নয়াপাড়া, নলবুনিয়া, বড় বালিয়াতলী, বালিয়াতলী, দ্বিগর বালিয়াতলী, চর বালিয়াতলী ও চর হাবিব।

৩. ডা. আনোয়ার হোসেন (গ্রাম্য দাতব্য ডাক্তার ছিলেন বিধায় স্থানীয় পর্যায়ে ডাক্তার হিসেবে পরিচিত), বয়স ৬৫ বছর, পিতা- মৃত সিরাজ উদ্দীন হাং ছিলেন বাজার প্রতিষ্ঠা কমিটির তিনসদস্যের সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি। অপর দুইজন ছিলেন যথাক্রমে আব্দুল হক হাওলাদার ও এ. বি. এম. আফতাব হোসেন। ডা. আনোয়ার হোসেন বলেন, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার বছর তিনেক পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক স্বনির্ভর খাল কাটানোর দুই বছর আগে পুরনো লঞ্চস্টেশনটি ভেঙ্গে পশ্চিম থেকে পূর্বে সরিয়ে আনা হয়।" সে মতানুযায়ী ১৯৭৯ সালে বালিয়াতলী বাজার স্থাপিত হয়। কেননা স্বনির্ভর খাল কাটার কর্মসূচি ১৯৮১ সালে বাস্তবায়নাধীন ছিল। খাল কাটার

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে স্থানীয় একটি ডিসপেন্সারির স্বত্বাধিকারী ও বালিয়াতলী গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ঝুনু কবিরের (বয়স ৫৫ বছর) বক্তব্য থেকে ডা. আনোয়ার হোসেনের বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। অন্যান্য ছাত্রদের সাথে কলাপাড়া স্কুল থেকে আমিও খাল কাটতে আসি। সেটা ১৯৮১ সালের ঘটনা।" স্থানীয় একটি মৎস্য গদির স্বত্বাধিকারী আব্দুর রব হাওলাদার (বয়স ৬৫) বলেন, "স্বনির্ভর খাল কাটার দুই বছর আগে বালিয়াতলী বাজার চালু হয়।"

৪. কানকুনি পাড়ায় নব্য গঠিত ছোট বালিয়াতলী ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স স্থাপন করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

Bangladesh Bureau of Statistics. (2006). *Population Census-2001, Community Series Zila : Patuakhali,* Dhaka

Bangladesh Bureau of Statistics. (2011). *Population and House Census, Community Report : Patuakhali*, July, Dhaka

Biswas, A. A. (1986). *Ethnography of a Coastal People of Bangladesh* (Unpublished Ph. D. Thesis), Department of Sociology, Dhaka University, Dhaka

Jack J. C. (1905). *Bakergonj District Gazzetteer,* Bengal Secretariate Press, Calcutta

আজাদ, আবুল কালাম, (২০০৬), *বাংলাদেশের জেলা পরিচিতি*, বুক ওয়াল্ড, ঢাকা

খান, আবদুল মাবুদ, (২০০৬), *পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

খান, আবদুল মাবুদ, (১৯৮৩), "পটুয়াখালীর বৌদ্ধ সম্প্রদায়", *CILO,* Journal of History Department, vol. 1, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka

চক্রবর্তী, তপংকর ও বাশার, সিকদার আবুল (সম্পা.), (২০০৪), *বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস*, আনন্দধারা, ঢাকা

বাকেরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার, (১৯৮৪), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, (২০০৩), *বাংলা পিডিয়া* (৫ম খণ্ড), ঢাকা

বেভারেজ, এইচ, (১৮৭৬), *দি ডিস্ট্রিক্ট অব বাকেরগঞ্জ ইটস হিস্টরি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস*, লন্ডন (অনুবাদ : বাশার, সিকদার আবুল, (২০০৮), গতিধারা, ঢাকা

মজিদ, মুস্তাফা, ১৯৯২, *পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

রায়, খোসলালচন্দ্র, (১৮৯৫), *বাকরগঞ্জের ইতিহাস*, কলকাতা (দ্র. চক্রবর্তী, তপংকর ও বাশার, এস. এ. (সম্পা) :*বৃহত্তর বাকেরগঞ্জের ইতিহাস*, আনন্দধারা, ঢাকা

সেন, রোহিণীকুমার, (১৯১৫), *বাকলা*, কলকাতা (দ্র. তপংকর চক্রবর্তী ও সিকদার আবুল বাশার (সম্পা.), (২০০৪), *বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস*, আনন্দধারা, ঢাকা)

হক, মোঃ আজিজুল, (২০০৬), *বাংলাদেশের সাঁওতাল সংস্কৃতির পরিবর্তন : ক্রিয়াশীল উপাদানের প্রভাব* (অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস), আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

.... (২০১০), "ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার মাতৃভাষায় বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার : সমস্যা ও সম্ভাবনা", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৫৩ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণা এলাকার সামাজিক সংগঠন

৫. সামাজিক সংগঠন

সমাজে ব্যক্তি কিংবা দলের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের বিস্তৃত জালই সামাজিক সংগঠন। সমাজের সদস্যদের প্রথা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক সংগঠন সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে চলতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংগঠনগুলো মূলত প্রাথমিকভাবে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং সমাজকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন আলী (১৯৮৯) সাঁওতালদের সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে বলেন,

> "Social organization of the Santals is considered as a functional aspects of the units of which association, i. e. the aggregate of the individuals and institutions (i. e. rules & procedures) governing the group to run the society smoothly are parts." (Ali, 1989: 123)

৫.১ রাখাইন সামাজিক সংগঠন

নৃগোষ্ঠী হিসেবে সামাজিক সংগঠনের বন্ধন রাখাইনদের জীবনে একটি অতি বড় স্থান দখল করে আছে। তবে সমতল ভূমির বাঙালিদের সাথে পারস্পরিক অবস্থান ও মিথস্ক্রিয়ার ফলে পাহাড়ি অঞ্চলের আদিবাসীদের মতো এই বন্ধন রাখাইনদের জীবনে অতটা দৃঢ়ভাবে কার্যকর নেই। সময়ের প্রবিক্রমায় এই বন্ধন অতীতের তুলনায় মোটামুটি শিথিলতা লাভ করেছে। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে তা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করেছে। রাখাইনদের পরিবর্তনশীল সামাজিক সংগঠনের এককগুলো গোত্র, গোষ্ঠী বা বংশ, পরিবার, বিয়ে, জ্ঞাতি সম্পর্ক ও সমাজ। এই অধ্যায়ে এই এককগুলোর কাঠামো এবং গ্রামগুলোতে এককগুলোর প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করব। গ্রামসমূহের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা উপলব্ধি করতে হলে সামাজিক কাঠামোর এই মৌলিক এককগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। সেজন্য আভ্যন্তরীণ দিক হিসেবে যেমন সমাজের অন্তর্নিহিত দিকটি আলোচনা করা হবে, তেমনই বিভিন্ন বাহ্যশক্তি সামাজিক সংগঠনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তাও আলোচনা করা হবে।

৫.১.১ গোত্র

প্রধানত রক্ত সম্বন্ধের ধারণার উপর গোত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। গোত্রের প্রত্যেক সদস্য রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ এবং গোত্রভুক্ত সদস্যরা তা পুরোপুরি বিশ্বাস করে। গোত্রের সদস্যরা বিশ্বাস করে যে, তারা একজন পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে, যদিও তারা সেই পূর্ব পুরুষের নাম জানে না। মূলত গোত্রজীবন প্রাচীনকালে আদিবাসীদের জন্য অপরিহার্য ছিল। কেননা, প্রাকৃতিক পরিবেশকে বশীভূত করে পরস্পরের মঙ্গল ও পরস্পরের সহযোগিতা এবং কালানুক্রমিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সংঘবদ্ধভাবে বহন ও বিকাশের লক্ষ্যে একত্র দলবদ্ধভাবে বা গোত্রবদ্ধভাবে বসবাস করা অপরিহার্য। অনুরূপভাবে, আদিম সমাজে স্বতন্ত্রসূচক নাম গোত্র-জীবনের জন্য অপরিহার্য। একটি গোত্র থেকে আর একটি গোত্র পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য প্রত্যেক গোত্র একটি বিশেষ নাম গ্রহণ করে। যে কোনো প্রাণী বা বস্তুর নামে গোত্রের নামকরণ করা হতো। গোত্রের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা বিশ্বাস করে যে, উক্ত বস্তু বা প্রাণী থেকে তাদের পূর্ব পুরুষের উদ্ভব হয়েছে।

রাখাইন সমাজ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। তাদের গোত্র নামসমূহ প্রাচীন আরাকানের বিভিন্ন স্থান-নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে জানা যায়। তবে তাদের গোত্র সম্পর্কিত একাধিক তথ্য পাওয়া যায়। হান্টার (১৯৭৬) মারমাদের ১৫টি গোত্র তালিকাভুক্ত করেছেন। সাত্তার (১১৯৮৩: ২৩) ১৫টি গোত্রের সন্ধান পান। বেসেইন (১৯৯৭) ২১টি গোত্রের তথ্য পান যা তিনি ১৯৫৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মং প্রধান থেকে সংগ্রহ করেন। তবে হক (১৯৯৫) সর্বাধিক ২২টি গোত্রের উল্লেখ করেন। যথা : ১. প্যালেন ছাহ্, ২. প্যালেনসে ছাহ্, ৩. লাওং কাদুং ছাহ্, ৪. ফাবাং ছাহ্, ৫. কাউকাদেং ছাহ্, ৬. ইয়াযাওং ছাহ্, ৭. কেয়াওকফেয়া ছাহ্, ৮. ছাবাহ ছাহ্, ৯. ইয়ায়াওং ছাহ্, ১০.রাগ্রাইং ছাহ্, ১১. ছা প্রেকেয়া ছাহ্, ১২. থাওং ছাহ্, ১৩. কৈং জৈ ছাহ্, ১৪. দাঃ ছৈ ছাহ্, ১৫. খ্যং ছাহ্, ১৬. দালাঃ ছাহ্, ১৭. রেব্রে ছাহ্, ১৮. রোয়াদৌ ছাহ্, ১৯. চিন রেহ ছাহ্, ২০. রিওয়াজৈ ছাহ্, ২১. কালাঃ ছাহ্, ২২. মাঃ রো ছাহ্। উল্লিখিত নামগুলো প্রাচীন আরাকানের স্থান-নাম বলে হক মত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, উপরোক্ত ২২টি স্থানের মগ অধিবাসী (রাখাইন/মারমা) চট্টগ্রামে আসার পর পূর্ব পুরুষদের বাসস্থানের নামকে নিজেদের গোত্র নাম হিসেবে গ্রহণ করে (১৯৯৫: ১১৯)। খান একই মত ব্যক্ত করে বলেন, গোত্রগুলির নাম তাদের পূর্ব পুরুষদের বাসস্থান দক্ষিণ আরাকানের কয়েকটি অঞ্চল যথা: রামরি দ্বীপ, সেন্ডোর, ক্যাউপ্রু, সি দোপ প্রভৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত (২০০৬: ২৭)। আহসানের মতে, সাধারণত একটি গোত্র কোনো নদী বা পর্বতের পাশে বসবাস শুরু করে এবং উক্ত পর্বত কিংবা নদীর নাম থেকে গোত্রের নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন, 'রিগ্রে ছাহ্' গোত্র। 'রিগ্রে'

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ 'পরিষ্কার পানি', 'ছাহ্' অর্থ সন্তান। সুতরাং রিগ্রে ছাহ্ অর্থ পরিষ্কার পানির সন্তান। এই গোত্র সাঙ্গো নদীর ধারে বসবাস করে। এই নদীর পানি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সুস্বাদু। প্রতিবছর তারা সাঙ্গো নদীর পূজা করে। তারা বিশ্বাস করে নদীর দেবতার পূজা না করলে দেবতা অসন্তুষ্ট হবেন এবং পরিণামে তাদের ক্ষতি হবে (Ahsan, 1993: 54)। মাঠ গবেষণায় রাখাইন গ্রামবাসীর নদী-দেবতায় বিশ্বাসের তথ্য পাওয়া যায়। এমন কি মেঘনা নদীর আগুনঝরায় মাঝে মধ্যে ঢাকা-পটুয়াখালী চলাচলকারী লঞ্চসমূহ যে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কবলে পড়ে এবং ফলশ্রুতিতে অনেক প্রাণহানী ঘটে সে ক্ষেত্রে তাদের ধারণা হলো নদীর দেবতার অসন্তুষ্টির কারণে এটা ঘটে। কর হিসেবে নদীর দেবতা এ-সকল মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়।[১] রাখাইনদের মতো বিশ্বের অনেক আদিবাসীই নদীর দেবতায় বিশ্বাস করে। ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার টোটো আদিবাসী নদীর দেবতায় বিশ্বাসী। প্রতিটি নদী আলাদাভাবে তাদের উপকার বা অপকার করতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে। আবার বিভিন্ন রোগের জন্যও এক-একটি নদীর কুপিত হওয়ার কারণ বলে টোটোদের বিশ্বাস। এরজন্য তারা নদী দেবতার পূজা করে (মজুমদার, ১৪১৫: ১৯০-৯১)।

রাখাইনদের এই গোত্র প্রথার সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের গোত্র ধারণার আংশিক মিল এবং বাঙালি হিন্দুদের গোত্র প্রথার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুর গোত্র ধারণার পার্থক্য দেখিয়েছেন ইনডেন এবং নিকোলাস (১৯৭৭: ৯৯)। তাঁদের মতে, হিন্দুদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় গোত্রের একাত্মতা হয়েছে শারীরিক উপাদানসমূহের ভাগাভাগির মাধ্যমে যা উৎসারিত হয়েছে বীজ পুরুষ থেকে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা জীবিত এবং মৃতের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানে এবং তারা জীবিত ব্যক্তিদের বংশধরদেরকে মৃত পূর্বপুরুষদের একই পর্যায়ে ফেলে না। হিন্দুরা যেখানে পূর্বপুরুষদের জন্য ভোগ দেয় এবং পূজা করে মুসলমানরা সেখানে এ-ধরনের আচার পালন করে না। হিন্দুরা যখন কুল সম্পর্কে কথা বলে তখন তারা কুল সদস্যদের দৈহিক উপাদানের অংশীদারিত্ব এবং জীবিত বা মৃত জ্ঞাতির যথাযথ আচরণবিধি নিয়েও কথা বলে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের অংশীদারিত্ব সম্পর্ক সাধারণত মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। কাজেই মুসলমানরা কুল সম্পর্কে কথা বলে না বরং বংশ বা গোষ্ঠী সম্পর্কেই কথা বলে (আরেফিন, ১৯৯৪: ৫১)। সেই বিচারে রাখাইনরাও পূর্বপুরুষদের জন্য ভোগ দেয় না আবার পূর্বপুরুষদের পূজাও করে না। তারা জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য টানে এবং তারা কখনো মৃত পূর্বপুরুষকে জীবিত ব্যক্তিদের সাথে একই পর্যায়ভুক্ত করে না। এমনকি হিন্দুদের মতো রাখাইনদের গোত্রের একাত্মতা কোনো বীজ পুরুষ থেকে উৎসারিত শারীরিক উপাদানসমূহের ভাগাভাগির মাধ্যমেও হয়নি।

খান (২০০৬) পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় অনুসন্ধান করে ৬টি গোত্রের সন্ধান পান। এগুলো হলো : (১) মারো চা, (২) সং চা, (৩) রামব্রে চা, (৪) রাপ্রে চা, (৫) ক্যাউ চা, ও (৬) সানঙ্গেয়ে চা। এই অনুসন্ধানে গবেষণাধীন গ্রামগুলোতে ৪টি গোত্রের নাম পাওয়া যায়। তবে খান-এর সাথে পার্থক্য হলো, এখানে 'ম অং চা' নামের একটি ভিন্ন গোত্র আছে, যা খানের অনুসন্ধানে নেই। গোত্র ৪টি হলো : রামব্রে চা, মারো চা, সং চা, এবং ম অং চা। নিম্নের ৬.১ নং সারণিতে তিনটি গ্রামের গোত্রসমূহের বিন্যাস উপস্থাপন করা হলো।

সারণি- ৫.১

তিনটি গ্রামের গোত্রসমূহের বিন্যাস

গোত্র নাম	গ্রাম ও গোত্রভুক্ত পরিবারের সংখ্যা			মোট পরিবার	শতাংশ	মোট জনসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া				
রামব্রে চা	৫	৯	৬	২০	৬৮.৯৭	৯১	৬৯.৪৭
মারো চা	৬	-	-	৬	২০.৬৯	২৫	১৯.০৮
সং চা	২	-	-	২	৬.৯০	৯	৬.৮৭
ম অং চা	১	-	-	১	৬.৯০	৬	৪.৫৮
সর্বমোট	**১৪**	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**	**১৩১**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮

চিত্র- ৫.১

তিনটি গ্রামের গোত্রসমূহের বিন্যাস

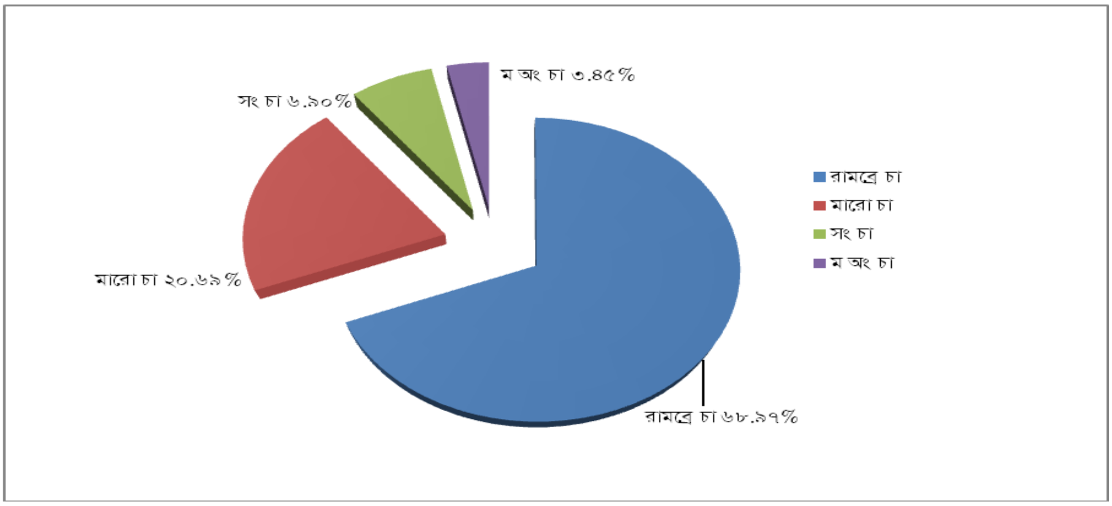

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

সারণি ৫.১ ও চিত্র ৫.১ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনটি গ্রামের ২৯টি পরিবারের মধ্যে রামব্রে চা গোত্রের সর্বাধিক ২০টি পরিবার আছে অর্থাৎ ৬৮.৯৭%। এরমধ্যে হাড়িপাড়ায় ৫টি, মধুপাড়ায় ৯টি ও তুলাতুলিপাড়ায় ৬টি পরিবার আছে। গ্রামসমূহের মোট ১৩১ জন লোকের মধ্যে

সর্বাধিক ৯১ জন অর্থাৎ ৬৯.৪৭% এই রামব্রে চা গোত্রের লোক। মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ার সকল পরিবারই রামব্রে চা গোত্রভুক্ত। এই গ্রাম দুটিতে অন্য কোনো গোত্রের বসবাস নেই। হাড়িপাড়ায় ১৪টি পরিবারের মধ্যে রামব্রে চা ভুক্ত ৫টি বাদে ৬টি মারো চা, ২টি সং চা ও ১টি ম অং চা গোত্রের পরিবারের বসবাস। দেখা যাচ্ছে হাড়িপাড়ায় মারো চা গোত্রের লোকের বসবাস বেশি। হাড়িপাড়ার ৫৬ জন লোকের মধ্যে ২৩ জন মারো চা গোত্রভুক্ত। অবশিষ্ট ৩০ জন লোকের মধ্যে ১৮ জন রামব্রে চা, ৯ জন সং চা এবং ৬ জন ম অং চা গোত্রের লোক।

রাখাইনদের মধ্যে গোত্র প্রথার বন্ধন তুলনামূলকভাবে শিথিল। কেননা এমন অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে যাদের গোত্রের সদস্যরা রক্তের বন্ধনের বিশ্বাসের কারণে প্রতিহিংসা ও রক্তের বদলে রক্ত নেয়ার স্পৃহাকে বহন করে চলে বলে অনেক গবেষক উল্লেখ করেছেন। রক্ত সম্বন্ধের এই ধারণার কারণে এক গোত্রের লোকেরা অন্য গোত্রের যে-কোনো সদস্যের উপর প্রতিশোধ নেয়। সেজন্য দেখা যায় যে, একটি গোত্রের কোনো একজন সদস্যের অন্যায় কাজের দায়-দায়িত্ব ঐ গোত্রের উপর বর্তায় (বেসেইন, ১৯৯৭)। কিন্তু রাখাইনদের ক্ষেত্রে গোত্রবন্ধনে হিংস্রতা লক্ষ্যণীয় নয়। রাখাইনদের গোত্রবন্ধন সম্পর্কে লেভি স্ট্রস বলেন, আদি মগরা তাদের গোত্রের জন্য কোনোরকম পৃথক কার্যক্রম নির্ধারণ করে না, যদিও তাদের কথাবার্তা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য অতীতকালে এক গোত্র থেকে অন্য গোত্র আলাদা করা হতো। যেমন পাগড়ি বা মাথায় কাপড় বাঁধার নিয়ম (Strauss, 1952: 50; বেসেইন, ১৯৯৭: ২৪)। অর্থাৎ তাদের কথা-বার্তা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য যেমন পাগড়ি পরা বা মাথায় কাপড় বাঁধার নিয়ম-কানুন দেখে অতীতে কোন মারমা কোন গোত্রের তা বলা যেত বা অনায়াসে এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রকে আলাদা করা যেত। সুদূর অতীতে রাখাইনদের এক একটি গোত্র এক একটি পাড়ায় বসবাস করত। সে সময় এক গোত্রের লোকেরা অন্য গোত্রের লোকের সাথে মেলামেশা কম করতো। তাদের মধ্যে গোত্র বহির্ভূত বিয়ে নিন্দনীয়। রাখাইন গোত্রভুক্ত লোকদের মধ্যে অন্যান্য পার্থক্যের মতো কথা-বার্তা ও শব্দ উচ্চারণভঙ্গির ক্ষেত্রে যথেষ্ট তারতম্য ছিল বলে জানা যায়। তবে বর্তমানে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে এই তারতম্য হ্রাস পেয়েছে। কালের পরিক্রমায় গোত্র বন্ধনও শিথিল হয়ে পড়েছে। ফলে বর্তমানে একটি পাড়ায় একাধিক গোত্রের লোকের বসবাস দেখা যাচ্ছে। গবেষণাধীন মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ায় কেবল রামব্রে চা গোত্রের বসবাস। অপরদিকে হাড়িপাড়ায় ৪টি গোত্র একত্রে বসবাস করছে (সারণি ৬.১ দ্রষ্টব্য)। বর্তমানে গোত্র বহির্ভূত বিয়েও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে।

গোত্রের প্রধান কাজ হলো বিয়ে, উত্তরাধিকার, ক্রমপরম্পরা, সম্বন্ধীকরণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা। গোত্র সদস্যরা একটি অসমর্থ পরিবারের পক্ষে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিংবা সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, বিয়ে, পূজা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তাসহ নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। রাখাইন

সমাজে সদস্যদের বিয়ে-রীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে গোত্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় কাউকে নিজ গোত্রের ভিতর খুঁজতে হয়। রাখাইনদের মধ্যে এই বিয়ে সবচেয়ে স্বীকৃত ব্যবস্থা। তবে গোত্র বহির্ভূত বিয়েও তাদের মধ্যে বর্তমানে দেখা যায়। গবেষণা এলাকায়ও এর তথ্য পাওয়া গেছে। যেমন হাড়িপাড়ার রামব্রে চা গোত্রের একজন ছেলে মধুপাড়ার মারো চা গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করেছে; আবার তুলাতুলিপাড়ার মারো চা গোত্রের একজন ছেলে হাড়িপাড়ার রামব্রে চা গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করেছে। কিন্তু এ ধরনের বিয়েকে উৎসাহ প্রদান করা হয় না। বার্নাটের (Bernot, 1953: 17-61) মতে, শতকরা ৯৮ জন মারমা সমগোত্রে বিবাহী। এরা বংশ পরিচয় খুব সাবধানতার সঙ্গে বিচার করে দেখে যাতে বর ও কনের মধ্যে অজাচার সম্পর্ক স্থাপিত না হয় এবং এটাই মারমারা খুব ভয় করে (বেসেইন, ১৯৯৭: ২৫)। রাখাইনদের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিয়ে নিন্দনীয় এবং তা অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। তবে কেউ বিয়ে করে বসলে তেমন কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় না (পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। গবেষণাকালে নতুন প্রজন্মের মধ্যে গোত্র পৃথকীকতার ধ্যান-ধারণা তেমন পাওয়া যায় না। সমাজজীবনের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায় যেভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা গৃহীত হচ্ছে সেক্ষেত্রে পুরাতন গোত্রীয় চিন্তা-চেতনা ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই। দিন দিন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা গুরুত্ব ও বৃদ্ধি পাচ্ছে, গোত্রের প্রাধান্য হ্রাস পাচ্ছে।

৫.১.২ গোষ্ঠী

রাখাইন সমাজ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠিত হয়। প্রধানত রক্ত সম্বন্ধ ধারণার উপর গোষ্ঠীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্য রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ এবং গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যরা তা পুরোপুরি বিশ্বাস করে। গোষ্ঠী বা বংশ বলতে স্থানীয় পিতৃ গোষ্ঠী বুঝায়। পিতৃকুল দ্বারা রাখাইন সমাজে বংশ নির্ণয় করা হয়। 'গোষ্ঠী' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ থেকে যার অর্থ পরিষদ, পারিবারিক সম্পর্ক, আত্মীয় এবং জ্ঞাতি। 'বংশ' শব্দটিরও উৎপত্তি সংস্কৃত 'ভংশ' শব্দ থেকে যা রক্ত সম্পর্ককে নির্দেশ করে। গোষ্ঠী বলতে পিতৃ গোষ্ঠীর উপর সরাসরি জোর না দিয়ে বরং নিকট গোষ্ঠীর উপর জোর দেয়। আক্ষরিক অর্থের দিক দিয়ে ভিন্ন হলেও গোষ্ঠী এবং বংশ এই দুটি শব্দই বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের মতো হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ার রাখাইনদের ক্ষেত্রেও পিতৃগোষ্ঠী সম্পর্ক বোঝায়। এখানে গোষ্ঠী বা বংশ হচ্ছে এমন একদল লোকের সমষ্টি যারা পিতৃগোষ্ঠীর সম্পর্কের ভিত্তিতে একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। তবে বাঙালি সমাজে যেমন এক গোষ্ঠীর জন্য একটি ভিটে থাকে, সেই ভিটেয় একটি গোষ্ঠীর দুই বা ততোধিক বাড়ি বা ঘর থাকে যেখানে গোষ্ঠীর লোকেরা বাস করে, গবেষণাধীন গ্রামের রাখাইনদেরও অতীতে তেমনটি থাকলেও

Dhaka University Institutional Repository

আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার কারণে বর্তমানে এক ভিটেয় এক গোষ্ঠীর বসবাস সম্ভব হয় না। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন রাখাইনের বসত বাড়ির জমি সাধারণ সম্পত্তি বা এজমালি সম্পত্তি যা মাতবরের নামে রেকর্ডকৃত। সুতরাং কোনো নব দম্পতিকে নতুন ঘর তৈরি করতে হলে বাবার বাড়ির বা ঘরের পাশে খালি জায়গা না থাকলে অন্য বাড়ির পাশে যেখানে খালি জায়গা থাকে সেখানে বাড়ি তৈরি করতে হয়। কিন্তু গোষ্ঠী বন্ধন অটুট থাকে।

আদর্শগতকারণে গ্রাম তিনটির গোষ্ঠীগুলো পিতৃসূত্রীয় হলেও বাস্তবে বৈবাহিক সূত্রে এবং মায়ের দিকের আত্মীয়তা সম্পর্কেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। বেশ কয়েকটি বাড়িতে ঘর জামাইয়ের দৃষ্টান্ত আছে। অবশ্য রাখাইনরা ঘরজামাই শব্দটি ব্যবহার করে না বা রাখাইন ভাষায় ঘরজামাইয়ের কোনো পরিভাষা নেই। কেননা বাঙালি সমাজে ঘরজামাইকে যে অবজ্ঞার ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়, রাখাইন সমাজে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। এখানে বিয়ের পর বর ইচ্ছে করলে শ্বশুর বা মেয়ের বাবার বাড়িতে বসবাস করতে পারে। এটা সম্পূর্ণ নব দম্পতির ইচ্ছের ব্যাপার। সমাজের কোনো কিছু বলার নেই। এটাকে অনেকটা ছেলে-মেয়ের সমান অধিকার নীতির প্রতিফলন বলা যায়। এই প্রথাকে মাতৃ আবাস বলা যেতে পারে। কারণ রাখাইনদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে মাতৃ আবাস প্রথা প্রচলিত আছে। আবার কোনো ব্যক্তির কোনো পুরুষ উত্তরাধিকার না থাকলে, সেক্ষেত্রে মাতৃ আবাস অনুসরণ করতেও দেখা যায়। জামাই শ্বশুরের সম্পত্তি দেখাশুনা করে এবং সে স্ত্রীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। মুসলমান সমাজে ঘরজামাই স্ত্রীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না, তবে ঘরজামাইয়ের ছেলে-মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু রাখাইনদের মধ্যে জামাই স্ত্রীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে এবং একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পিতৃ গোষ্ঠী সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক সংহতি থাকা উচিত তা বর্তমানে সেই মাত্রায় নেই। সমতল ভূমি হওয়ায় প্রতিবেশী অ-আদিবাসীদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন সম্ভব হয়নি, ফলে তাদের সাথে স্বাভাবিক মিথস্ক্রিয়ার প্রভাব পড়ে জ্ঞাতি সংগঠনে। অতীতের স্বনির্ভর অর্থনীতির বিলুপ্তি এবং বাজার অর্থনীতি বিকাশের সাথে সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ছে। তবে গ্রামগুলোতে শ্রেণি সম্পর্কের অবয়ব বিকাশ এখনও লক্ষ্য করা যায় না। গ্রামগুলোর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোনো পরিবার সীমিতভাবে স্বাধীন অর্থনৈতিক একক দাঁড়াচ্ছে। এছাড়া একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে খুব বড় ধরনের পার্থক্য নেই। তবে বর্তমানে এই পার্থক্য স্পষ্টতর হওয়ার রূপ নিচ্ছে। আধুনিক পেশাগ্রহণ ও বাজার অর্থনীতি সে ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাখাইনদের গৃহীত গোষ্ঠী পদবিগুলো বাঙালি প্রভাবিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। গোষ্ঠীর গৃহীত নামপদবিগুলো থেকে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। কেননা এই নামগুলো কোনো রাখাইন শব্দ নয় বা পদবি নয়। এগুলো বাঙালিদের গোষ্ঠী পদবি। মাবুদ খানের মতে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের স্বতন্ত্র কোনো পদবি নেই। তবে দীর্ঘদিন বাঙালিদের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে চৌধুরী, তালুকদার ও হাওলাদার প্রভৃতি পদবি ব্যবহার করার প্রথা সম্প্রতি চালু হয়েছে (খান, ২০০৬: ২৮)। যেমন তালুকদার কিংবা মাতবর পদবির কথা ধরা যাক। 'মাতবর' শব্দটি আরবি শব্দ "মুত'বর" থেকে এসেছে। মাতবর শব্দটির অনেকগুলো পরিভাষা পাওয়া যায়। যেমন : পল্লির মোড়ল, সর্দার, প্রধান ব্যক্তি, গণ্যমান্য ব্যক্তি। কখনো কখনো বয়োবৃদ্ধ কিংবা মুরব্বিদের মাতবর বলা হয় (*ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ. ৯৭২)। আবার 'তালুকদার' শব্দটি আরবি "তা'আল্লুক" শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ তালুকের মালিক। তালুক অর্থ জমিদারি; সরকার বা জমিদারের নিকট থেকে বন্দোবস্ত করে নেওয়া সম্পত্তি (*ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ. ৫৫৬)। এই দুটি পদবি-গোষ্ঠী ছাড়াও গবেষণাধীন তুলাতুলিপাড়ায় কবিরাজ ও ঠাকুর গোষ্ঠী দেখা যায়। কবিরাজ গোষ্ঠী সম্পর্কে জানা যায়, এই পরিবার প্রধানের পিতামহ (পিতাও) কবিরাজি করত। পরবর্তীকালে তিনি 'কবিরাজ' পদটি, যার উৎস পেশা, গোষ্ঠী পদবি হিসেবে ব্যবহার করেন এবং সেই থেকে তার গোষ্ঠী গ্রামে কবিরাজ গোষ্ঠী বলে পরিচিত। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর কেউ কবিরাজি পেশার সাথে জড়িত নেই। উল্লেখ্য, কবিরাজ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ কবিশ্রেষ্ঠ অথবা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক অথবা বৈদ্য (*ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ. ২২২)। বর্মী ভাষায় কবিরাজকে 'সিধমা' বলে। আবার, ঠাকুর পদবি সম্পর্কে জানা যায়, তুলাতুলিপাড়ার মন্দিরের পুরোহিত বাল্য বয়সে ধর্মীয় শিক্ষালাভের জন্য বার্মায় চলে যান। সেখানে পড়াশুনা শেষে প্রায় বিশ বছর পরে তিনি দেশে ফিরে এসে মন্দিরের পুরোহিতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে সবাই তাকে ঠাকুর বলে ডাকে এবং এটাই তার পরিবারের পদবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্মর্তব্য যে, ঠাকুর শব্দটিও সংস্কৃত 'ঠক্কুর' শব্দ থেকে এসেছে যার বাংলায় অনেক অর্থ পাওয়া যায়। যেমন হিন্দুদের দেবতা, প্রতিমা, ঈশ্বর, ভগবান, রাজা, অধীশ্বর, অধিপতি, প্রভু, মালিক, পূজনীয় বা মাননীয় বা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, গুরুজন, গুরু, ব্রাহ্মণ, পূজক, পুরোহিত প্রভৃতি (*ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ. ৫০৯)। উপাধি গ্রহণের ব্যাপাটি যে রাখাইনদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়, বরং আনেক আদিবাসীর ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়। যেমন ভারতের উত্তরবঙ্গের মেচ উপজাতিগুলি রায় বা চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করেছে (ভৌমিক, ১৮৮৬: ২৫৩)।

এছাড়া এই গ্রামগুলোতে অন্য কোনো গোষ্ঠীর বসবাস নেই। যেমন পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো কোনো গ্রামে হাওলাদার ও চৌধুরী পদবির গোষ্ঠী দেখা যায়। তবে সুদূর অতীতেও মাতবর শব্দটির

প্রচলন ছিল। লেভি স্ট্রস, পিয়ারে বেসেইন প্রমুখ সে তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু তা গোষ্ঠীর নাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো না। সমতল ভূমির পাড়ার (রাখাইন ভাষায় রোয়া) প্রধানকে মাতবর সম্বোধন করা হতো যা পরবর্তীকালে গোষ্ঠী পদবি হয়ে দাঁড়ায়। তবে মাতবরদের সেই সর্বব্যাপী ভূমিকা এখন দেখা যায় না। পাহাড়ি বনাঞ্চলে পাড়া প্রধানকে হেডম্যান বলা হয়। হেডম্যান পাড়ার কৃষিজমির খাজনা আদায় করে রাজাকে দেন। রাজা সরকারি কোষাগারে জমা দেন। গোষ্ঠী পদবি গ্রহণ সম্পর্কে মোহেন চিং বলেন, অতীতে একজনের বড় তালুক ছিল, তাকে প্রতিবেশি সকলে তালুকদার বলে সম্বোধন করতে করতে পরবর্তীকালে এক পর্যায়ে সেটাই গোষ্ঠী পদবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২] উল্লেখ্য, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে আবাদকার্যের বহুস্তর বিশিষ্ট মধ্যস্বত্ব ভোগীদের ১ম স্তরে অর্থাৎ জমিদাররা তালুকদার (এরও কয়েকটি স্তর আছে) নিয়োগ করতো। নিম্নের ৬.২ নং সারণিতে তিনটি গ্রামের গোষ্ঠী বিন্যাস উপস্থাপন করা হলো।

সারণি– ৫.২

তিনটি গ্রামের রাখাইনদের গোষ্ঠীর বিন্যাস

পদবি	গ্রামভিত্তিক গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারের সংখ্যা			মোট পরিবার	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
মাতবর	১৩	৬	৪	২৩	৭৯.৩১
তালুকদার	১	৩	-	৪	১৩.৭৯
কবিরাজ	-	-	১	১	৩.৪৫
ঠাকুর	-	-	১	১	৩.৪৫
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮

চিত্র– ৫.২

তিনটি গ্রামের রাখাইনদের গোষ্ঠীর বিন্যাস

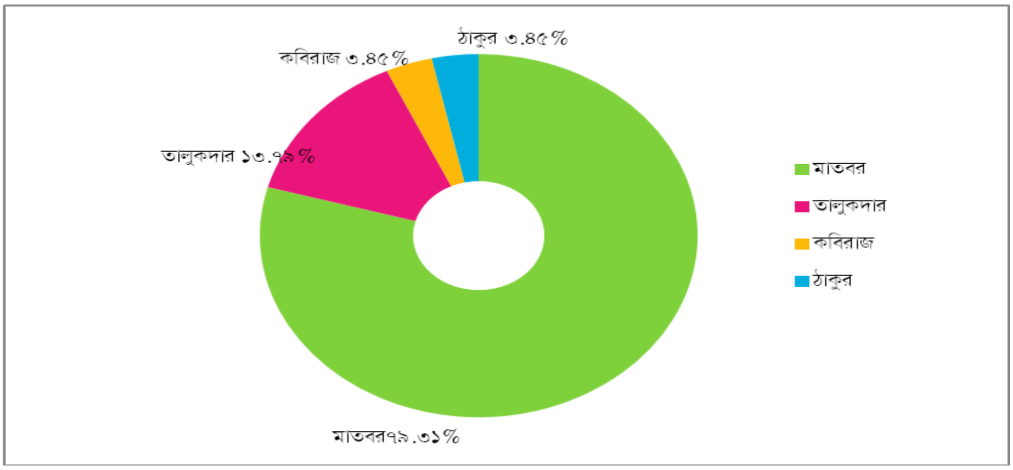

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে, তিনটি গ্রামের ২৯টি পরিবারের মধ্যে ২৫টি মাতবর গোষ্ঠীর, ৪টি তালুকদার গোষ্ঠীর, ১টি কবিরাজ গোষ্ঠী ও ১টি ঠাকুর গোষ্ঠী। হাড়িপাড়ার ১৪টি পরিবারের মধ্যে ১৩টিই মাতবর গোষ্ঠীর ও ১টি তালুকদার গোষ্ঠী। মধুপাড়ার ৯টি পরিবারের মধ্যে ৬টি মাতবর গোষ্ঠীর ও ৩টি তালুকদার গোষ্ঠীর। তুলাতুলিপাড়ার ৬টি পরিবারের মধ্যে ৪টি মাতবর গোষ্ঠীর, ১টি কবিরাজি গোষ্ঠীর ও ১টি ঠাকুর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

সু ত্মাং দেখা যাচ্ছে, গবেষণা এলাকায় গোষ্ঠী সংগঠনে পদবির ব্যবহার খু ব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। বাংলাদেশের বাঙালি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও এই একই তথ্য পাওয়া যায় (বিস্তারিত দেখুন : আরেফিন, পৃ. ৫০)। রাখাইনদের মধ্যেও পদবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো কঠোর বিধি-নিষেধ পরিলক্ষিত হয় না। বরং একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে-কোনো পদবি গ্রহণে যথেষ্ট শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। তিনটি গ্রামের রাখাইনদের মধ্যে গোষ্ঠীধারা অনুপস্থিত বা গোষ্ঠীর ধারাবাহিক সম্পর্ক অনুপস্থিত। কেননা এখানে ভিন্ন গোত্রের কিংবা গোষ্ঠীর কোনো পুরুষ বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে থেকে গেলে সে তখন থেকে শ্বশুরের গোষ্ঠী পদবি গ্রহণ করে। সুতরাং বলা যায়, গবেষণাধীন তিনটি গ্রামের রাখাইনদের গোষ্ঠী সংগঠনে অবিচ্ছিন্ন গোত্রকুল এবং বংশের বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত।

৫.১.৩ পরিবার

সব সমাজে পরিবারের উৎপত্তি নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও সমাজ-জীবনযাপন করার জন্য মানুষ যে সব প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তারমধ্যে পরিবার যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাচীন তাতে কেউ সন্দেহ পোষণ করেননি। সামাজিক বিধি অনুযায়ী বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যখন কোনো পুরুষ ও নারী একত্রে বাস করে তখনই পরিবার গঠিত হয়। জিপি মারডক পরিবারের সংজ্ঞায় বলেন,

> “একত্রে বসবাসকারী অর্থনৈতিক কর্মধারায় সহযোগিতাকারী এবং প্রজননকারী একটি সামাজিক দলকে পরিবার বলা হয়। পরিবারের মধ্যে একজন পুরুষ একজন স্ত্রীর যৌন জীবন সমাজ স্বীকার করে এবং নিজেদের বা দত্তক এক বা একাধিক ছেলেমেয়ে দেখা যায়।” (Murdoc, 1949)

বাংলা ‘পরিবার’ শব্দটি বহুলার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এই শব্দটি ‘স্ত্রী’ অর্থে অথবা কোনো একটি পরিবারের সকল সদস্যকে একযোগে বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত পরিবার প্রত্যয়টি ‘চুলা’, ‘ঘর’, ‘খানা’ (যারা একসঙ্গে খায়), ঘর (আক্ষরিক অর্থে বাসা), গৃহস্থালী প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। গ্রামবাসীরা পরিবার সংখ্যাকে চুলা দ্বারা নির্ধারণ করে। কারণ একটি পরিবারের খাবার তৈরি হয় একটি চুলায়। ‘ঘর’ (সংস্কৃত শব্দ ‘গৃহ’ যার অর্থ বসবাসের ঘর) শব্দটিও পরিবার বুঝাতে ব্যবহৃত হয় এবং এর দ্বারা বুঝানো হয় কিছু লোককে যারা একসঙ্গে একটি গৃহে বসবাস করে। খানা শব্দটিও পরিবার বুঝাতে ব্যবহার করা হয় যার অর্থ একটি একান্নবর্তী গোষ্ঠী (আরেফিন, ১৯৯৪: ৫৬)। গৃহস্থালী শব্দটি দ্বারা সংসারকে বোঝায় (বসু, ১৪১৬ : ১৯৯)

রাখাইন জনগোষ্ঠীতে বর্তমানে পিতৃতান্ত্রিকতা প্রবল হয়ে উঠেছে। তবে তাদের সমাজে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অনেক ক্ষয়িত অবশেষ এখনো বিদ্যমান। রাখাইনদের বংশধারা, নারীর অধিকার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের অবস্থানের বর্তমান চিত্রে এর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। মজিদ (১৯৯২) এ-সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। যেমন : ১. পিতৃতান্ত্রিক সমাজ হওয়ায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ধারা পিতৃসূত্রীয়। রাখাইন জনগোষ্ঠীর প্রথাগত আইনে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার পুরুষের সমান। পক্ষান্তরে বাঙালিদের জন্য প্রযোজ্য মুসলিম বা হিন্দু আইনে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সমান নয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইন জনগোষ্ঠীর পিতা বা মাতার উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাই যেটুকু অংশ পায় বোনের অংশও ততটুকু। তবে ব্যতিক্রমও লক্ষ্যণীয়। এ-ক্ষেত্রে পিতা-মাতা ছেলে বা মেয়েকে সম্পত্তির কিছু অংশ বেশি দান করলে সকলে তা মেনে নেয়। কখনও কখনও বড় ছেলে পিতার সম্পত্তি থেকে একটু বেশি পেয়ে থাকে। বড় ছেলে পরিবারের অন্য সকল সদস্যদের দায়িত্ব পালন করে বলে সে একটু বেশি সম্পত্তি পেয়ে থাকে। সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ার বিষয়ে তাদের মধ্যে লিখিত আইন-কানুন নেই। ২. রাখাইনদের মাঝে মেয়ের বাড়ি থাকার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিয়ের পর বর-কনে তাদের সুবিধা মতো কনের বাবার বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। তবে কনের বাড়িতে বসবাসের কারণে বাঙালি সমাজে ঘর-জামাইয়ের মতো তাদের অবস্থা অবমাননাকর বা লাজুক নয়। বরং তা এমন এক প্রথায় পরিণত

হয়েছে যে, স্বাভাবিক ন্যায্য অধিকারেই স্বামী এইভাবে স্ত্রীর গৃহে সংস্থান করে নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী শ্বশুরালয়ে পৃথক ঘরে ও পৃথক অন্নে স্ত্রীকে নিয়ে তার দাম্পত্য জীবন-যাপন করে। ৩. পরিবারের সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এ-সমাজে নারীর অধিকার পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়নি। অনেকটা নমনীয় মাত্রায় হলেও এখনো নারীরাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে কতৃত্বাসনে। ৪. মাতৃতান্ত্রিক সমাজের যুগে গৃহস্থালী ও কৃষিতে নারীর ভূমিকা ছিল প্রধান। কিছুকাল আগেও পটুয়াখালীর রাখাইনরা গৃহস্থালীর কাজ ছাড়াও ক্ষেত-খামারের কাজে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করতো। আউশ-আমন মৌসুমে ক্ষেতের বীজ তোলা, বীজ বপন এমনকি হাল চাষেও তারা অংশ নিতো। দুধের শিশুকে কাপড়ে ঝুলিয়ে কোলে নিয়ে নারীদের হাল ধরার দৃশ্য একসময় খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। এছাড়াও রান্নাবান্না, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, তাঁতে কাপড় বোনা ও হাট-বাজার করার কাজও তারাই করতো। এ-জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পুরুষরা বরং কম সময় দিত। তারা বন্য জন্তু ও পাখি শিকার এবং কখনো কখনো মাছ ধরে সময় কাটাতে ভালোবাসতো। চাষাবাদে পুরুষরা অংশ নিলেও মাঠে সরাসরি শ্রম দেওয়ার কাজের চেয়ে তত্ত্বাবধানের কাজেই তাদের বেশি আগ্রহ ছিল। (মজিদ, ১৯৯২: ৮৯-৯১)।

বর্তমানে সমাজ গবেষকদের কাছে এটা প্রমাণিত যে, নারীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায়নের মূল উৎস নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা। আর অতীতে রাখাইন নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ছিল। গৃহস্থালী ও কৃষিকাজ ছাড়াও প্রত্যেক নারী তাঁতের কাজ করত। ফলে তারা যে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ছিল, এবং সামাজিকভাবে স্বাধীন ছিল তা প্রমাণিত হয়। সার্বিক দিক থেকে পরিবারে নারীদের এই ব্যাপক অধিকারের সমর্থনে Shway Yeo-এর মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তাঁর মতে, ইউরোপের সর্বাধিক উন্নত একটি দেশের নারীদের চেয়ে বার্মার মেয়েরা অধিক স্বাধীন (Yeo, 1963: 52)। নারীর এই নমনীয় কর্তৃত্বাসন একটা ঐতিহাসিক পরম্পরা ও যোগসূত্রের সন্ধান দেয়। তবে তাদের মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতায় রূপান্তর প্রক্রিয়ার শুরু এ-দেশে নয়। বরং তা শুরু হয় নিজ আদিভূমি বার্মাতেই। এই প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে বেগবান হয়েছে এ-দেশের সংস্কৃতির প্রভাবে।

রাখাইন পরিবারে পিতা হলো প্রধান ব্যক্তি। পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের বয়স্ক পুরুষ পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তবে উপযুক্ত পুরুষ না থাকলে মা বা অন্য কেউ এ দায়িত্ব পালন করে। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ তত্ত্বাবধানে শিশু লালিত-পালিত হয়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শ্রমবিভাগ আছ। সাংসারিক কাজে ছেলে-মেয়ে বিভিন্নভাবে পিতামাতাকে সাহায্য করে। পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খুবই মধুর। তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। মাঝেমধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। কখনো কখনো বিবাদের নিষ্পত্তি হয়, আবার কখনো কখনো বিবাদের কারণে পরিবারে বিচ্ছেদ ঘটে যার নজির বিরল।

৫.১.৪ বিয়ে

গবেষণাধীন রাখাইন গ্রামবাসীর কাছে বিয়ে কোনো চুক্তি নয়। তাদের কাছে বিয়ে একটি বড় সামাজিক উৎসব এবং ধর্ম পালনের অপরিহার্য শর্ত। যদিও রাখাইনরা পিতৃসূত্রীয় তবুও মাতৃপক্ষের এবং বৈবাহিকসূত্রের সম্পর্কের গুরুত্বকে অবহেলা করা হয় না; বরং অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের বিস্তৃতি ঘটে। বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা আছে। মা-বাবা কদাচিৎ ছেলে-মেয়ের এই স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে। ছেলে-মেয়ের মতামত নিয়েই মা-বাবা পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে। তাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। বিধবাদেরও বিয়ে হয়। কিন্তু বাল্য বিবাহ দেখা যায় না। সাধারণত বছরের একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে বর্ষাকালে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় না বা বিয়ের তেমন প্রচলন নেই। মূলত আমন ধান বোনার শুরু থেকে প্রবারণা পূর্ণিমা অর্থাৎ আষাঢ় মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত ফসল না ওঠা অবধি তারা কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে না।

রাখাইন সমাজে অন্য গোত্র এবং অন্য সম্প্রদায় বা জাতির সাথে বিয়ে অগ্রহণীয়। অতীতে তাদের বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সম্প্রতি রাখাইনরা বৃহত্তর পটুয়াখালীর বাইরে বান্দরবান, কক্সবাজার, রামু, টেকনাফ এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও বার্মায় বসবাসরত একই নৃগোষ্ঠীর মধ্যে পাত্র-পাত্রীর সন্ধান ও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলছে। হাড়িপাড়ায়ও এই তথ্য পাওয়া যায়। হাড়িপাড়ার মাতবর গোষ্ঠীর এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে বার্মায় এবং সেখানে সে স্বামীর সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এমনকি বিয়ের পর আর বাংলাদেশে আসেনি।

রাখাইন সমাজে কুলগত অর্থাৎ চাচাতো ও খালাতো ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে অর্থাৎ প্যারালাল-কাজিন বিয়ে নিষিদ্ধ। ফুফাতো ও মামাতো ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে অর্থাৎ ক্রস-কাজিন বিয়ে হতে পারে। তবে ক্রস-কাজিন বিয়েতে ধর্মীয় কোনো বিধি-নিষেধ না থাকলেও পারিবারিকভাবে এ-বিয়েকে নিরুৎসাহিত করা হয়। উল্লেখ্য, মুসলমান সমাজে ইসলামি আইন অনুযায়ী প্যারালাল ও ক্রস-কাজিন বিয়ে গ্রহণীয়। নিম্নের ৫.৩ নং চিত্রে ক্রস-কাজিন ও প্যারালাল-কাজিন চিহ্নিত করা হলো।

চিত্র- ৫.৩
ক্রস-কাজিন ও প্যারালাল-কাজিন

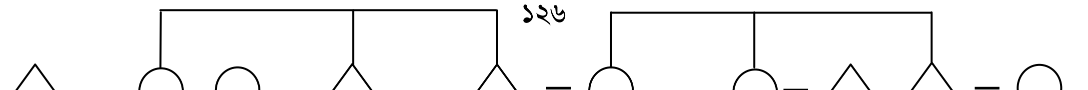

Dhaka University Institutional Repository

উৎস : গবেষক প্রণীত

অভিভাবকদের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বিয়ের ব্যবস্থা রাখাইনদের প্রধান ধরন। সাধারণত ছেলের যৌবনপ্রাপ্তির পর মা-বাবা পাত্রীর সন্ধান শুরু করে। কোনো উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পেলে পাত্রের আত্মীয়-স্বজন কিংবা গ্রামের মাতবর পর্যায়ের কারো মাধ্যমে পাত্রীর অভিভাবকদের কাছে আনুষ্ঠানিক বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হয়। প্রস্তাব পাঠাবার পর পাত্রীর অভিভাবক কখনো কখনো তৎক্ষণাৎ সম্মতি দেন। আবার কখনো কখনো গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি, গণক এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী কোনো এক সময় বিয়ের সম্মতি দেন। তবে অমত থাকলে সম্বন্ধ না করার বিষয়ে প্রস্তাবককে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর পাত্র পছন্দ হলে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা-বার্তা এবং বাগদানের (পানচিনি) অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তখন আনুষ্ঠানিক কথা-বার্তা ও বিয়ের দিন নির্ধারণ করার জন্য পাত্র এবং আত্মীয়-স্বজন সহকারে পাত্রপক্ষের অভিভাবক মেয়ের বাড়িতে আসে। ঠাকুর শুভ দিন দেখে বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করে দেন। পাত্রপক্ষ কনেকে বিয়েতে কী উপহার দেবে তাও এ-সময় আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হয়।

বিয়ের অনুষ্ঠান সাধারণত মেয়ের বাড়িতে হয়। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী সাতদিন স্ত্রীর বাবা-মার বাড়িতে থাকে। সাতদিন কনের মা-বাবার বাড়িতে থাকার কারণ সম্পর্কে জানা যায়, তারা মনে করে বিয়ের পর মেয়ের নতুন জীবন শুরু হয়। মেয়েটি শ্বশুর বাড়িতে নতুন আত্মীয়-স্বজনের সাথে নতুন জীবন শুরু করে। সেই নতুন জীবনের সাথে অভ্যস্ত হওয়ার প্রস্তুতি তৈরি হয় এই সময়ে। বর-কনে সাতদিন পর বরের বাবা-মার বাড়িতে যায়। কনেকে এই সাতদিনে বরের আত্মীয়-স্বজনের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বর-কনে আত্মীয়-স্বজনের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করে এবং আশীর্বাদ, উপহার গ্রহণ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে থাকে। এভাবে বিয়ের অনুষ্ঠানসহ বিয়ে-পূর্ব ও বিয়ে-উত্তর পনের দিন দীর্ঘস্থায়ী জৌলুস, বর্নাঢ্য ও আনন্দঘন পরিবেশে অতিবাহিত করার পর তারা নতুন করে পারিবারিক জীবন শুরু করে। উল্লেখ্য অতীতে বিয়ের পরে সাত দিন শ্বশুর বাড়িতে থাকার যে নিয়ম ছিল তা বর্তমানে পুরোপুরি মানা হয় না। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ের পর কনেকে নিয়ে বর নিজের বাবার বাড়িতে চলে আসে। অধিকন্তু, অতীতে বিয়ের ৩ দিন বা সর্বাধিক ৭ দিন পর বর-কনের বাসর রাত করার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। এর পেছনে মুরুব্বিদের যুক্তি ছিল, নব-দম্পতির মান-সম্মান সুন্দরভাবে বজায় থাকে। তবে ইদানীং বিয়ের রাতেই নব-দম্পতির বাসর রাত হয়ে থাকে। সামাজিক সম্পর্কের এই পরিবর্তন যে অ-আদিবাসী বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবপ্রসূত তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিয়ে ছাড়াও রাখাইনদের মধ্যে প্রণয়ঘটিত বিয়েও সংঘটিত হয়। রাখাইন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা নেই। বাঙালি হিন্দুদের মতো তাদেরও সারা বছর জুড়ে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব চলতে থাকে। বছরব্যাপী পালিত বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে ছেলে-মেয়েরা আনন্দ-হাসি, নাচ-গান, আমোদ-ফূর্তি, হৈ-হুল্লোড়ে মেতে ওঠে। মেলামেশার অবাধ সুযোগে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরিণামে প্রেম বিয়েও লক্ষ্যণীয়। তবে যেহেতু বিয়ের ক্ষেত্রে রাখাইন সমাজ অত্যন্ত গোঁড়া, অন্য সম্প্রদায় বা অন্য জাতির সাথে বিয়ে অগ্রহণীয়, সেজন্য যুবক-যুবতীরা প্রেমের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে। এরপরও প্রতিবেশী মুসলমান সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়ের সাথে প্রণয়ঘটিত বিয়ের ঘটনা ঘটেছে।

কোনো ছেলে-মেয়ে প্রেমে পড়লে এবং তাদের মা-বাবা বিয়েতে অসম্মত থাকলে তারা সুযোগ বুঝে একদিন পালিয়ে গিয়ে কোনো আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ছেলের পক্ষ থেকে কোনো একজন আত্মীয় বা বন্ধু ছেলের বাবা-মার কাছে গিয়ে ছেলের বিয়ের কথা উত্থাপন করে তাদেরকে গ্রহণ করার অনুরোধ করে। বাবা-মা সম্মতি দিলে স্ত্রীকে নিয়ে ছেলে পিতৃগৃহে চলে আসে। ছেলের বাবা-মা রাজি না থাকলে মেয়ের বাবা-মার কাছে উভয়কে গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। সে-ক্ষেত্রে মেয়ের বাবা-মাও যদি রাজি না হয় তাহলে কিছু দিন পর তারা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন শুরু করে। ব্যতিক্রম দুই-একটি বাদ দিলে সাধারণত কারো পিতা-মাতা তাদেরকে গ্রহণ করতে আপত্তি করে না। অনক সময় দেখা গেছে উভয়ের মা-বাবা টাকা-পয়সা, জমিজমা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করে। এ ধরনের বিয়েতে সামাজিক বা ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

রাখাইনদের মধ্যে একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে কোনো বাধা-নিষেধ না থাকলেও কেউ সাধারণত একাধিক বিয়ে পছন্দ করে না। কারণ এটা সমাজে নিন্দনীয়। মহিলাদের একাধিক স্বামী রাখার কোনো নিয়ম এই সমাজে নেই। এই সমাজে বিধবা বিয়ের প্রচলন আছে। তবে তাদের মধ্যে বিধবা বিয়ে খুবই সীমিত। এর অন্যতম একটি কারণ হলো, সমাজের নিয়ম অনুসারে বিধবাদের অপেক্ষাকৃত কম বয়সী ছেলের সাথে বিয়ে বসতে হয়। ফলে পাত্র পাওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। দলগত আলোচনা থেকে জানা যায় তাদের মধ্যে মধ্যে বহু স্ত্রী বিয়ে, শ্যালিকাবরণ, দেবরবরণ ও বিনিময় বিয়ের প্রচলন আছে। তবে গবেষণাধীন তিনটি গ্রামে এই চার ধরনের বিয়ের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

রাখাইনদের বিয়েতে পণ-প্রথা নেই। নেই মৌখিক বা লিখিত চুক্তিভিত্তিক যৌতুক প্রথা। কিন্তু মেয়েকে কি পরিমাণ সোনা-গহনা দেওয়া হবে তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করার প্রচলন আছে যা বাঙালি মুসলমান বা হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা নয়। মুসলমানদের রয়েছে বাধ্যতামূলক কনেপণ-প্রথা যার অপর নাম মোহরানা। যখন একজন পুরুষ কোনো নারীর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাকে মোহর দিতে হয়। ইসলাম ধর্ম অনুযয়ী বর অবশ্যই কনেকে মোহর প্রদান করবে এবং এটি বিয়ের চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সমপর্যায়ের বিষয় হচ্ছে মোহর। এই রীতি অনুযায়ী বিয়ের পর যৌন মিলনের আগে কনেকে মোহরানার অর্ধেক টাকা পরিশোধ করতে হয়। যদিও প্রথাগত আইন অনুযায়ী এটি বাধ্যতামূলকভাবে পরিশোধযোগ্য নয়। কেবল চুক্তিতেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে (আরেফিন, ১৯৯৪: ৭২)। মুসলমান সমাজে কনেপণের পাশাপাশি বরপণের প্রাপ্তি বা যৌতুক প্রথার মারাত্মক রূপ দেখা যায়। হিন্দুদের কনেপণ নেই, তবে বরপণ আছে যা যৌতুক প্রথা হিসেবে পরিচিত। রাখাইনদের মধ্যে এক সময় মেয়ের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তার প্রশ্নে বিয়ের সময় বরপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ গহনা দাবি করা হতো। তবে বর্তমানে এ-দাবিরও প্রচলন নেই। যৌতুক প্রথার প্রভাব না থাকার দরুন সামাজিক অনাচার ও নারী নির্যাতনের কোনো ঘটনা নেই। নিম্নের সারণিতে দুটি মধ্যম আয়ের পরিবারের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিয়ের খরচের নমুনা দেখানো হলো। এই খরচ বাধ্যতামূলক নয়। উভয়পক্ষ আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে সাধ্যমতো ব্যয় বহন করে।

সারণি– ৫.৩

বিয়েতে বর ও কনে পক্ষের খরচের নমুনা

বর পক্ষের খরচ	কনে পক্ষের খরচ

Dhaka University Institutional Repository

১. বর ও কনের জন্য বিয়ের পোশাক। যেমন বরের জন্য ঐতিহ্য অনুযায়ী লুঙ্গি বা ধূতি, ফতুয়া বা পাঞ্জাবি, রাখাইন বারেস্টার (দামি কালো জ্যাকেট) ও ফুলসজ্জিত কিংবা জারির কাজ করা পাগড়ি। কনের পোশাক যেমন ঐহিত্যময় কারুকাজ খচিত বর্ণাঢ্য লুঙ্গি বা ঘাগড়া বা থামি, ব্লাউজ, মাথার বর্ণময় ওড়না ও কোমরের বেল্ট। কনের জন্য গয়না-গাটি যেমন হাতের চুড়ি, আঙুলের আঙটি, পায়ের মল, কোমরের বিছা, গলার হার ও লকেট, কানের দুল, নাকের নোলক, মাথার চন্দ্রাহার। এবং কনের সাজ-গোছের কসমেটিক্স ও সুগন্ধি প্রভৃতি।	১. কনের বিয়ের পোশাক যেমন ঐতিহ্যময় কারুকাজ খচিত বর্ণাঢ্য লুঙ্গি বা ঘাগড়া বা থামি, ব্লাউজ, মাথার বর্ণময় ওড়না ও কোমরের বেল্ট। কনের স্বর্ণালঙ্কার যেমন হাতের চুড়ি, আঙুলের আঙটি, পায়ের মল, কোমরের বিছা, গলার হার ও লকেট, কানের দুল, নাকের নোলক ও মাথার চন্দ্রাহার। বরের জন্য অন্যান্য উপহার সামগ্রী যেমন ঘড়ি, বাইসাইকেল বা মোটর সাইকেল, জমি, টিভি, বাড়ি, গরু, মহিষ ও নগদ টাকা। বরের জন্য স্বর্ণালঙ্কার যেমন আঙুলের আঙটি, গলার হার ইত্যাদি।
২. কনে বাড়িতে নিয়ে আসার পর আয়োজিত বৌ-ভাত অনুষ্ঠানের খরচ।	২. বিয়ে অনুষ্ঠানের সাজসজ্জাসহ আমন্ত্রিত অতিথিদের ভোজনের খরচ।

গবেষণা এলাকার রাখাইনদের মধ্যে বিয়ের পর বউ নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে থাকার ক্ষেত্রে কোনোরকম বাধা নেই যা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে । মুসলমান ও হিন্দু সমাজে এ-প্রথাকে ঘরজামাই বলা হয়। কিন্তু রাখাইন সমাজে যেহেতু এটা স্বাভাবিক প্রথা সেহেতু 'ঘরজামাই'-এর মতো ভিন্ন কোনো নামে চিহ্নিত করা হয় না। বাঙালি সমাজে ঘরজামাই অনেকটা হেয় প্রতিপন্ন হয়। যেমন প্রবাদ আছে– 'ঘরজামাইয়ের পোড়া মুখ/মরা বাঁচা সমান সুখ।' কিংবা 'ঘরজামাই সোয়ামী যার/কানের সোনার নিন্দে তার।' এ-রকম আরো অসংখ্য প্রবাদ আছে। এই দুটি প্রবাদ থেকে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ঘরজামাইয়ের সামাজিক অবস্থান অনুধাবন করা যায়। কিন্তু গবেষণা এলাকার রাখাইনদের মধ্যে এটা যে স্বাভাবিক প্রথা তা বিয়ের পর বর-কনের বরের শ্বশুর বাড়িতে বসবাস সম্পর্কিত নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে এ-বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

সারণি– ৫.৪

তিনটি গ্রামে বরের বিবাহ-উত্তর বাসস্থান

জামাইয়ের বাসস্থান	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
শ্বশুর বাড়িতে বাস	৬	৪	৩	১৩	৪৪.৮৩

নিজ পিতার বাড়িতে বাস	৮	৪	২	১৪	৪৮.২৪
প্রযোজ্য নয়	-	১	১	২	৬.৯০
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

সূত্র : মাঠ গবেষণা ২০১৮

চিত্র– ৫.৪

তিনটি গ্রামে বরের বিবাহ-উত্তর বাসস্থান

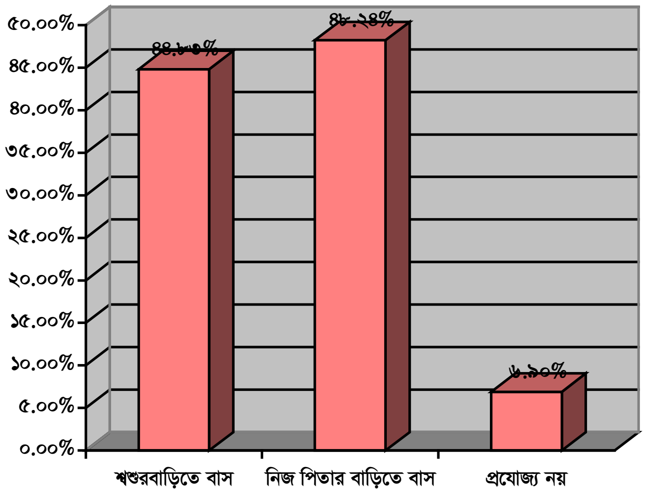

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

সারণি ৫.৪ ও চিত্র ৫.৪ থেকে দেখা যাচ্ছে, গবেষণা এলাকার ২৯টি পরিবারের মধ্যে ১৩টি পরিবার প্রধান অর্থাৎ ৪৪.৮৩% বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করছে। হাড়িপাড়ার ১৪টি পরিবারের মধ্যে ৬টি পরিবারের প্রধান অর্থাৎ ৪২.৮৬% বিয়ের পর শ্বশুরের বাড়িতে থেকে যায়। ৬ জনের মধ্যে ১ জনের জন্ম তুলাতুলিপাড়ায়, ১ জনের পার্শ্ববর্তী মেলাপাড়ায়, ২ জনের মধুপাড়ায় এবং ২ জনের খেপুপাড়ার কাওয়ার চরে জন্ম। মধুপাড়ার ৯টি পরিবারের মধ্যে ৪টি পরিবারের প্রধান অর্থাৎ ৪৪.৪৪% বিয়ে করে শ্বশুর বাড়িতে থেকে যায়। ৪ জনের মধ্যে ১ জনের জন্ম মধুপাড়াতে, কিন্তু বিয়ের পর নিজের বাপের ভিটেয় না থেকে শ্বশুরের ভিটেয় থেকে যায়। অন্য ৩ জনের মধ্যে ১ জনের জন্মস্থান পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মায়, ১ জনের খেপুপাড়ার কাওয়ার চরে, ও আর ১ জনের টিয়াখালীতে। তুলাতুলিপাড়ায় ৬টি পরিবারের মধ্যে ৩টি পরিবার প্রধানের অর্থাৎ ৫০% জন্ম ভিন্ন পাড়ায় যারা বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে থেকে যায়। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, যেহেতু রাখাইন সমাজে ছেলে-মেয়ের অধিকার সমান এবং তাদের লিঙ্গভেদে ভিন্ন চোখে দেখা হয় না সেজন্য বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে থাকার প্রচলন স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা এলাকায় রাখাইনদের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম বিয়ের তথ্য পাওয়া যায় না। সমমান বিয়েই তাদের মধ্যে চর্চা করা হয়। তবে দলগত আলোচনা থেকে জেনেছি যে, তারা কেবল একটি অনুলোম বিয়ের তথ্য জানে কিন্তু সেটি পার্শ্ববর্তী বৌলতলী গ্রামের ঘটনা। এটি বাদে তাদের জানা সকল বিয়েই সমমান বিয়ে। এ-ধরনের বিয়েতে কনে এবং বর পক্ষের লেনদেন সামগ্রীর প্রবাহ সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৌলতলী গ্রামের অনুলোম বিয়ের ঘটনাটি হলো : বৌলতলী গ্রামের এক মাতবরের ৪০-৪৫ কানি জমি ছিল। ঐ মাতবর তার মেয়ে-কে তালতলীর আগাঠাকুরপাড়ার এক দিনমজুরের ছেলের সাথে বিয়ে দেয়। কারণ ছেলেটি শিক্ষিত–আইএ পাশ। ছেলেরা চার ভাই সবাই শিক্ষিত ছিল। ছেলেটি খেপুপাড়ার টিএনও অফিসে চাকুরি করতো। অন্য ছেলেরাও চাকুরিজীবী ছিল বলে তাদের শহরের সাথে ভালো যোগাযোগ ছিল। এক্ষেত্রে ছেলেটির শিক্ষা, সরকারি চাকুরি ও শহরের সাথে পারিবারিক যোগাযোগ বিয়েতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এটি একটি অনুলোম বিয়ের দৃষ্টান্ত। তবে এ-ধরনের দৃষ্টান্ত রাখাইন সমাজে সচরাচর পাওয়া যায় না। এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এ-ধরনের বিয়ে শিক্ষা, চাকুরি ও শহরের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

রাখাইনদের স্বগোত্রীয় বিবাহের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বর্তমানে নানা কারণে পারিবারিকভাবে বহির্গোত্র বিবাহ মেনে নিতে দেখা যাচ্ছে। যেমন শিল্পী মারমার বয়স ২০ বছর। তার বাড়ি রাঙামাটি জেলায়। সে স্থানীয় স্কুল থেকে এসএসসি পাস করে ঢাকার বাংলা একাডেমিতে অফিস সহায়কের চাকরি গ্রহণ করে। সে বিয়ে করেছে একজন চাকমাকে। এই বিয়ে পারিবারিকভাবেই হয়েছে বলে জানায়। তার স্বামী জ্ঞান চাকমা। বয়স ৩৫ বছর। বি কম পাস। স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম- কদমতলি, পো.- সুবলং, উপজেলা- বরকল, জেলা- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। সে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে চাকরিরত। বর্তমানে ঢাকা উত্তরাস্থ বাংলা একাডেমি স্টাফ কোয়ার্টারে স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, রাখাইন সমাজে ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিয়ের কোনো নিয়ম-নীতি নেই। এটাকে সমাজ কোনোভাবেই সমর্থন করে না। অতীতে এ ধরনের কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না। তথাপি প্রতিবেশি অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিথস্ক্রিয়া লক্ষ্যণীয়। এক্ষেত্রে নিকটস্থ বালিয়াতলী বাজার আদিবাসী ও অআদিবাসীদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ফলে বর্তমানে বাঙালিদের সাথে তাদের সচরাচর ওঠাবসার সম্পর্ক নজরে আসে। এই সম্পর্কের সূত্র ধরে এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ের ঘটনা পর্যন্ত গড়িয়েছে। এ-ধরনের দুটি কেস এখানে উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি ১ : রাখাইন মেয়ে ও মুসলমান ছেলের বিয়ে

সানা (ছদ্মনাম) গবেষণাধীন হাড়িপাড়ার রাখাইন মাতবর গোষ্ঠীর মেয়ে। বয়স ৩৮ বছর। ১৮-২০ বছর বয়সে কলাপাড়া উপজেলা শহরের মুসলমান বাসিন্দা করিমের (ছদ্মনাম) সাথে প্রণয়াবদ্ধ হয়ে পালিয়ে বিয়ে করে। করিমের বয়স ৪৪ বছর। সানা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। বর্তমানে তারা ঢাকা গাজীপুরে বসবাস করছে। ছেলে একটি গার্মেন্টসে চাকুরি করে। তাদের একটি কন্যা সন্তান আছে। বয়স ১৫ বছর। করিমের বাবা হাড়িপাড়ার নিকটস্থ বালিয়াতলী বাজারে চালের ব্যবসা করতো। বালিয়াতলী বাজারে তাদের চালের দোকান ছিল। রাখাইন মেয়েরা অত্যন্ত স্বাধীনভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তারা বাজারে যায়, কেনাকাটা করে। এমনকি বর্তমানেও রাখাইন মেয়েদের বাজার-সওদা করতে দেখা গেছে। হাড়িপাড়ার ওই মেয়েটিও সওদা কিনতে বাজারে যেত। ক্রেতা-বিক্রেতার সূত্র ধরে তাদের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরিণামে তারা পালিয়ে বিয়ে করে। যেহেতু রাখাইন সমাজ তাদের মেনে নেবে না তাই বিয়ের পর অদ্যাবধি মেয়েটি হাড়িপাড়ায় আসেনি। তবে গ্রামে আসা-যাওয়া না থাকলেও পরিবারের কোন কোন সদস্যের সাথে সানাদের ভালো-মন্দ খোঁজ-খবর নেওয়ার মতো অল্প-স্বল্প যোগাযোগ আছে বলে জানতে পারি।

কেস স্টাডি ২ : রাখাইন ছেলে ও মুসলমান মেয়ের বিয়ে

অনু (ছদ্মনাম) পার্শ্ববর্তী সোনাপাড়ার একটি রাখাইন ছেলে। বয়স ৪০ বছর। কানকুনি পাড়ার মুসলমান মেয়ে স্বপ্নার (ছদ্মনাম) সাথে তার প্রেম হয়। স্বপ্নার বয়স ৩৫ বছর। ১৭ বছর আগে তারা প্রণয়সূত্রে বিয়ে করে। অনু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে কানকুনি পাড়ায় স্ত্রীকে নিয়ে পরিবার থেকে আলাদা হয়ে বসবাস করছে। পরিবারের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও পরোক্ষ যোগাযোগ আছে বলে জানা গেছে। এ-ক্ষেত্রে সামাজিক বিধি নিষেধের ক্ষয়িষ্ণু প্রথার কারণেই যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হচ্ছে না তা বোঝা যায়। তবে এই পরোক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে রাখাইন গ্রামবাসী কোনোরকম মাথা ঘামায় না। বর্তমান যুগের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে তাদের মধ্যে চরম বিদ্বেষভাবও দেখা যায় না।

উল্লেখ্য, এ ধরনের বিয়ে দেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায়। *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় ১৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত “প্রেম মানে না কোন বাধা, জাত কি বেজাত” শীর্ষক সংবাদে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ সংবাদদাতা জানান যে, রূপগঞ্জ উপজেলার গোলাকান্দাইলের ডহরগাও এলাকার ফকির ফ্যাশনের ফিনিসিং বিভাগে কর্মরত শ্রমিক আড়াইহাজার উপজেলার দুপ্তারা ইউনিয়নের বাজবী গ্রামের রফিকুল ইসলাম রনি তার সহকর্মী খাগড়াছড়ি জেলার

Dhaka University Institutional Repository

রামগড় উপজেলার ২ নং হাফছড়ির বদংপাড়া এলাকার মংশেপ্রু মারমার মেয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ঞাইজাইরী মারমার সাথে গড়ে ওঠা দীর্ঘদিনের প্রেম সম্পর্কের জেরে উভয় পরিবারে তৃতীয়পক্ষের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হলে ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে কোন পরিবারই রাজি হয়নি। তাই তারা আদালতের মাধম্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

৫.১.৫ জ্ঞাতিসম্পর্ক

বাংলায় 'জ্ঞাতি' শব্দের অর্থ হলো 'যাকে আত্মীয় বলে জানা যায়' (দাস, ১৯৮৬: ৮৭০)। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বলা যায় যে, জ্ঞাতিসম্পর্ক হলো মানুষকে সংঘবদ্ধ করার একটি প্রাচীন ও প্রচলিত রীতি। প্রত্যেক সমাজেই এই সম্পৃক্ততা শুধুই কতকগুলি সম্পর্ককে চিহ্নিত করে না, এই সম্পর্কগুলির আইনগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যকেও নির্দেশ করে। যেমন কিছু আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রায় সব সমাজেই বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে থাকে; কিছু সম্পর্ক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তি তৈরি করে। কোনো কোনো সমাজে, যেগুলোকে মাতৃসূত্রীয় সমাজ বলে সেখানে মার দিক থেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয়। অন্যদিকে, পিতৃসূত্রীয় সমাজে বাবার দিক থেকে সম্পত্তির মালিকানা বর্তায়। সাধারণভাবে অধিকাংশ সমাজই পিতৃসূত্রীয় সমাজ; তবে অধিকাংশ আদিবাসী সমাজই মাতৃসূত্রীয় সমাজ। অধিকন্তু আত্মীয়, কুটুম্ব, জ্ঞাতি প্রত্যেকের কাছ থেকেই প্রত্যাশিত নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকা সব সমাজই আকাঙ্ক্ষা করে। অর্থাৎ জ্ঞাতিসম্পর্ক সমাজে একজন ব্যক্তিকে কেবল সামাজিকভাবে চিহ্নিত করে দেয় না, আচার ব্যবহারগত দিকটিকেও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। এরমধ্য দিয়ে মানুষ নানা স্তরে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এরফলে সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে। তাই সমাজে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক বুঝতে গেলে জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থা পর্যালোচনার কোনো বিকল্প নেই। জ্ঞাতিসম্পর্ক সকল সমাজেই অনিবার্য এবং আবশ্যক। তাই কোনো সমাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাঠামো, আচার-আচরণ-ব্যবহার-রীতিনীতির ধরন, আভ্যন্তরীণ, সামাজিক সচলতা ইত্যাদি বোঝার ক্ষেত্রে জ্ঞাতি ব্যবস্থার প্রাথমিক গুরুত্বটি সহজেই অনুধাবন করা যায়। জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রাচীনতা, প্রভাব ও গুরুত্ব বোঝাতে 'চর্যাপদ' থেকে নিম্নে দুটি ছত্রের উল্লেখ করা হলো :

> "টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
> হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥" (গোস্বামী, ১৪১৫: ৩৯১)

এখানে একজন দরিদ্র গৃহবধূ আক্ষেপ করে বলছে– প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন, পাড়া-পড়শী নেই, অন্নহীন কষ্টের সংসার, তবুও আত্মীয় কুটুমের নিত্য আসার বিরাম নেই। প্রাচীন সাহিত্যের এই উদ্ধৃতি থেকে সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের তাৎপর্য বোঝা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞাতি কুটুম সম্পর্ক গড়ে ওঠে দুইভাবে। প্রথমত জন্মগত সম্পর্ক। বাবা, মা, ভাইবোন, কাকা, জ্যাঠা, মাতামহী, দাদী, নানা, দাদা, খালা, ফুফু, মামা, নানা-নানী-দাদা-দাদীর ভাইবোন প্রমুখ। দ্বিতীয়ত, বিবাহ সম্পর্কিত বা বিবাহ পরবর্তী কুটুম। শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর, দেবর, শালি, খালু, ফুফা, জামাই বাবু, খালাতো-ফুফাতো-চাচাতো-মামাতো ভাইবোন, ননদ, সৎ মা, জা, সতীন, বেয়াই, বেয়ান, কাকিমা, জেঠিমা প্রমুখ। জন্মগত কুটুমের চেয়ে বিবাহ-পরবর্তী কুটুমের সংখ্যা অনেক বেশি। বিভিন্ন তত্ত্ব ও বিভিন্ন সংস্কৃতি পর্যালোচনা করে জ্ঞাতিসম্পর্কের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও সাধারণভাবে সবধরনের সমাজই আট ধরনের প্রাথমিক জ্ঞাতিসম্পর্ককে গণ্য করে। এগুলো হলো স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, মাতা-পুত্র, পিতা-পুত্রী, মাতা-পুত্রী, ভাই-দাদা, বোন-দিদি ও ভাই-বোন (চট্টোপাধ্যায়, ১৪১৫: ৩১৫)। এই আটটি প্রাথমিক আত্মীয়তার বাইরে অপেক্ষাকৃত গৌন তেত্রিশ ধরনের সম্পর্ক খুঁজে বের করা সম্ভব। এগুলো হলো মার ভাই, বাবার ভাই, মার দাদা, বাবার দাদা, মার বোন, মার বড় বোন, বাবার বোন, বাবার বড় বোন, ভাইয়ের স্ত্রী, বড় ভাইয়ের স্ত্রী, বড় বোনের বর, বোনের বর ইত্যাদি। এরপরও থেকে যায় কিছুটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা। যেমন, স্ত্রীর ভাইয়ের ছেলে, স্ত্রীর ভাইয়ের মেয়ে, স্ত্রীর বড় ভাবী, স্ত্রীর ভাইয়ের বউ, স্বামীর বড় ভাইয়ের ছেলে, স্বামীর বড় ভাইয়ের মেয়ে, স্বামীর বড় ভাইয়ের স্ত্রী ইত্যাদি। এভাবে প্রায় একশ একান্ন ধরনের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় (বসু, ১৪১৫: ৩০২-৩)। তবে এক্ষেত্রে নিকট সম্পর্ক ও দূর সম্পর্ক নির্ধারিত থাকলেও বাস্তবে অনেক সময়ে নিকট-সম্পর্কিত ব্যক্তি মনের কোণের বাইরে চলে যায়। এমনকি কোনো যোগাযোগ, দেখা-সাক্ষাৎও থাকে না। অপর দিকে, দূর সম্পর্কিত ব্যক্তি মনের কাছে চলে আসে, পর হয়ে ওঠে আপন। আর আপন হয়ে যায় পর।

বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মতো রাখাইনরা জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত। রাখাইনদের মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ব, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি একজনের রক্তসম্পর্কীয় পরিবার ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে বংশতালিকা সম্পর্কের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। রাখাইনরা পরস্পরের সাথে জ্ঞাতিসম্পর্ক দ্বারা সম্পর্কিত। রাখাইন সম্প্রদায়ের জ্ঞাতিবাচক শব্দগুলির অন্যান্য সমাজের জ্ঞাতিবাচক শব্দগুলির সঙ্গে অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে। এই শব্দগুলি বয়স, নারী-পুরুষভেদে নির্ণীত হয়। বিবাহের রীতিনীতি, পারস্পরিক আচার-ব্যবহার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বংশানুক্রম নীতি ইত্যাদি নির্ণয়ে জ্ঞাতিবাচক শব্দগুলির অধ্যয়ন একটি সমাজ সংগঠনের রূপটি বুঝতে আমাদের সহায়তা করে। এই জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং কিভাবে কোন আত্মীয়তার দাবিতে পরস্পরকে সম্বোধন করা হয় তা প্রত্যেকটি সমাজের জন্যই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কে কার হাসি-ঠাট্টার পাত্র আর কাকে

বিশেষভাবে সম্মান দেখানো উচিত তা নির্ভর করে অনেকটা এই সম্বোধন রীতির উপর। এই সম্বোধন রীতি ক্ষেত্রবিশেষে শ্রেণিমূলক আর ক্ষেত্রবিশিষে বর্ণনামূলক। নিম্নের সারণিতে একজন বিবাহিত পুরুষের সাপেক্ষে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার রাখাইন জ্ঞাতিবাচক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো এবং বোঝার সুবিধার্থে বাঙালি জ্ঞাতিশব্দ উল্লেখ করা হলো ।

সারণি– ৫.৫
জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত্তিতে রাখাইন জ্ঞাতিবাচক শব্দ

ক্রমিক	রাখাইন জ্ঞাতিশব্দ	জ্ঞাতিসম্পর্ক	বাঙালি জ্ঞাতিশব্দ
১.	ববা	পিতা	আব্বা/বা'জান/বাবা
২.	এয়ো/মেমে	মাতা	আম্মা/মা
৩.	গো গ্রি	অগ্রজ/সহদর/ বড় ভাই	ভাইয়া
৪.	নিঃসে	অনুজ/ছোট ভাই/সহদর	নাম ধরে ডাকা হয়
৫.	মেক্রি	বড় বোন/সহদরা	আপা, বুজি, বুবু, বুয়া
৬.	মাসে	ছোট বোন/সহদরা	নাম ধরে ডাকা হয়
৭.	বাজি	বাবার বড় ভাই	জ্যেঠা, বড় আব্বা
৮.	গ্রিগ্রি	বাবার বড় ভাইয়ের স্ত্রী	জ্যেঠী, বড় আম্মু
৯.	বে বে	বাবার ছোট ভাই	কাকা, চাচা
১০.	এয়ো	বাবার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী	কাকিমা, চাচী
১১.	গোগ্রি	বাবার ভাইয়ের ছেলে (বয়সে বড় হলে)	চাচাতো ভাই
১২.	নিঃসে	বাবার ভাইয়ের ছেলে (বয়সে ছোট হলে)	চাচাতো ভাই
১৩.	মেক্রি	বাবার ভাইয়ের মেয়ে (বয়সে বড় হলে)	চাচাতো বোন
১৪.	মাসে	বাবার ভাইয়ের মেয়ে (বয়সে ছোট হলে)	চাচাতো বোন
১৫.	স্যায়গ্রি	বাবার বড় বোন	ফুফু
১৬.	খ্যাগ্রি	বাবার বড় বোনের স্বামী	ফুফা
১৭.	স্যাইসে	বাবার ছোট বোন	ফুফু
১৮.	খ্যাইসে	বাবার ছোট বোনের স্বামী	ফুফা
১৯.	ইয়াওফা	বাবার বোনের ছেলে (বয়সে বড় হলে)	ফুফাতো ভাই
২০.	ইয়াওফাসে	বাবার বোনের ছেলে (বয়সে ছোট হলে)	ফুফাতো ভাই
২১.	ম্রি	বাবার বোনের মেয়ে (বয়সে বড় হলে)	ফুফাতো বোন
২২.	খ্রেমাসে	বাবার বোনের মেয়ে (বয়সে ছোট হলে)	ফুফাতো বোন
২৩.	মি গ্রি	মায়ের বড় ভাই	মামা
২৪.	মিসি	মায়ের ছোট ভাই	মামা
২৫.	স্যায়গ্রি	মায়ের বড় ভাইয়ের স্ত্রী	মামি/মামানি/মামিমা
২৬.	আরিসে	মায়ের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী	মামি/মামানি/মামিমা
২৭.	ইয়াওফা	মায়ের ভাইয়ের ছেলে (বয়সে বড় হলে)	মামাতো ভাই
২৮.	ইয়াওফাসে	মায়ের ভাইয়ের ছেলে (বয়সে ছোট হলে)	মামাতো ভাই

Dhaka University Institutional Repository

২৯.	ম্রি	মায়ের ভাইয়ের মেয়ে (বয়সে বড় হলে)	মামাতো বোন
৩০.	খ্রেমাসে	মায়ের ভাইয়ের মেয়ে (বয়সে ছোট হলে)	মামাতো বোন
৩১.	গ্রিগ্রি	মায়ের বড় বোন	খালা
৩২.	এয়ো	মায়ের ছোট বোন	খালা
৩৩.	বাগ্রি	মায়ের বড় বোনের স্বামী	খালু
৩৪.	বেবে	মায়ের ছোট বোনের স্বামী	খালু
৩৫.	গোগ্রি	মায়ের বোনের ছেলে (বয়সে বড় হলে)	খালাতো ভাই
৩৬.	নিঃসে	মায়ের বোনের ছেলে (বয়সে ছোট হলে)	খালাতো ভাই
৩৭.	মেক্রি	মায়ের বোনের মেয়ে (বয়সে বড় হলে)	খালাতো বোন
৩৮.	মাসে	মায়ের বোনের মেয়ে (বয়সে ছোট হলে)	খালাতো বোন
৩৯.	ফো ফো	বাবার বাবা	দাদা
৪০.	দো দো	বাবার মা	দাদি
৪১.	ফো ফো	মায়ের বাবা	নানা
৪২.	দো দো	মায়ের মা	নানি
৪৩.	ম্রি	বড় ভাইয়ের স্ত্রী	ভাবি
৪৪.	খ্রেমা	ছোট ভাইয়ের স্ত্রী	ভাদ্দুর বউ/ভাউই
৪৫.	ম্রি	বড় ভাইয়ের স্ত্রীর বোন	আপা/বেয়ান
৪৬.	মি মি	স্ত্রীর বাবা (শ্বশুর)	আব্বা
৪৭.	মি মি	ভাই/বোনের শ্বশুর	তালুই
৪৮.	আড়িই	স্ত্রীর মা (শাশুড়ি)	আম্মা
৪৯.	আড়িই	ভাই/বোনের শাশুড়ি	মাওউ
৫০.	ইয়াউফা	স্ত্রীর বড় ভাই	সম্বন্ধী
৫১.	ইয়াওফাসে	স্ত্রীর ছোট ভাই	শালা
৫২.	মে মে	স্ত্রীর ভাইয়ের স্ত্রী	ভাবি
৫৩.	ম্রি	স্ত্রীর বড় বোন	শালি
৫৪.	খ্রেমাসে	স্ত্রীর ছোট বোন	শালি
৫৫.	গো গো	স্ত্রীর বড় বোনের স্বামী	ভায়রা
৫৬.	নিঃসে	স্ত্রীর ছোট বোনের স্বামী	ভায়রা
৫৭.	চসে	স্ত্রীর বোনের ছেলে	ভাগনে
৫৮.	চামিসে	স্ত্রীর বোনের মেয়ে	ভাগিনী
৫৯.	তসে	ভাইয়ের ছেলে	ভাতিজা, ভাইপো
৬০.	তামিসে	ভাইয়ের মেয়ে	ভাতিজি, ভাতিঝি
৬১.	তু	বোনের ছেলে	ভাগিনা
৬২.	তুঃমা	বোনের মেয়ে	ভাগিনী
৬৩.	খ্যেমে	ছেলের শ্বশুর	বেয়াই
৬৪.	খ্যেমেমা	ছেলের শাশুড়ি	বেয়ান
৬৫.	খ্যেমে	মেয়ের শ্বশুর	বেয়াই

Dhaka University Institutional Repository

৬৬.	খ্যেমেমা	মেয়ের শাশুড়ি	বেয়ান
৬৭.	ম্রিনসে	ছেলের ছেলে	নাতি
৬৮.	ম্রিন মা	ছেলের মেয়ে	নাতনি
৬৯.	ম্রিনসে	মেয়ের ছেলে	নাতি
৭০.	ম্রিন মা	মেয়ের মেয়ে	নাতনি
৭১.	ম্রিইসে	ছেলের ছেলের ছেলে	পুতি
৭২.	ম্রিইমাসে	ছেলের ছেলের মেয়ে	পুতনী
৭৩.	ম্রিইসে	ছেলের মেয়ের ছেলে	পুতি
৭৪.	ম্রিইমাসে	ছেলের মেয়ের মেয়ে	পুতনি
৭৫.	ম্রিইসে	মেয়ের ছেলের ছেলে	পুতি
৭৬.	ম্রিইমাসে	ছেলের ছেলের মেয়ে	পুতনি
৭৭.	ম্রিইসে	মেয়ের মেয়ের ছেলে	পুতি
৭৮.	ম্রিইমাসে	মেয়ের মেয়ের মেয়ে	পুতনি
৭৯.	চাগ্রি	বড় ছেলে	খোকা/পুত্র
৮০.	চা মিং গ্রি	বড় মেয়ে	খুকি/পুত্র
৮১.	চঙে	ছোট ছেলে	খোকা
৮২.	চ মিংঙে	ছোট মেয়ে	খুকি
৮৩.	মিয়ো	স্ত্রী	বউ

উৎস : মাঠ গবেষণা, জুন ২০১৮

গবেষণা এলাকার রাখাইন জ্ঞাতিসম্পর্ক লিঙ্গ, বয়স, প্রজন্মভেদে ভিন্ন ভিন্ন। দেখা যায় তাদের বেশিরভাগ জ্ঞাতিশব্দ বর্ণনামূলক। তবে ইংরেজি আংকেল, আন্ট-র মতো অল্পকটি এই প্রকার জ্ঞাতিশব্দ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তারাও এক প্রজন্মের বিভিন্ন সম্পর্ক বোঝাতে একই জ্ঞাতিশব্দ ব্যবহার করে। যেমন : ফো ফো, দো দো, স্যায়গ্রি, মিমি, আড়িই। ফো ফো বলতে বাবার বাবা (দাদা) ও মায়ের বাবা (নানা), দো দো বলতে বাবার মা (দাদি) ও মায়ের মা (নানি), স্যায়গ্রি দ্বারা মায়ের বড় ভাইয়ের স্ত্রী (মামি) ও বাবার বড় বোন (ফুফু), মিমি দ্বারা স্ত্রীর বাবা বা শ্বশুর (আব্বা) ও ভাই বা বোনের শ্বশুর (তালুই), আড়িই দ্বারা স্ত্রীর মা বা শাশুড়ি (আম্মা) ও ভাই বা বোনের শাশুড়ি (মাওউ) বোঝানো হয়। এখানে স্ত্রীর দিক ও স্বামীর দিক সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বংশধারাকে চিহ্নিত করে না। বিশেষ করে ঊর্ধ্বতন তৃতীয় প্রজন্মে জ্ঞাতিশব্দ দ্বারা এই তফাৎ বোঝা যায় না। সেখানে পিতামহ দো দো, মাতামহ ফো ফো, পিতামহী দো দো, মাতামহী ফো ফো। সুতরাং এখানে দুটি ভিন্ন ধারার মধ্যে যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হচ্ছে তা বোঝা যায় না।

গবেষণা এলাকার রাখাইনদের জ্ঞাতিশব্দগুলো প্রজন্মগত ব্যবধানকে স্পষ্ট করে তোলে। দেখা যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন প্রজন্মের আত্মীয়দের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ। বাবা হলো ববা, কিন্তু তার পূর্ব প্রজন্মের বাবার বাবা হলো ফো ফো। বাবার প্রজন্মের সমান্তরাল আত্মীয়দের সঙ্গে বাবার পার্থক্য আলাদা শব্দ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, যেমন : বাবা ববা, বাবার বড় ভাই বাজি, বাবার ছোট ভাই বে বে। অনেক আদিবাসী সমাজ আছে যাদের জ্ঞাতিশব্দে এক প্রজন্মে সমান্তরাল আত্মীয়দের অন্তঃপ্রজন্মগত একত্রীকরণ ঘটে। যেমন ভারতের মেচ আদিবাসীদের কথা ধরা যায়। মেচ সমাজে বাবার বাবা, বাবার ভাই সবাই 'আয়োং' নামে সম্বোধিত হয় (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪১৫: ৩৮২)। আবার রাখাইনদের একই প্রজন্মের মধ্যে বয়সের ব্যবধান স্পষ্টভাবে জ্ঞাতিশব্দ দ্বারা প্রকাশিত। যেমন : বাবার বড় বোন সাইগ্রি, বাবার ছোট বোন সাইসে; আবার বড় ভাই গো গ্রি, ছোট ভাই নিঃসে, বড় বোন মেক্রি, ছোট বোন মাসে, বড় ভাইয়ের স্ত্রী ম্রি, ছোট ভাইয়ের স্ত্রী খ্রেমা।

গবেষণা এলাকার রাখাইনদের মধ্যে আত্মীয়তার লিঙ্গগত পার্থক্য বোঝাতে বিশেষ কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। বরং একই অংশবিশেষ জ্ঞাতিশব্দ দ্বারা পুরুষলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়কেই বোঝায়। যেমন : গো গ্রি, মি গ্রি, স্যাইগ্রি, চা মিনগ্রি, গ্রি গ্রি, খ্যাগ্রি প্রভৃতি। এখানে প্রতিটি জ্ঞাতিশব্দে 'গ্রি' যুক্ত আছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে গ্রি দ্বারা একই লিঙ্গ বোঝালেও ব্যবহারের দিক দিয়ে উভয় লিঙ্গে প্রয়োগ হয়। যেমন : গো গ্রি বড় ভাই, আবার গ্রি গ্রি বড় ভাইয়ের স্ত্রী, মি গ্রি মায়ের বড় ভাই, স্যায়গ্রি মায়ের বড় ভাইয়ের স্ত্রী ও বাবার বড় বোন, চা মিনগ্রি বড় ছেলে বোঝায়। অনুরূপভাবে নিঃসে, মাসে, স্যাইসে, খ্যাইসে, আরিসে, ইয়াওফাসে, খ্রেমাসে, চসে, চামিসে, তসে, তামিসে, ম্রিইসে, ম্রিইমাসে, প্রভৃতি। এখানে প্রতিটি জ্ঞাতিশব্দে 'সে' যুক্ত আছে। বাহ্যিকদৃষ্টিতে এই সে দ্বারা একই লিঙ্গ বোঝালেও ব্যবহারের দিক দিয়ে নারী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে দেখা যায়। যেমন : নিঃসে ছোট ভাই ও স্ত্রীর ছোট বোনের স্বামী, মাসে ছোট বোন, স্যাইসে বাবার ছোট বোন, খ্যাইসে বাবার ছোট বোনের স্বামী, ইয়াওফাসে বাবার বোনের ছেলে ও স্ত্রীর ছোট ভাই, খ্রেমাসে বাবার বোনের মেয়ে, মায়ের ভাইয়ের মেয়ে ও স্ত্রীর ছোট বোন, মিসে মায়ের বোনের মেয়ে, চসে স্ত্রীর বোনের ছেলে, চামিসে স্ত্রীর বোনের মেয়ে, ম্রিইসে ছেলের ছেলের ছেলে, ছেলের মেয়ের ছেলে, মেয়ের ছেলের ছেলে ও মেয়েরে মেয়ের ছেলে, ম্রিইমাসে ছেলের ছেলের মেয়ে, ছেলের মেয়ের মেয়ে, মেয়ের ছেলের মেয়ে ও মেয়েরে মেয়ের মেয়ে বোঝায়।

তবে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, মুসলমান বা হিন্দু জ্ঞাতিসম্পর্কে চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান চিহ্নিত করা হয় না। কিন্তু রাখাইন জ্ঞাতিসম্পর্কে চাচাত ও খালাত ভাই-বোনদের অর্থাৎ প্যারালাল কাজিনদের একই জ্ঞাতিশব্দে এবং ফুফাত ও মামাত ভাই-বোনদের অর্থাৎ ক্রস-কাজিনদের একই জ্ঞাতিশব্দে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তবে তাদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান পৃথক জ্ঞাতিশব্দে চিহ্নিত করা হয়। যেমন : গো গ্রি, নিঃসে, মেক্রি, মাসে। গো গ্রি বয়সের বড় চাচাত ও খালাত ভাইকে এবং নিঃসে বয়সের ছোট চাচাত ও খালাত ভাইকে; মেক্রি বয়সের বড় ফুফাত ও মামাত বোন, মাসে বয়সের ছোট ফুফাত ও মামাত বোন বোঝায়।

বাঙালি মুসলমান প্রয়াত আত্মীয়দের পূর্বে মরহুম, মৃত; বাঙালি হিন্দুরা স্বর্গীয়; ইংরেজরা লেট শব্দ ব্যবহার করে। সাধারণভাবে মৃত আত্মীয়বর্গকে চিহ্নিত করতে রাখাইনরা চির্ম্যা শব্দটি ব্যবহার করে।

রাখাইনদের জ্ঞাতিসম্পর্ক পদাবলি থেকে তাদের জ্ঞাতিসম্পর্ক কাঠামোর বন্ধনের শক্তি ও গুরুত্ব বোঝা যায়। তারা কেউ বড়দের নাম ধরে ডাকে না। কেবল একই প্রজন্মের এবং পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের নাম ধরে ডাকতে পারে।

গবেষণা এলাকার রাখাইনদের মধ্যে রসিকতা করতে দেখা যায়। হাসি, ঠাট্টা, তামাসা, ইয়ার্কি, ফাজলামি, মৌখিক ও দৈহিক আচরণের দ্বারা তারা রসিকতা করে থাকে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো তারাও মনে করে, রসিকতার সম্পর্কের অধিকারীদের মধ্যে সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ যৌন সম্পর্ক অজাচার পর্যায়ে পড়ে না। আবার কতগুলো ব্যবধানসূচক প্রথাও চালু রয়েছে। যেমন : কতিপয় আত্মীয়-স্বজনের নাম ধরে সম্বোধন করা, তাদের নিকটে বসে আহার করা, গুরুজনদের সম্মুখে ধূমপান করা ইত্যাদি। এই বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনকারী সমাজে নিন্দিত হয়। এর দ্বারা তাদের মধ্যে কুলুজীর অপরিসীম প্রভাব প্রমাণিত হয়। গবেষণা এলাকায় নিম্নলিখিত জ্ঞাতিসদস্যদের মধ্যে রসিকতার সম্পর্ক দেখা যায় :

ক. পুরুষ পুরুষে রসিকতা

১. স্বামী ও স্ত্রীর ছোট ভাই,

২. স্বামীর পিতা ও স্ত্রীর পিতা, এবং

৩. স্বামীর ছোট ভাই ও স্ত্রীর ছোট ভাই।

খ. পুরুষ ও নারীর মধ্যে রসিকতা

১. স্বামীর পিতা ও স্ত্রীর মাতা,

২. স্বামীর মাতা ও স্ত্রীর পিতা,

৩. স্বামী ও স্ত্রীর ভাইয়ের স্ত্রী, এবং

৪. স্ত্রী ও স্বামীর বোনের স্বামী।

গ. নারী নারীতে রসিকতা

১. স্বামীর ছোট বোন ও স্ত্রী,

২. স্বামীর বোন ও স্ত্রীর বোন,

৩. স্বামীর মা ও স্ত্রীর মা, এবং

৪. ভাইয়ের স্ত্রীগণ।

অনুরূপভাবে কিছু সম্পর্ক আছে যারা রসিকতা করতে পারে না। এই সম্পর্ক সম্মানসূচক দূরত্ব বজায় রেখে ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ মেনে চলে। যেমন :

Dhaka University Institutional Repository

১. স্বামীর বড় ভাই ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রী,

২. ছোট বোনের স্বামী ও স্ত্রীর বড় বোন,

৩. স্বামীর বড় বোনের স্বামী ও স্ত্রীর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী,

৪. স্বামীর ছোট বোনের স্বামী ও স্ত্রীর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী,

৫. স্বামীর বড় বোন ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রী,

৬. মায়ের ভাই ও বোনের ছেলে-মেয়ে।

দলগত আলাপ করে জানতে পারি তাদের মধ্যে সন্তান দত্তক গ্রহণের প্রথা আছে। যদিও গবেষণাধীন তিনটি গ্রামে সন্তান দত্তক নেওয়া সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। আরো জানা যায় যে, এই দত্তক গ্রহণ নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে হতে পারে, আবার ভিন্ন সম্প্রদায় থেকেও হতে পারে। তবে কেউ দত্তক গ্রহণ করলে সেই ছেলে বা মেয়েকে পরিবারের অন্য দসদ্যদের মতো পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হয়। দত্তক গ্রহণকারী সমাজের কাছে হেয় পতিপন্ন না হয়ে বরং বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকে। সমাজে এটাকে বুদ্ধিমত্তার কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৫.১.৬ কাল্পনিক আত্মীয়তা

শোণিত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্কের চিরাচরিত প্রথার বাইরে গিয়েও মানুষ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই সম্পর্ক কাল্পনিক আত্মীয়তা খ্যাত। কাল্পনিক আত্মীয়তা ধর্ম-বাপ, ধর্ম-মা, ধর্ম-ভাই, ধর্ম-বোন, উকিল-জামাই, উকিল-শ্বশুর প্রভৃতি হয়ে থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি এই ধরনের সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন সে এই সম্পর্ককে বিশেষ স্থান দিয়ে থাকে। এই ধরনের সম্পর্কের ফলে মানুষ সত্যিকারের আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়ে এ সম্পর্কের আত্মীয়দের প্রতি বিশেষ বাধ্যবাধকতা অনুভব করে। নিয়মানুযায়ী এই ধরনের আত্মীয়তা পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে হয় এবং কোনো এক পক্ষ এই সম্বন্ধ ধরে রাখতে ব্যর্থ হলে এই আত্মীয়তা সম্পর্ক ভেঙে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাধীন তিনটি গ্রামের মধ্যে দুটি গ্রামে ধর্ম-বাবা ও ধর্ম-মা'র কাল্পনিক আত্মীয়তার তথ্য পাওয়া যায়। হাড়িপাড়ায় মহেন চিং মাতবরের মাতামহীকে বাখরগঞ্জের কালীগঞ্জের এক মুসলমান ছেলে ধর্ম বাবা বলে আত্মীয়তা করে। তবে হাড়িপাড়ার এই কাল্পনিক আত্মীয়তার সম্পর্কের বর্তমানে কোনো কার্যকারিতা নেই। এই সম্পর্কের প্রথম প্রজন্মের সকলে প্রয়াত। তাদের বংশধরদের মধ্যে এখন আর কোনো যোগাযোগ নেই। যদিও ওই ছেলের পরবর্তী বংধধররা পার্শ্ববর্তী গ্রামে বসবাস করে। আবার খুলনার একটি মুসলমান ছেলে তুলাতুলিপাড়ায় একজন রাখাইন নারীকে ধর্ম মা বলে আত্মীয়তা করেছে। তুলাতুলিপাড়ার ধর্ম মা-র কাল্পনিক আত্মীয়তা-সম্পর্ক এখনো বজায় আছে। এছাড়া এই তিনটি গ্রামের মধ্যে আর কোনো কাল্পনিক আত্মীয়তা কিংবা আন্তঃসম্প্রদায়ের মধ্যকার কাল্পনিক আত্মীয়তার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

গবেষণা এলাকায় কাল্পনিক আত্মীয়তার ঘটনা যে বর্তমানে কমে যাচ্ছে তা উপরোক্ত তথ্য থেকে বোঝা যায়। এ-ধরনের সম্পর্কের ঘটনা কমে যাওয়ার অনেক কারণ আছে (আরেফিন : ১৯৯৪ দ্রষ্টব্য)। অতীতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে এই সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অভাবগ্রস্ত এবং বিরোধপূর্ণ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কেবল নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং নিজ সম্প্রদায়ের লোকের সহযোগিতা ছাড়াও কাল্পনিক আত্মীয়দের কাছ থেকেও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহায়তার প্রয়োজন হতো। বর্তমানে গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় এবং গ্রামের বাইরে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। আগে গ্রামের বাইরে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক কম ছিল, ফলে গ্রামের বাইরে থেকে নানা রকম সমর্থনের জন্য এ ধরনের অতিরিক্ত আত্মীয়ের প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে গ্রামের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের কারণে কাল্পনিক আত্মীয়তা সম্পর্কের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

৫.১.৭ সমাজ

হাড়িপাড়া মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ার রাখাইন গ্রামবাসীদের নিত্য দিনের আলাপ-আলোচনাকালে সমাজ নিয়ে কথা বলতে শোনা যায়। গ্রামবাসী সমাজ শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে। বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রাম গবেষণায় একই তথ্য পাওয়া যায়। যেমন আরেফিন (১৯৯৪) দেখিয়েছেন যে, শিমুলিয়া গ্রামবাসী প্রধানত দুটি পৃথক অর্থে সমাজ শব্দ ব্যবহার করে। যথা : (১) এলাকাভিত্তিক একক, (২) ধর্মীয় গোষ্ঠী ভিত্তিক একক। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন, কখনো কখনো বন্ধন বুঝাতে গ্রামবাসী সমাজ শব্দের ব্যবহার করে। তবে আমার গবেষণা এলাকায় রাখাইন গ্রামবাসীকে তিনটি পৃথক অর্থে সমাজ শব্দকে প্রয়োগ করতে দেখা যায়। যেমন :

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সমাজ হলো এলাকাভিত্তিক একক। অর্থাৎ এক পাড়া থেকে অন্য পাড়াকে আলাদা করার ক্ষেত্রে সমাজ শব্দ ব্যবহার করে থাকে। যেমন, তারা বলেন, তুলাতুলিপাড়ার সমাজে আমাদের লোক কম। একই তথ্য পাওয়া যায় আজিজের গবেষণায়। তাঁর মতে, "In most villages the social division on samaj coincides with the physical division of para which has a territorial boundary, i. e. para may form a samaj which 'is taken as the basic frame of reference for social activities'." (Aziz, 1979: 26)

(খ) জাতিগত গোষ্ঠী বোঝাতে সমাজ শব্দের ব্যবহার। অর্থাৎ আদিবাসীদের সাথে অ-আদিবাসী বাঙালিদের পার্থক্য বোঝাতে সমাজ শব্দের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন, তাদের বলতে শোনা যায়, রাখাইন সমাজে নারীরা সম্পত্তিতে পুরুষের সমান ভাগ পায়।

(গ) ধর্মীয় গোষ্ঠী বোঝাতে সমাজ শব্দের ব্যবহার। অর্থাৎ রাখাইনদের বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের সাথে মুসলমান বা হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে আচার-আচরণগত পার্থক্য বোঝাতে সমাজ শব্দটি ব্যবহার করে। যেমন, আলাপকালে তারা বলেন, আমাদের সমাজেও মৃতদেহ কবর দেওয়ার নিয়ম আছে। শান্তি রোজারিও-র দরিয়া গ্রাম গবেষণা থেকেও এই তথ্য পাওয়া যায় (Rozario, 2001: 46)।

সংস্কৃত শব্দ থেকে বাংলা 'সমাজ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ জনগণ বা সংগঠন। সমাজ বিভিন্নভাবে কাজ করে। সালিশ, দলাদলির উৎস, আবার কখনো অন্য একটি গ্রামের বিরুদ্ধে গ্রামকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সমাজ ভূমিকা রাখে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গবেষণা এলাকায় রাখাইনরা পাড়া বোঝাতে সর্বাধিক অর্থে সমাজ শব্দটিকে ব্যবহার করে। উল্লেখ্য রাখাইন আর্থ-সামাজিক জীবনে পাড়ার গুরুত্ব অপরিসীম (খান, ২০০৬; মজিদ, ১৯৯২)। যদিও পাড়ার পূর্বের কাঠামোর সাথে বর্তমানে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়, তবুও প্রতি ক্ষেত্রেই পাড়ার প্রভাবের ক্ষয়িষ্ণু চিহ্ন বহমান আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ হিসেবে পাড়া নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাখাইনরা পাড়াকে 'রোয়া' বলে। 'রোয়া' শব্দ আরাকানি ভাষা থেকে গৃহীত। একটি পাড়া একজন সরদারের নেতৃত্বে গঠিত হয়। এজন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাড়াগুলো প্রতিষ্ঠাকারী সরদারের নামে পরিচিত। পাড়াগুলো সাধারণত ছোট খাল বা নদীর তীরে গঠিত। যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা ও পানি ব্যবহার এবং পারিবারিক প্রয়োজনে মাছ ধরার সুযোগের কারণে নদী-তীরে পাড়া গড়ে তোলা হয়। পাড়া গঠনের পূর্বে জ্যোতিষীর সাহায্য নেয়া হয়। জ্যোতিশাস্ত্রের প্রতি গ্রামবাসীর প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে। বৌদ্ধবিহার, দেবতা গাছ, রিজার্ভ পুকুর, বিশ্রামাগার (জ্রাই) ও মাতবর– এগুলো প্রত্যেক পাড়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধবিহার ব্যতীত কোনো পাড়ার অবস্থান অকল্পনীয়। দৈনন্দিন উপাসনার প্রয়োজনে নির্মিত বৌদ্ধবিহারে বুদ্ধমূর্তি রাখা হয়। এই মূর্তিতে প্রতিদিন ফুল, আহার্য দ্রব্য ও পানীয় দ্রব্য দিয়ে নারী-পুরুষ পূজা করে। বৌদ্ধবিহারে ভিক্ষু বা শ্রমণ বাস করে। তবে বর্তমানে পাড়ায় লোকসংখ্যা কমে যাওয়া এবং আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক বৌদ্ধবিহারে ভিক্ষু নেই এবং কোনো কোনো বৌদ্ধবিহার পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। যেমন হাড়িপাড়া ও মধুপাড়ার বৌদ্ধ মন্দিরে বর্তমানে কোনো ভিক্ষু নেই। তবে তুলাতুলিপাড়ার বৌদ্ধ মন্দিরে ভিক্ষু আছে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের আয়োজনসহ এতদ্সংক্রান্ত সভা-সমিতি এখানেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রত্যেক পাড়ায় রিজার্ভ পুকুর আছে। এই পুকুরে নেমে হাত-পা ধোয়া কিংবা গোসল করা নিষিদ্ধ। পুকুরের পানি একটি পাত্রের দ্বারা উপরে তুলে সকল প্রকার কাজে ব্যবহার করা যায়। এই পুকুরের পানি অতীতে পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে গ্রামগুলোতে টিউবওয়েল ও ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপিত হওয়ায় সকলে পুকুরের পানির পরিবর্তে টিউবওয়েলের পানি পান করে।

প্রত্যেক পাড়ায় একটা দেবতা গাছ (ন্যা প্যা) আছে। পাড়া গঠনের পূর্বেই একটি নির্দিষ্ট গাছকে দেবতা গাছ হিসেবে ঠিক করে সকলে গাছটিকে প্রণাম করে প্রার্থনা করে। সাধারণত সুন্দর করনজা গাছকে (রেইন ট্রি) দেবতা গাছ হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়। বৈশাখ ও মাঘ মাসে পাড়ায় দেবতা গাছ পূজা করা হয়। এ-সময় পাড়ার সকল ঘর থেকে একজন করে দেবতা গাছের সামনে উপস্থিত হয়ে একত্রে হাতজোড় করে অধিক ফসল ফলন, রোগমুক্তি, গ্রামের উন্নতি প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা করে। পাড়ার একজন বয়স্ক ব্যক্তি বা মাতবর পূজা পরিচালনা করে। যৌথভাবে পূজা করার পাশাপাশি রাখাইনরা এককভাবে পূজা করে নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা দেবতাকে জানায়। দেবতা গাছ পূজার সময় মোরগ, ছাগল, কবুতর প্রভৃতি উপঢৌকন দেওয়া হয়।

অতীতে প্রত্যেক পাড়ায় একটি বিশ্রামাগার (জ্রাই) থাকতো। পথিকদের বিশ্রামের জন্য পাড়ার লোকেরা জ্রাইঘর তৈরি করে। তৃষ্ণা মেটানোর জন্য ঘরের একপাশে একটি মাচাঙয়ের উপর কলসি ভর্তি পানি থাকে। সাধারণত কুমারী মেয়েরা ঐ কলসিতে পানি ভর্তি করে। পথিক ইচ্ছে করলে এখানে রাত্রিযাপনও করতে পারে। দুপুরে ও অবসর মুহূর্তে পাড়ার যুবক-বৃদ্ধরা এই ঘরে বসে গল্প-গুজব ও তাস-পাশা খেলায় মেতে ওঠত। মাঝে মাঝে পাড়ার ঝগড়া-বিবাদ এখানে বসে মিটানো হতো। তবে কালের পরিক্রমায় বাস্তবতার কারণে এক সময় এসে এই জ্রাইঘরের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। কেননা অতীতে রাস্তা-ঘাট তেমন ভালো ছিল না। ছিল না যানবাহনের ব্যবস্থা। পথ ছিল বনে-জঙ্গলে ভরা দুর্গম-দুস্তর। জনবসতি ছিল পাতলা-বিরল। পায়ে হেঁটে মানুষকে জনশূন্য দুর্গম-দীর্ঘ পথ

Dhaka University Institutional Repository

অতিক্রম করতে হতো। স্বভাবতই তখন দূর-দূরান্তের মানুষের বিশ্রাম, নিরাপত্তার জন্য পথিমধ্যে নিরাপদ স্থানের ও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সুপেয় পানির প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে পরিবর্তিত ভৌগোলিক পরিবেশে এ-সবের প্রয়োজন পড়ে না। কেননা পূর্বোল্লিখিত চলকগুলোর কোনো অভাব বর্তমানে নেই। তাই বিশ্রামাগারের কোনো প্রয়োজন পড়ে না বিধায় বিশ্রামাগারের উপস্থিতিও চোখে পড়ে না। রাখাইন মহিলাদের প্রার্থনার জন্য আরো এক ধরনের জ্রাইঘর আছে। মহিলারা অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে বৌদ্ধবিহারে গিয়ে ভিক্ষুর কাছ থেকে অষ্টশীল গ্রহণ করে নিকটবর্তী জ্রাইঘরে ধ্যানে মগ্ন থাকে এবং বিকালে আবার অষ্টশীল গ্রহণ করে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যায়। অতীতে জ্রাইঘর ও বিশ্রামাগারের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। বর্তমানে এগুলো হয় পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা যায় নতুবা বিলীন হয়ে যাচ্ছে পরিলক্ষিত হয়।

গবেষণাধীন প্রতিটি গ্রামে দুটি শ্মশানের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। পাড়ার বৌদ্ধবিহার ও দেবতা গাছের বিপরীত দিকে এই শ্মশানের অবস্থান। এই দুটি শ্মশানের একটিতে পাড়ার লোককে সৎকার করা হয়, অন্যটিতে বহিরাগতদের সৎকার করা হয়। কেউ পাড়ার বাইরে মারা গেলে এবং কেউ আত্মহত্যা করলে তাদেরকে বহিরাগতদের জন্য বা অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট শ্মশানে দাহ করা হয়।

প্রত্যেক পাড়ার জন্য নেতা নির্বাচন করা হয়। নেতা 'মাতবর' (রো চু গ্রি) নামে পরিচিত। সাধারণত সম্মানিত, পরোপকারী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি মাতবর হয়ে থাকেন। তিনি আমৃত্যু মাতবর থাকেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে মাতবর নির্বাচিত হয়। কোনো ছেলে না থাকলে গ্রামবাসী নতুন করে মাতবর নির্বাচিত করে। মাতবর রাখাইন সমাজের একটি স্তম্ভ। তিনি পাড়ার সমস্যাবলি সরকারের গোচরীভূত করা এবং সরকারের বিভিন্ন নীতি স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার করার দ্বৈত ভূমিকা পালন করেন। সমাজের সদস্যরা যাতে সমাজের নিয়ম ভঙ্গ না করে সেদিকে মাতবরদের সবসময় দৃষ্টি দিতে হয়। নিয়মভঙ্গকারীদের ভৎসনা করা, তিরষ্কার করা, সতর্ক করা, ক্ষমা চাওয়ানো কিংবা শাস্তির ববস্থা করা হয়।

সেক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের সাথে রাখাইন সমাজের যথেষ্ট মিল আছে। হিন্দুদের কাছে সমাজ হলো বর্ণ ও জাতি ভিত্তিক কাউন্সিলের পরিচায়ক, যার দায়িত্ব হলো সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ (আরেফিন, ১৯৯৪: ৮০)। হিন্দু সমাজ জাতি-বর্ণের সদস্যদের নিয়ে গঠিত। তেমনি রাখাইন সমাজ রাখাইন গোত্রভুক্ত সদস্যদের নিয়ে গঠিত। মুসলমান সমাজের মতো অধি-আত্মীয়তা সম্পর্কের প্রতিফলন এখানে দেখা যায় না। তবে, সমাজের কার্যকারিতা এখন পূর্বের মতো নেই। এর মূল কারণ হলো শিক্ষার প্রসার, পেশাগত বিভিন্নতা, নগরায়নের প্রভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি,

Dhaka University Institutional Repository

প্রযুক্তির ব্যবহার, বাজার অর্থনীতির প্রভাব, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়া প্রভৃতি। পূর্বে সমাজের নেতাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করতে পারতো না। এখন নেতাদের কোনো সিদ্ধান্ত প্রশ্নাতীত নয়। তথাপি, এখনো সমাজ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। সমাজের নেতারা কেবল নিজেদের সমাজেরই নয় বরং দুটি সমাজের ভেতর কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা মেটাতে চেষ্টা করেন। আন্তঃসমাজ কোন্দল মেটানোর জন্য পার্শ্ববর্তী সমাজের নেতাদের নিয়েই গ্রামবাসী সালিশে বসে। বিশেষ করে যখন তারা জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং নিজস্ব সমাজ নেতারা এই পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। এই প্রক্রিয়ায়ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক করতে না পারলে তখন বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্রে আমি হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ার সামাজিক সংগঠন ও এর পরিবর্তনের দিকে নজর দিয়েছি। গ্রামগুলোতে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের রাখাইনরা বৃহত্তর বাঙালি সম্প্রদায় দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসবাস করছে, এর প্রভাব পড়ছে তাদের সামাজিক সংগঠনসমূহের উপর। রাখাইনরা তাদের নিজস্ব গোত্র, গোষ্ঠী, পরিবার, বিয়ে, জ্ঞাতিসম্পর্ক, কাল্পনিক আত্মীয়তার সম্পর্ক, সমাজ প্রভৃতি সামাজিক সংগঠন নিয়ে বসবাস কররেও এসবের বন্ধন সময় ও প্রয়োজনের বাস্তবতায় আদি বৈশিষ্ট্য লোপ পেয়ে ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে পড়ছে। দেখা গেছে যে, গোষ্ঠী ও কাল্পনিক আত্মীয়তার মতো বাঙালি সামাজিক সংগঠনের প্রভাবও তাদের সামাজিক সংগঠনে প্রভাব রেখেছে ও তাদের জীবনের উপর ক্রিয়াশীল। সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তিত অবস্থা তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে। সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে স্বার্থ বা লাভের চেয়ে আত্মীয়তার সম্পর্কই রাখাইনদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে মূল বিষয় হলেও সহজাতভাবে অপেক্ষাকৃত সংগঠিত আত্মীয়তার সংগঠন গ্রামগুলোতে ভূমিকা পালনে অনেক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। আর্থ-সামাজিক জীবনে এর সামগ্রিক প্রভাব নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

টিকা

১. হাড়িপাড়ার নিপু মাতবর (বয়স ৪৯) ও মহেন চিং মাতবর (বয়স ৫০)-এর সাথে আলাপ। স্থান : বালিয়াতলী লঞ্চঘাট সংলগ্ন আন্ধার মানিক নদীর পাড়। সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০টা। তারিখ : ১ জুন ২০১৮।

২. হাড়িপাড়ার মহেন চিং মাতবর (বয়স ৫০)-এর সাথে আলাপ। স্থান : বালিয়াতলী বাজার। সময় : বিকেল ৫.০০টা। তারিখ : ২ জুন ২০১৮।

গ্রন্থ নির্দেশ

Ahsan, S. (1993). *The Marmas of Bangladesh*, HRDP, BARC, Dhaka

Ali, A. (1989). *Santals of Bangladesh*, Institute of Social Rearch and Applied Anthropology, Midnapur, West Bengal

Aziz, K. M. A. (1979). *Kinship in Bangladesh*, ICDDRB, Dhaka

Bernot, L. (1953). "In the Chittagong Hill Tracts", in *Pakistan Quarterly*, (3), Karachi

Khan, A. M. (1999). *The Maghs A Buddist Community in Bangladesh*, UPL, Dhaka

Rozario, S. (2001). *Purity and Communal Boundaries,* UPL, Dhaka

Strauss, L. (1952). "Kinship System of Three Chittagong Hill Tribes", in *South Western Journal of Anthropology*, Spring, New York

Yeo, S. (1963). *His Life and Nations,* New York

আরেফিন, এইচ. কে. এস., (১৯৯৪), *শিমুলিয়া পরিবর্তনশীল কৃষি কাঠামো*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

খান, আবদুল মাবুদ, (২০০৬), *পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

গোস্বামী, কাননবিহারী, (১৪১৫), "আত্মীয়-কুটুম্ব : প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ২০ বর্ষ ৪ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা

চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, (১৪১৫), "জ্ঞাতি নাম", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, পূর্বোক্ত

চৌধুরী, আব্দুল হক, (১৯৯৫), "বৃহত্তর চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহের মঘ বা মারমা উপজাতি", *প্রবন্ধ বিচিত্রা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, (১৯৮৬), *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*, ২য় সংস্করণ ১ম মুদ্রণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৩ মার্চ ২০১৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান, (১৪১৫), "আত্মীয়-ব্যবস্থা : মেচ সমাজ", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বসু, রাজশেখর, (১৪১৬), *চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান*, নতুন সংস্করণ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বসু, রাজশ্রী, (১৪১৫), "জ্ঞাতি-কুটুম", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, পূর্বোক্ত

বেসেইন, পিয়েরে, (১৯৯৭), *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (২০১০), দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ভৌমিক, প্রবোধকুমার, (১৮৮৬), "আদিবাসী", দ্র. *ভারতকোষ*, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা

মজিদ, মুস্তাফা, (১৯৯২), *পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মজুমদার, বিমলেন্দু, (১৪১৫), "টোটো জনজাতির আর্থ-সামাজিক বিবর্তন", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাখাইন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন : তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণ

৬. সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজতত্ত্ব

পরিবর্তন শাশ্বত, পরিবর্তন চিরন্তন, পরিবর্তনই নিয়ম। মানবসমাজ সদা পরিবর্তনশীল। যদিও সকল সময়ে সকল সমাজে পরিবর্তনের গতি বা মাত্রা একরূপ নয়, তবে কখনও কোন মানবসমাজই থেমে থাকেনি। পরিবর্তনের গতি কখনও মন্থর, কখনও বা দ্রুত হয়েছে। কিন্তু কোন সমাজই কখনও সম্পূর্ণরূপে স্থবির ছিল না। তাই সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝতে গেলে সর্বাগ্রে সামাজিক পরিবর্তন কি তা জানা দরকার। সমাজবিজ্ঞানী মরিস গিন্সবার্গ (১৯৬৮) সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সামাজিক পরিবর্তন দুই প্রকার পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। প্রথমত, সামাজিক কাঠামো এবং তৎসম্পর্কিত কার্যাবলির পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, যে সব আদর্শ, মূল্যবোধ বা সামাজিক বিধি সামাজিক কাঠামোকে সংহত করে রাখে এবং এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, এদের পরিবর্তন। তিনি বলেন, যে সমস্ত পরিবর্তন সমাজ-কাঠামোর রূপান্তর ঘটায় সেগুলিই সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে পরিগণিত হয়। সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন অর্থাৎ সমাজের পরিধি, তার বিভিন্ন অংশের গঠন বা ভারসাম্য বা তার গঠনবিন্যাসের প্রকৃতির পরিবর্তন। এভাবে দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাসের পরিবর্তনও সামাজিক পরিবর্তনের ধারণার অন্তর্ভুক্ত। গিন্সবার্গ বলেন,

> "By social change I understand a change in social structure, e.g. the size of a society, the composition or balance of its parts or the type of its organisation… The term social change must also include changes in attitudes or beliefs, in so far as they sustain institutions and change with them."(Ginsberg , 1968: 129)

সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে,

> "By 'social change' is meant only such alterations as occure in social organization– that is, the structure and functions of society. Social change thus forms only a part of what is essentially a broader category called 'cultural

change'.The latter embraces all changes occurring in any branch of culture, including art, science, technology, philosophy, etc. as well as changes in the forms and rules of social organization." (Davis, 1949)

এই সামাজিক পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মতবাদের জন্ম দিয়েছেন। প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানীই সমাজ গবেষণার জন্য কোন-না-কোন মতবাদ অনুসরণ করেন। কেউ কেউ একাধিক মতবাদেরও আশ্রয় নিয়েছেন। সামাজিক পরিবর্তন বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা মতবাদ প্রদানকারীদের মধ্যে হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩), কার্ল মাক্স (১৮১৮-১৮৮৩), ম্যাক্স ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০), এমিল ডুর্খাইম (১৮৫৮-১৯১৭), ভি এফ ডি প্যারেটো (১৮৪৮-১৯২৩), ওয়াল্ট হুইটম্যান রস্টো (১৯১৬-২০০৩), এজি ফ্রাংক (১৯৬৯) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৬.১ সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বসমূহ

সামাজিক পরিবর্তন কেন ঘটে, কিভাবে ঘটে তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানে প্রচলিত নানারকম তত্ত্ব বা মতবাদসমূহকে নানাভাবে শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণের প্রধান মতবাদসমূহকে নিম্নোক্ত পাঁচটি শ্রেণিতেবিভক্ত করা যায়[১] :

সামাজিক-ঐতিহাসিক তত্ত্ব (Socio-historical theory)

(১) বিবর্তনবাদী তত্ত্ব(The evolutionaries theory) : অগাস্ট কোৎ, লুইস হেনরি মর্গান, হার্বার্ট স্পেন্সার, এমিল ডুর্খাইম প্রমুখ এ-মতবাদের প্রবক্তা।

(২) উত্থান এবং পতন তত্ত্ব (The rise and fall theory) : ইবনে খালদুন, আরনল্ড জে. টয়েনবি, পিট্রিওন এ. সরোকিন প্রমুখ এ-মতবাদের প্রবক্তা।

কাঠামোগত-ক্রিয়াবদী তত্ত্ব(Structural-functional theory)

কাঠামোগত ক্রিয়াবাদের মতবাদ দিয়েছেন ট্যালকট পারসন, হ্যারল্ড ফল্ডিং, নেইল স্মেলসার প্রমুখ।

দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব(Conflict theory)

(১) মার্ক্সীয় তত্ত্ব(Marxist theory) : প্রবক্তা কার্ল মার্ক্স।

(২) অ-মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব (Non-marxist conflict theory) : মূল প্রবক্তা রাল্ফ ডরেনড্রফ।

আধুনিকীকরণ তত্ত্ব (Modernization theory)

(১) The psychological approach to modernization : ইভার্ট ই. হ্যাগেন, ডেভিড সি ম্যাকক্ল্যান্ড-এর নাম এ-মতবাদে যুক্ত।

(২) The ideal typical index approach : এ জি ফ্রাঙ্ক, ডব্লিউ ডব্লিউ রস্টো প্রমুখ এ-তত্ত্বের প্রবক্তা।

(৩) The diffusionist approach : গুন্ডার ফ্রাঙ্ক প্রধান প্রবক্তা।

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (Dependency theory)

এ-মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে রাউল প্রেবিশ, আরঘিরি ইমানুয়েল, আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংক, সামির আমিন, ইমানুয়েল ওয়েলাস্টাইন, পল ব্যারেন, চেলসো ফুতার্দো, পল সুইজ ও সুনকেল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৬.১
সামাজিক পরিবর্তনের মতবাদসমূহ

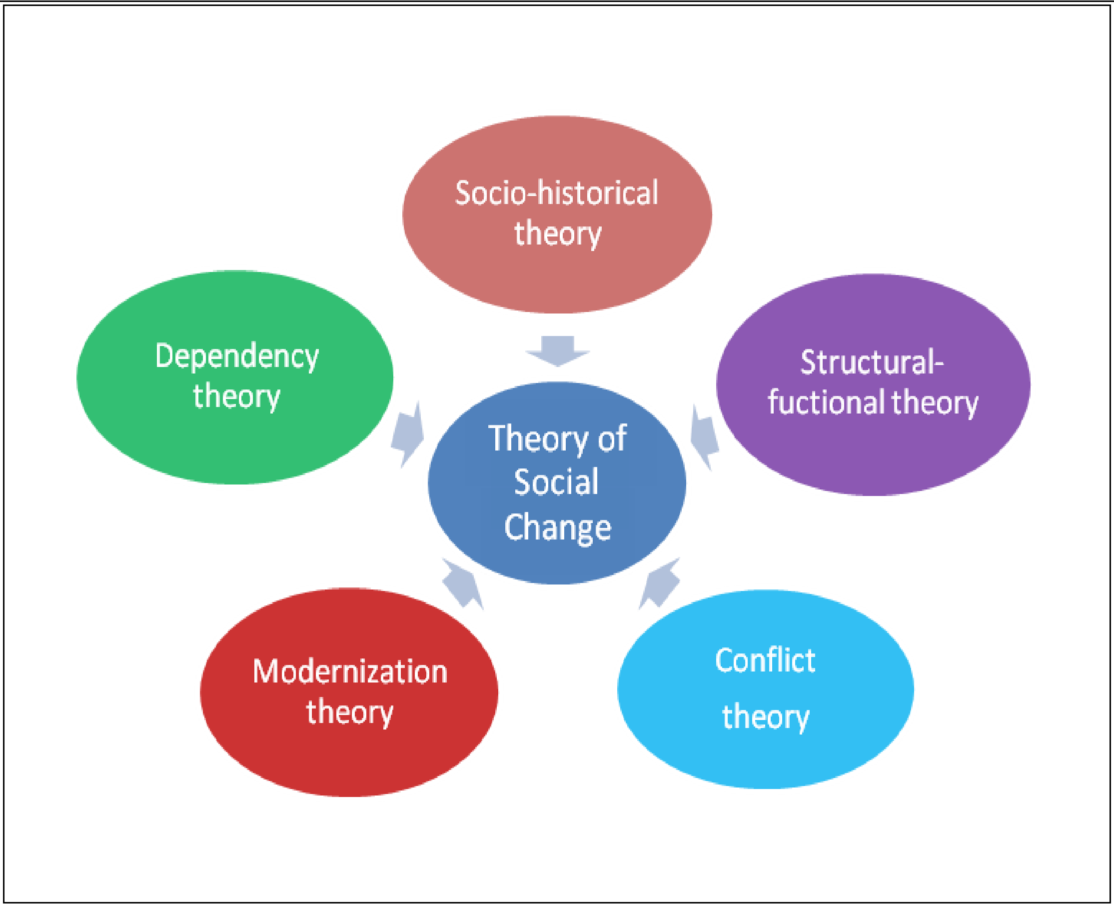

উৎস : গবেষক কর্তৃক প্রণীত

৬.২ রাখাইন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যে প্রশ্নটি প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে তা হলো এ-দেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দৃশ্যমান নয় কেন? কেন তাদের উন্নতির কোন লক্ষণ নেই? কেন তারা অনুন্নত? কেন উত্তরোত্তর তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটছে? রাখাইন আর্থ-সামাজিক ক্রমাবনমনের প্রেক্ষাপটে 'নির্ভরশীলতা তত্ত্ব'র নিরিখে বাংলাদেশে রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর বিশ্লেষণ করার প্রয়াসী হবো। কেননা সমাজ পরিবর্তন আলোচনায় রাখাইন সমাজের আর্থ-সামাজিক অনুন্নয়নের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করতে অনিবার্যভাবে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের দ্বারস্থ হতে হয় এইজন্য যে, নির্ভরশীলতা তত্ত্ব অনুন্নয়ন বিশ্লেষণ এবং অনুন্নয়নের কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ করে (Hout, 1995)।বিশ্বে বিরাজমান রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নত ও অনুন্নত প্রক্রিয়ার কারণ নির্দেশক হিসেবে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের জন্ম। মূলত আধুনিকীকরণ তত্ত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতবাদ হিসেবে নির্ভরশীলতা বা অনুন্নয়ন তত্ত্বের আবির্ভাব। সুতরাং নির্ভরশীলতা তত্ত্ব আলোচনায় যাওয়ার আগে আধুনিকীকরণ তত্ত্বের বক্তব্য জানা দরকার অর্থাৎ উন্নয়ন তত্ত্ব কি তা সংক্ষেপে জানা দরকার।

৬.২.১ আধুনিকীকরণ বা উন্নয়ন তত্ত্ব

উন্নয়ন সমাজবিজ্ঞানের সর্বপ্রথম স্কুল 'আধুনিকীকরণ তত্ত্ব'। এর তাত্ত্বিকদের মত হলো, সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে একটি স্থির নিয়মের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট স্তরসমূহের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া (কার্টার, ১৯৯৮: ২)। বস্তুত, বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে কতিপয় সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের কারণ বিশ্লেষণের জন্য যে বক্তব্য প্রদান করেন তা আধুনিকীকরণ তত্ত্ব নামে পরিচিত। ম্যাক্স ওয়েবার (১৯৫৮), রবার্ট কে. মার্টন (১৯৬১), ডেভিড সি. ম্যাকক্লেল্যান্ড (১৯৬৩), ইভারেট ই. হ্যাগেন (১৯৬৩), এ. জি. ফ্রাঙ্ক (১৯৬৯), ট্যালকট পারসন (১৯৫১), ডব্লিউ ডব্লিউ রস্টো (১৯৬০), এফ হসলিজ (১৯৬০) প্রমুখ আধুনিকীকরণ তত্ত্বের প্রবক্তা। উন্নয়ন তাত্ত্বিকদের মতানুসারে, তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের জন্য এসব দেশের আদি-প্রকৃতিই দায়ী। পাশ্চাত্যের রূপান্তর প্রক্রিয়ার অনুরূপ উপাদানসমূহ এসব দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল না বলেই আধুনিকীকরণ বা উন্নয়ন সাধিত হয়নি। এসব দেশের উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য উন্নয়ন প্রক্রিয়াই যথার্থ কৌশল বলে তারা মত ব্যক্ত করেন।

উন্নয়ন ধারণার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনায় দেখা যায়, অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন দার্শনিক ধারা বিভিন্নভাবে উন্নয়নের তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করে উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছে। মূলত,

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতির ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী উন্নয়ন একটা গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র একাডেমিক বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। আর তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় পঞ্চাশের দশকে। কারণ এর আগ পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন বলতেই ছিল ঔপনিবেশিক উন্নয়ন। তখন এসব দেশের অধিকাংশই ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত। ঔপনিবেশিক উন্নয়ন ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদী ইস্যু; তা কোনক্রমেই কলোনির উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ ছিল না। ১৯৫০-এর দশকে উপনিবেশিক শাসন থেকে বিভিন্ন দেশের মুক্তিলাভের পর আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপকভাবে উন্নয়ন গবেষণা শুরু হয়। আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশ নতুন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তারা সোচ্চার হয়। তাছাড়া স্নায়ুযুদ্ধকালীন মার্কিন ও সোভিয়েত ব্লক একে অপরকে অসুবিধায় ফেলতে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের সাথে তাদের সম্পর্ক নিবিড় করতে সচেষ্ট হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতবাদ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নির্দিষ্ট যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে পশ্চাৎপদ বা শিল্পে অনুন্নত সেসব দেশকে উন্নত, আধুনিক ও শিল্পায়িত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া দরকার তার দিক-নির্দেশনা প্রদান করাই ছিল এসব উন্নয়ন তত্ত্বের মূল বিষয়।

তবে, ঐতিহাসিকভাবে উন্নয়ন বা আধুনিকীকরণ ধারণার উদ্ভব হয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ইউরোপে। ম্যাক্স ওয়েবারের (১৯৫৮) মতে, মধ্যযুগের শেষভাগের স্বায়ত্তশাসিত নগর রাষ্ট্রগুলো, মধ্যযুগের বাণিজ্যিক অগ্রগতি এবং সর্বোপরি প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন পাশ্চাত্য জগতে আধুনিকীকরণ সূচনা করেছিল। মূলত সনাতন হতে আধুনিক সমাজে রূপান্তর প্রক্রিয়াকেই আধুনিকীকরণ বলে গণ্য করা হয়। সাধারণত কৃষিপ্রধান সমাজ সনাতন এবং শিল্পপ্রধান সমাজ আধুনিক সমাজ হিসেবে চিহ্নিত। উন্নয়ন তাত্ত্বিকদের মধ্যে অন্যতম মার্কিন অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ ওয়াল্ট হুইটম্যান রস্টো *The Stage of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*(১৯৬০) শীর্ষক গ্রন্থে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক স্তর তত্ত্ব উপস্থাপন করেন; যা মূলত সমাজ বিকাশের মার্কসীয় মৌলিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 'ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'র বিকল্প হিসেবে উপস্থাপিত হয়। রস্টো তত্ত্ব বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঁচটি স্তর চিহ্নিত করেন। যথা:(১) সনাতন সমাজ, (২) উড্ডয়নের পূর্বাবস্থা, (৩) উড্ডয়নকাল, (৪) পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রা, ও(৫) উচ্চ গণভোগের কাল। তাঁর মতে, যে সমাজ বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি তথা জনগণের উপভোগের চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে সে সমাজ উন্নত। তিনি সমাজের পরিবর্ধনশীলতাকেই সামগ্রিক উন্নয়নের ভিত্তি বলে গণ্য করেছেন। মোট জাতীয় উৎপাদন এবং

মাথাপিছু গড় আয়ের বৃদ্ধিই এক্ষেত্রে উন্নয়নের স্বীকৃতিসূচক। তাঁর মতে, কোন একটি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি যখন পঞ্চম স্তর উচ্চ গণভোগের কাল পর্যায়ে পৌঁছায় তখন সে রাষ্ট্রটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তখন অর্থনীতিতে মূর্ত হয়ে ওঠা পরিবর্তনসমূহ হলো : (ক) দেশের জনসাধারণের আয় বেড়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যাতে তারা মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে অন্যান্য ভোগ্যপণ্য (বিশেষত টেকসই পণ্য) এবং সেবা খাতের জন্য যথেষ্ট খরচ করতে পারে। (খ) শ্রমশক্তির কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন আসে, যারফলে একদিকে নগরভিত্তিক শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে, অন্যদিকে দক্ষ ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীল শ্রমিকের অংশও বাড়ে। (গ)আধুনিক প্রযুক্তি বিকাশের লক্ষ্য অতিক্রম করে সমাজ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার উপর। রস্টোর মতে, একটি অর্থনীতি যখন উচ্চ গণভোগের স্তরে পৌঁছে তখন ঐ অর্থনীতির নেতৃস্থানীয় খাতের ভূমিকা পালন করে টেকসই ভোগ্যপণ্যের শিল্প ও সেবা। ঐতিহাসিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র এ স্তরে পৌঁছায় ১৯২০ সালে, যুক্তরাজ্য ১৯৩০ সালে, জাপান ও জার্মানি ১৯৫০ সালে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন স্টালিনের মৃত্যুর পর (সোহরাওয়ার্দী, ২০১৩)।

আধুনিকীকরণ তত্ত্ব অনুসারে মৌলিক নীতিমালা হচ্ছে যে–(ক)পশ্চিমা উন্নত দেশগুলো উন্নয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের জন্য সেই একই পদ্ধতি গ্রহণ করা। আর এর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের সনাতন, প্রাক-শিল্পায়িত, কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রগতিশীল উত্তরণ ঘটবে যা তাকে পরিণত করবে আধুনিক, শিল্পায়িত ও সমৃদ্ধ দেশে। (খ) তৃতীয় বিশ্বের কেন্দ্রীয় সমস্যা হলো পুঁজির অভাব। রস্টোর মতে, তৃতীয় বিশ্বে অনেক ধরনের সম্পদ আছে যেগুলো থাকে অব্যবহৃত। কারণ উন্নয়নের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এসব দেশে অনুপস্থিত, যার জোগান দেওয়া সম্ভব হলে এসব দেশ দ্রুতগতিতে উন্নয়নের দিকে ধাবিত হবে। আর এই অনুপস্থিত উপাদান হলো পুঁজি। অন্য সম্পদ থাকলেও পুঁজির অভাবে তা কাজে লাগছে না। উল্লেখ্য, পুঁজি জোগানের এই তত্ত্ব বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কিত তত্ত্ব দাঁড় করানোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে (সরদার, ২০১২)।

মূলত মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপকে পুনর্বাসনের জন্য যে তহবিল জোগান দেওয়া হয় তার ধরনই পরবর্তীকালে বিদেশি সাহায্য নামে পরিচিতি লাভ করে। সময়ের আবর্তে এই বিদেশি সাহায্যকে একটা লাভজনক বিনিয়োগ ও তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিতে অতি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবহার করতে থাকে। ফলে বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নয়ন এ-দুয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মূল বক্তব্যটা হলো পুজিঁবাদী পশ্চিমা হচ্ছে উন্নত আদর্শ এবং তৃতীয় বিশ্ব মডেল হিসেবে এই পশ্চিমকে বিবেচনা করবে। এই

তত্ত্বের উন্নয়ন কাঠামোকে আধুনিকীকরণ প্যারাডাইম বলা হয়। এই প্যারাডাইমের মূলকথা হলো বৈদেশিক সাহায্য, বিশেষজ্ঞ ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে তৃতীয় বিশ্বকে সাহায্য করবে পশ্চিম এবং এর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্ব সেই প্রতিকৃতিতে অগ্রসর হবে। অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের প্রধান পথ হচ্ছে পুঁজিবাদী ইউরোপ বা আমেরিকার সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা। যতটা দক্ষতার সাথে এই অনুসরণ সম্পন্ন হবে ততবেশি উন্নয়ন সম্ভব হবে। বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে 'দুই ঘাটতি তত্ত্ব' অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বে দু'ধরনের ঘাটতি প্রকট: সঞ্চয়-বিনিয়োগ ঘাটতি ও আমদানি-রফতানি ঘাটতি। বলা হয় যে, তৃতীয় বিশ্বে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। ফলে এখানে একটা বড় ব্যবধান আছে। আরেকটি হচ্ছে আমদানির তুলনায় রফতানি কম। সুতরাং একটা বাণিজ্য ঘাটতি এখানে প্রকট থাকে। এক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্ব যদি বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে এ দুটি ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম হয় তাহলে সে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবে। এক্ষেত্রে সনাতন সমাজ কতগুলো পশ্চিমা আধুনিক পদক্ষেপ (ফ্যাক্টর) অনুসরণ করে আধুনিক সমাজে রূপান্তরিত হতে পারে, যেমন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক বিনিয়োগের ক্রমবর্ধনশীল হার ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই)।

কিন্তু ষাটের দশকে নব্য মার্কসবাদী নামে খ্যাত একদল সমাজবিজ্ঞানী এই আধুনিকীকরণ তত্ত্বকে অনুন্নয়নের উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ও নেতিবাচক বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে 'অনুন্নয়ন তত্ত্ব' বা 'অনুন্নয়ন ও নির্ভরতা তত্ত্ব' বা 'নির্ভরশীলতা তত্ত্ব' উপস্থাপন করেন। তারা পাশ্চাত্যের পুঁজি ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার করে অনুন্নত দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনার বিরোধিতা করেন। তাদের মতে, অনুন্নয়নের জন্য অনুন্নত দেশের আদি প্রকৃতি নয়, বরং উন্নয়ন এবং তদ্‌উপজাত নির্ভরশীলতাই দায়ী। বৈশ্বিক ধনতন্ত্রের শোষণব্যবস্থা নিহিত তার কাঠামোর মধ্যে, যা নির্ভরশীলতা তৈরি করেছে; এই প্রক্রিয়ায় 'মেট্রোপলিস' (ভূস্বামী) 'স্যাটেলাইট'কে (কৃষক) শোষণ করছে (Frank, 1969)। সমাজবিজ্ঞানে এই তত্ত্ব নির্ভরশীলতা তত্ত্ব নামে পরিচিত।

৬.২.২ নির্ভরশীলতা তত্ত্ব

উন্নয়ন সমাজবিজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান স্কুল হলো 'নির্ভরশীলতা তত্ত্ব'। নির্ভরশীলতা তত্ত্ব অনুসারে বিবর্তনবাদী অনুমান একেবারে অযৌক্তিক। অনুন্নয়ন উন্নয়নের পথ থেকে অনেক দূরবর্তী একটি স্তর, সম্পূর্ণরূপে একটি ভিন্ন অবস্থা যা কোন একটি অবস্থানে নিয়ে যায় না। সে অনুযায়ী এটি একটি প্রক্রিয়া নয়, একটি সম্পর্কমাত্র, এই অবস্থান অন্যের দ্বারা সৃষ্ট একটি ব্যবস্থা (কার্টার, ১৯৯৮:৩)।

Dhaka University Institutional Repository

আগেই বলা হয়েছে, উদারবাদী বা উন্নয়ন তাত্ত্বিকরা উন্নয়ন পদ্ধতির সূচনা হিসেবে সনাতন সমাজকে বিবেচনা করেন। তবে, নির্ভরশীলতা তত্ত্ব মতে প্রথম কথা হচ্ছে অনুন্নয়ন। আর অনুন্নয়ন এমন একটি অবস্থা, যা সকল দেশেই কোন না কোন সময় বিদ্যমান ছিল। বলা চলে সারাবিশ্বে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন জৈবিকভাবে সংযুক্ত, একটার সাথে আরেকটা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। আজকে ইউরোপ বা আমেরিকার প্রবৃদ্ধি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়ন একটা কারণ হিসেবে আমরা পাই। অর্থাৎ যে কারণে তৃতীয় বিশ্ব অনুন্নত ঠিক সে কারণেই প্রথম বিশ্ব উন্নত। এই পারস্পরিক সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে তাত্ত্বিকেরা ঔপনিবেশিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখান যে, ইউরোপের শিল্পবিপ্লব, আমরিকার শিল্পায়ন প্রভৃতির পেছনে তৃতীয় বিশ্ব থেকে সম্পদ সংগ্রহ-লুণ্ঠন গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। প্লান্টেশন অর্থনীতির সম্পদ ল্যাটিন আমেরিকা থেকে চলে গেছে আমেরিকা ও কানাডায়। অন্যদিকে, একথা সর্বজন বিদিত যে, ভারত-বাংলার সম্পদ ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের প্রধান উপাদান ছিল। আফ্রিকার ক্ষেত্রে শোষণ-লুণ্ঠন আরো বেশি পরিমাণে হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার নব্য-মার্কসবাদীরা আধুনিকীকরণ তত্ত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে একে অনুন্নয়নের উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ও নেতিবাচক বলে মত দেন। এঁদের মধ্যে আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংক, রাউল প্রেবিশ, আরঘিরি ইমানুয়েল, সামির আমিন, ইমানুয়েল ওয়েলার্স্টাইন, পল ব্যারেন, চেলসো ফুতার্দো, পল সুইজ, সুনকেল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাদের মতে, পাশ্চাত্যের পুঁজি ও প্রযুক্তির অন্তপ্রবাহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের স্ব-নির্ধারিত উন্নয়নের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করেছে এবং এসব দেশের অর্থনীতিকে অনুন্নয়নের প্রান্তে দাঁড় করিয়েছে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে গড়ে ওঠা নির্ভরশীল অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিণতিতে প্রান্ত (অনুন্নত বিশ্ব) থেকে কেন্দ্রে (উন্নত বিশ্ব) উদ্বৃত্ত মূল্যের স্থানান্তর হচ্ছে। অর্থাৎ নির্ভরশীলতা কাঠামোর কারণে পাশ্চাত্য কেবলই প্রাচ্যকে শোষণ করছে।

পল ব্যারেন, পল সুইজ, সামীর আমীন প্রমুখ এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বলেন যে, পুঁজিবাদী কেন্দ্র দেশগুলোর সাথে অনুন্নত দেশগুলোর ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এটি একটি মিথ। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে এর মাধ্যমে অনুন্নত দেশ একটা জাল বা ফাঁদের মধ্যে পতিত হচ্ছে। যার ফলে এসব দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা বিপর্যস্ত হয়েছে; অনুন্নয়ন ও ধ্বংসাত্মক অনুন্নয়ন স্থায়ী রূপ নিয়েছে। কেন্দ্র হচ্ছে এখানে পুঁজিবাদী পশ্চিম, যেগুলো এখন জি-এইট বা ওইসিডি-তে ঐক্যবদ্ধ। এই কেন্দ্রের অর্থনৈতিক নীতি ও চাহিদার উপর নির্ভর করে প্রান্তস্থ দেশগুলো বা তার চারিদিকে অবস্থিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর গতিপথ নির্ধারণ করে। তৃতীয় বিশ্বের ভবিষ্যৎ

কি হবে, কোন ধরনের বিনিয়োগ হবে তার অনেক কিছুই নির্ভর করে এই কেন্দ্র দেশগুলোর গতি-প্রকৃতির উপর (সীজার ২০১২)।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংক। তিনি ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত*Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে বলেন, অনুন্নত দেশসমূহের জন্য ক্রমবর্ধমান প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত এবং বিদেশি বিনিয়োগ তাদের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক শোষণ প্রক্রিয়ার রূপকে বোঝাতে গিয়ে ফ্রাঙ্ক দুটি প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন, যথা– 'মেট্রোপলিস' ও 'স্যাটেলাইট'। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক মেট্রোপলিটনগুলোর তুলনায় জাতীয় কেন্দ্রগুলো স্যাটেলাইট। আবার আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোর তুলনায় জাতীয় কেন্দ্রগুলো মেট্রোপলিস। এভাবে ছোট শহরের তুলনায় গ্রাম স্যাটেলাইট। মেট্রোপলিস ও স্যাটেলাইটের সম্পর্ক ধনতান্ত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত প্রত্যন্ত প্রান্ত পর্যন্ত শেকলের মতো বিস্তৃত। এ-সম্পর্ক কেবল ভৌগোলিক নয়, সামাজিক ও শ্রেণিগতও। সাধারণ কৃষকের তুলনায় ভূস্বামী মেট্রোপলিস। মেট্রোপলিস-স্যাটেলাইট সম্পর্কের সূত্র ধরে উদ্বৃত্তের বড় অংশ মেট্রোপলিস পেয়ে যায় এবং সংযোগসাধনকারীরা উদ্বৃত্তের অংশীদার হিসেবে এই শোষণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। এইজন্য ধনতান্ত্রিক বিশ্বের প্রান্তে প্রকৃত উন্নয়ন ব্যাহত হয় ও অনুন্নয়ন ঘটে। উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কিত এবং যুগপৎ প্রক্রিয়া। এক অংশের উন্নয়ন ঘটে অপর অংশের অনুন্নয়নের মূল্যে। স্যাটেলাইট অবস্থায় কিছু কিছু উন্নয়ন (লুমপেন উন্নয়ন) সম্ভব হলেও তা বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো, যা সমাজের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বিকশিত করে না। এই লুমপেন উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত লুমপেন বুর্জোয়া, যারা শ্রেণিগত স্বার্থে মেট্রোপলিটন কেন্দ্রগুলোর আজ্ঞাবাহী। তিনি মনে করেন, বিদ্যমান বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্যাটেলাইট দেশগুলোর সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। কারণ তারা নিজস্ব ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এরা কি উৎপাদন করবে, কিভাবে করবে, কার জন্য করবে ইত্যাদি জাতীয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটনের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। এরা মূলত কাঁচামাল উৎপাদন ও রফতানি-নির্ভরকারী। তাই মেট্রোপলিস-স্যাটেলাইট সম্পর্ক ছিন্ন না করতে পারলে কিংবা এই সম্পর্ক দুর্বল না হলে প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হবে না।

সনাতনী আধুনিকীকরণ তত্ত্বের প্রবক্তাগণ প্রাচ্যের জাগরণ তথা আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়নকে গণ্য করেছেন পাশ্চাত্যের রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রতিধ্বনি হিসেবে। তাঁদের মতে, প্রাচ্যের জাগরণ ও উন্নয়ন নিহিত রয়েছে ইউরোপীয় অনুপ্রবেশের ইতিহাসের অন্তস্থলে, অর্থাৎ প্রাচ্যের আর্থ-সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

বিকাশ পাশ্চাত্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবদর্শগত সংস্পর্শের ফলেই সংগঠিত হয়েছিল। উপনিবেশবাদ প্রাচ্যের উন্নয়নের মৌলিক কাঠামো বিনির্মাণের ক্ষেত্রে একটি প্রচণ্ড শক্তি হিসেবে কাজ করেছে বলে তাদের ধারণা। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সনাতন আধুনিকীকরণ তাত্ত্বিকগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে, যুগপৎভাবে প্রাচ্যসমাজের আধুনিক সমাজে রূপান্তর ও উন্নয়ন পাশ্চাত্য পুঁজি ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের 'নিউ ডিল' এই ধারণারই বহিঃপ্রকাশ। মূলত 'নিউ ডিল' চিন্তাধারা আধুনিকীকরণ তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে এমনভাবে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ে যার আবর্তের মধ্যে অনুন্নত বিশ্বের উন্নয়নের বিষয়ও বিবেচিত হতে থাকে। মূলত এই ধারণার উপর ভিত্তি করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত রাষ্ট্রের উন্নয়ন-প্রয়াস গ্রহণ করা হয়।

বিশ্ব ব্যাংকসহ পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রিত অর্থ সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাগণ এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন সাধনে তৎপর হন। এরমধ্য দিয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বের কয়েকটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন দারুণ সাফল্য বয়ে আনে। পাশ্চাত্যের পুঁজি ও প্রযুক্তি ব্যাপক ব্যবহার করে সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশ বিস্ময়কর সফলতা লাভ করে। এই দেশগুলোতে মার্কিন, ব্রিটিশ ও জাপানি পুঁজি ব্যাপক হারে প্রবেশ করে। ফলে মূলধন সংকটের নিরসন হয়। এদের উন্নয়নে বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তি ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। কিন্তু গড়ে ওঠে এক ধরনের নির্ভরশীল ধনতান্ত্রিক কাঠামো যেখানে দীর্ঘস্থায়ী ও পর্যায়ক্রমিক উন্নতি সাধন বাধার সম্মুখীন হয়। যেজন্য দক্ষিণ কোরিয়া ষাট ও সত্তরের দশক জুড়ে মোট জাতীয় আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেও আশির দশকের শুরুতে ৫.৭ শতাংশ হারে কমে যায়। ব্রাজিলে বিদেশি সাহায্যের অন্তপ্রবাহে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্ধনশীলতা বাড়লেও স্থিতিশীল ও আত্মনির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ১৯৭৮ সালের হিসেব অনুযায়ী ব্রাজিলে মাথাপিছু আয় ১৫৭০ মার্কিন ডলার হলেও উপরের ১০ শতাংশ লোক ৫০.৫ শতাংশ ও নিচের ২০ শতাংশ লোক মাত্র ২ শতাংশ জাতীয় আয় ভোগ করে। অন্যদিকে সমগ্র অর্থনীতির ৪০ শতাংশ বিনিয়োগকারী বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর অধীনে ছিল। এভাবে পাশ্চাত্য নির্ভরতায় ব্রাজিলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন লাভ ব্যাহত হয়। ক্রমান্বয়ে এসব দেশে ঔপনিবেশিক শোষণ নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রশ্ন হলো– সেই ঔপনিবেশিক প্রবিষ্টতায় শোষণের নতুনরূপ কেমন ছিল? এর জবাবে বলা যায়, বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা নতুন রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পুঁজি ও প্রযুক্তির দরকার মর্মে মত প্রচার করে এবং উন্নয়নের নামে প্রচুর পুঁজি ও প্রযুক্তি নিয়ে এসব দেশে

হাজির হয়ে প্রকারান্তরে পরোক্ষ শোষণ শুরু করে। এই শোষণ উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতি, রাজনীতি, শাসন ব্যবস্থা, নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত।

নব্য উপনিবেশবাদের বিষয়ে জন গালটুং (১৯৭১) "A Structural Theory of Imperialism"শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন, উপনিবেশবাদ হলো বিভিন্ন জনপদের মধ্যে এক ধরনের আধিপত্যের সম্পর্ক। এই সম্পর্কে মৌল দুটি বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমত, এ সম্পর্কে প্রভাবশালী রাষ্ট্রের কেন্দ্র ও প্রান্তিক রাষ্ট্রের কেন্দ্র সমস্বার্থের ভিত্তিতে সৌহার্দ্যের এক সুষম বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যদিও প্রভাবশালী রাষ্ট্রের প্রান্ত ও প্রান্তিক রাষ্ট্রের প্রান্তের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তীব্র স্বার্থ-সংঘাত। তাঁর মতে, প্রভাবশালী রাষ্ট্র ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক তা মূলত পোষক-আশ্রিতের (Patron-client relationship) সম্পর্ক। দ্বিতীয়ত, এ-সম্পর্কে পরস্পর যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী রাষ্ট্রের কেন্দ্র ও প্রান্তিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রই একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। ফলে প্রান্তসীমার আদান-প্রদান বা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কোন সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয় না। এভাবে পাশ্চাত্যের পরম পরাক্রমশীল রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে দুর্বল নতুন রাষ্ট্রগুলোর যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা কেন্দ্র-প্রান্তের সম্পর্ক। গালটুংয়ের মতে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো বৈদেশিক বিনিয়োগের কাজ সম্পন্ন করে বৃহৎ ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক যুগের মতোই এসব দেশে বৈদেশিক মূলধনের সিংহভাগ বিনিয়োগ করা হয় পেট্রোলিয়াম গ্যাস ও খনিজদ্রব্য উৎপাদন খাতে। যাবতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো প্রণীত হয় এসব রফতানিযোগ্য দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে। উৎপাদন থেকে যে মুনফা অর্জিত হয় তারও বৃহদাংশ স্থানান্তরিত হয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে। সুতরাং অর্থনীতি শক্তিশালীকরণে যে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছে তা স্থানীয় অর্থনীতিকে সঞ্জীবিত করেনি। এরফলে এ-সব দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথও প্রশস্ত হয়নি। আবার শিল্পক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ করা হয় তা মূলত রফতানি প্রতিস্থাপনীয় হাল্কা শিল্পে, বিশেষ করে শেষ পর্যায়ে সংযোজনকারী শিল্প প্রচেষ্টায় নতুবা মধ্যম পর্যায়ের দ্রব্য উৎপাদনের জন্য; মূলধন উৎপাদন ক্ষেত্রে নয়। এরফলে এসব দেশে শ্রমপ্রধান শিল্পও গড়ে ওঠেনি। তদুপরি, এসব দেশের জন্য দ্বিপাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয় যাতে আন্তর্জাতিক বাজারের চলমান শোষণমূলক কাঠামো অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক বিনিয়োগ ক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং অর্থনৈতিক কাঠামোয় নির্ভরশীলতার বন্ধন আরো মজবুত ভিত্তি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

রাউল প্রেবিশ (১৯৫০, ১৯৫৯) *The economic develoment of Latin America and its principal problems*গ্রন্থ ও“Commercial policy in the underdeveloped countries”প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রতিকূল বাণিজ্য শর্তের মুখে অনুন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোতে প্রধানত কাঁচামাল রফতানি করে এবং ওইসব দেশ থেকে শিল্পপণ্য আমদানি করে। কিন্তু উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশে শিল্পপণ্য রফতানি করে ও ওইসব দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করে। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে পাশ্চাত্য বিশ্ব শিল্পপণ্যের মূল্য অধিক নির্ধারণ করলেও কাঁচামালের মূল্য কম ধার্য করে। ফলে এই মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুন্নত দেশগুলো শোষিত হচ্ছে। তাই পাশ্চাত্যের পুঁজির ব্যবহার সকল ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক নয়। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রযুক্তি অনুন্নত দেশের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কেননা উন্নত দেশের নিজস্ব প্রেক্ষাপট ও উপকরণ সংগঠনে গড়ে ওঠা প্রযুক্তির কৌশল অনুন্নত দেশে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে না। পাশ্চাত্যের আধুনিক ও জটিল প্রযুক্তি সমবায়ে সৃষ্ট আধুনিক অর্থনৈতিক সেক্টর অনুন্নত দেশের জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখতে সক্ষম নয়। কারণ যথা প্রকৃত প্রযুক্তির ব্যবহার না করে জটিল প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে অর্থনীতি দ্বৈত চরিত্র ধারণ করে ও অগ্রগতি ব্যাহত হয়। দেশজ প্রযুক্তির বিকাশ ও নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাউল প্রেবিশের মতে, বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান এক মৌলিক দ্বিভাজন। এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থিত কিছু দেশ উৎপাদন, বাজার, যোগাযোগ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। প্রান্তিক দেশগুলোর অর্থনীতি কাঠামোগতভাবে ভিন্ন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রান্ত কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রান্তের উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রমাণস্বরূপ মন্দা বা যুদ্ধজনিত আমদানি-রফতানি বাণিজ্য ব্যাহত হলেই ল্যাটিন আমেরিকায় শিল্পোন্নয়নের হার হঠাৎ বেড়ে যেতে দেখা গেছে।

ইমানুয়েল ওয়েলার্স্টাইন (১৯৭৯) *The Capitalist World-economy*গ্রন্থে বলেন, উন্নত ধনতান্ত্রিক বিশ্ব অপেক্ষাকৃত অগ্রসর অনুন্নত দেশে (সেমি পেরিফারি) প্রযুক্তি রফতানির মাধ্যমে তাদের বাজার সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া টিকিয়ে রাখে। ফলে অনুন্নত বিশ্বে উন্নত প্রযুক্তির অন্তপ্রবাহ দীর্ঘ মেয়াদি শোষণ তথা নির্ভরশীলতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে তোলে। তিনি ‘অসম বিনিময় তত্ত্ব’ আলোচনায় ‘অসম মজুরি তত্ত্ব’ প্রসঙ্গে বলেন, মজুরির অসমতা প্রান্তের নির্ভরশীলতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মজুরি কাঠামোর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। অসম মজুরির ফলেই বহুজাতিক কোম্পানিগুলো অনায়াসে উন্নয়নশীল দেশে প্রতিষ্ঠা পায়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একতরফা নীতি, ভিন্ন মজুরি কাঠামো, এক দেশে উৎপাদিত পণ্য অন্য দেশের

Dhaka University Institutional Repository

লেভেল এঁটে বিক্রি, প্রান্তিক দেশগুলোকে বাজারে পরিণতকরণ, সর্বোপরি ওইসব দেশের শিল্প ধ্বংসের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

সুনক্যাল (১৯৭৯) ক্রমবর্ধমান হারে বিদেশি ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ল্যাটিন আমেরিকার নির্ভরশীলতার মূল চারটি প্রক্রিয়া চিহ্নিত করেন। যেমন : ১. কৃষিজাত পণ্যের রফতানি হ্রাস এবং খাদ্য আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধিজাত কৃষির অবনতি। ২. রফতানি দ্রব্যের মধ্যে কৃষিজাত পণ্যের কেন্দ্রিভবন।৩. শিল্পায়নে বিদেশি মুদ্রালগ্নীর উঁচু হার এবং শিল্পে বিদেশি মালিকানার প্রাধান্য। ৪. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি এবং খনিখাতে স্বল্প উৎপাদনের ফলে রাজস্ব ঘাটতি। তাঁর মতে, উন্নয়ন, অনুন্নয়ন, নির্ভরশীলতা, প্রান্তিকতা ও উন্নয়নের ভৌগোলিক বিষমতা পরস্পর সম্পৃক্ত। ধনতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে ঐতিহাসিক উন্নয়ন ধারার মধ্যে যে মেরুকরণ ঘটেছে তার পরিণামে কিছু দেশ অধিক উন্নত, শিল্পায়িত ও ধনী হয়েছে। বিপরীতে রয়েছে অনুন্নত দরিদ্র প্রান্তিক দেশগুলো। বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিস্তৃত থাকায় অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যকার গতিশীল উন্নত সেক্টরের উঁচু আয়ের শ্রেণিগুলো নিশ্চল জীবননির্বাহী সাবসিসটেন্স সেক্টরের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শোষণ করে। উঁচু আয়ের শ্রেণিগুলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে যুক্ত এবং স্থানীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন। তাতে সমাজের অন্যান্য শ্রেণিগুলো পরিণত হয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে। ফলস্বরূপ ধনতন্ত্রের আন্তর্জাতিক সংহতি ও জাতীয় বিভাজনের মুখে পড়ে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতি গতিময় হতে পারে না; উন্নয়নের সাথে এগুতে পারে না। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে ভারতের ভূমিকা ছিল ইংল্যান্ডের ধনতান্ত্রিক বিকাশের জন্য সম্পদ সরবরাহ করা এবং তার প্রস্তুতপণ্য ক্রয় করা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথম দিকে ভারত থেকে সম্পদ আহরণের প্রধান রূপ ছিল লুণ্ঠন। অবাধ বাণিজ্যনীতি, বৈষম্যমূলক শুল্কনীতি, বাণিজ্যপ্রভুত্ব ইত্যাদি কারণে ভারত মূলত কাঁচামাল প্রস্তুত এলাকায় পরিণত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে ইংল্যান্ডের গুরুত্ব কমতে থাকে ও শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তিরিশ দশকের শেষের দিকে বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থাগুলো ভারতে অনুপ্রবেশ শুরু করে। তখন স্থানীয় বুর্জোয়াদের স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। শুরু হয় নির্ভরশীল ধনতন্ত্রের যুগ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি সমাজকাঠামোকে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে রাষ্ট্রক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে সামন্ত শ্রেণির সাথে আঁতাত করে পশ্চাৎপদ কৃষিব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। কৃষি উদ্বৃত্ত থেকে শিল্পায়নের সম্ভাবনা কমে যায়। (সরদার, ২০১২; ভূইয়া, ১৯৯৪: ৬০-৬১)

হামজা আলাভি (১৯৭৫) "India and the Colonial Mode of Production"এবং"*The Colonial Transformation in India* " প্রবন্ধদ্বয়ে ঔপনিবেশিক সমাজকাঠামো নিয়ে আলোচনা করেন। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভরশীলতার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ ছিল পদানত। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় পুঁজি আর ইংল্যান্ডে পাচার হয়নি। এই পুঁজি ভারতীয় সমাজে ব্যবহৃত হতে শুরু করে, আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়ে সংযোগিতা করতে থাকে। কেননা বহুজাতিকদের সাথে প্রতিযোগিতা করা ভারতের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি প্রথমে ১৯৭৫ সালে ভারতে ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন আশা করেও দেশীয় বুর্জোয়ারা আন্তর্জাতিক বাজারে পুঁজিলগ্নী শুরু করলে ১৯৭৮ সালে এসে মত পরিবর্তন করেন। তাঁর মতে, যেহেতু ভারতের পক্ষে স্বতন্ত্র বাজার সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয় তাই অধঃস্তন হিসেবেই থাকতে হবে। ভারতীয় পুঁজি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। যেজন্য ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে ভারতের পক্ষেও সত্যিকার জাতীয় উন্নয়ন অর্জন সম্ভন নয় যার দরুন জনগণের দারিদ্র্য দূর হবে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায়, নির্ভরশীল তাত্ত্বিকদের মতানুযায়ী, উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর বিপুল পুঁজি ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সুষ্টি করে। উন্নয়নের নাম করে মূলত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো ব্যাপক মুনাফা অর্জন করে। এর ফলস্বরূপ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নয়নের দিকে ধাবিত না হয়ে বরং অবোন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়। এই ব্যবস্থা যতদিন চালু থাকবে ততদিন পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে দারিদ্র্যের অবসান ঘটিয়ে জীবনমান উন্নত করা সম্ভবপর হবে না।

৬.২.২.১ নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ও বাংলাদেশ

নির্ভরশীলতা ও উপনিবেশবাদের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। ঐতিহাসিক মাইকেল ডইলি (১৯৮৬ : ৪৫) বলেন, '...relationship…in which one state controls the effective political sovereignty of another political society. It can be achieved by force (or) by economic, social or cultural dependence.'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে ভারত উপমহাদেশে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের ব্যাপ্তি ঘটে। ফরাসি ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য সম্পর্ক এবং পরবর্তীকালে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কোম্পানি আমলে কর, নিম্নমানের পণ্য ক্রয়, সস্তায় উৎপাদিত পণ্য

Dhaka University Institutional Repository

অধিক মুনাফায় বিক্রির মাধ্যমে সম্পদ অপসারিত হয়। ঔপনিবেশিক আমলে স্বাধীন বাণিজ্য নীতির আড়ালে স্বল্পমূল্যে কাঁচামাল স্থানান্তর, বেশিমূল্যে শিল্পপণ্য বিক্রি ও গণপূর্ত কাজের ফলশ্রুতিতে সাধিত আর্থিক ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে সুদ হিসেবে বিদেশি মুদ্রার বহির্গমন ঘটে। তাতে ভারতের, বিশেষ করে, বাংলাদেশ অঞ্চলে অর্থনৈতিক উজ্জীবনের সম্ভাবনা বাধাগ্রস্ত হয়।

ব্রিটিশ শাসন তৎকালীন ভারতীয় সমাজের মৌলিক কাঠামোতে পরিবর্তন সাধন করে। মুগল আমলে বাংলায় যে রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল, ব্রিটিশ আমলে তার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত নানান বন্দোবস্তে কৃষক সর্বস্বান্ত হয়, কিন্তু কৃষির উন্নতি হয়নি। সুনীল সেন (১৯৮৫: ৬-৭) দেখিয়েছেন, দু হাজারেরও বেশি সময় ধরে লক্ষ লক্ষ লোক যেসমস্ত অধিকার ভোগ করছিল, ব্রিটিশদের নানান বন্দোবস্তের ফলে তারা তা থেকে বঞ্চিত হয়। সনাতন জমিদারের হাত থেকে জমি ও গ্রামসমূহ জমির দালাল, আইন ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের দখলে চলে যেতে থাকে– এরা ছোট বড় জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এভাবে যতবারই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে ততবারই কৃষককূল ও গ্রামসম্প্রদায় কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (মোহাম্মদ, ১৯৯৯: ২৬)। অন্যদিকে চলতে থাকে সম্পদ পাচার।

বাংলাদেশ থেকে সম্পদ পাচার শুরু অনেক আগে থেকে। উল্লেখ্য, বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদ কালে কালে বিদেশিদের আকৃষ্ট করেছে। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খ্যাতি সুপ্রাচীন কাল থেকে। এ-সম্পর্কে হান্টার (১৯৪৮) বলেন, বাংলা সুজলা সুফলা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা অত্যন্ত মনোরম আবহাওয়া সমৃদ্ধ। বেভারেজের মতে, পাহাড় ও উপত্যকা; জংগল ও নদী এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই দেশটি ভূতত্ত্ববিদ ও সৌন্দর্যবিলাসী উভয়ের কাছেই আকর্ষণীয়। তবে পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজরা সম্পদ পাচার শুরু করে উলঙ্গভাবে। এত নিষ্ঠুর ও বিপুল সম্পদ আহরণ ও পাচার এর আগে কখনো ঘটেনি। ক্লাইভ কাউন্সিলের সদস্য এল. স্ক্রাফট ঘোষণা করেন যে, ভারত থেকে আহরিত সম্পদে কয়েকবছর বাণিজ্য সম্ভব। তিনি বলেন–

> "These glorious successes have brought nearly three millions of money of the nation (Britain);...the whole immense sums received from the Soubah (Bengal) finally centres in England. So great a proportion of it fell into the company's hands,…that they have been enabled to carry on the whole trade of India for three years together, without sending out one ounce of bullion." (উদ্ধৃতঃ Sen, 1962: 51)

ব্রিটিশ সরকারের অতিরিক্ত শোষণ ও লুটতরাজের ফলে বাংলাসহ সারা ভারতবর্ষে বহুবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ছোটখাটো বাদে ভারতে ২২টি ও বাংলায় ৭টি বড়ধরনের দুর্ভিক্ষ হয়। পলাশির যুদ্ধের ১৩ বছরের মাথায় ১১৭৬ সনে (১৭৬৯-৭০ সালে শীতকালে) সংঘটিত হয় বিখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। রেভারেন্ড তাঁর *দি গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ইটস লোকালিটিজ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বাংলায় প্রত্যেক দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ইংরেজ শোষণ ও লুটতরাজের নীতি এবং ভূমিরাজস্বের সম্পর্ক (মোহাম্মদ, ১৯৯৯:২৬)। হান্টার (১৯৪৮) বলেন, ১৭৬৯ সালের শীতকালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে যে ক্ষতি হয়, পরবর্তী দুই পুরুষকালেও তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয়নি। জনসংখ্যার তিনভাগের একভাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানে বহুজাতিক কর্পোরেশন ও কার্টেলসমূহ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভ করলে উৎপাদন ও মূল্য নির্ধারণ কর্তৃত্ব পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলোর হাতে চলে যায় এবং উদ্বৃত্ত অপসারণ অব্যাহত থাকে। ষাটের দশকে অভ্যন্তরীণ পুঁজি সঞ্চয়নের পরিবর্তে পাশ্চাত্য পুঁজির উপর নির্ভরতা বাড়লে ঋণ ও সাহায্য হিসেবে ব্যাপক পুঁজি ও প্রযুক্তি পাকিস্তানে প্রবেশ করে। তখন নির্ভরতা মজবুত ভিত্তি লাভ করে। আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের পরিমণ্ডলে পাকিস্তান নির্ভরশীল ধনতন্ত্রে পর্যবসিত হয় এবং পাকিস্তানের আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিধিতে বাংলাদেশ তার শোষণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। পাকিস্তানের মেট্রোপলিটন এলিটরা কেবল বিদেশি ও স্থানীয় সম্পদ নয়, পাশাপাশি শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, বীমা, আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন– সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। শিল্প বিকাশের উদ্দীপক হিসেবে সঞ্চিত পুঁজির সিংহভাগের জোগানদার কৃষি নির্ভর পূর্ব পাকিস্তান হলেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সকল শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে এবং এ-সবের মালিকানা হস্তান্তরিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে। এক হিসেবে দেখা যায়, সরকারি এন্টারপ্রাইজের ১২%-এর সবই প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। মুসলিম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন ফার্ম ও সরকারি এন্টারপ্রাইজ মিলে ৬৮.৫%-এর একচেটিয়া মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। পূর্ব পাকিস্তান কাঁচা মাল উৎপাদনকারী ও পশ্চিম পাকিস্তানের বাজার হিসেবে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শোষিত হয়। আবার বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূল ভারসাম্য থাকা সত্ত্বেও আন্তঃআঞ্চলিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিকূল ভারসাম্যের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে আভ্যন্তরীণ নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করা হয়। (ভূঁইয়া, ১৯৯৪: ৬৮)

অতঃপর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান আমলের মতো আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী অনুরূপ শ্রেণির বিকাশ ঘটে যারা রাষ্ট্রের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশকে নির্ভরশীল কাঠামোয় আবদ্ধ করে। সেই প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতার পর বিতাড়িত পাকিস্তানি বুর্জোয়াদের পরিত্যক্ত সম্পদসহ দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অর্থনীতির সিংহভাগ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে শুরুতে বিদেশি পুঁজির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলেও সরকারের জাতীয়করণ কর্মসূচির ফলে পাটশিল্প, বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীণ জল-পরিবহনে বিদেশি পুঁজি সংকুচিত হয়ে পড়ে। বিদেশি পুঁজি ও বহুজাতিক কর্পোরেশন ক্রমশ ওষুধশিল্প, তামাক, অক্সিজেন, কিছু ভোগ্যপণ্য ও ব্যাংকশিল্পের অংশীদারিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। উপরন্তু, ঋণ ও সাহায্যের নামে বিপুল পরিমাণ পাশ্চাত্য পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ, সেই সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূলতাজনিত ভারসাম্যহীনতায় এ-দেশের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। চা, সিগারেট, সাবান, ঔষধ ও গার্মেন্টস শিল্পের মতো লাভজনক আধুনিক ও লাভজনক সেক্টরে বিদেশি পুঁজির কারণে মুনাফা হিসেবে প্রচুর অর্থ বিদেশে চলে যেতে শুরু করে। বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য হ্যারী ম্যাকডকের[২] মতানুসারে নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

৬.২.২.২নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ও রাখাইন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রাখাইন নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের তাত্ত্বিক আলোচনায় হামজা আলাভি (১৯৭২, ১৯৭৫) ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের প্রেক্ষাপটে নির্ভরশীলতার মতবাদে যেভাবে মার্কসীয় 'সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন তত্ত্ব' এবং নব্য সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটনকারী 'অনুন্নয়নের নব্য-মার্কসীয় তাত্ত্বিক'দের অবস্থানকে সুসমন্বিত করেছেন (ইসলাম, ২০১২) সেটাকেই আমি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মনে করছি। সে অনুসারে নিম্নে হামজা আলাভির মতবাদের আলোকে রাখাইন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হলো।

আলাভির বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো সমাজ কাঠামো ও উৎপাদন পদ্ধতি। তাঁর মতে, উন্নয়ন-অনুন্নয়ন সমাজকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত। উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজকাঠামোর চরিত্র নির্ধারিত হয়। সমাজে বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতি ক্রিয়াশীল থাকায় বিভিন্ন শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এভাবে রাষ্ট্র বা সমাজে ৩টি শ্রেণির প্রাধান্য দেখা যায়–মেট্রোপলিস বুর্জোয়া, দেশি বুর্জোয়া ও ভূমি স্বার্থ সংলগ্ন শ্রেণি। প্রাক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র এখানে স্বায়ত্তশাসিত ভূমিকা পালন করে। ফলে রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি ও আমলারা সমস্ত সুযোগ-

Dhaka University Institutional Repository

সুবিধা ভোগ করে (ভূঁইয়া, ১৯৯৪: ৫৬)। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র একটা নির্দিষ্ট চরিত্র ধারণ করে। অর্থাৎ সমাজে অর্থনীতি, রাজনীতি, মতাদর্শের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ প্রভাব কাজ করে। যে অর্থে শিল্প বিপ্লব ও ধনতন্ত্রের বিকাশ সাধিত হয়েছে, ভারতবর্ষে সে অর্থে তা বিকশিত হয়নি। বরং কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির বদলে অবনতি হয়েছে। মূলত উৎপাদন চরিত্রই এজন্য দায়ি। কলোনিকালীন ও কলোনি-উত্তর উৎপাদন চরিত্র পর্যবেক্ষণ করলে তা বোঝা যায়। ভারত যখন সরাসরি ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল তখন কংগ্রেসের মধ্যে দুটি প্রভাব বিস্তারকারী শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল– দেশি বুর্জোয়া ও বিদেশি সামন্তবাদী বুর্জোয়া। এরা শিল্প-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করতো নিজেদের স্বার্থ অটুট রেখে। ফলে ব্রিটেনে যে ভারি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে ভারতে তা হয়নি। ভারতে হয়েছে অধঃস্তন প্রকৃতির হালকা শিল্পকারখানা। কৃষির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির জন্য সার, বিজ, ট্রাক্টর ইত্যাদি ছোট কৃষকরা পেত না, ধনী কৃষকরা কুক্ষিগত করে। এক পর্যায়ে দরিদ্র কৃষকরা অধিকতর দারিদ্র্যের কবলে পড়ে একমাত্র সম্বল কৃষিজমিটুকু বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিরাট একটা শ্রেণি দরিদ্র হতে থাকে এবং অন্যদিকে ভূস্বামীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে নির্ভরশীলতা হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পায়। সেজন্য ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে ধনতন্ত্রে উন্নীত হয়েছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে তা হয়নি (ভূঁইয়া, ১৯৯৪: ৫৮)।

আলাভি প্রদত্ত ভারতের কৃষকের দরিদ্রতার বয়ান বাংলাদেশের রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক অনুন্নয়নের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য তার বিশ্লেষণই আমার মুখ্য বিষয়। গবেষণা এলাকার রাখাইনরা ব্রিটিশ শাসনামলে আঠারো শতকের আশির দশকে আরাকান থেকে অভিবাসিত হয়ে বঙ্গদেশে এসেতৎকালীন বাকেরগঞ্জের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় বসতি করে। ব্রিটিশ শাসনামলেই রাখাইন নৃগোষ্ঠীর সমাজজীবন নানাভাবে নানাদিক দিয়ে পরিবর্তিত হতে শুরু হয়। এই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত আছে। পরিবর্তনে যেমন রয়েছে ব্যাপকতা, তেমনি রয়েছে বৈচিত্র্যতা। কোন কোন পরিবর্তন প্রায় প্রচ্ছন্নভাবে অগোচরে ঘটেছে এবং ধীরে ধীরে এ-ধরনের পরিবর্তনের পূর্ণ আকার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনের মুখে রাখাইন সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটেছে। রখাইন সমাজের অনুন্নয়নের বিস্তার ঘটে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শাসনামলে। পরবর্তীকালে ১৯৪৭-এর ভারত বিভক্তি-উত্তর পাকিস্তান রাষ্ট্রের যাত্রার পর থেকে আর্থ-সামাজিক অধঃগতি বেগবান হয় এবং ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর মারাত্মক পরিণতি লাভ করতে শুরু করে।

প্রশ্ন হলো– ভারতীয় বাঙালি গ্রামীণ কৃষি সমাজের সঙ্গে রাখাইন নৃগোষ্ঠীর গ্রামীণ সমাজের কোন মিল ছিল কিনা? কেননা আমরা জানি, আদিবাসী সমাজের রয়েছে নিজস্ব জীবনপদ্ধতি। ভারতবর্ষের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার কয়েকটি ধরন ছিল। যেমন সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিম ভারতবর্ষের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে মোট চারভগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো হলো :১. The Northern Indian or the Aryan type, ২. The Daccan type, ৩. The Bengal type, ৪. The tribal type (Karim, 1986: 3)। একথা অনস্বীকার্য যে রাখাইনরা নিজস্ব স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতি ধারণ ও লালন করে। তবে রাখাইনরা সমুদ্র উপকূলবর্তী তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার জঙ্গল এলাকায় বসতি গড়ে তুললেও তা পলল গঠিত উর্বর সমভূমি অঞ্চল; পাহাড়ি অঞ্চল নয়। আর নৃগোষ্ঠী মাত্রই কৃষিজীবী। তবে রাখাইনদের নিজস্ব কৃষিব্যবস্থার প্রমাণ তার সংস্কৃতির নানান উপাদানে মিশে আছে। রাখাইনরা যে কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী তার প্রমাণ তাদের ভাষা, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে পাওয়া যায়। বার্মা থেকে বিতাড়িত হয়ে বঙ্গদেশে আসার পর জঙ্গল থেকে তাদের জীবনযাত্রার রসদ সংগ্রহ করতো। কিন্তু আসার সময়ে তারা চাষ-আবাদের স্পৃহা ও পারদর্শিতা সঙ্গে নিয়ে আসে। তাদের নিজস্ব ফসল, নিজস্ব সাজ-সরঞ্জাম, আবাদের নিজস্ব পদ্ধতি এবং পল্লি জীবন সম্পর্কে নিজস্ব শব্দসম্ভার ছিল। যেমন সাধারণত বাংলা ভাষায় যাকে *ধান* (Paddy) বলা হয়, রাখাইন ভাষায় তাকে বলা হয় *চব্যা*। বিজ ধানকে বাংলা ভাষায় বিজ, রাখাইন ভাষায় বলে *পিয়ো*। তেমনি ধান চাষের প্রত্যেক পর্যায়ে রাখাইনরা ভিন্নধর্মী একটি করে উৎসব পালন করে। সুতরাং রাখাইন গ্রামগুলোও কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজ। আর করিম ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় ট্রাইবাল টাইপ পৃথক করেছেন মূলত পাহাড়ি আদিবাসীদের জন্য। কেননা, পাহাড়ে জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন করা হয়নি। পক্ষান্তরে, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ব্যক্তি মালিকানায় জমি প্রদান করা হয়।

সেদিক থেকে সার্বিক বিবেচনায় ব্রিটিশামলে কৃষিভিত্তিক রাখাইন সমাজকে বাংলার অন্যান্য গ্রামের মতো চার্লস ম্যাটকাফের ভাষায় 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র সদৃশ' বলা যায়; যাকে ইরফান হাবিব 'স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরিস্থিতি' (করিম, ২০০৮) বলেছেন। এমনকি হাবিবের মতে, ছোট শহরগুলি এক একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছাড়া অন্য কিছু নয় (সেন, ১৯৯৭: ৩৯)। এটা ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় গ্রাম সম্পর্কে অধিকাংশ প্রাচ্য বিশারদ যেমন উইকস (১৭৯৯), ক্যামবেল, মেটক্যাফ, র‍্যাফ্লিস প্রমুখ অভিন্ন মত পোষণ করেন। মার্কস-এঙ্গেলস এঁদের সমর্থন করেন। স্যার থমাস স্টামফোর্ড র‍্যাফ্লিস ভারতীয় গ্রাম সম্পর্কে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> "…the inhabitants have lived from time immemorial. The boundaries of the villages have seldom alteed; and though the villages themselves have been sometimes injured, and evendislocated… by war, famine and disease, the same limits, the same interests, and even the same families, have continued for ages. The inhabitants give themselves no trouble about the breaking up and division of Kingdoms;...its internal economy remains unchanged." (উদ্ধৃত: Krader, 1975: 67)

মূলত, বঙ্গদেশে গ্রামীণজীবনের সূচনা সেই আদিকালে– অস্ট্রিকরাই প্রথম গ্রামীণসমাজের পথে যাত্রা শুরু করে। এ সম্পর্কে রংগলাল সেন বলেন, বাংলাদেশ বারিবহুল, নদীমাতৃক ও সমতল প্রধান অঞ্চল বিধায় উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার অনেক আগেই কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির প্রচলন ঘটে। বাঙালির আদি পুরুষ অস্ট্রিকরা কৃষিপ্রধান ও গ্রামীণ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। বস্তুত, ট্রাইব ভেঙে কালক্রমে পরিবার ও গ্রামের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ শতকের প্রথম দশকে 'ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার'-এ তিন দশক আগের বিভারলি-এর বক্তব্যের পুনরুক্তি করে বলা হয়, "বাংলা স্পষ্টতই একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং তথাকথিত অনেক শহরই কেবল বর্ধিষ্ণু গ্রাম।" (সেন, ১৯৮৫: ১৮, ৭০)

আলাভির মতানুসারে বলা যেতে পারে, ব্রিটিশ শাসনকালের শেষের দিকে রাখাইন গ্রামীণ কাঠামোর পরিবর্তন শুরু হয়। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় কর আরোপ ও আদায়, সস্তা শ্রমের ভিত্তিতে উৎপাদন, কুটির শিল্পের পৃষ্টপোষকতাহীনতা, স্বল্পমূল্যে কাঁচামাল স্থানান্তর, অধিকমূল্যে শিল্পপণ্য বিক্রি ইত্যাদি কারণে সাধিত আর্থিক ক্ষতি রাখাইন গ্রামগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভাবনা ব্যাহত করে। এ-সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস (১৮৯৩)-এর বক্তব্যে সমর্থন পাওয়া যায়। 'কমুনিস্ট পার্টির ইস্তেহার'-এ ক্ল্যাসিকাল ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁরা বলেন, "গ্রামাঞ্চলকে এরা যেমন শহর মুখাপেক্ষী করে তুলেছে, ঠিক তেমনি বর্বর বা অর্ধ-বর্বর জাতিগুলোকে বুর্জোয়া প্রধান জাতির এবং পূর্বাঞ্চলকে পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল করেছে।" এই র্নিভরশীলতা প্রকৃত উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেনান তাঁদের মতে, উৎপাদনের উপাদানকে এরা কেন্দ্রীভূত করেছে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পত্তি জড়ো করেছে।

বাংলার গ্রামীণ সমাজকাঠামোর পরিবর্তনে ব্রিটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটি সূচকস্তম্ভ স্বরূপ। ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও পরবর্তীকালে আনুষঙ্গিক পত্তনি প্রথা সৃষ্ট যে জোতদার শ্রেণি উনিশ শতকের বাংলায় সমাজ কাঠামোয় একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয় তাকে অনেক ঐতিহাসিকই বাংলার ব্রিটিশ শাসক এলিট বর্গের প্রধান অবলম্বন ও গ্রাম বাংলার

অনুন্নয়নের অন্যতম সামাজিক কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। (সেন, ১৯৮৫: ৭৯) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে বাংলার কৃষকশ্রেণি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা এর আগে জমিদার আমলেও দেখা যায়নি। এই দুরবস্থা ১৮৫৯ সালের রাজস্ব অধ্যাদেশ ও ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব অধ্যাদেশ জারির পূর্ব পর্যন্ত কমবেশি চলতে থাকে। তবে এই দুটো আইন কৃষকদের খুববেশি নিরাপত্তা দিতে পারেনি। নানান অবস্থার মোকাবেলায় শেষ পর্যন্ত কৃষকরা জমি ছেড়ে মুক্তি খুঁজতে শুরু করে এবং ধ্বংসের কবলে পড়ে (করিম, ২০১১ : ৭৪)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার কৃষি সমাজে তালুকদারের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। জমিদার খাজনা আদায়ের স্বার্থে তাদের জমির মালিকানা স্বত্ব বিক্রি করে অসংখ্য ছোট ছোট মধ্যস্বত্বভোগী জমির মালিক শ্রেণির জন্ম দেয়। এরই নাম পত্তনি প্রথা, যার মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ২৫ বছর অতিবাহিত হতে না হতেই মূল জমিদার থেকে আসল রায়তের মধ্যে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বহুস্তর বিশিষ্ট একটি বিরাট ভূমি মালিকানা সমন্বিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। এতে কৃষকদের উপর সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বৃদ্ধি পায়। তাদের দারিদ্র্যও বাড়ে। জমিদাররা যে পরিমাণ খাজনা পেত তার বেশিরভাগই তারা বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করতো। জমিদাররা সরকারকে রাজস্ব পরিশোধ করতে না পেরে জমিদারি নিলামে চড়াতো। কোম্পানির টাকা-পয়সাওয়ালা এজেন্ট, কর্মচারী ও প্রভাবশালী মহাজনরা এসব নিলাম ধরতো। এভাবে শহরবাসী জমিদার শ্রেণির জন্ম হয়, যারা জমিদারিকে মহাজনী ব্যবসা মনে করতো। এরফলে বাংলাদেশের বেশিরভাগ জমি একশ্রেণির শহুরে পুঁজিপতিদের হস্তগত হয় (সেন, ১৯৮৫: ৫৬)।বিশ শতকে বাংলাদেশে পুঁজির দাপট ও তদ্‌জনিত সমাজকাঠামোর পরিবর্তন প্রসঙ্গে রংগলাল সেন (১৯৮৫: ৯৫) বলেন–

> “বাংলাদেশ তথা এ উপমহাদেশে যে কালো টাকার দাপট আজ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে তার সূত্রপাত সম্ভবত ১৯৪৩ সনের (১৩৫০ বাংলা) মহামন্বন্তরের সময় ঘটে; ঐ সময় রেশন ব্যবস্থার জন্য সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মজুদদারি ও চোরাচালান স্বাভাবিক ব্যবসায়ের অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, যা আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত। বস্তুত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ১৯৪৩ সনের মহামন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্তি বর্তমান বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সমাজজীবনে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে যা সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সমাজকাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।” (সেন, ১৯৮৫: ৯৫)

ষাটের দশকে বাংলাদেশের সমাজে বাঙালি মুসলিম বুর্জোয়ার বিকাশ প্রসঙ্গে রুশ অর্থনীতিবিদ বারানভের বক্তব্য হলো, বাঙালি বুর্জোয়ারা পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে সুদি কারবার, মধ্যস্থতা ও জমিজমার মালিক হওয়াকে অধিকতর মূল্য দিত। (সেন, ১৯৮৫: ৯৪)

সাম্রাজ্যবাদী কার্যক্রম কিভাবে বুর্জোয়া তৈরি করেছে, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি ও বুর্জোয়া উদ্ভব ঘটিয়েছে সে সম্পর্কে ফজলুল হক (১৯৪৪) বলেন, বাংলার মানুষকে না খাইয়ে মারার সরকারের সমগ্র নীল নকশাটি তৎকালীন গভর্নর স্যার জন হার্বার্টার প্রণীত। এর পেছনে ছিল ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ ও সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তাদের পরামর্শ। বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত সরকারের সাথে কোনরকম যোগাযোগ না করে ব্রিটিশ সরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন জাপানি আক্রমণ প্রতিরোধের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। ব্রিটিশ সরকার বাংলার মফস্বল এলাকায় কিছু সংখ্যক পছন্দসই এজেন্ট নিয়োগ করে। এদের হাতে প্রচুর অবৈধ অর্থ দেওয়া হয়, যাতে করে তারা ইচ্ছেমতো বাজার থেকে চাল ক্রয়-বিক্রয় ও মজুদ করতে পারে। এই সুযোগে তারা বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের খাদ্যাভাবে মৃত্যুর বিনিময়ে অবিশ্বাস্য রকমের ধনসম্পদের মালিক হয়।

১৮৮৮ সালের 'ডাফরিন রিপোর্ট'-এ কুটির শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্তির তথ্য পাওয়া যায়। রাজশাহী জেলা প্রসঙ্গে রিপোর্টে বলা হয়, সেখানকার কুটির শিল্পী শ্রেণি ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। অধিকাংশ দেশীয় প্রস্তুতকারকরা ব্রিটিশদের সাথে প্রতিযোগিতার ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন তাঁতশিল্প প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে দেশীয় কুটির শিল্পে নিয়োজিত লোকজন শিল্পকর্ম ছেড়ে দিবে এবং নেহাৎ জীবিকার জন্য অধিকতর হারে কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। (সেন, ১৯৮৫: ৬৬)

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে অন্যান্য সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মতো রাখাইনদের মূল সমস্যা হলো ভূমি ও জীবিকা (কামাল, ২০০৩)। কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রথম শর্তই ভূমি। কেননা ভূমিকে ঘিরেই তাদের জীবিকার প্রশ্ন, অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক বিকাশ, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু এই জমি ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অথবা শহুরে বুর্জোয়ারা হস্তগত করার পরিণামে জমি হারিয়ে ভূমিহীন হয়ে পড়ায় তাদের আর্থিক অবস্থার অনুন্নয়ন হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া জানার জন্য রাখাইনদের ভূমি অধিকার বিষয়ে জানা দরকার।

রাখাইনরা পটুয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে প্রথম জনবসতি গড়ে তোলে (মজিদ, ১৯৯২)। বনভূমিকে আবাদযোগ্য করে ভূমির স্বত্বাধিকারী অর্জন করে তারা। শ্রমের দ্বারা তারা ভূমিকে উৎপাদনের উপাদানে পরিণত করে। এ সম্পর্কে ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে,

> "... খেঁপুপাড়া-কলাপাড়ায় অধিকাংশ রাখাইন অধিবাস তা ঐতিহাসিকভাবেই তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত। কলাপাড়া মূলত সুন্দরবনে আবৃত ছিল এবং এ বনাঞ্চল বর্তমান কলাপাড়া থানা ও এর দক্ষিণাংশ বড়বগী ও করইবাড়িয়া ইউনিয়নসমূহে বিস্তৃত ছিল। লাগোয়া দুটি পাড়া কলাপাড়া মগ প্রধান কলামাতব্বর এবং খেঁপুপাড়া অন্য একজন মগপ্রধান খেঁপুর নামে পরিচিত হয়।" (*District Gazetteers: Patuakhali* 1982: 248)

রাখাইনরা পটুয়াখালীর কলাপাড়া, আমতলী, গলাচিপা, বরগুনার বিভিন্ন জায়গায় বসতি গড়ে তোলে। ব্রিটিশ সরকার তাদের দিয়ে সূচিত জঙ্গল উদ্ধার ও পতিতাবাদ পরবর্তীকালে চাহিদা বৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ করযোগ্য জমি বৃদ্ধির পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম থেকে চব্বিশ পরগনা পর্যন্ত ব্যাপকতর করতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু পতিতাবাদ অত্যন্ত ব্যয়বহুল, কষ্টকর, ঝুঁকিপূর্ণ ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় এই কাজকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার ভূমিতে আবাদকারদের প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু পতিতাবাদের ব্যয়াধিক্য ও সময়সাপেক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি রাজস্ব আদায়ে সূর্যাস্ত আইনের (বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব বিক্রয় আইন ১৮৫৯) হাত হতে রক্ষা পেতে আবাদকার জমিদারদের সৃষ্টি করতে হয় পত্তনী তালুক। ঝুঁকি লাঘব ও পুজি জোগানদান ঠিক রাখতে পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয় উসত তালুক, নিম উসত তালুক, হাওলাদার, নিম হাওলাদার ও উসত নিম হাওলা ইত্যাদি (ইসলাম, ১৯৮৫: ৪৮)।

খেপুপাড়া রেসিডেন্ট মেজিস্ট্রেটের রেকর্ড অনুযায়ী, ১৯০৭ সালে কলাপাড়া, খেপুপাড়া অঞ্চলে উপনিবেশ সূচিত হয়। কলোনিজেশন এলাকার নামকরণ করা হয় 'দি বাখরগঞ্জ-সুন্দরবন কলোনিজেশন'। কলাপাড়া উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন, আমতলী উপজেলার বড়বগী ও ছোটবগী ২টি ইউনিয়ন এবং পশ্চিমের পাথরঘাটা উপজেলার বেশকিছু অংশ নিয়ে কলোনিজেশন এলাকা গঠিত হয়। দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার বনভূমি উদ্ধার করে রাখাইনদের উপনিবেশনের অন্যত্র অপসারণ করা হয়। উপনিবেশনের সূচনায় জমির উপর কোন খাজনা ছিল না। প্রথম সি এস (ক্যাডাসট্রাল সার্ভে) জরিপের পর কর আরোপ করা হয় এবং মহেন্দ্রনাথ শাহ্ ও অন্যান্য এবং দত্তদের খাজনা আদায়কারী স্বার্থভুক্ত হয়। কিছু এলাকা খাজনা আদায়কারী স্বার্থবহির্ভূত ছিল। এই খাস মহালভুক্ত এলাকার জন্য জনসাধারণ সরকার বরাবর খাজনা প্রদান করতো। ১৯৫০ সালে কর আদায়কারীদের স্বার্থ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন বলে অধীগৃহীত হয় (মজিদ, ১৯৯২:

Dhaka University Institutional Repository

১০৬)। কলোনিজেশন বহির্ভূত বড় বাইজদিয়া, বড় বালিয়াতলী ও বরগুনা জেলার কিছু অংশের বৌদ্ধরা ঐ এলাকার জমিদারের প্রজা হিসেবে ছিল। তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ইংরেজদের কাছ থেকে কিছু কিছু জমিদারি ইজারা নিতে সক্ষম হন। তারা হলেন খাপড়াডাঙার ম্রাচা চৌধুরী, লালুয়ার লাথায় চৌধুরী, মংখেন চৌধুরী; বড় বাইজদিয়ার মোচাহাওলাদার ও তাজা হাওলাদার। উক্ত কলোনিজেশনে রাখাইনদের ২০০ গ্রাম গড়ে ওঠে যা তারা নিজ হাতে জঙ্গল কেটে তৈরি করেছিল। প্রথমদিকে জঙ্গল আবাদ করার পর বিনা খাজনায় ৫-১০ বছর চাষ করতে পারতো। পারবর্তীকালে সিএস জরিপের পর প্রথম ১০ বছরের জন্য খাজনা ধার্য করা হয়(জাঁ, ১৯৯২)।

রাখাইন নৃগোষ্ঠী সমাজের সংহতি বিনষ্ট করে তাদের অনুন্নয়নের দিকে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংহতি নষ্টের সূত্রপাত করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। নৃগোষ্ঠীর মানুষদের গড়ে তোলা, উন্নত করা, পরিবর্তন করার নামে বিভিন্ন শাসনের প্রতিক্রিয়ায় নৃগোষ্ঠীর সমাজজীবনে পুরাতন সমাজব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই ছন্দপতন তাদের জীবনে সমূহ ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসে। সুবোধ ঘোষ (১৩৫০:২৫১)-এর মতে, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় উন্নয়নের নামে যেসব ক্রিয়াকলাপ নৃগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থার উপর আঘাত হানে সেগুলো হলো:(ক) কর সংগ্রহের পদ্ধতি,(খ) পুলিশি পদ্ধতি, ও(গ) বিচার পদ্ধতি।

ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শাসনপ্রসূত এই তিন পদ্ধতি হলো কেন্দ্রীভূত পদ্ধতি যা কেন্দ্র থেকে চালিত হয়ে নৃগোষ্ঠী সমাজের উপর কর্তৃত্ব করছে। নৃগোষ্ঠীর উন্নতি নয়, ব্রিটিশের উন্নতিতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় যাতে নৃগোষ্ঠী সমাজ সাহায্য করে তার জন্যই এসব বিধান। এরমধ্য দিয়ে নৃগোষ্ঠীসমাজের সংহতির মতো, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মতো, স্বয়ংচালিত আত্মশাসনের সাধারণতন্ত্র নষ্ট হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে বিচারের নামে ভুক্তভোগীরা সর্বস্বান্ত হয়েছে। অন্য গবেষণায়ও এ-তথ্য পাওয়া যায়। যেমন কিভাবে বিচারের নামে বীরভূমের সাঁওতালরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সম্পর্কে হান্টার সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন। তিনি জানান, শতকরা পঁচানব্বইটি মামলার ক্ষেত্রে বিবাদিই দোষী ছিল। কিন্তু ঘুষের প্রতিযোগিতায় সেই জয়লাভ করতো। মামলার রায় আসলে ঘুষখোর পেশকারের উপরই নির্ভর করতো, হাকিমের উপর নয়। মামলার ডিগ্রি পাওয়ার অর্থ ছিল দুর্গতি ও হয়রানীর সূত্রপাত হওয়া। ডিগ্রিদার নিজে বা তার দায়িক ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত টানা-হ্যাঁচড়া চলতে থাকতো। কে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে তার উপরই শেষপর্যন্ত মামলার জয়-পরাজয় নির্ভর করতো (হান্টার, ১৯৬৯: ২৯২-৯৩)। হান্টারের এই বক্তব্য রাখাইনদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। মজিদ (১৯৯২: ১৪৩-৪৫) দেখিয়েছেন, যে ক্ষেত্রে বাঙালিদের একসময় রাখাইন এলাকায় কোন জমি ছিল না, সেখানে নামে-বেনামে ৬০-১৬০ বিঘা পর্যন্ত জমি রয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, জবরদখল, ভুয়া

নিলাম ও জাল বায়নামা-দখলনামা সৃষ্টি করে পার্শ্ববর্তী প্রভাবশালী কতিপয় বাঙালি রাখাইনদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীভূমি গ্রাস করেছে। এক্ষেত্রে আদালত অবমাননার নজির আছে। কখনো মামলায় রাখাইনরা নিম্ন-আদালতে জয়লাভ করলে বাঙালিরা উচ্চ আদালতে মামলা করে; রাখাইনদের পক্ষে একটি নিষ্পত্তি হলে অন্য বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে। এভাবে ক্রমাগত মামলার দুষ্টচক্রের আবর্তে অর্থ-বিত্ত-সম্পদ সব খুঁইয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে রাখাইনরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তিনি বলেন,

> "পর্যবেক্ষণে পরিদৃষ্ট হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতে স্বত্ব সাব্যস্তের মামলায় পরাজিত রাখাইনদের আপিলের সময় তামাদি হয়ে যাওয়ার পূর্বে আপিলের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশনামা/রায়/ডিক্রি মুন্সেফ অজানিত কারণে প্রার্থনা সত্ত্বেও সরবরাহ করেননি।"(মজিদ, ১৯৯২: ১৪৫)

ব্রিটিশ সরকারের বননীতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, মূলত বন এলাকার সম্পদ আহরণার্থে নৃগোষ্ঠী সমাজের সহযোগিতা অপরিহার্য– সেদিক বিবেচনা করেই ব্রিটিশের বননীতি নির্ধারিত হয়। এজন্য নৃগোষ্ঠীর জীবনজীবিকা বিশেষভাবে যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। উল্লেখ্য, ১৮৭১ সালে লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পলের আমলে ৩৬ বর্গমাইল সংরক্ষিত জঙ্গল হিসেবে প্রথম ঘোষিত হয়। এক্ষেত্রে নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নের কোন বিবেচনা সক্রিয় ছিল না, বনসম্পদ সংগ্রহই মূল লক্ষ্য ছিল। এ বক্তব্যের সমর্থনে অবিভক্ত ভারতের মধ্য অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী নিয়ে স্যার রিচার্ড টেম্পলের তাৎপর্যপূর্ণ নাতিদীর্ঘ উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য–

> "...তাদের মধ্যে সর্বদা একটা লুঠেরা প্রবৃত্তি দেখা যায়।...তারা সশস্ত্রভাবে বাধা দেবার যোগ্যতা রাখে। ...আর্থিক অভাবে পতিত হয়, তবে তারা লুঠ করেই জীবিকা অর্জন করবে, বিশেষ করে গৃহপালিত পশু চুরি করার দিকে ঝুঁকে পড়বে।...প্রদেশের সমতল অঞ্চল থেকে গবাদি পশু যেসব বড় বড় গোচারণভূমিতে এসে খাদ্য লাভ করে, সেই সব গোচারণভূমিগুলি এই পাহাড়ী আদিবাসী অঞ্চলেই অবস্থিত। যদি আদিবাসীরা এখানে না থাকে, তবে জঙ্গল এলাকার অবস্থা চরম দুর্দশার স্তরে নেমে যাবে। কারণ জঙ্গল এলাকা থেকে মানুষের বসতি উঠে গেলে ভূমি বন্দোবস্ত ও জঙ্গল কেটে পথ করার ভরসাও লুপ্ত হবে। তাহলে বন্যজীবজন্তু সমাকীর্ণ, ম্যালেরিয়া আচ্ছন্ন, পথশূন্য জঙ্গল অঞ্চলে কোন বন-কর্মচারী বা কাঠুরিয়ার পক্ষে প্রবেশ করার সাধ্য হবে না, বাস করাও সম্ভব হবে না। আর একটা সত্যিকারের আপদ জঙ্গলের বন্যজন্তু। এদের উপদ্রবে ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে। বন্যজন্তুগুলিই যাতে জঙ্গল এলাকার প্রভু হয়ে উঠতে না পারে, তার সম্ভাবনা রোধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে পাহাড়ী সমাজকে জঙ্গল এলাকায় স্থায়ী বসতি করিয়ে দেওয়া।" (উদ্ধৃত: ঘোষ, ১৩৫৫: ২১২)

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, নৃগোষ্ঠীর উন্নতির দিকে ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য ছিল না; বরং জঙ্গলের উন্নতি করে বনসম্পদ সংগ্রহই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এজন্য জমির আবাদ বৃদ্ধি করতে প্রথমদিকে কোন খাজনা ছাড়াই নৃগোষ্ঠীর মানুষকে জমি দেওয়া হয়েছে; অতঃপর অভ্যস্ত ও দীক্ষিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার নতুন জরিপ ও বন্দোবস্ত করে খাজনা প্রথা চালু করে। এ প্রসঙ্গে বীরভূমে সাঁওতাল পল্লি গড়ে ওঠার এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্রথমে মাত্র কয়েক শ' সাঁওতাল নামমাত্র খাজনায় জমি বন্দোবস্ত নেয়। কিন্তু কয়েকটি ফসলের পরই তাদের অবস্থা ফিরে যায়। ফলে তারা দক্ষিণের পাহাড়ি এলাকা থেকে তাদের অত্মীয়-স্বজনদের খবর দিয়ে নিয়ে আসে। এভাবে ১৩৮৮ সালের আগেই তিন হাজার আদিবাসী সম্বলিত চল্লিশটি গ্রাম গড়ে ওঠে। ১৮৪৭ সাল নাগাদ দেড় হাজার সাঁওতাল গ্রাম ও শহর গড়ে ওঠে, লোকসংখ্যা একলক্ষে পরিণত হয়। সাম্প্রতিক এক হিসেবে লোকসংখ্যা দুই লাখের অধিক উল্লেখ করা হয়েছে (হান্টার, ১৯৬৯: ১৮৮-৮৯)।

ব্রিটিশ ভারতে জমির মালিকানা অপ্রতিহতভাবে হাতবদল হয়েছে, এরফলে গ্রামের ভাবমূর্তি পাল্টে যায়। গ্রামীণ দারিদ্র্যের সুযোগে ব্যবসায়ী, আমলা, পুরোহিত শ্রেণি, ব্যাংকার, স্থানীয় মহাজনরা জমি কুক্ষিগত করে। গোটা উনিশ শতক জুড়ে চলা জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় ধ্বংস হয়ে যায় পুরোনো গ্রাম সাম্যব্যবস্থা। এর উদাহরণস্বরূপ সুনীল সেন (১৯৮৫: ৪২) ছোট নাগপুরে পুরোনো গ্রাম ভেঙে পড়াকে উল্লেখ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর নির্ভরশীলতার অর্থনীতি নতুন রূপ পায়। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থায় নব্য ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় রাখাইন সমাজে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের ব্যাপকভিত্তিক প্রসার ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তানের মেট্রোপলিটান এলিটরা যাবতীয় সম্পদের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করে। পাকিস্তানের বুর্জোয়া শ্রেণি সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের চেষ্টা না করে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে আয়ত্তে রাখার জন্য সামন্ত শ্রেণির সাথে আঁতত করে পশ্চাৎপদ কৃষি ব্যবস্থা কায়েম করে (ভূঁইয়া, ১৯৯৪)। এই শ্রেণি পর্যায়ক্রমে রাখাইনদের সমুদয় ভূমি বিভিন্ন কৌশলে আত্মসাৎ করে দরিদ্রতাকে বেগবান করে এই জনগোষ্ঠীকে নির্ভরশীল করে তোলে।সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ নির্ভরশীলতায় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পাকিস্তানামলে ১৯৫০ সালে 'মগ' অভিধায় রাখাইনদের ভূমি হস্তান্তর সম্পর্কিত স্বার্থ রক্ষার্থে 'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে' ৯৭ নং ধারা সন্নিবেশ করা হয়। এই ধারা তাদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে অনেক গবেষক মনে করেন। কেননা, উক্ত ধারা অনুসারে রাখাইনরা কেবল নিজেদের মধ্যেই জমি হস্তান্তর করতে পারবে নতুবা রাজস্ব প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। মজিদ (১৯৯২) দেখিয়েছেন, এরফলে রাখাইনদের ভূমির বাজার একদিকে কেবল নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায় একই আর্থিক বলয়ে বিদ্যমানতার জন্য রাখাইনদের পক্ষে মূল্যের

Dhaka University Institutional Repository

বিনিময়ে ভূমি গ্রহণের ক্ষমতা না থাকায় তা কার্যকারিতা হারায়। অন্যদিকে, কর্তৃত্ববলে রাজস্ব প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিগণ রাখাইনদের ভূমি হস্তান্তরকে তাদের খেয়ালখুশি ও সন্তুষ্টির শর্তাধীন করে ফেলে। এইসব কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে যোগসাজশে নকল দলিল ও কাগজপত্র তৈরি করে পার্শ্ববর্তী প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী বাঙালিরা রাখাইনদের জমি আত্মসাৎ করেছে।

পাকিস্তান আমলে ১৯৪৭–১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর পুঁজিবাদী শাসনাধীনে ছিল। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জমিদারি অধিগ্রহণে বৃহত্তর কৃষক, ভাগচাষি, ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত মজুরের ভাগ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি; বরং প্রজাস্বত্ব আইনে এদের অধিকার সংরক্ষণের কোন বিধি-বিধান না থাকায় আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এর ফলে পূর্ব বাংলার কৃষক সমাজে গরিব ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অপরিহার্য ফলস্বরূপ এক শ্রেণির নব্য ধনীর হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হতে থাকে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আউয়ুব খান প্রবর্তিত অভিনব বুনিয়াদী গণতন্ত্র ও উহার আনুষঙ্গিক ওয়ার্কস প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেশের জোতদার, ধনীকৃষক, ব্যবসায়ী ও কন্ট্রাক্টর শ্রেণি তাদের পূর্বতন ক্ষমতার ভিত্তি আরও সু দৃঢ় করে। বস্তুত এঁরাই তখনকার পাকিস্তানি শাসক শ্রেণির শক্তিশালী সামাজিক সমর্থক হিসেবে কাজ করে। পাকিস্তানে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী কৃষক শ্রেণি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কতক ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ঐ লক্ষ্যেই পরিবার প্রতি জমির সর্বোচ্চ সীমা পূর্বতন সীমা ১০০ বিঘার পরিবর্তে ৩৭৫ বিঘা নির্ধারণ করা হয়। ফলস্বরূপ, গ্রাম এলাকার জোতদার ও ধনী কৃষক আরও সম্পদশালী হয় এবং বিপরীতে দরিদ্র কৃষক দরিদ্রতর হয়। যেজন্য দেখা যায়, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ষাটের দশকে শতকরা প্রায় ২০ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ১৪.৩ ভাগ। ১৯৬০–৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামীণ জনসংখ্যার মধ্যে যেখানে শতকরা ৫২ ভাগ পরিবার ছিল সম্পূর্ণ দরিদ্র, গ্রামীণ নিঃস্বকরণের মুখে সেখানে মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে ১৯৬৮-৬৯ সালে এটি বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৮৪ ভাগে(সেন, ১৯৮৫: ৮৯-৯০)।

১৯৭১ সালে প্রান্তীয় পুঁজিবাদী সামন্ত ব্যবস্থা নিয়েই বাংলাদেশ স্বাধীন হয় (আলাভি, ১৯৭২)। সাম্রাজ্যবাদী সাহায্য ও বিনিয়োগের মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে দেশীয় পুঁজিপতিদের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীভূত হয়। বিভিন্ন সম্পদ রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। শহরের মধ্যস্বত্বভোগী সরকারি আমলা ও ব্যবসায়ীদের আঁতাতের মাধ্যমে গড়ে ওঠা শহুরে অর্থনীতির সমান্তরাল গ্রামেও অনুকূল অর্থনৈতিক বিন্যাস গড়ে ওঠে; উৎপত্তি লাভ করে গ্রামীণ বুর্জোয়া শ্রেণি। এরা নানাভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কৃষকদের শোষণ করে। এরূপে, অঞ্চলগতভাবে গ্রাম ও শহরের মধ্যে এবং শ্রেণিগতভাবে

উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণির মধ্যে বৈষম্যমূলক দ্বৈত অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে যা নির্ভরশীল প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত (সাদ উদ্দিন, ১৯৮৫)। এইরূপ নির্ভরশীল ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাখাইনদের অর্থনৈতিক জীবনের স্থিতি ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়নি। কেননা তাদের 'লুমপেন উন্নয়ন'কারী (Frank, 1969)দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজির উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে; যা নতুন নতুন কলাকৌশল, প্রযুক্তিবিদ্যা, ব্যবসা, পুঁজি, ঋণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রভৃতির দ্বারা কর্তৃত্বকে সুসংহত করছে (Wallenstein, 1979); উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। বি কে জাহাঙ্গীর (১৯৯৫), এরিক জনসন (১৯৯০), এইচএসকে আরেফিন (১৯৯৪), আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী (১৯৮২), এ এইচ এম জেহাদুল করিম (১৯৯১), মহিউদ্দীন খান আলমগীর (১৯৭৮), কামাল সিদ্দিকী (১৯৯২), প্রমুখ গবেষক গ্রাম বাংলার দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, গ্রামের ধনী কৃষক শ্রেণি প্রতিনিয়ত অধিকতর সম্পদশালী হচ্ছে। সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে, উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় প্রকৃতঅর্থেই অধিকতর উচ্চবিত্ত ও সম্পদশালী হয়েছে। এরফলে একটি মেরুকরণ সংঘটিত হয়েছে। তাঁদের মতানুসারে, সময়ে সময়ে সাধিত ভূমি রাজস্বব্যবস্থার পরিবর্তন কৃষককুল ও গ্রামসম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। গ্রাম্য ধনী কৃষক, জোতদার, মহাজনরা বিভিন্ন কৌশলে ও চিরাগত উপায়ে ভাগচাষি, ঋণগ্রহীতা, নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে শোষণ করেছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা যে জটিল সম্পর্ক তৈরি করেছে, সেখানে তিনটি শ্রেণির সুস্পষ্ট অবস্থান লক্ষণীয়:ক) ভূমিহীন সর্বহারা শ্রেণি, যারা গ্রামে অপ্রত্যক্ষ ভূমিদাস; খ) মধ্যবিত্ত কৃষক, যারমধ্যে রয়েছে স্বাধীন চাষি, বর্গাচাষি ও প্রান্তিক চাষি; গ) ধনী কৃষক ও মহাজন, যারা চিরায়ত উৎপাদন ব্যবস্থায় ভাগচাষের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আত্মসাতের উৎপাদন কৌশল হিসেবে ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান ও পৃষ্টপোষকতায় অপ্রত্যক্ষ ভূমিদাস শ্রমের বুর্জোয়া প্রবণতার উপাদান বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে (মোহাম্মদ, ১৯৯৯: ১২৬)। আব্দুল মাহমুদের মতে, এই ধনী কৃষকশ্রেণি গ্রামের বাজার ও অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হয়ে গ্রামের উদ্বৃত্ত সম্পদ পাচারের অধিনায়ক। এরা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া দালালদের গ্রামীণ তৃণমূল পর্যায়ের সম্পদ পাচারের ব্যাপারী। বর্তমানে গ্রামীণ সম্পদ পাচারের প্রধান ভূমিকা পালনকারী এই মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ারা এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ। ফলে জনগোষ্ঠীর মধ্যে মেরুকরণ তীব্রতর হচ্ছে– ধনী কৃষক অধিক ধনী হচ্ছে, গরীব ক্রমে অধিকতর গরীব হচ্ছে, বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা (Mahmud, 1977: 55)।

কৃষকদের জীবনব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য যে সকল ভূমি সংস্কার আইন, গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গৃহীত হয়েছে তাতে সাধারণ ভূমিহীন কৃষকের জীবনব্যবস্থার উন্নতি ও নিরাপত্তা তৈরি হয়নি। পরন্তু, ধনী কৃষক, মহাজন, সম্পন্ন গৃহস্থ ও সুযোগ-সন্ধানীরা ফায়দা নিয়ে লাভবান হয়েছে। যেমন গ্রামোন্নয়নে সমবায় ব্যবস্থা চালু হলে সুযোগ-সন্ধানীরা সকল গ্রুপ থেকে এগিয়ে এসে আর্থিক ও বিষয়গত সুবিধা দখল করে; প্রান্তিক চাষি, বর্গাচাষি মোটেই উপকৃত হয়নি। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৮৭: ১৯) দেখিয়েছেন, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর যেসমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গৃহীত হয়েছে তাতে দারিদ্র্য দূরীভূত না হয়ে বরং মেরুকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ারা আর্থিক ও বৈষয়িকভাবে লাভবান হয়েছে, ব্যাংক ঋণের সুবিধা গ্রহণ করে নগদ অর্থ পুঞ্জীভবন করেছে, কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অধিকহারে ভূসম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। নানান সংস্কার সম্পর্কে লেলিন বলেন,

> "সংস্কার নিশ্চিতভাবেই মুমূর্ষু সামন্ততন্ত্রকে বেঁচে থাকার নতুন মেয়াদ দিয়েছে, ঠিক যেভাবে...সেই দূরভিসন্ধিমূলক সংস্কারটি কর্ভি ব্যবস্থার জীবনে একটি নতুন মেয়াদ এনেছিল, ১৯০৫ সাল পর্যন্ত যা নানা ধরনের মোড়কে টিকে ছিল।" (উদ্ধৃত: খাসনবিশ, ১৯৮৬: ১৪)

হামজা আলাভির মতানুসারে, এভাবেই বিশ্ব পুঁজিবাদ কেন্দ্রীয় পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রান্তিক আর্থসাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দালাল মুৎসুদ্দীদের সামন্তীয় রাজনৈতিক অংশীদারদের স্বার্থ বাঁচিয়ে রেখে বিশ্ব-পুঁজি বাজার ও পুঁজি পাচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে গ্রামীণ কৃষকদের ভূমিহীনতার যেসব বিবিধ কারণ চিহ্নিত করেছেন রংগ লাল সেন তা সমতল ভূমির রাখাইন নৃগোষ্ঠীর কৃষকদের ক্ষেত্রেও কম-বেশি প্রযোজ্য। তাঁর মতে,

> "গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের লগ্নি প্রথা কৃষকদের ভূমিহীন করছে।...কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের সমস্যা, কৃষি উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ বৃদ্ধি, ছেলেমেয়েদের বিয়েতে ব্যয়বাহুল্য, মামলা-মোকাদ্দমার খরচ ও সর্বোপরি জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে গরিব ও মাঝারি কৃষকের হাত থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে জমিজমা হস্তান্তরিত হচ্ছে।" (সেন, ১৯৮৫: ১০১)

সেন উদাহরণ হিসেবে ঢাকা শহরের অদূরে শ্রীনগর উপজেলার চিত্র উল্লেখ করেন যে, শ্রীনগরে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ১২৯টি গ্রামের ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল ৫৪৪৫ জন। ১৯৮২-৮৫ সাল পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

এক বেসরকারি হিসেবে তা বেড়ে ৯০৫৭ তে পৌঁছে। অর্থাৎ ওই উপজেলার প্রতিটি গ্রামে প্রতি বছর গড়ে ৭ জন করে কৃষক ভূমিহীন হয়েছে। গ্রামগুলোর কৃষি জমির অধিকাংশ মালিক হচ্ছে ঢাকার বড় চাকুরে, ব্যবসায়ী, মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, জোতদার, আধা-জোতদার ও মহাজন শ্রেণির অকৃষক।

সাঁওতালদের ক্ষেত্রে হান্টার (১৯৬৯: ১৯৪-৯৫) দেখিয়েছেন, চাষের জন্য নতুন জমি প্রস্তুত কিংবা মেহমানদারি কিংবা দুর্দিনে মহাজনের কাছ থেকে একবার ধানের দাদন নিলে সে আর মহাজনের হাত থেকে কোনমতেই রেহাই পাবে না। চাষি তার পরিবারের জন্য যত কমই ধান নিয়ে থাকুক, অনাহারে-অর্ধাহারে যত কঠোর পরিশ্রম করেই দেনা পরিশোধ করার চেষ্টা করুক না কেন তার রক্ষা নেই। মহাজন তার সমস্ত ফসল তো নেবেই, এমনকি পরের ফসল থেকে আরো আদায় করার জন্য খাতায় লিখে রাখে। বছরের পর বছর সাঁওতালরা এভাবে হিন্দু জমিদারদের হাতে নির্যাতিত হতে থাকে। এছাড়া গোপনে আদালতে মামলা, তদবির-তাগাদা করে একতরফা ডিক্রি জারি করে গরীব কৃষকের গরু-মহিষ, ভিটেবাড়ি, পিতলের ঘটিবাটি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। প্রতিকারের প্রশ্ন অবান্তর; আদালতের দূরত্ব অনেক; ইংরেজ হাকিমের রাজস্বআদায় বাদ দিয়ে এসব ছোটখাটো বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সময় নেই। টাকার বিনিময়ে আদালতের নিম্নপর্যায়ের হিন্দু অফিসাররা সাঁওতাল বিবাদিদের বিপক্ষে হিন্দু বাদিদের পক্ষে সমর্থন করতেন।

সাধারণ বাঙালি ছোট ও মাঝারি কৃষকের মতো রাখাইন ছোট ও মাঝারি কৃষকরাও এভাবে জমি হারিয়েছে। গ্রামীণ বাংলাদেশে জমি হস্তান্তরের একটি চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৭৭ সালে এক জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট কৃষি পরিবারের ৯.৬৭ শতাংশ পরিবার মোট জমির ৫০.৬৮ শতাংশের মালিক। অন্যদিকে, ৭৭.৬৭ শতাংশ পরিবারের অধীনে আছে মাত্র ২৫.১৭ শতাংশ জমি। ৩২.৭৯ শতাংশ কৃষকের কোন জমি নেই। ১৯৮০ সালের অন্য এক জরিপ অনুযায়ী, দেশের ২৫.১৭ শতাংশ আবাদি জমি ২ শতাংশ লোকের মালিকানায় রয়েছে। দেশের ৫০ ভাগ চাষির মালিকানায় আছে মাত্র ৪.৮ শতাংশ জমি। দেশের অল্প জমির মালিক দ্রুত জমি হারাচ্ছে। ১৯৭১-৭৬ সালের ভেতর গ্রামের জমিজমার কেনাবেচা ৫ গুণ বৃদ্ধি পায়। এক হিসেব মতে, ১৯৭১ সালে যেখানে গ্রামাঞ্চলে বিক্রিত জমির পরিমাণ ৬৪.০৬৪ একর, সেখানে ১৯৭৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১.২৭.৫৩৫ একর। বিক্রিত জমির আয়তন খুবই ক্ষুদ্র। যা নির্দেশ করে যে, মূলত ছোট ও মাঝারি কৃষকেরাই তাদের জমি বিক্রি করছে (সেন, ১৯৮৫: ১০০)।

Dhaka University Institutional Repository

কেবল মুৎসুদ্দী শ্রেণি রাখাইনদের জমি হাতিয়ে নিয়েছে তাই নয়, ষড়যন্ত্র করে রাখাইনদের নানারকম হয়রানিমূলক মামলায় জড়ানো হয়েছে। তারা এর মোকাবেলা করতে পারেনি। আইনের মারপ্যাচ না জানা, কোর্টের ভাষাজ্ঞান এমনকি বাংলা ভাষা ভালো না বোঝা, মামলা-মকদ্দমা চালানোর ব্যয়ভার বহনের আর্থিক অসমর্থতা, কোর্ট-কাচারির নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা, দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসনের অসহযোগিতা, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অসহযোগিতা ইত্যাদি নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এভাবে যে এলাকায় বাঙালিদের এককালে কোন বসতি ছিল না, জমি ছিল না, সেখানে নামে-বেনামে কোন কোন প্রভাবশালী বাঙালির ১০০-১৫০ বিঘা পর্যন্ত জমি আছে (মজিদ, ১৯৯২: ১৪৫)। ভুয়া ও জাল 'হস্তান্তর ও দখলগ্রহণের সার্টিফিকেট' প্রবণতার তীব্রতা অনুধাবনের জন্য এখানে পটুয়াখালীর একটি নিম্ন আদালতের ২টি রায় তুলে ধরা হলো। ১৯৭৯ সালে ৩০ জুলাই এক মামলার রায়ে বলা হয়–

> "বয়নামা ও দখলনামা ভুয়া এবং বাদী জাল কাগজপত্র দিয়ে ধাপ্পা দিতে চেষ্টা করেছে। বিনা শাস্তিতে এ ধরনের ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া উচিৎ হবে না।"(উদ্ধৃত: মজিদ, ১৯৯২: ১০৯)

এই আদালতের অপর এক মামলার (টাইটেল স্যুট নং ১৬৮/৭৩) রায়ে বলা হয়:

> "বাদী বয়নামা ও অন্যান্য কাগজপত্র জাল করেছে সম্পত্তি গ্রাসের জন্য। যে ব্যক্তিরা এই জাল সার্টিফিকেট নং ৮৪৪৯ k/৫৫ তৈরী করেছে তারা দুষ্ট প্রকৃতির এবং এই দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের বিনা শাস্তিতে অব্যাহতি পাওয়া সমীচীন নয়।"(উদ্ধৃত: মজিদ, ১৯৯২: ১০৯)

এভাবে নানারকম চক্রান্তের আশ্রয়ে রাখাইনদের জমি হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই বলা যায়, প্রকারান্তরে মেট্রোপলিস বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় স্থানীয় মধ্যস্বত্বভোগী বুর্জোয়ারা স্যাটেলাইট রাখাইনদের ভূমি ছলে-বলে-কৌশলে দখল করে তাদের ভূমিহীনে পরিণত করেছে। এই ভূমিহীনতা তাদের দারিদ্র্যকরণ ব্যাপক ও ত্বরান্বিত করেছে। তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সনাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতরে বা তার বাইরে এদের সকলের কর্মসংস্থান প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠায় বেকারত্ব বেড়ে গিয়েছে। গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী ভূমিহীন পরিবারে বেকারত্ব অন্যান্য পরিবারের তুলনায় বেশি। এর একটি কারণ হলো–মহিলারা সচরাচর ফসল তোলার পরবর্তী যে কাজগুলো করে থাকে তা বন্ধ হয়ে যাওয়া (নভেদ্, ১৯৯১: ১৫৫)।

Dhaka University Institutional Repository

রাখাইনদের শতশত বছরের লালিত তাঁতশিল্প এখন বিলুপ্ত। তাঁতশিল্পে অনেক পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হতো। প্রত্যেক পরিবারে অন্তত ২টি করে তাঁত ছিল (দীপু, ২০০০)। রাখাইনরা ঐতিহ্যানুযায়ী কাঠের তৈরি দোতলা বিশিষ্ট ঘরে বসবাসে অভ্যস্ত ছিল। নীচে তাঁতকল বসানো হতো। রাখাইন নারীরা প্রত্যেকে এক একজন সুনিপূণ তাঁতি। তারা তুলা থেকে সুতা কেটে কাপড় বুনতো। কাপড় বুননের কাজটা রাখাইন সমাজে নারীরাই করতো। বিপণনে যুক্ত ছিল পুরুষরা। সংসার সচল রাখতে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতো। এ শিল্পের উন্নতমানের লুংগি, চাদর, থামি, গামছার চাহিদা ছিল প্রচুর। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে বিক্রি করা হতো। অথচ বর্তমানে ৯০ শতাংশ তাঁত বন্ধ হয়ে গেছে (দীপু, ২০০০)। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার সমৃদ্ধ তাঁতের সুতো, সিল্ক ও পাটকল ক্রমান্বয়ে সরকারি শিল্পনীতির চাপে পৃষ্ট হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কারণ ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ছিল এখানকার উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস করে ব্রিটিশপণ্যের একচেটিয়া বাজার কায়েম করা। অধ্যাপক নেহাল করিমের (২০১১: ৭৫) মতে, “এভাবে ব্রিটিশ শিল্পনীতি বাংলার হস্তশিল্প ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রাণ টেনে নিয়ে যায় বধ্যভূমির দিকে।

মূলত আশির দশকে রাখাইনদের তাঁতশিল্পে বিপর্যয় নেমে আসে। রং, সুত্র, রাসায়নিক দ্রবাদি ও আনুষঙ্গিক কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, পুঁজির স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় সরকারি পৃষ্টপোষকতার অভাব, বিভিন্ন চোরাপথে বিদেশি কাপড়ের অনুপ্রবেশ প্রভৃতি কারণে তাঁতশিল্পের স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং লোকসানের সম্মুখীন হয়। কক্সবাজারের রাখাইনদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, তাঁতশিল্পের বিপর্যয় ঠেকাতে সরকারিভাবে স্বল্পসুদে ঋণ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত তাঁতিরা ঋণ না পাওয়া, কৌশলে মধ্যস্বত্বভোগীদের ঋণ হস্তগত করে ভিন্ন খাতে ব্যবহার, উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এই ঋণ কার্যকর অবদান রাখেনি। তাছাড়া, ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাঁতিদের নামে সার্টিফিকেট মামলা জারি করা হয়। তারা হয়রানির শিকার হয়। অনেকে আত্মগোপন করে। স্বাভাবিক জীবনযাপন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এভাবে তাদের জীবন ঋণের কবলে সরকারি সহয়তার নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। দেখা যাচ্ছে, এভাবে সাহায্য হিসেবে যে অর্থ দেওয়া হচ্ছে তা উন্নয়নের কাঠামো বিনির্মাণের পরিবর্তে অর্থনীতিকে পরাশ্রয়ী করে তুলছে। সাহায্য কর্মসূচি অর্থনৈতিক কাঠামোয় নির্ভরশীলতার বন্ধন আরও দৃঢ় করছে (আহম্মদ, ১৯৭৯)।

পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, রাখাইনরা বর্মী রাজার নির্যাতনের মুখে বার্মা থেকে অভিবাসী হয়ে আঠার শতকের সত্তরের দশকে বাকেরগঞ্জ জেলায় সমুদ্র উপকূলীয় বনাঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। ব্রিটিশরা অধিক কর আদায়ের লক্ষ্যে অনাবাদি জমিকে চাষযোগ্য করে আবাদি জমির পরিমাণ বাড়ানোর প্রচেষ্টায় রাখাইনদের বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করে। প্রথমে বিনা

Dhaka University Institutional Repository

টাকায়, পরবর্তীকালে স্বল্প করের বিনিময়ে জমি প্রদান করে। শুরু হয় শোষণ ও নির্ভরশীলতার শাসন। তবে ব্রিটিশ শাসনে তারা কিছুটা নিরুপদ্রব জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সাতচল্লিশে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর শোষণ ও শাসন তীব্র নেতিবাচক মাত্রা পায়। কেননা সাম্প্রদায়িক ও ঔপনিবেশিক মানসিকতাপুষ্ট শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্টপোষকতায় গ্রামীণ ও উঠতি শহুরে বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বারা রাখাইনদের জমি বেদখল হতে থাকে। উপরন্তু কৃষির সকল প্রকার সরকারি সহায়তা গ্রাস করে এই শ্রেণি। কৃষকদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। পরবর্তীকালে উনিশশ একাত্তরে এক বিরাট সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আশা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ রাষ্ট্র। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদের মোড়কে উঠতি পুঁজিপতিদের আগ্রাসনে অসহায় হয়ে পড়ে রাখাইনরা। একইভাবে জমি ও কৃষি সহায়তা গ্রাস হতে থাকে পুরাতন ও নবউত্থিত বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে। এ-অবস্থা এমন পর্যায়ে পোঁছেছে যে, বর্তমানে গবেষণাধীন তিনটি গ্রামে রাখাইনদের সকলে প্রায় ভূমিহীন। যে পতিত পরিত্যক্ত জমিকে তারা আবাদি করেছিল আজ তা তাদের মালিকানাহীন। জনগোষ্ঠীর সকলে ঋণগ্রস্ত, যে ঋণ এনজিও থেকে চড়া সুধে গৃহীত হয়েছে। ঋণের জালে জর্জরিত অবস্থা থেকে রাখাইন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। তাদের জীবন চলে সরকারি-বেসরকারি সাহায্যে। তাদের গৃহ, স্যানিটারি ব্যবস্থা, গ্রামের নলকূপ, স্বাস্থ্য, সন্তানদের শিক্ষা, বিভিন্ন পেশা গ্রহণ প্রভৃতি সরকারি-বেসরকারি সহায়তানির্ভর। তাদের উন্নয়নের জন্য নানান পরিকল্পনা গৃহীত হলেও প্রকারন্তরে নির্ভরশীলতা বেড়ে গেছে, অনুন্নয়ন ঘটছে এবং প্রকৃত উন্নয়ন হচ্ছে না। যথাযথ উদ্যোগের অভাবে তাদের সুপ্রাচীন হস্তশিল্প লুপ্তপ্রায়। সরকারি বেসরকারি নানান সম্পৃক্ততা তাদের আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে চরম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে; উত্তরোত্তর নির্ভরশীলতাকে বেগবান ও দৃঢ়ভিত্তি প্রদান করছে। রাখাইন অর্থনীতিতে নির্ভরশীলতার সবচেয়ে কার্যকর উপাদান হচ্ছে বিভিন্ন সাহায্য ও ঋণ। এই দুইয়ের অন্তঃপ্রবাহ স্থানীয় অর্থনীতির কাঠামোকে দুর্বল করে দিচ্ছে। স্থানীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও উৎপাদন ব্যাহত করছে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এসব অর্থ ফেরত যাচ্ছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ইনপুট হিসেবে যথার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে না। নির্ভরশীলতার এই বন্ধন তাদের ক্রমানুন্নয়নের অস্ত্র হিসেবে কাজ করছে। তাই নির্ভরশীলতাই তাদের অনুন্নয়নের প্রধান কারণ।

Dhaka University Institutional Repository

টিকা

১. ইদারি (১৯৭৬) তাঁর *Social Change* গ্রন্থে প্রথম থেকে চতুর্থ ক্রমিক পর্যন্ত অর্থাৎ সামাজিক-ঐতিহাসিক তত্ত্ব থেকে আধুনিকীকরণ তত্ত্ব পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। নির্ভরশীলতা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেননি। মূলত নির্ভরশীলতা তত্ত্বের জন্য আলভিন (১৯৯০)-এর গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

২. হ্যারি ম্যাকডক বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কে বলেন, রফতানি আয় ও আমদানি ব্যয়-উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান ঘাটতি একটি দেশের অর্থনীতিকে বিদেশি বিনিয়োগের পথে ঠেলে দিতে পারে এবং দেশের অর্থনীতিকে নির্ভরশীল করে তুলতে পারে।

তথ্য নির্দেশ

Alamgir, M. K. (1978). *Bangladesh, A Case of Below Poverty Level Equilibrium Trap,* The Bangladesh Studies of Development, Dhaka

Alavi, H. (1972). “India and the Colonial Mode of Production”, in Miliband, R. & Saville, J. (ed.) *The Socialist Register,* Monthly Review Pess, New York

.... (1975). “The Colonial Transformation of India”, in Miliband, R. & Saville, J. (ed.) *The Socialist Register,* Monthly Review Pess, New York

Alvin. (1990). *Social Change and Development: Modernization, Dependency and World System Theory,* SAGE Publicatio, Newbury Park, London

Amin, S. (1972). “Under Development and Dependence in Balck Africa: Origins and Contemporary Forms”, *Journal of Modern African Studies,* Vol.10, No. 4

Chowdhury, A. (1978). *A Bangladesh Village: A Study of Social Stratification,* Centre of Social Studies, Dhaka

Davis. K. (1949). *Human society, MacMillan*

Doyle, M.W. (1986). *Empires,* Ithoca, Cornell University Press

Edari, R. S. (1976). *Social Change,* Wm. C. Brown Company Publishers, USA

Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil,* Monthly Review Press, New York

Ginsberg, M. (1968). *Essays in Sociology and Social Philosophy,* Peregrine Book

Government of Bangladesh, (1982), *District Gazetteers: Patuakhali,* B. G. Press, Dhaka.

Gultun, J. (1971). “A Structural Theory of Imperialism”, *Journal of Peace Research,* Souce : https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002234337100800201

Haque, F. (1944). *Bengal To Day,* Dhaka

Hout, W. (1995). *Capitalism and the Third World*, Reprint, Edward Elgar Publishing Limited, England

Hunter, W. W. (1868). *The Annals of Rural Bengal*, Smith, Elder & Co, England

Jahangir, B. K. (1979). *Differentiation Polarisation and Confrontation*, Centre for Social Studies, Dhaka University, Dhaka

Karim, A. K. N. (1961). *The Changing Society of India and Pakistan*, Ideal Publication, Dhaka

............(1986). “Max Webr’s Theory of Prebendalization and Bengal Society”, in *Bangladesh Sociological Review*, Bangladesh Sociology Association, Vol. 1, No. 1, Dhaka

Kosambi, D. D. (1975). *An Introduction to the History of Indian History,* Popular Prakashan, Bombay

Krader, L. (1975). *The Asiatic Mode of Production*, Van Gorcum & Comp. B.V-Assen, The Netherlands

Mahmood, A. (1977). *A Plea for a Fresh Approach to Socio-Economic Development,* Centre for Social Studies, Dhaka

Mukherje, R. K. (1971). *Six Villages of Bengal*, Popular Prakashan, Bombay

Prebish. R. (1950). *The economic develoment of Latin America and its principal problems*, Lake Success, N.Y., United Nations Department of Economic Affairs

.... (1959). “Commercial policy in the underdeveloped countries”, *American Economic Review, Papers and Proceedings*, vol. 49, no. 2

Ritzer, G. (1992). *Classical Sociological Theory*, McGraw-Hill, Inc. New York

Rostow, W. W. (1960). *The Stage of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, Cambridge University Press, Cambridge, U. K.

Dhaka University Institutional Repository

Sen, A., (1962). *The State, Industrilization and Class Formation in India,* Routledge & Kegan Paul, London, Boston & Henly

Wallenstein, I. (1979). *The Capitalist World-economy,* Cambridge University Press, Cambridge, U. K.

.... (1974). *The Modern World System,* Academic Press, New York

আহম্মদ, এমাজউদ্দিন, (১৯৭৯), "নব্য উপনিবেশবাদ : কেন্দ্রপ্রান্ত সম্পর্ক : উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ১০ম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ইসলাম, সিরাজুল, (১৯৮৫), *ভূমি সংস্কার ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

উমর, বদরুদ্দীন, (১৯৭২), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, ঢাকা

করিম, এ এইচ এম জেহাদুল, (১৯৯১), "বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্বেও ধরন", *সমাজ নিরীক্ষণ*, ৩৯ সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

করিম, নেহাল, (২০১১), *জাতীয়তাবাদ : উন্মেষ ও বিকাশ*, কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ঢাকা

কার্টার, আইডান ফস্টার, (১৯৯৮), *উন্নয়নের সমাজতত্ত্ব*, (অনূ. সাদাত উল্লাহ খান) বাংলা একাডেমী, ঢাকা

খান, সাদাত উল্লাহ (অনূ.), (১৯৯৮), *উন্নয়নের সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

খাসনবিশ, রতন, (১৯৮৬), *আধাসামন্ততন্ত্র ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি*, পিপল্স বুক সোসাইটি, কলিকাতা

ঘোষ, সুবোধ, (১৩৫৫), *ভারতের আদিবাসী*, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা

চৌধুরী, আনোয়ার উল্লাহ, (১৯৮৩), *বাংলাদেশের একটি গ্রাম: সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারা*, এসোসিয়েট বুক কোম্পানি, ঢাকা

জনসন, এরিক, (১৯৯০), *গ্রামীণ বাংলাদেশ : সীমিত সম্পদের প্রতিযোগিতা*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

জাহাঙ্গীর, বি. কে. (১৯৯৫), *বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শ্রেণীসংগ্রাম*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

জাঁ, উথুন অং, (১৯৯২), "বাংলাদেশের উপকূলীয় রাক্ষাইনদের জীবন সংগ্রাম", *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, জুন ১২, ঢাকা

দীপু, দীপক বড়ুয়া, (২০০০), "শতাব্দীর শিল্প বিলুপ্তির পথে", *The Rakhain Review 2000,বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন*, কক্সবাজার

নভেদ্, রুচিরা তাবাস্সুম (১৯৯১), "বাংলাদেশের কৃষিতে প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি: অবক্ষয়ের বিবরণ", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা

ভূঁইয়া, মোঃ আবদুল ওদুদ, (১৯৯৪), *সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

মনিরুজ্জামান, (২০১৯), *পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ভাষা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মহাপাত্র, অনাদিকুমার, (১৯৯৪), *বিষয় সমাজতত্ত্ব*, ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন, কলকাতা

মার্কস-এঙ্গেলস, (১৮৯৩), *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো

মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, (১৯৮৭), *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী)*, কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা

মোহাম্মদ, ইসা, (১৯৯৯), *এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের সামন্তবাদ সন্ধান ও বিচার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রায়, নীহাররঞ্জন, (১৯৫১), *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

সরদার, সীজার, (২০১২), "তৃ ীয়ত বিশ্বের অর্থনৈতিক মুক্ত ি কোন পথে?" ইন্টারনেটঃhttp://www.somewhereinblog.net/blog/cesar007/29617881)

সা'দ উদ্দিন, এ কে এম, (১৯৮৫), "উন্নয়ন তত্ত্ব ও নব্য মার্কসবাদ" *বীক্ষণ*, ঢাকা, ১ আগস্ট ১৯৮৫

সিদ্দিকী, কামাল, (১৯৯২), *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

.... (১৯৮১), *বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা

সেন, সুনীল, (১৯৮৫), *ভারতে কৃষি সম্পর্ক*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা

সেন, রংগলাল, (১৯৮৫), *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সোহরাওয়ার্দী, জি. এম., (২০১৩), "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশঃ রস্টোর স্তর তত্ত্বের নিরিখে একটি পর্যালোচনা", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, খণ্ড ৩০, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা

হান্টার, ডব্লিউ. ডব্লিউ, (১৯৬৯), *পল্লী বাংলার ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন বিশ্লেষণ

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কোন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর থেকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকে, ততদিন তার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও মোটামুটি অবিকৃত থাকে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শ ও আদান-প্রদান স্বতন্ত্র জীবনাচরণ বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনে (মজুমদার, ২০০৪)। বাংলাদেশে সমতল ভূমিতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা পাহাড়ি এলাকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মতো ভৌগোলিকভাবে বাঙালিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করতে পারেনি। তাছাড়া, সমতলের নৃগোষ্ঠীর মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে অধিকতর শোচনীয়। গবেষক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (২০১৩: ২০) উল্লেখ ক
রেছেন, সমতলের আদিবাসীদের ৬০% দরিদ্র এবং ২৭.৬% কঠিন দারিদ্র্যের শিকার যা জাতীয় পর্যায়ের চেয়ে অনেক বেশি। এদের এক-তৃতীয়াংশ (৩৩.৭%) প্রয়োজনীয় খাদ্যের যথাযথ সংস্থান করতে পারে না, এমনকি কখনো কখনো না খেয়েও দিন কাটাতে হয়। এদের বেশির ভাগই রাতের খাবার ভালোভাবে খেতে পারে না। গবেষক দেখতে পান, ৩৪% লোক রাতে খাবার গ্রহণ ব্যতীত ঘুমিয়ে গেছেন। এ-সমস্ত নৃগোষ্ঠীর লোকেদের প্রায় ৬১% ১ বছরের মধ্যে ১০ মাস খাদ্যাভাবে কাটিয়েছে।

সমতলের অধিবাসী হওয়ায় রাখাইনদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলাদেশে বসবাসের সূচনা থেকে রাখাইন নৃগোষ্ঠী যতদিন ভৌগোলিক দিক থেকে মোটামুটি বিচ্ছিন্ন ছিল, ততদিন তাদের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোপুরি বজায় ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতিবেশী বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় সেই মৌলিকতা হারিয়েছে। তবে রাখাইন জনগোষ্ঠীর এই পরিবর্তন একদিনে আসেনি। তা এসেছে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিবেশী সংস্কৃতির সঙ্গে আদান-প্রদান ও গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে। এভাবে রাখাইন সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিরাজ করছে দ্বৈত সত্তার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি। যেমনটি অনেক নৃ-গোষ্ঠী গবেষকের মতো অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্ত্তী (১৯৯৮: ৩৯) লক্ষ্য করেছেন সিলেটের পাত্র সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে। একদিকে রাখাইন ঐতিহ্যে নিহিত রয়েছে তাদের শেকড়, অন্যদিকে বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাব। এই দ্বৈত সত্তার উপস্থিতি রাখাইন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম-বেশি প্রকাশিত। তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন গতানুগতিক এবং আধুনিকতার এক

সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। তাদের আর্থিক দৈন্যের কারণে আর্থ-সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সাহায্য ও ঋণ সহায়তাশ্রিতনির্ভরশীলতার পরিচয় স্পষ্ট। তাদের জীবনবোধ, জীবনজিজ্ঞাসা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সবকিছুই দরিদ্রতার কারণে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। উল্লেখ্য, ইংরেজ রাজত্ব শুরু হওয়ার আগে, এমন কি ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকেও আদিবাসীদের জীবন ছিল মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোনকিছুর জন্য কারো কাছে হাত পাততে হতো না। তাছাড়া তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাও ছিল যৎসামান্য। নিজেদের প্রয়োজন বনজ সম্পদ সংগ্রহ কিংবা চাষ-আবাদ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। একমাত্র লবণ ও কাপড়চোপড় কেনাকাটার জন্যই বাইরের জগতের উপর তাদের নির্ভর করতে হতো। কিছু কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীকে আবার বাঁশ, ঝুড়ি, খেজুর-তালপাতার চাটাই কিংবা নানারকম গাছের ছালে দড়ি তৈরী করে জীবিকা অর্জন করতে দেখা যেত (হান্টার, ১৯৬৯)। মূলত ইংরেজ শাসনের যাতাকলে সেই জীবনে ছেদ পড়ে; ভারত উপমহাদেশের বিভক্তির পর জীবন দূর্বিসহ হয়ে ওঠে।

এই অধ্যায়ে গবেষণাধীন এলাকার রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের স্বরূপ তুলে ধরার জন্য প্রধান প্রধান চলকসমূহ যেমন ভাষা দক্ষতা, বৈবাহিক অবস্থা, ঘরবাড়ি, জমি, পেশা, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেনিটেশন, এনজিও সম্পৃক্ততা, ঋণ গ্রহণ, সুপেয় পানির উৎস, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আত্মরক্ষা, জমি বন্ধক, পত্তন প্রথা, বিবাহ, পরিবার, নারীদের কর্ম সংযুক্তি, গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান ও চিকিৎসা, শিশুদের রোগগ্রস্ততা ও চিকিৎসা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, বিনোদন, তাঁত শিল্পের অবস্থা, লোক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সংগঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করা হবে। দেখা গেছে, এ-সবের কোন কোনটির বেলায় নির্ভরশীলজনিত কিছু কিছু অ-টেকসই উন্নয়ন ঘটলেও, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুন্নয়ন ঘটেছে। অনুন্নয়নের ফলে তাদের দারিদ্র্য নির্ভরশীলতাকে বৃদ্ধি করেছে; এই নির্ভরশীলতাই তাদের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অতীত ও বর্তমানের তারতম্য তথ্যের সন্নিবেশে নিম্নে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হলো।

৭.১ তিনটি গ্রামের গৃহস্থালী

হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়া গ্রাম তিনটিতে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী ও বাঙালি উভয় জাতিগোষ্ঠীর মানুষের গৃহস্থালী দেখা যায়। বাঙালিদের মধ্যে কেবল বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের গৃহস্থালী থাকলেও কোন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গৃহস্থালী নেই। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিকভাবে গ্রাম তিনটি আদিবাসী অধ্যুষিত ছিল। প্রায় ২৫০ বছর পূর্বে রাখাইনরা এ-ভূমিতে পদার্পণ করে জঙ্গল-জলাকীর্ণ

অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করে তোলে এবং জনহীন ভূমিতে গড়ে তোলে মনুষ্যবাস, সৃষ্টি করে জনপদ। তখন এ-উপকূলীয় বৃক্ষাচ্ছাদিত বন্যপ্রণীর বিপদ-সম্ভাবনা সঙ্কুল এলাকায় কেবলই ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী গৃহস্থালীই ছিল, বাঙালি গৃহস্থালী ছিল না। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে দেশের প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালিদের অনুপ্রবেশে ক্রমান্বয়ে বাঙালি গৃহস্থালীর সংখ্যাধিক্য ঘটে। মূলত ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর প্রচ্ছন্ন সরকারি উৎসাহে এ-সব এলাকায় বাঙালিদের অধিকহারে অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এছাড়া নানান টানাপড়েনে রাখাইনদের বার্মায় প্রত্যাবর্তনও সংখ্যালঘু হওয়ার একটি কারণ। নিম্নে ৭.১ নং সারণি ও ৭.১ নং চিত্রে গ্রাম তিনটির বর্তমান বাঙালি ও রাখাইন গৃহস্থালী পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

সারণি- ৭.১

তিনটি গ্রামের রাখাইন ও বাঙালি গৃহস্থালী পরিসংখ্যান

গ্রামের নাম	রাখাইন গৃহস্থালী		বাঙালি গৃহস্থালী						মোট গৃহস্থালী	শতাংশ
	গৃহস্থালী	শতাংশ	বাঙালি (মুসলমান)		বাঙালি (হিন্দু)		মোট বা. গৃ.	শতাংশ		
			গৃহস্থালী	শতাংশ	গৃহস্থালী	শতাংশ				
হাড়িপাড়া	১৪	১১.৫৭	৯৪	৭৭.৬৮	১৩	১০.৭৪	১০৭	৩৫.২০	১২১	৩৬.৩৪
মধুপাড়া	৯	১৩.৮৫	৫৬	৮৬.১৫	–	–	৫৬	১৮.৪২	৬৫	১৯.৫২
তুলাতুলিপাড়া	৬	৪.০৮	১৪১	৯৫.৯২	–	–	১৪১	৩৬.৩৮	১৪৭	৪৪.১৪
সর্বমোট	**২৯**	–	**২৯১**	–	১৩	–	৩০৪	১০০.০০	**৩৩৩**	**১০০.০০**

উৎস : গবেষকের শুমারি জরিপ, মার্চ ২০১৮

চিত্র– ৭.১
তিনটি গ্রামের রাখাইন ও বাঙালি গৃহস্থালী

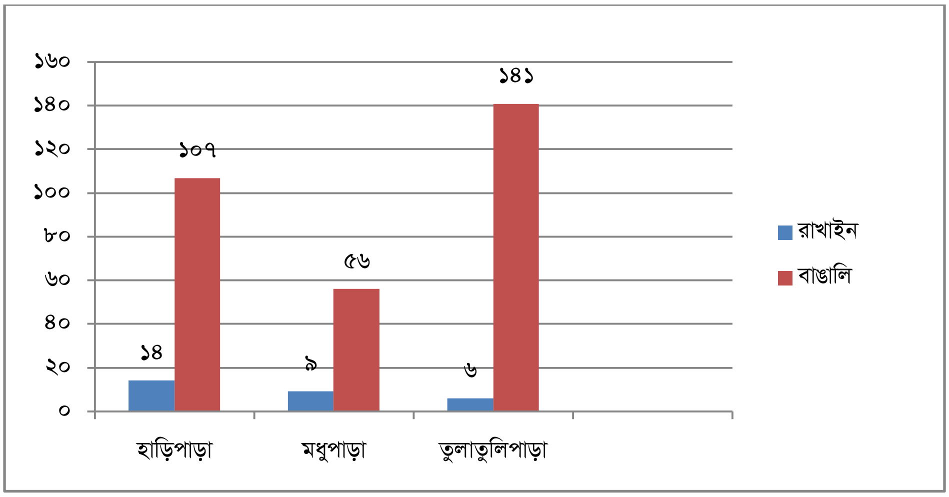

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

সারণি-৭.১ ও চিত্র– ৭.১ পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, তিনটি গ্রামের মোট গৃহস্থালীর সংখ্যা ৩৩৩। এরমধ্যে হাড়িপাড়ায় ১২১টি, মধুপাড়ায় ৬৫টি ও তুলাতুলিপাড়ায় ১৪৭টি গৃহস্থালী আছে।

হাড়িপাড়ায় ১২১টি গৃহস্থালীর মধ্যে রাখাইন মাত্র ১৪টি অর্থাৎ ১১.৫৭%, বাকি ১০৭টি অর্থাৎ ৮৮.৪৩% গৃহস্থালীই বাঙালিদের। যার মধ্যে ৯৪টি অর্থাৎ ৭৭.৬৮% বাঙালি মুসলমানের ও ১৩টি অর্থাৎ ১০.৭৪% বাঙালি হিন্দুদের। মধুপাড়ায় ৬৫টি গৃহস্থালীর মধ্যে রাখাইন মাত্র ৯টি অর্থাৎ ১৩.৮৫%, বাকি ৫৬টি অর্থাৎ ৮৬.১৫% গৃহস্থালীই বাঙালি মুসলমানদের। তুলাতুলিপাড়ায় ১৪৭টি গৃহস্থালীর মধ্যে রাখাইন মাত্র ৬টি অর্থাৎ ৪.০৮%, অবশিষ্ট ১৪১টি গৃহস্থালীই অর্থাৎ ৯৫.৯২% বাঙালিদের, যার সবই বাঙালি মুসলমানদের। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, এই তিনটি গ্রামের ৩৩৩টি গৃহস্থালীর মধ্যে আদিবাসী রাখাইন গৃহস্থালী মাত্র ২৯টি অর্থাৎ ৮.৭১%। অবশিষ্ট ৩০৪টি অর্থাৎ ৯১.২৯% গৃহস্থালী বাঙালি যার মধ্যে ২৯১টি অর্থাৎ ৯৫.৭২% বাঙালি মুসলমান ও ১৩টি অর্থাৎ ৪.২৮% বাঙালি হিন্দু গৃহস্থালী রয়েছে। এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, তিনটি গ্রামের মধ্যে হাড়িপাড়াতে রাখাইন গৃহস্থালীর সংখ্যা বেশি। একক হাড়িপাড়াতে ১৪টি রাখাইন গৃহস্থালী আছে এবং মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়া মিলে আছে ১৫টি গৃহস্থালী। দলগত আলোচনা থেকে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে গ্রাম তিনটিতে কোন নতুন রাখাইন গৃহস্থালীর সৃষ্টি হয়নি। উপরন্তু, ২০১৭ সালে মধুপাড়া থেকে একটি ভূমিহীন গৃহস্থালী তালতলী উপজেলাতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তর করেছে।[১] এছাড়াওএকদা অতীতে পার্শ্ববর্তী যে আইমপাড়াস্থ স্কুলে আশপাশের গ্রামের রাখাইনরা কাদাপানি মাড়িয়ে লেখাপড়া করতে যেত, সেই গ্রামও প্রায় দুই দশক ধরে রাখাইন গৃহস্থালী শূন্য। পাশের অপর গ্রাম কানকুনি থেকে শেষ রাখাইন গৃহস্থালীটি অন্যত্র চলে যাওয়ায় গ্রামটি রাখাইন শূন্য হয়েছে ৩ বছর আগে। তাই দেখা যাচ্ছে, একদিকে বাঙালিদের গৃহস্থালী যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অপরদিকে রাখাইনদের গৃহস্থালী সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। রাখাইন গৃহস্থালী লোপ পাচ্ছে মূলত পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিকে থাকতে না পারার কারণে।

৭.২ তিনটি গ্রামের জনসংখ্যা

আগেই বলা হয়েছে, গ্রাম তিনটিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রাখাইন ও বাঙালিদের বসবাস। বাঙালিদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক হিন্দু ও বেশির ভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। তবে কোন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বাস নেই। রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। গবেষক মুস্তাফা মজিদ (১৯৯২), অধ্যাপক আবদুল মাবুদ খান (২০০৬), অধ্যাপক আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস (১৯৯৬) সহ বিভিন্ন গবেষক উল্লেখ করেছেন, পটুয়াখালীর এসকল গ্রামে রাখাইনরা প্রথম জনবসতি গড়ে তোলে। রাখাইরাও এমনটি দাবি করে। বাঙালিরা প্রথম দিকে কাজের সন্ধানে এসব এলাকায় যেত, বিশেষ করে কৃষি মৌসুমে। ধান কাটতে অনেক দিন লাগতো, তখন বাঙালিরা রাখাইনদের পাশাপাশি আশেপাশের এলাকায়

বসবাস শুরু করে। এভাবে ধীরে ধীরে বাঙালিদের যেমন সংখ্যাধিক্য ঘটে, তেমনি জীবনধারণের আয়োজনে ব্যর্থ হয়ে এবং নানান প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তির মুখে নির্ভরশীলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে অনেক রাখাইন বার্মাসহ আশপাশের এলাকায় স্থানান্তর করে। এভাবে এ-গ্রামগুলাতে তাদের লোকসংখ্যা দিন দিন কমতে থাকে এবং কোন কোন গ্রাম একবারেই রাখাইন শূন্য হয়ে পড়ে। নিম্নের ৭.২ নং সারণিতে গ্রামগুলোর রাখাইন ও বাঙালি তথা সমূদয় জনসংখ্যার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.২

তিনটি গ্রামের রাখাইন ও বাঙালি জনসংখ্যার পরিসংখ্যান

গ্রামের নাম	রাখাইন			বাঙালি							মোট (%)
				মুসলমান			হিন্দু			মোট (%)	
	পুরুষ	নারী	মোট (%)	পুরুষ	হারী	মোট(%)	পুরুষ	নারী	মোট (%)		
হাড়িপাড়া	৩৭	১৯	৫৬ (১০.৪৫)	২২২	২১৬	৪৩৮ (৮১.৭২)	২৪	১৮	৪২ (৭.৮৪)	৪৮০ (৩৩.১৭)	৫৩৬ (৩৩.৯৭)
মধুপাড়া	২০	২৫	৪৫ (১৫.০৫)	১৩১	১২৩	২৫৪ (৮৪.৯৫)	-	-	-	২৫৪ (১৭.৫৫)	২৯৯ (১৮.৯৫)
তুলাতুলিপাড়া	১৭	১৩	৩০ (৪.০৪)	৩৫১	৩৬২	৭১৩ (৯৫.৯৬)	-	-	-	৭১৩ (৪৯.২৭)	৭৪৩ (৪৭.০৮)
সর্বমোট	**৭৪**	**৫৭**	**১৩১** (৮.৩০)	**৭০৪**	**৭০১**	**১৪০৫** (৮৯.০৪)	**২৪**	**১৮**	**৪২** (২.৬৬)	**১৪৪৭** (১০০.০০)	**১৫৭৮** **(১০০.০০)**

উৎস : গবেষকের শুমারি জরিপ, মার্চ ২০১৮

চিত্র– ৭.২

তিনটি গ্রামের রাখাইন ও বাঙালি জনসংখ্যা

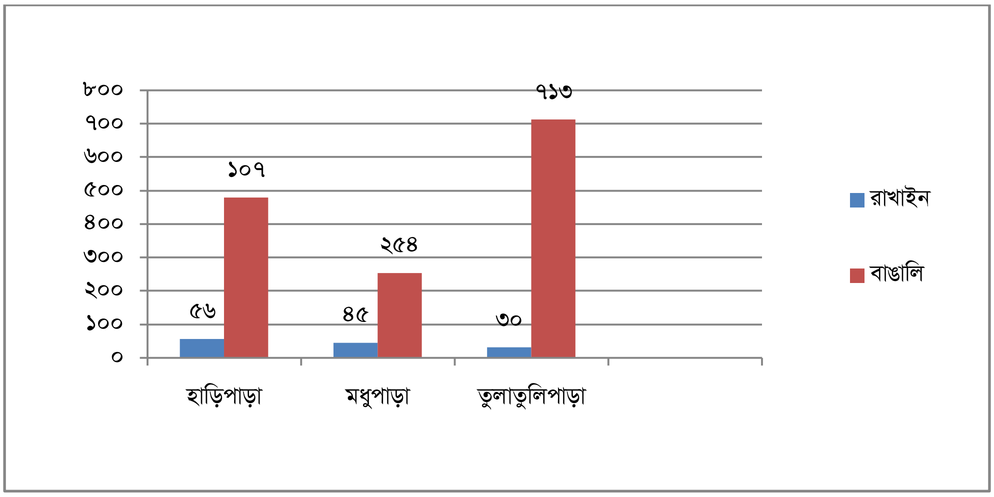

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

সারণি ৭.২ ও চিত্র ৭.২ পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, বাঙালি ও রাখাইন মিলে তিনটি গ্রামের মোট জনসংখ্যা ১৫৭৮ জন। এরমধ্যে আদিবাসী রাখাইন ১৩১ জন অর্থাৎ ৮.৩০%। বাকি ১৪৪৭ জন অর্থাৎ ৯১.৭০% বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু । এই ১৪৪৭ জনের মধ্যে মাত্র ৪২ জন হিন্দু, বাকি ১৪০৫ জনই মুসলমান। রাখাইন ১৩১ জনের মধ্যে পুরুষ ৭৪ জন এবং নারী ৫৭ জন। মুসলমান ১৪০৫ জনের মধ্যে পুরুষ ৭০৪ জন এবং নারী ৬৯৫ জন। হিন্দু ৪২ জনের মধ্যে পুরুষ ২৪ জন ও নারী ১৮ জন। এটা স্পষ্ট যে, গবেষণাধীন তিনটি গ্রামের মধ্যে হাড়িপাড়াতে রাখাইন জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি। তিনটি গ্রামের ১৩৭ জন রাখাইনের মধ্যে ৬১ জনই হাড়িপাড়ায় বাস করে। অবশিষ্ট ৭৬ জনের বাস মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ায়। এরমধ্যে ৪৭ জন মধুপাড়ায় ও ২৯ জন তুলাতুলিপাড়ায় বাস করে।

আগেই বলা হয়েছে, গবেষণা এলাকার বাঙালি সকলে বহিরাগত। দেশের বিভিন্ন জেলা বিশেষ করে পাশ্ববর্তী বরিশাল, বরগুনা, ফরিদপুর ও পটুয়াখালী জেলার অপরাপর থানা থেকে তারা অভিবাসন করে এখানে বসতি স্থাপন করে। হাড়িপাড়ার লা সেখে মাতবরের এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, তিনি ৬৮ বছর যাবৎ হাড়িপাড়ায় বসবাস করে আসছেন। আমতলী থানার আগাতুলাতুলি পাড়া থেকে বৈবাহিকসূত্রে তিনি হাড়িপাড়ায় আগমন করেন। প্রথমজীবনে হাড়িপাড়ার আশেপাশে কোনো হিন্দু-মুসলমানের বসতি তিনি দেখেননি। তাঁর মতে, ১৯৩৬ সালের শেষদিকে উক্ত এলাকায় হিন্দু মুসলমানদের বসতি গড়ে উঠতে শুরু করে (খান, ২০০৬: ১০০)।

আব্দুল মাবুদ খান পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী ১৯৭৯ সালে এই তিনটি গ্রামে ২৩টি রাখাইন পরিবারের মোট জনসংখ্যা ছিল মোট ১১৮ জন(২০০৬: ১০৯)। এই গ্রাম তিনটিতে ২০১৮ সালে

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায় ২৯টি পরিবারে মোট ১৩১ জন লোক। প্রায় ৪০ বছরের ব্যবধানে পরিবার বেড়েছে মাত্র ৬টি, জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১৩ জন। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে স্বাভাবিক হার তার তুলনায় রাখাইন জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ যে নিতান্ত কম তা বলাই বাহুল্য। নিম্নের ৭.৩ নং সারণিতে গ্রাম তিনটির ১৯৭৯ ও ২০১৮ সালের মধ্যকার প্রায় ৪০ বছরের ব্যবধানে গৃহস্থালী ও জনসংখ্যার তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণি– ৭.৩

১৯৭৯ ও ২০১৮ সালে তিনটি গ্রামের রাখাইন গৃহস্থালী ও জনসংখ্যার তুলনামূলক চিত্র

গ্রামের নাম	১৯৭৯ সাল				২০১৮ সাল			
	গৃহস্থালী	পুরুষ	নারী	মোট	গৃহস্থালী	পুরুষ	নারী	মোট
হাড়িপাড়া	১৬	৪৩	৩৪	৭৭	১৪	৩৭	১৯	৫৬
মধুপাড়া	৫	১৫	১৬	৩১	৯	২০	২৫	৪৫
তুলাতুলিপাড়া	২	৪	৬	১০	৬	১৭	১৩	৩০
সর্বমোট	**২৩**	**৬২**	**৫৬**	**১১৮**	**২৯**	**৭৪**	**৫৭**	**১৩১**

উৎস : খান (২০০৬: ১০৯) ও গবেষকের শুমারি জরিপ (মার্চ ২০১৮)

উপর্যুক্ত ৭.৩ নং সারণি থেকে স্পষ্ট যে, ১৯৭৯ সালে এই তিনটি গ্রামে রাখাইন গৃহস্থালী ছিল ২৩টি। এরমধ্যে হাড়িপাড়ায় সর্বাধিক সংখ্যক ১৬টি, মধুপাড়ায় ৫টি ও তুলাতুলিপাড়ায় ২টি গৃহস্থালী ছিল। ২০১৮ সালে এসে তিনটি গ্রামে ২৯টি গৃহস্থালী পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৪০ বছর পরে এসে মাত্র ৬টি গৃহস্থালী বর্ধিত হয়েছে। হাড়িপাড়ায় ১৬টি গৃহস্থালী থেকে কমে ১৪টিতে দাঁড়িয়েছে। এই পরিবর্তন নিম্নমুখী। অন্য দুটি গ্রামে অবশ্য গৃহস্থালী সংখ্যা সামান্য বেড়েছে। যেমন মধুপাড়ায় ১৯৭৯ সালে যেখানে ৫টি গৃহস্থালী ছিল, ২০১৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৯টিতে দাঁড়িয়েছে এবং তুলাতুলিপাড়ায় ২টি থেকে ৪টি বৃদ্ধি পেয়ে ৬টিতে দাঁড়িয়েছে। দলগত আলোচনা থেকে জানা যায়, অনেকে বার্মায় চলে যাওয়ায় তুলাতুলিপাড়াটি এক পর্যায়ে আশপাশের আরো কয়েকটি গ্রামের মতো রাখাইনশূন্য হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তবে পূর্বের দুটি পরিবার শেষ পর্যন্ত থেকে যাওয়ার কারণে পরবর্তী বংশধরদের দ্বারা পরবর্তীকালে এখানে ৬টি পরিবার তৈরি হয়েছে।[২]

১৯৭৯ সালের জরিপ অনুযায়ী তিনটি গ্রামের মোট ১১৮ জন লোকের মধ্যে পুরুষ ৬২ জন ও নারী ৫৬ জন। ২০১৮ সালে গবেষকের পরিচালিত জরিপে দেখা যায় তিনটি গ্রামের মোট রাখাইন জনসংখ্যা ১৩১ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ৭৪ জন ও নারী ৫৭ জন। অর্থাৎ ৪০ বছরের ব্যবধানে জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১৩ জন। তবে তিনটি গ্রামের একত্রে জনসংখ্যা কিছুটা বাড়লে গ্রামভিত্তিক

চিত্র ভিন্ন। অর্থাৎ একটি গ্রামে জনসংখ্যা না বেড়ে বরং কমে গেছে। মাবুদ খানের জরিপ তথ্য অনুসারে ১৯৭৯ সালে গ্রাম তিনটির ১১৮ জন রাখাইনের মধ্যে হাড়িপাড়ায় ছিল সর্বাধিক ৭৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ছিল ৪৩ জন ও নারী ছিল ৩৪ জন। ২০১৮ সালে অর্থাৎ ৪০ বছরের মাথায় হাড়িপাড়ার জনসংখ্যা কমে পুরুষ ৩৭ জন ও নারী ১৯ জন মিলে সর্বমোট ৫৬ জন হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা ২১ জন কমে গেছে। ১৯৭৯ সালে মধুপাড়ায় মোট রাখাইন ছিল ৩১ জন, যারমধ্যে পুরুষ ১৫ জন ও নারী ১৬। ২০১৮ সালে মধুপাড়ার রাখাইন ৪৫ জন। অর্থাৎ ১৪ জন বেড়েছে। আবার, তুলাতুলিপাড়ায় ১৯৭৯ সালে ৪ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী মিলে মোট লোক ছিল ১০ জন। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ জন।

সারণি ৭.৩ থেকে বোঝা যায় যে, ৪০ বছরের ব্যবধানে তিনটি গ্রামের রাখাইন জনসংখ্যা যে পরিমাণ হওয়ার কথা ছিল বিদ্যমান জনসংখ্যা সে তুলনায় কম। এর একটি কারণ হলো, তাদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো তাদের অভিবাসন। কয়েকটি পরিবার ভবিষ্যৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে তাদের পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান মিয়ানমারে অভিবাসন করেছে। বর্তমানে কোন কোন পরিবার দোদুল্যমানতার মধ্যে বসবাস করছে। যদি তারা মনে করে যে, আর টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না, তখন হয়তো বাধ্য হয়ে জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে মিয়ানমারে পাড়ি দেবে বলে সাক্ষাৎদাতাদের কেউ কেউ জানিয়েছেন। এছাড়া ভরণ-পোষণের দুশ্চিন্তা থেকে রাখাইন পুরুষদের অনেকে বিয়ে না করার কারণে নতুন পরিবার গঠিত হচ্ছে না, জনসংখ্যাও বাড়ছে না।

৭.৩ লিঙ্গ ও বয়সভেদে রাখাইন জনগোষ্ঠীর বিন্যাস

জনসংখ্যার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বয়স ও লিঙ্গ। রাখাইনদের আয়ুষ্কাল বাঙালিদের মতোই। উত্তরদাতাদের মধ্যে কম বয়সি কেউ নেই। বেশিরভাগ উত্তরদাতার বয়স ৫০-এর উর্ধ্বে। দুইজন উত্তরদাতা ব্যতীত সবাই পুরুষ। হাড়িপাড়া ও মধুপাড়ায় দুইজন নারী উত্তরদাতা আছে। নিম্নের সারণিতে উত্তরদাতাদের বয়স ও লিঙ্গ বিন্যাস দেখানো হলো।

সারণি– ৭.৪

রাখাইন উত্তরদাতাদের বয়ঃবিন্যাস

বয়স শ্রেণি	হাড়িপাড়া			মধুপাড়া			তুলাতুলিপাড়া			মোট পুরুষ	মোট নারী	মোট জন.	শতকরা হার
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট				
২৯ পর্যন্ত	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩০–৩৯	২	-	২	২	-	২	-	-	-	৪	-	৪	১৩.৭৯

৪০–৪৯	৫	-	৫	-	-	-	৩	-	৩	৮	-	৮	২৭.৫৯
৫০–৫৯	১	-	১	৪	-	৪	১	-	১	৬	-	৬	২০.৬৯
৬০-৬৯	৪	-	৪	২	-	২	১	-	১	৭	-	৭	২৪.১৪
৭০ তদূর্ধ্ব	১	১	২	-	১	১	১	-	১	২	২	৪	১৩.৭৯
সর্বমোট	**১৩**	**১**	**১৪**	**৮**	**১**	**৯**	**৫**	**১**	**৬**	**২৭**	**৩**	**২৯**	**১০০**

উৎস : মাঠগবেষণা ২০১৮

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, ২৯ জন গৃহস্থালী প্রধানের মধ্যে ৩০ বছরের কম বয়সি কেউ নেই। কেননা রাখাইনরা অল্প বয়সে বিয়ে করে না। তাদের মধ্যে ২৫ জনের অর্থাৎ শতকার ৮৬.২ ভাগের বয়স ৪০-এর ঊর্ধ্বে। সর্বাধিক ৮ জন অর্থাৎ ২৭.৬% উত্তরদাতা ৪১-৫০ বছর বয়সি। ৬০-এর কোটায় আছে ৭ জন অর্থাৎ ২৮.১৪%। ৭০-এর ঊর্ধ্বে ৪ জন অর্থাৎ ১৩.৮%। ১৭ জনের অর্থাৎ ৫৮.৬% এরবয়স ৫০-ঊর্ধ্ব, যে বয়সে উপার্জন ক্ষমতা কমতে থাকে। দেখা যাচ্ছে নতুন পরিবার গঠন হচ্ছে না। কোন কোন সদস্য বিয়ে করলেও যৌথ পরিবারের মধ্যে বসবাস করছে। বিগত ১ দশকে নতুন পরিবারের সূচনা হয়নি। লিঙ্গানুসারে কেবল ২ জন গৃহস্থালী প্রধান নারী, বয়স সত্তরোর্ধ্ব। এ থেকে বোঝা যায় রাখাইনরা বর্তমানে পিতৃতান্ত্রিক ধারা অনুসরণ করে থাকে, যদিও সুদূর অতীতে তাদের জীবনাচরণের অনেক ক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অনেক বৈশিষ্ট্য অনুসৃত হতে দেখা গেছে।

অপরদিকে, ১৩১ গৃহস্থালী সদস্যের মধ্যে ৬০ বছর অতিক্রম করেছে ২০ জন অর্থাৎ ১৫.২৭%। ২৫ জনের (৮৬.২%) বয়স ৪০-এর ঊর্ধ্বে। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৬ ভাগই ২০-৪০ বছর বয়সি নারী-পুরুষ নিয়ে গঠিত। লিঙ্গভেদে সর্বাধিক সংখ্যক ১৩ জন করে নারী আছে ১০-১৯ ও ৩০-৩৯ বয়ঃশ্রেণিতে। যেখানে সর্বাধিক ১৮ জন পুরুষ আছে ২০-২৯ বয়সি। ৬০-ঊর্ধ্ব নারী আছে ৮ জন অর্থাৎ ৬.১১%, যেখানে পুরুষ ১০ জন অর্থাৎ ৭.৬৩%। নিম্নের সারণি ৭.৪ থেকে রাখাইনদের বয়স ও লিঙ্গ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি– ৭.৫
বয়স ও লিঙ্গভেদে রাখাইন জনসংখ্যার বণ্টন

বয়স শ্রেণি	হাড়িপাড়া			মধুপাড়া			তুলাতুলিপাড়া			মোট পু. (%)	মোট না. (%)	মো. জনসংখ্যা (%)
	পু.	না.	মোট	পু.	না.	মোট	পু.	না.	মোট			
০–৯	৩	০	৩	২	০	২	০	৪	৪	৫ (৫৫.৫৬)	৪ (৪৪.৪৪)	৯ (৬.৮৭)
১০–১৯	৬	২	৮	৩	৪	৭	২	৭	৯	১১ (৪৫.৮৩)	১৩ (৫৪.১৭)	২৪ (১৮.৩২)
২০–২৯	৭	৩	১০	৪	২	৬	৭	২	৯	১৮ (৭২.০০)	৭ (২৮.০০)	২৫ (১৯.০৮)
৩০–৩৯	৫	৭	১২	২	৩	৫	৩	৩	৬	১০	১৩	২৩

										(৪৩.৪৮)	(৫৬.৫২)	(১৭.৫৬)
৪০–৪৯	৬	২	৮	৩	১	৪	১	৫	৬	১০ (৫৫.৫৬)	৮ (৪৪.৪৪)	১৮ (১৩.৭৪)
৫০–৫৯	২	২	৪	১	০	১	৫	২	৭	৮ (৬৬.৬৭)	৪ (৩৩.৩৩)	১২ (৯.১৬)
৬০-৬৯	৪	২	৬	০	১	১	২	১	৩	৬ (৬০.০০)	৪ (৪০.০০)	১০ (৭.৬৩)
৭০ তদূর্ধ্ব	৪	১	৫	২	২	৪	০	১	১	৬ (৬০.০০)	৪ (৪০.০০)	১০ (৭.৬৩)
সর্বমোট	**৩৭** (৬৬.০৭)	**১৯** (৩৩.৯৩)	**৫৬** (১০০.০০)	**১৭** (৫৬.৬৭)	**১৩** (৪৩.৩৩)	**৩০** (১০০.০০)	**২০** (৪৪.৪৪)	**২৫** (৫৫.৫৬)	**৪৫** (১০০.০০)	**৭৪** (৫৬.৪৯)	**৫৭** (৪৩.৫১)	**১৩১** (১০০.০০)

উৎস : গবেষকের শুমারি জরিপ, মার্চ ২০১৮

উপরের সারণি-৭.৫ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বয়সভেদে মোট ১৩১ জন জনসংখ্যার মধ্যে ৯ জনের অর্থাৎ ৬.৮৭% এর বয়স ০-৯ বছরের মধ্যে, ২৪ জনের অর্থাৎ ১৮.৩২% ভাগ ১০-১৯ বছর, ২৫ জনের অর্থাৎ ১৯.০৮% ভাগ ২০-২৯ বছর, ২৩ জনের অর্থাৎ ১৭.৫৬% ভাগ ৩০-৩৯ বছর, ১৮ জনের অর্থাৎ ১৩.৭৪% ভাগ ৪০-৪৯ বছর, ১২ জনের অর্থাৎ ৯.১৬% ভাগ ৫০-৫৯ বছর; এ-ছাড়া ১০ জন করে অর্থাৎ ৭.৬৩% করে যথাক্রমে ৬০-৬৯ ও ৭০-উর্ধ্ব বয়সের লোক। তিনটি গ্রামে অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল ০-১৪ বছর বয়সের শিশু-কিশোর আছে ১৭ জন যা মোট রাখাইন জনসংখ্যার ১২.৯৮%। ৬০-উর্ধ্ব বয়সের বৃদ্ধ লোক আছে মোট ২০ জন অর্থাৎ ১৫.২৬%। কর্মক্ষম ১৫-৫৯ বছর বয়সের লোক আছে ৯৪ জন অর্থাৎ ৭১.৭৬%। এই সারণি থেকে আরো স্পষ্ট যে, গ্রাম তিনটিতে ২০-২৯ বছর বয়সি লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি– ২৫ জন অর্থাৎ ১৯.০৮%; এবং ০-৯ বয়োশ্রেণির জনসংখ্যা সবচেয়ে কম– ৯ জন অর্থাৎ ৬.৮৭%। ৩২ জনের (২৪.৪৩%) বয়স ৫০-উর্ধ্ব, যে বয়সে উপার্জন ক্ষমতা কমতে থাকে।

চিত্র–৭.৩

বয়ঃশ্রেণিভিত্তিতে রাখাইন জনসংখ্যা

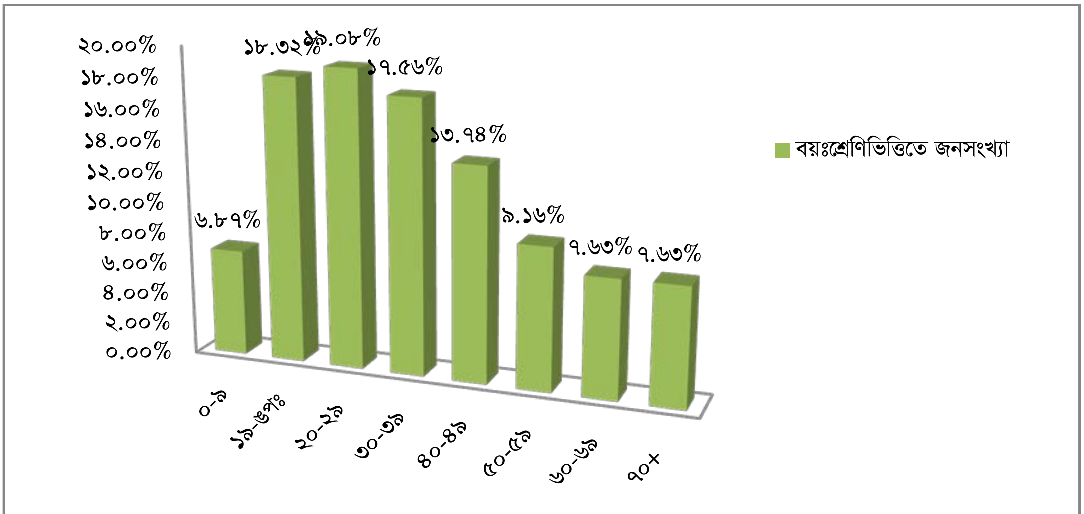

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

Dhaka University Institutional Repository

লিঙ্গ ভেদে দেখা যায়, সর্বাধিক ১৩ জন করে (৯.৯২%) মোট ২৬ জন (১৯.৮৪%) নারী যথাক্রমে ১০-১৯ ও ৩০-৩৯ বছর বয়ঃশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত; সেখানে এই দুই বয়ঃশ্রেণিতে পুরুষ কম–যথাক্রমে ১১ জন (৮.৪০%) ও ১০ জন (৭.৬৩%)। অর্থাৎ এ-স্তরে নারী জনসংখ্যা পুরুষের চেয়ে বশি। ৬০-উর্ধ্ব নারী আছে মোট ৮ জন অর্থাৎ ৬.১১%; সেখানে পুরুষ আছে ১২ জন (৯.১৬%)। তবে মোট জনসংখ্যার ৭৮ জনের (৫৯.৫৪%) বয়স ২০-৬০ বছরের মধ্যে।

৭.৪ রাখাইনদের ভাষা-দক্ষতা

কথায় বলে, 'মানুষ বেঁচে থাকে ভাষায়'। একটি জাতির জীবনে ভাষার গুরুত্ব কতখানি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৯৫২-এর মাতৃভাষা আন্দোলন, যা বাঙালিকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধে নিয়ে; প্রাণদানে অনুপ্রাণিত করে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। সেই স্বাধীনতাযুদ্ধজাত রাষ্ট্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা রক্ষার প্রয়াস সীমিতই বলা চলে। প্রসঙ্গত বিশ্ব ভাষা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ভাষা বিষয়ক তথ্য সরবরাহকারী ওয়েবসাইট এথনোলগের মতে, বর্তমান পৃথিবীতে আনুমানিক ৭০৯৭টি ভাষা বেঁচে আছে। এরমধ্যে ২ হাজার ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা ১ হাজারের কম। এছাড়া মোট ভাষার মাত্র অর্ধেকের আছে লিখিত রূপ। এসব ভাষায় ব্যবহার করা হয় ৪৬ ধরনের বর্ণমালা। বাকিগুলো কেবল মৌখিকভাবেই চর্চিত আছে। ইউনেস্কোর মতে, এ-শতাব্দীতে পৃথিবীতে অর্ধেকের বেশি ভাষা বেঁচে থাকবে না। কলম্বিয়া বিশ্বদ্যিালয়ের ভাষাতাত্ত্বিক ভাষাকেন্দ্রিক গবেষণার তথ্যানুযায়ী আগামী ২১১৫ সালে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে শুধু ৬০০টি ভাষা। আর কঠিন বাস্তবতা হলো প্রতি ১৪ দিনে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে একটি করে ভাষা (নাসরীন, ২০১৯)। বিশ্বব্যাপী আদিবাসীদের ভাষা পরিস্থিতির বাস্তবতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে জাতিসংঘ ২০১৯ সালে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে 'Indigenous Languages', যার মূল সুরের সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম দেশে দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে– 'আদিবাসী ভাষা চর্চা ও সংরক্ষণে এগিয়ে আসুন' (*যুগান্তর*, ৯.৮.২০১৯)।

গবেষণা এলাকার উত্তরদাতা ও সদস্যরা সকলে রাখাইন ভাষা ছাড়াও কমবেশি বাংলা ভাষা বলতে পারে। কেননা 'Speakers of ethnic languages for the communication with the majority people learn Bangla and for that they are bilinguals.' (Ali, 2017: 93) তবে লেখার ক্ষেত্রে তারতম্য আছে। ২৯ জন গৃহস্থালী প্রধানের মধ্যে রাখাইন ভাষা লিখতে পারে ২৫ জন (৮৬%), বাংলা লিখতে পারে ২০ জন (৬৯%)। গৃহস্থালী সদস্যদের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রজন্ম রাখাইন ভাষা লিখতে পারে না। নিম্নের সারণি ও চিত্রে উত্তরদাতাদের রাখাইন ও বাংলা ভাষা পারদর্শীতা তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৬

গ্রামভিত্তিক রাখাইন গৃহস্থালী প্রধানদের ভাষা-দক্ষতা

ভাষা দক্ষতা	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা	মোট	শতাংশ

	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া	গণসংখ্যা	
রাখাইন ভাষা বলতে পারেন	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০
রাখাইন ভাষা লিখতে পারেন	১২	৭	৬	২৫	৮৬.২১
বাংলা ভাষা বলতে পারেন	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০
বাংলা ভাষা লিখতে পারেন	১১	৭	২	২০	৬৫.৫২

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র :৭.৪
রাখাইন গৃহস্থালী প্রধানদের ভাষা-দক্ষতা

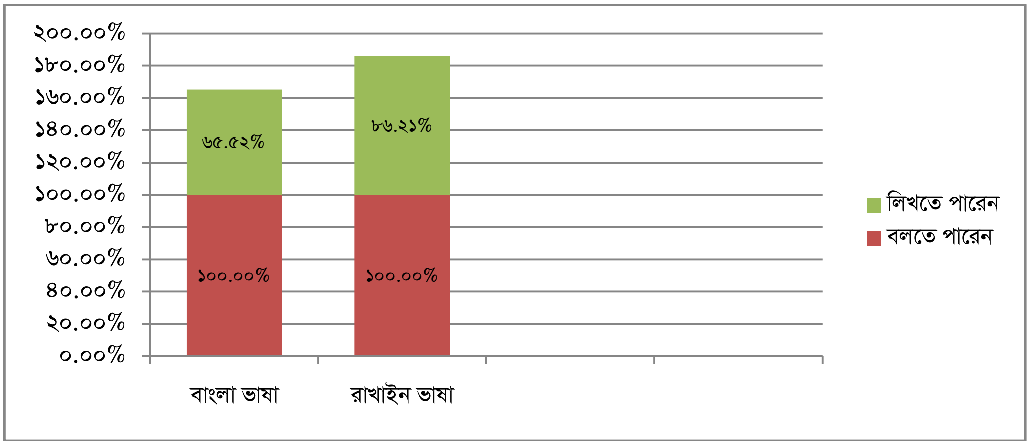

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

উপরোক্ত সারণি ও চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১০০% গৃহস্থালী রাখাইন ও বাংলা ভাষা বলতে পারে। তবে সকলে লিখতে পারে না। কারণ তাদের শিক্ষা নেই।আবার রাখাইন ভাষার চেয়ে বাংলা লিখতে পারে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক উত্তরদাতা। এর কারণ তারা ছোটবেলায় মাতৃভাষা রাখাইন অল্প-বিস্তর শিখেছে, কিন্তু বাংলা মাধ্যমে পড়ালেখা করেনি। অপরদিকে, নতুন প্রজন্মের রাখাইনরা মাতৃভাষায় কথা বললেও লিখতে পারে না। রাখাইন ছেলে-মেয়েদের নিজ মাতৃভাষা লিখতে না পারার অন্যতম কারণ এই ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না থাকা। এমনকি আগে পিতামাতারা বাড়িতে শিক্ষা দিত কিংবা স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল– এসবের কোনকিছুই চালু নেই। উল্লেখ্য, উত্তরদাতাদের কেউ কেউ সামান্য বাংলা বলতে পারলেও বোঝে কম। খুবই সাধারণ বিষয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলেও অন্যান্য বিষয়ে একেবারেই যোগাযোগ করতে সক্ষম হন না।

অতীতে প্রত্যেক গ্রামে নিজেদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চং বা টোলে শিশুদের পড়ালেখা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। এই ধরনের গ্রামভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। আব্দুল আওয়াল বিশ্বাস (১৯৯৬: ১৩৬) স্কুলের নাম উল্লেখ করেছেন 'কিয়াং', মাবুদ খান (২০০৬: ৪০) উল্লেখ করেন 'ফুঙ্গী' নামে। গবেষণাধীন গ্রামগুলোতে তা চং বা টোল বলা হয়। গ্রাম তিনটিতে প্রায়

২৫ বছর ধরে সেগুলো বন্ধ। টোল চালানোর সামর্থ্য রাখাইনদের নেই। রাখাইন ভাষার বইও দুষ্প্রাপ্য। উত্তরদাতারা সকলে জানান যে, স্কুলে রাখাইন ভাষা শেখানোর কোন ব্যবস্থা নেই। তারা মনে করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাখাইন ভাষা-পারদর্শী ও বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষক রাখা প্রয়োজন। অতীতের স্থানীয় টোল বর্তমানে না থাকার বিষয়ে উত্তরদাতাদের মনোভাব নিম্নের সারণি থেকে বোঝা যাবে।

সারণি– ৭.৭

স্থানীয় টোল ব্যবস্থা চালু না থাকার বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমত

অভিমত	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
আর্থিক সংগতি নেই	৭	৫	৩	১৫	৫১.৭২
শিক্ষক পাওয়া যায় না	১	১	-	২	৬.৯০
ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যায় না	২	২	১	৫	১৭.২৪
রাখা. ভাষা বাস্তবকাজে লাগে না	২	১	১	৪	১৩.৭৯
প্রাইমারি স্কুল তৈরি হওয়া	২	-	১	৩	১০.৩৪
সর্বমোট	**১৪**	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র ৭.৫

স্থানীয় টোল ব্যবস্থা চালু না থাকার বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমত

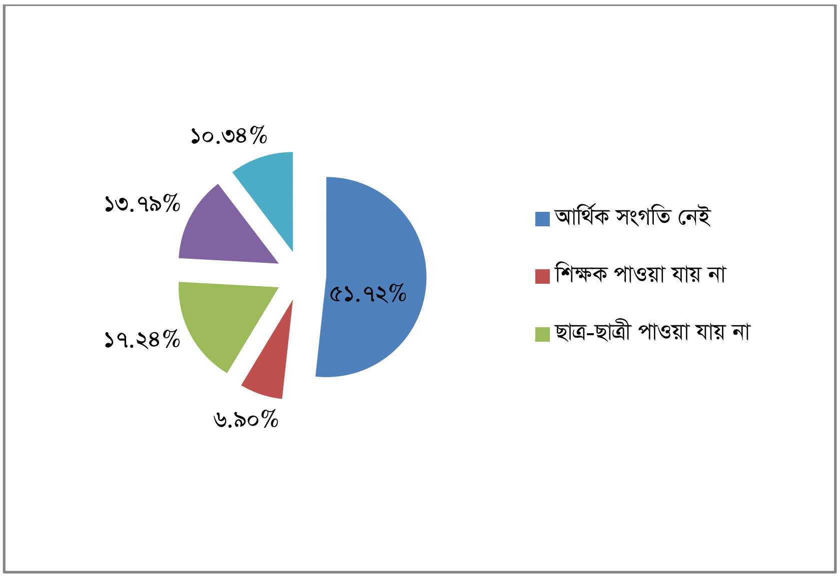

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

সারণি৭.৭ ও চিত্র ৭.৫ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ১৫ জন অর্থাৎ ৫১.৭২% মনে করেন যে, আর্থিক অসংগতির কারণে টোল ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষকের ব্যয়ভার বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ৫ জন অর্থাৎ ১৭.২৪% মনে করেন ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যায় না, ১৩.৭৯% মনে করেন রাখাইন ভাষা বাস্তবজীবনে কোন কাজে লাগে না সেজন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি কারো আগ্রহ থাকে না। উত্তরদাতাদের ২ জন অর্থাৎ ৬.৯% শিক্ষক না পাওয়া ও ১০.৩৪% গ্রাম এলাকায় সরকারি প্রাইমারি স্কুল তৈরি হওয়াকে স্থানীয় টোল ব্যবস্থা চালু না থাকার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে নিজস্ব এ-ব্যবস্থা চালু থাকলে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা অন্তত নিজেদের ভাষার বর্ণ-পরিচয় লাভ করার সুযোগ পেত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এরফলে যেটা অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে তা হলো– রাখাইন ভাষায় লেখাপড়া জানার মতো কোন লোক গবেষণা এলাকায় পাওয়া যাবে না। যাই হোক, এ-তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, স্থানীয় টোল না থাকার বিষয়ে প্রায় সবগুলো কারণের সাথে কম-বেশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে আর্থিক অসংগতি তৈরি হওয়া। যেজন্য টোল নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষকের ব্যয়ভার বহন, শিক্ষা-উপকরণ– যেমন রাখাইন ভাষার বই, ব্লাক-বোর্ড, স্লেট, খাতা, কলম ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহে সমস্যা প্রভৃতি কারণে ঐতিহ্যবাহী টোল ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের যে নিজস্ব স্বনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তা কেবল নির্ভরশীল সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ভর করেছে, যে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা শিক্ষাদানের কোন সুযো নেই। রাখাইন দরিদ্রতা ও নানাবিধ কারণে নিজেদের মাতৃভাষার ব্যবহার ক্রমশ কমিয়ে দিচ্ছে। কেননা রাখাইন ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগ সীমিত। ফলে শিশু সন্তানরা পরিবারে মাতৃভাষা শেখা ও বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নিম্নে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের রাখাইন ভাষা না জানার কেস-স্টাডি তুলে ধরা হলো।

কেস স্টাডি৩:তুলাতুলি পাড়ার স্কুলছাত্রীর রাখাইন ভাষা লিখতে পড়তে না পারা

তুলাতুলিপাড়ার লাবি মাতবর দম্পতির দুই ছেলে মেয়ে। মেয়ে বড়। তার নাম মেখেনে। বয়স ১৬ বছর। ছোট ছেলের নাম দিপু। তার বয়স ৮ বছর। লাবি মাতবর একজন কৃষক। তিনি বাংলা ভাষা বলতে ও লিখতে পারেন। রাখাইন ভাষাও বলতে ও লিখতে পারে। বড় মেয়ে মেখেনে তুলাতুলিপাড়া মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির ছাত্রী (২০১৮)। সে ২০২০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। মোটামুটি ভালোভাবে বাংলা বলতে পারে। আমি তাকে খাতা ও কলম দিয়ে তার নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ও কোন শ্রেণিতে পড়ে– এই চারটি তথ্য বাংলা, ইংরেজি ও রাখাইন তিন ভাষাতেই লিখতে বলি। সে বাংলা ও ইংরেজিতে তথ্যগুলো লিখে দিলো, কিন্তু রাখাইন ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

লিখলো না। তখন আমি তাকে রাখাইন ভাষায় না লেখার কারণ জিজ্ঞেস করি। জবাবে সে সলজ্জভাবে জানায়, 'আমি রাখাইন ভাষা বলতে পারি, লিখতে পারি না।'

এর কারণ হিসেবে আরো জানা গেল, পারিবারিকভাবে তারা রাখাইন ভাষায় কথা বলে। গ্রামে যখন নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা কথাবার্তা বলে তখন নিজেদের রাখাইন ভাষায় কথা বলে। এজন্য তারা স্বাভাবিকভাবেই রাখাইন ভাষা রপ্ত করে। কিন্তু অতীতের মতো রাখাইন ভাষায় পড়াশুনার কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বর্তমানে চালু নেই। এমনকি তার বাবা রাখাইন ভাষা কম-বেশি লিখতে পড়তে পারলেও তাকে কোনরকম শেখাননি। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে লাবি মাতবর জানান যে, 'এখন রাখাইন ভাষার বই পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই ভাষায় লেখা-পড়া করে কোন লাভ নেই।' অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বাস্তব জীবনে আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রে রাখাইন ভাষা কোনরকম কাজে আসে না। তাই রাখাইন ভাষায় লিখতে না পারলেও কোনপ্রকার অসুবিধা হবে না। শুধু শোনা-বোঝা করতে পারলে হবে।

কেস স্টাডি ৪ : হাড়িপাড়ার স্কুলছাত্রের রাখাইন ভাষা লিখতে পড়তে না পারা

হাড়িপাড়ার নিপু মাতবর ও মাখেনো দম্পতির একটি মাত্র সন্তান– ছেলে। নাম স্যাললয়েন। বয়স ১৪ বছর। সে তুলাতুলিপাড়া মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির ছাত্র (২০১৮)। আমি তাকেও তার নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ও কোন শ্রেণিতে পড়ে– এই চারটি তথ্য বাংলা, ইংরেজি ও রাখাইন তিন ভাষাতেই লিখতে বলি। স্যাললয়েনও বাংলায় এবং ইংরেজিতে লিখলো, কিন্তু রাখাইন ভাষায় লিখলো না। তাকেও রাখাইন ভাষায় না লেখার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, 'আমি রাখাইন ভাষা লিখতে পারি না, বলতে পারি।' সে জানায় ছোটবেলায় বাড়িতে প্রথম প্রথম রাখাইন ভাষার বর্ণমালা পড়া ও লেখা শিখলেও বর্তমানে ভুলে গেছে। এর কারণ সে পরবর্তীকালে আর চর্চা করেনি। এ-সম্পর্কে নিপু মাতবরও লাবি মাতবরের অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

৭.৫ রাখাইনদের শিক্ষাগত অবস্থা

রাখাইনদের সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সফলতা লক্ষ্য করা যায়। অতীতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান, ভাষা পরিস্থিতি ইত্যাদি কারণে রাখাইনদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ঘটেনি। তবে বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি এসেছে। এ-বিষয়ে ইতিপূর্বেকার গবেষণা থেকে তা বোঝা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, পটুয়াখালীর রাখাইন শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে গবেষক আবদুল মাবুদ খান (১৯৮৩: ১১) বলেন, বৌদ্ধ মন্দিরের পাঠশালায় শিক্ষা লাভের পর ছেলেমেয়েরা স্থানীয় বাংলা মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হলেও তাদের বেশিরভাগ পরবর্তীকালে স্কুলে যায় না। বাংলা ভাষা শেখা ও লেখাপড়াকে তারা খুবই কষ্টসাধ্য মনে করে। তদুপরি প্রান্তিক জনপদ হিসেবে

স্কুলের লেখাপড়ার অবনতিশীল মানের কারণে পড়াশুনা চালু রাখতে পারে না। এর সঙ্গে গবেষক মুস্তাফা মজিদ (১৯৯২) যাতায়াত সমস্যা ও দারিদ্র্যকে যুক্ত করেছেন। দেখা গেছে, স্বাধীনতার পর আশির দশকের শেষের দিকে রাখাইন গ্রামগুলোর আশপাশে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলেও দুষ্কর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আর্থিক দুরবস্থার জন্য তারা শিক্ষা সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। তিনি বলেন,

> "সাম্প্রতিককালে রাখাইন এলাকার আশেপাশে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কারণে সে সুযোগও ব্যাপকভাবে গ্রহণীয় হয়নি।"(মজিদ, ১৯৯২: ৮৪)

এছাড়াও অতীতে রাখাইনদের মধ্যে শিক্ষায় তেমন আগ্রহ ছিল না, বরং অনীহা ছিল বলে জানা যায়। অধ্যাপক আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস দেখতে পান, বেলকাটা গ্রামের অনেক রাখাইন শিশুই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না সামাজিক কারণে। সমতলের প্রতিবেশি শিশুদের সাথে তারা মিলেমিশে চলতে পারে না। তিনি বলেন, অল্প যে কজন প্রাইমারি স্কুল শেষ করে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়, ভাষা সমস্যা ও অন্যান্য কারণে তাদের অনেকে ঝরে পড়ে। যারা পাশ করে, তারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব, লেখাপড়ার খরচ নানা কারণে পড়াশুনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অভিভাবকরাও ব্যয়নির্বাহের দুশ্চিন্তা থেকে ছেলেদের মাঠে কৃষি কাজে ও মেয়েদের বাড়িতে বুননের কাজে নিযুক্ত করে (Biswas, 1986: 137)। তবে বর্তমান গবেষণায় শিক্ষার ফলাফল বেশ ভালো। শিশুদের কেউ নিরক্ষর নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। শিশুরা নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্কুলে পড়ালেখা করে। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া নেই বললেই চলে। মাধ্যমিক স্তরেও ঝরে পড়া কমে গেছে। যেখানে বিবিসি-এর ১৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের এক রিপোর্টে দেখা যায়, দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ঝরে পড়ছে প্রতি ৫ জনে ১ জন। আর ১০০ জন এসএসসি'র জন্য নিবন্ধন করলেও পরীক্ষায় বসছে মাত্র ৭০%। রাখাইনদের ক্ষেত্রে মূলত কলেজ থেকে পাস-ফেলের পর পড়াশুনা বন্ধ করতে দেখা গেছে। নিম্নের ৭.৭ ও ৭.৮ নং সারণি থেকে রাখাইন গৃহস্থালী প্রধান ও রাখাইন সদস্যদের শিক্ষাবস্থা জানা যাবে।

সারণি– ৭.৮

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত অবস্থা

শিক্ষা পর্যায়	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
অক্ষরজ্ঞানহীন	৩	২	৪	৯	৩১.০৩
১ম- ৫ম	৪	২	১	৭	২৪.১৪
৬ষ্ঠ–১০ম	৭	৪	১	১২	৪১.৩৮

এসএসসি পাস	-	১	-	১	৩.৪৫
এইচএসসি পাস	-	-	-	-	-
স্নাতক পাস	-	-	-	-	-
স্নাতকোত্তর পাস	-	-	-	-	-
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপর্যুক্ত সারণি পর্যালোচনান্তে দেখা যাচ্ছে, তিনটি গ্রামের ২৯ জন রাখাইন গৃহস্থালী প্রধানের মধ্যে শিক্ষিত ২০ জন অর্থাৎ ৬৯%, নিরক্ষর ৯ জন অর্থাৎ ৩১%। তাদের বেশির ভাগের পড়াশুনা ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত। এ-স্তরে শিক্ষা নিয়েছেন ১২ জন অর্থাৎ ৪১.৯% ভাগ। এসএসসি পাশ মাত্র ১ জন অর্থাৎ ৩.৪৫% ভাগ। গৃহস্থালী প্রধানদের মধ্যে কেউ এইসএসসি ও ডিগ্রিধারী নেই। প্রাপ্ত তথ্য থেকে গৃহস্থালী প্রধানদের মধ্য ঝরে পড়ার বেশ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। দেখা যাচ্ছে, মাধ্যমিক স্তরেই প্রায় সকলে পড়া লেখা চুকিয়েছেন। এর কারণ স্কুলের দূরত্ব, খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা, পড়ালেখার প্রতি অনীহা, অভিভাবকদের পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহের দুশ্চিন্তা, পড়ালেখা করে সরকারি চাকরি-বাকরি না পাওয়া আশঙ্কা, রাখাইন ভাষায় পড়ালেখার ব্যবস্থা না থাকা ও বাংলা ভাষায় বিদ্যার্জন কষ্টসাধ্য ইত্যাদি কারণে পড়ালেখা আর এগুয়নি তাদের। আব্দুল আউয়াল বিশ্বাসের (১৯৮৬) গবেষণায় একই তথ্য পাওয়া যায়। তিনি দেখান উল্লিখিত কারণে অভিভাবকরা অতীতে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার সমাপ্তি টেনে কাজে-কামে লাগিয়ে দেন। গবেষণাধীন এলাকায় রাখাইন অভিভাবকদের ক্ষেত্রে সে-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

সারণি-৭.৯

রাখাইন গৃহস্থালী সদস্যদের শিক্ষাগত অবস্থা

শিক্ষাস্তর	হাড়িপাড়া			মধুপাড়া			তুলাতুলিপাড়া			মোট পুরুষ	মোট নারী	মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	পু.	না.	মোট	পু.	না.	মোট	পু.	না.	মোট				
অক্ষরজ্ঞানহীন	৮	৬	১৪	২	১১	১৩	৪	৫	৯	১৪	২২	৩৬	২৭.৪৮
১ম-৫ম শ্রেণি	৬	৭	১৩	২	৪	৬	৩	৩	৬	১১	১৪	২৫	১৯.০৮
৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি	১৫	৯	২৪	৮	৬	১৪	৪	২	৬	২৭	১৭	৪৪	৩৩.৫৯
এসএসসি	২	২	৪	৫	৪	৯	৩	২	৫	১০	৮	১৮	১৩.৭৪
এইচএসসি	-	-	-	১	২	৩	৩	-	৩	৪	২	৬	৪.৫৮

স্নাতক	১	-	১	-	-	-	-	-	-	১	-	১	০.৭৬
স্নাতকোত্তর	-	-	-	-	-	-	১	-	১	১	-	১	০.৭৬
সর্বমোট	৩২	২৪	৫৬	১৮	২৭	৪৫	১৮	১২	৩০	৬৮	৬৩	১৩১	
শতাংশ	৫৭.১৪	৪২.৮৬	-	৪০.০০	৬০.০০	-	৬০.০০	৪০.০০	-	৫১.৯১	৪৮.০৯	১০০.০০	

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র ৭.৬

রাখাইন গৃহস্থালী প্রধান ও সদস্যদের শিক্ষা-অবস্থা

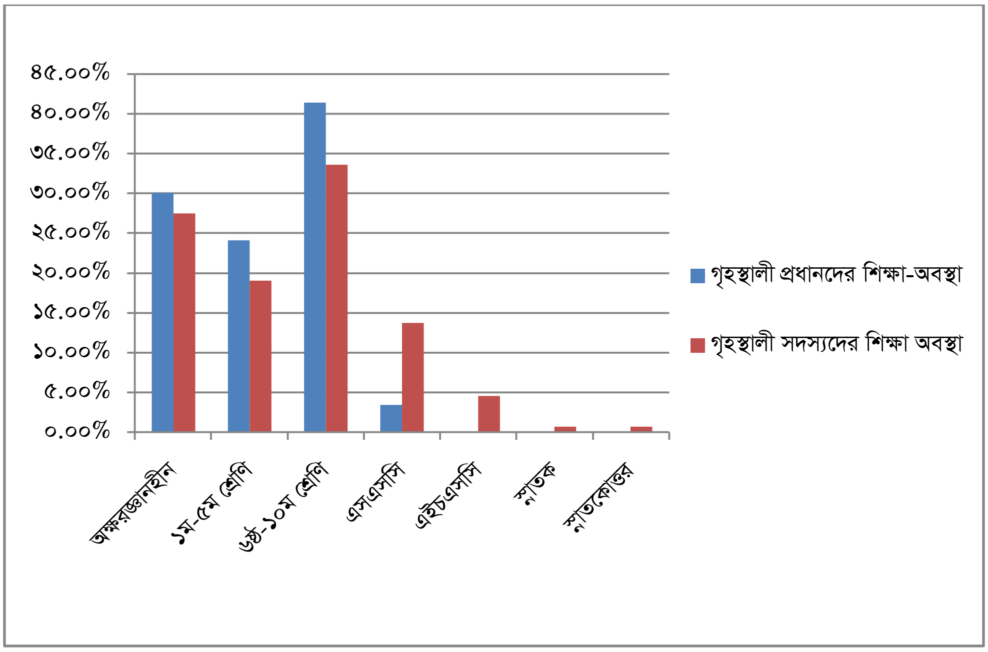

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

সারণি ৭.৯ও চিত্র ৭.৬ থেকে দেখা যায়, গ্রামসমূহের শিক্ষার হার ৬৯.৩৪%। এরমধ্যে ৬৫.২৬% পুরুষ ও ৩৪.৭৪% মহিলা। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত মোট ৪৬ জন অর্থাৎ ৪৮.৪২% যাদের মধ্যে ২৪ জন অর্থাৎ ২৪.২৬% ছেলে ও ২২ জন অর্থাৎ ২৩.১৬% মেয়ে। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৪২ জন অর্থাৎ ৪৪.২১%, যাদের মধ্যে ৩৩ জন অর্থাৎ ৩৪.৭৪% ছেলে ও ৯ জন অর্থাৎ ৯.৪৭% মেয়ে। এসএসসি পাস করেছে ৭ জন অর্থাৎ ৭.৩৭%, যাদের ৫ জন অর্থাৎ ৫.২৬% ছেলে ও ২ জন অর্থাৎ ২.১১% মেয়ে। গ্রাম তিনটির মধ্যে এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ কেউ নেই। সাঁওতালদের উপর পরিচালিত আজিজুল হকের (২০০৬) পিএইচডি গবেষণা থেকে দেখা যায়, সাঁওতালদের শিক্ষার হার শতকরা ৭৮.৪১ এবং উচ্চ শিক্ষার হার শতকরা ২ ভাগের কম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সর্বজনীন শিক্ষার হার রাখাইনদের থেকে (৬৯.৩৪%) সাঁওতালদের মধ্যে বেশি (৭৮.৪১%)। উচ্চ শিক্ষার হারও সাঁওতালদের মধ্যে বেশি। হক সাঁওতালদের শিক্ষার যে চিত্র তুলে

Dhaka University Institutional Repository

ধরেছেন তা থেকে বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যার বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেন,

> "...এতকিছুর পরও প্রাথমিক পর্যায়ে সাঁওতাল শিশুদের মধ্যে 'ড্রপ আউট' আছে।...এর অন্যতম কারণ হলো, শিশু অবস্থায় প্রাথমিক স্কুলে উপজাতীয় শিশুদের বাংলা ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বাংলা ভাষায় পাঠ রপ্ত করতে না পারা। বাঙালি শিক্ষকগণ যখন বাংলায় পাঠদান করেন, তখন কমলমতি অবাঙালি শিশুরা তেমন বাংলা বুঝে না এবং ক্লাসে আনন্দ পায় না। অশিক্ষিত পিতামাতারাও তাদের সন্তানদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে পারে না। ফলে শিশুরা স্কুলে আসার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং তাদের মধ্যে এক ধরনের অনীহা ও ভীতি কাজ করে।"(হক, ২০০৬)

উপরে বর্ণিত সাঁওতালদের এই শিক্ষা সমস্যা কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। রাখাইনদের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। একইরকম তথ্য পাওয়া যায় আবদুল মাবুদ খানের (২০০৬) গবেষণায়। খান শিক্ষাজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিকে পটুয়াখালীর রাখাইন জনসংখ্যার দ্রুত পতনের অন্যতম কারণ হিসেবেও সনাক্ত করেন। তিনি পটুয়াখালীর রাখাইন শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে বলেন,

> "বৌদ্ধ মন্দিরের পাঠশালায় শিক্ষা লাভের পর এদের স্থানীয় বাংলা মাধ্যম স্কুলে পাঠানো হয়। তবে অনেক ছেলে মেয়েই আর বাংলা মাধ্যম স্কুলের পা মাড়ায় না। মূলত ভিন্ন ভাষা শেখা ও সেই মাধ্যমে লেখাপড়া তাদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এছাড়া প্রান্তিক জনপদ বলে এখানকার বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোর লেখাপড়ার মান এতই অবনতিশীল যে তা দিয়ে বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হওয়াও সম্ভব নয়। তাই এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পটুয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চল সাধারণভাবেই একটি শিক্ষাবঞ্চিত জনপদ। সুযোগের অভাবে মূল ভূখণ্ডের অপরিহার্য বাংলা ভাষা ও ইংরেজি তাদের জন্য সুদূর পরাহত হয়ে পড়েছে।"(খান, ২০০৬)

অতীতে বৌদ্ধ মন্দির থেকে রাখাইন শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের যে সুযোগ একদা রাখাইন গ্রামগুলোতে সর্বত্র বিদ্যমান ছিল তা বর্তমানে চালু নেই। হাড়িপাড়ার মন্দিরে শিক্ষক রেখে শিশুদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। বিশ বছর আগে এই শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার দরুন বেতন দিয়ে শিক্ষক রেখে সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু রাখা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে যাওয়া সেই ব্যবস্থা পুনরায় চালুও হয়নি। এরফলে দেখা গেছে বর্তমান প্রজন্মের রাখাইন শিশুরা কেবল রাখাইন ভাষায় কথা বলতে পারছে। কেননা পারিবারিক পরিমণ্ডলে তারা নিজেদের মধ্যে রাখাইন ভাষায় কথা বলে। তবে তারা রাখাইন বর্ণমালা পড়তে ও লিখতে পারে না। অথচ অতীতে অভিভাবকদের মধ্যে যারা টোল ঘরে (ফুঙ্গি স্কুল) শিক্ষা নিয়েছে তারা কম-বেশি রাখাইন ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে। অবশ্য তুলাতুলি পাড়ার মন্দিরে বর্তমানে ছেলে মেয়েদের সকাল-সন্ধ্যা পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫.১ বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে উত্তরদাতাদের সন্তুষ্টি

বর্তমানে রাখাইনদের শিক্ষার হার অতীতের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষা বিষয়ে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি কম-বেশি প্রকাশ পেতে দেখা গেছে। সংখ্যালঘুতার বিচ্ছিন্নতাবোধ এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে থাকে। শিক্ষার পরিণতি নিয়ে তাদের মধ্যে এক ধরনের নৈরাশ্য বিরাজমান দেখতে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অভিভাবকদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির বিষয়ে যেমন জানা গেছে, তেমনি কিছুটা কৌশলীভাবও লক্ষ্যণীয়। নিম্নে প্রদত্ত সারণিতে বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতির সন্তুষ্টির বিষয়ে অভিভাবকদের মতামত তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.১০

বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতিতে উত্তরদাতাদের সন্তুষ্টি

সন্তুষ্টি	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
সন্তুষ্ট	৩	৩	২	৮	২৭.৫৯
অসন্তুষ্ট	২	২	১	৫	১৭.২৪
মোটামুটি	৬	৩	২	১১	৩৭.৯৩
জবাব নেই	৩	১	১	৫	১৭.২৪
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ৮ জন অর্থাৎ ২৭.৫৯%। অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ৫ জন অর্থাৎ ১৭.২৪%। মোটামুটি বলেছেন ১১ জন অর্থাৎ ৩৭.৯৩%। এবং জবাবদানে বিরত থাকেন ৫ জন অর্থাৎ ১৭.২৪%। যারা মোটামুটি বলছেন, ধরে নেওয়া যায় তারা অন্তত পুরোপুরি সন্তুষ্টি নয়। এমনিভাবে জবাবদানে যারা বিরত থাকেন তারাও য়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয় তা স্পষ্ট। তাহলে দেখা যাচ্ছে অসন্তুষ্টির পরিমাণই বেশি। এই অসন্তুষ্টি ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার প্রতি নিস্পৃহ হতে সহায়ক হয়। এজন্য সমস্যা কিভাবে দূর করা যায় সে মতামতও গ্রহণ করা হয় যা নিম্নে আলোচিত হলো।

৭.৫.২ বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতির সমস্যা দূরীকরণে উত্তরদাতাদের অভিমত

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে স্কুলে বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি জানার পর তাদের কাছ থেকে শিক্ষা পদ্ধতির সমস্যা কিভাবে দূর করা সম্ভব সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে খুব গভীর চিন্তাপ্রসূত কোন জবাব পাওয়া না গেলেও সাদামাটাভাবে তারা তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। যেমন

অনেকে স্কুলে রাখাইন ভাষায় পারদর্শী শিক্ষক রাখার কথা বলেছেন, আবার কেউ কেউ বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষকের প্রস্তাব করেছেন। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এ-বিষয়ে তাদের মধ্যে অনেকের তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। এর কারণ হতে পারে যে, তারা শাসিত হওয়ার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তন অকল্পনীয় বলেই ধরে নিয়েছেন। সম্প্রতি সরকারিভাবে নৃগোষ্ঠীদের স্বভাষায় শিক্ষার জন্য যে পদক্ষেপসমূহ নেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে অনেকে জানে না। আবার অনেকে বাস্তবায়ন হবে বলে মনে করে না। সেজন্য বিষয়টি তাদের কছে নিরাসক্তই ঠেকেছে। নিম্নের সারণিতে বিদ্যমান শিক্ষাপদ্ধতির সমস্যা দূরীকরণে তাদের মতামত চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত তথ্য নিন্মে প্রদত্ত হলো।

সারণি– ৭.১১

বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতির সমস্যা দূরিকরণে উত্তরদাতাদের অভিমত

অভিমত	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গুসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
স্কুলে ১জন রাখাইনভাষার শিক্ষক দরকার	৬	৫	৪	১৫	৫১.৭২
স্কুলে ১জন বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষক থাকা দরকার	২	১	-	৩	১০.৩৪
১+২	৩	২	১	৬	২০.৬৯
প্রযোজ্য নয়	৩	১	১	৫	১৭.২৪
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৫ জন অর্থাৎ ৫১.৭২% মনে করেন রাখাইন অধ্যুষিত এলাকার আশপাশের স্কুলে রাখাইন ছাত্রদের পাঠগ্রহণের সুবিধার্থে একজন রাখাইন ভাষায় পারদর্শী শিক্ষক থাকা দরকার। শিক্ষক রাখাইন সম্প্রদায়ের হবেন এমনটি নয়, রাখাইন ভাষা জানলে হবে। আবার ৩ জন উত্তরদাতা অর্থাৎ ১০.৩৪% মনে করেন এসব স্কুলে একজন বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষক থাকা দরকার, যিনি ধর্মীয় জ্ঞানপ্রদানসহ ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় উৎসাহী রাখবেন। এছাড়া উত্তরদাতাদের ৬ জন অর্থাৎ ২০.৬৯% পূর্বোক্ত দুটি মতের দুটিই প্রয়োজন বলে মত দেন। উপরন্তু, সর্বমোট ৫ জন অর্থাৎ ১৭.২৪% কোনরকম মত প্রদান থেকে বিরত থাকেন। উত্তরদাতারা অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, স্কুলে ভাষাগত সমস্যা তাদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ছেলে। কেননা, অল্পবয়সে শিশু-কিশোররা পরিবার থেকে সাধারণত মাতৃভাষাই আয়ত্ত করে। এজন্য বিদ্যালয়ে গিয়ে তারা ভাষাগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিরানন্দ বোধ করে। আনন্দ থেকে বঞ্চিত অনেক ছেলে-মেয়ে শেষ পর্যন্ত শিক্ষা লাভের আগ্রহ ধরে রাখতে পারে না। যেজন্য ঝরে পড়া বন্ধ হয় না। তবে এনজিও

কার্যক্রমসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন তৎপরতায় শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করার ফলে শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বর্তমানে ঝরে পড়া অতীতের তুলনায় অনেক কমে গেছে। তবে এই ঝরে না পড়ার অন্যতম কারণ হলো শিক্ষার্থীদের মাসিক বৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান। এক্ষেত্রে প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত না হওয়ায় শিক্ষার প্রতি নির্ভরশীলতাজনিত আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে বটে, স্বপ্রণোদিত আগ্রহ তৈরি হচ্ছে না। যেমন সাঁওতালদের ক্ষেত্রেও হক লক্ষ্য করেন,

> "সাঁওতালরা শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও এখন বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পাওয়াসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন না থাকার কারণে এবং সন্তান প্রতি মাসিক ১৫ কেজি গম বা নগদ ১০০ টাকা পাবার কারণে তারা শিক্ষার ব্যাপারে বেশ উৎসাহিত হয়েছে।..."(হক, ২০০৬)

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর ২৩ নং ধারায় দেশের সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানোর কথা বলা হয়েছে। এই শিক্ষানীতির দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে।" এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলেই রাখাইন শিশুদের শিক্ষায় আগ্রহী করার প্রচেষ্টা সফল হবে। কেননা, 'Languge is an essential tool of nation-building and mother langue is the best medium through which we can become familiar with human knowledge, science and technology.'(Ali, 2017:98) প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উল্লিখিত অনুচ্ছেদেরই আলোকে ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৫টি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বই প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কর্মসূচি শুরু করা হলেও সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি (নাসরীন, ২০১৯)।

৭.৬রাখাইনদের বৈবাহিক অবস্থা

গবেষণা এলাকার বিবাহ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। বিয়ে ও পরিবার গঠন রাখাইন সমাজে স্বাভাবিক নিয়ম। তাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ বর্তমানে নেই বললেই চলে। তবে অতীতে বাল্য বিবাহ হতো (মং বা, ২০০৩: ১২৬)। যদিও বিয়ের জন্য কোন বয়স নির্ধারিত নেই, তবে উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তির পর এবং হবু বর-বধূর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা অর্জনের পরই বিয়ে করা সমুচিত বলে তারা মনে করে। পিতামাতার উপর নির্ভরশীল সন্তানদের বিয়েতে অভিভাবকদের কোন আগ্রহ দেখা যায় না। গবেষণাধীন গ্রামে দুটি পরিবার প্রধানসহ চল্লিশোর্ধ্ব অরো

Dhaka University Institutional Repository

দু-একজনের অবিবাহিত থাকতে দেখা গেছে। এ-ক্ষেত্রে বিয়ের প্রতি অনাগ্রহ ভাব লক্ষ্যণীয়। মূলত যৌথ পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়ভারের দুশ্চিন্তা থেকে তারা বিয়ে থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে বলে জানা যায়। নিম্নের সারণিতে উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.১২

উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা

গ্রাম	বিবাহিত			অবিবাহিত		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
হাড়িপাড়া	১৪	-	১৪	-	-	-
মধুপাড়া	৮	-	৮	১	-	১
তুলাতুলিপাড়া	৫	-	৫	১	-	১
সর্বমোট	২৭	-	২৭	২	-	২
শতাংশ (%)	৯৩.১০	-	৯৩.১০	৬.৯০	-	৬.৯০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৭ জন অর্থাৎ ৯৩.১% বিবাহিত, ২জন অর্থাৎ ৬.৯% অবিবাহিত। এরমধ্যে তুলাতুলি পাড়ায় ১ জন ও মধুপাড়ায় ১ জন অবিবাহিত। অপরদিকে হাড়িপাড়ায় সকল গৃহস্থালী প্রধানই বিবাহিত। তবে ব্যয়নির্বাহের দুশ্চিন্তাজনিত বিবাহের অনাগ্রহ থেকে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুরো রাখাইন সমাজের চিত্র একই। নিম্নের সারণি থেকে তা স্পষ্ট হবে।

সারণি– ৭.১৩

রাখাইন গৃহস্থালী সদস্যদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	পুরুষ	শতাংশ	নারী	শতাংশ	মোট	শতাংশ
বিবাহিত	২৯	২২.১৪	৩০	২২.৯০	৫৯	৪৫.০৪
অবিবাহিত	৪৪	৩৩.৫৮	২৫	১৯.০৮	৬৯	৫২.৬৭
বিধবা	-	-	১	.৭৬	১	.৭৬
বিপত্নীক	১	.৭৬	-	-	১	.৭৬
তালাকপ্রাপ্তা	-	-	১	.৭৬	১	.৭৬
সর্বমোট	৭৪	-	৫৭	-	১৩১	-
শতাংশ (%)	৫৬.৪৮	-	৪৩.৫১	-	১০০.০০	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের ৭.১৩ নং সারণি থেকে পরিবারের সমুদয় সদস্যের বিয়ে পর্যালোচনা করলে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায়, সদস্যদের মধ্যে বিবাহিত ৫৯ জন অর্থাৎ ৪৫.০৪%, অবিবাহিত ৬৯ জন অর্থাৎ ৫২.৬৭%। বিবাহিতদের মধ্যে পুরুষ ২৯ জন অর্থাৎ ২২.১৪%, মহিলা ৩০ জন অর্থাৎ২২.৯০%। অবিবাহিতদের মধ্যে পুরুষ ৪৪ জন অর্থাৎ ৩৩.৫৮%, নারী ২৫ জন অর্থাৎ১৯.০৮%। এ-ছাড়াও ১ জন করে অর্থাৎ.৭৬% করে যথাক্রমে বিপত্নীক, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা আছে। আর্থ-সামাজিক অসচ্ছলতার কারণে রাখাইন ছেলেদের মধ্যে বিবাহের আগ্রহ কম বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। গবেষণা এলাকায় ২০ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোনো বিয়ের তথ্য পাওয়া যায়নি। এরফলে নতুন পরিবার গঠিত হচ্ছে না। নিম্নের ৭.১৩ নং সারণিতে তিনটি গ্রামের রাখাইন জনগোষ্ঠীর লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক বৈবাহিক অবস্থার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.১৪

তিনটি গ্রামের রাখাইনদের লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক বৈবাহিক অবস্থা

বয়ঃশ্রেণি	বিবাহিত				অবিবাহিত				বৈধব্যপ্রাপ্ত			
	পুরুষ	নারী	মোট	হার	পুরুষ	নারী	মোট	হার	পুরুষ	নারী	মোট	হার
০–৯	-	-	-	-	৫	৪	৯	৬.৮৭	-	-	-	-
১০–১৯	-	-	-	-	১৪	১০	২৪	১৮.৩২	-	-	-	-
২০–২৯	১	৩	৪	৩.০৬	১৪	৭	২১	১৬.০৩	-	-	-	-
৩০–৩৯	১০	৯	১৯	১৪.৫০	৩	১	৪	৩.০৬	-	১	১	.৭৬
৪০–৪৯	৭	৮	১৫	১১.৪৫	২	১	৩	২.২৯	-	-	-	-
৫০–৫৯	৫	৩	৮	৬.১০	২	১	৩	২.২৯	-	-	-	-
৬০–৬৯	৪	৩	৭	৫.৩৪	১	১	২	১.৫২	-	১	১	.৭৬
৭০ তদূর্ধ্ব	৩	৩	৬	৪.৫৮	২	১	৩	২.২৯	১	-	১	.৭৬
সর্বমোট	**৩০**	**২৯**	**৫৯**	৪৫.০৩	**৪৩**	**২৬**	**৬৯**	৫২.৬৭	**১**	**২**	**৩**	২.২৯

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে, ০-৯ ও ১০-১৯ এই দুই বয়স-শ্রেণির মধ্যে বিবাহিত কোনো ছেলে-মেয়ে নেই। সুতরাং বোঝা যায়, রাখাইনদের মধ্যে বাল্য বিয়ে নেই। ২০-২৯ বয়ঃশ্রেণির মোট ৪ জন বিবাহিত। এরমধ্যে পুরুষ ১ জন ও নারী ৩ জন। এই বয়ঃশ্রেণির মধ্যে নারীদের বিয়ের হার বেশি। এই বয়ঃশ্রেণিতে ২১ জন অবিবাহিত। এরমধ্যে ১৪ জন পুরুষ ও ৭ জন নারী। ফলে স্পষ্ট যে, ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের বেশিমাত্রায় অবিবাহিত থাকতে দেখা যায়। ৩০-৩৯ বয়ঃশ্রেণির ১০ জন পুরুষ ও ৯ জন নারী মোট ১৯ জন বিবাহিত। এই বয়ঃশ্রেণির ৪ জন অবিবাহিত যাদের মধ্যে ৩ জন পুরুষ ও ১ জন নারী। এই বয়ঃশ্রেণিতে অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা বেশি। এই শ্রেণির

মধ্যে ১ জন নারী তালাকপ্রাপ্ত। আনুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে। গবেষণা এলাকায় আর কোনো তালাকের ঘটনা নেই। ৪০-৪৯ বয়ঃশ্রেণির ৭ জন পুরুষ ও ৮ জন মহিলা মোট ১৫ জন বিবাহিত। এই শ্রেণিতে বিবাহিত নারীর সংখ্যা বেশি। এই শ্রেণীর ৩ জন অবিবাহিত যাদের ২ জন পুরুষ ও ১ জন নারী। ৫০-৫৯ বয়ঃশ্রেণিতে ৫ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী মোট ৮ জন বিবাহিত। এই বয়ঃশ্রেণির ২ জন পুরুষ ও ১ জন নারী মিলে মোট ৩ জন অবিবাহিত। এই শ্রেণির মধ্যে ১ জন নারী বৈধব্যপ্রাপ্ত যার স্বামী মারা গেছে।। ৬০-৬৯ বয়ঃশ্রেণির ৪ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী মোট ৭ জন বিবাহিত এবং ১ জন করে নারী ও পুরুষ অবিবাহিত। এই শ্রেণীতেও ১ জন বৈধব্যপ্রাপ্ত যার স্বামী মারা গেছে। ৭০-উর্ধ্ব বয়সের বিবাহিত লোক ৬ জন। এদের ৩ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী। এই বয়ঃশ্রেণির অবিবাহিত ৩ জন, তাদের ২ জন পুরুষ ও ১ জন নারী; এবং ১ জন পুরুষ বৈধব্যপ্রাপ্ত বিপত্নীক।

৭.৭ রাখাইন পরিবারের ধরন

পরিবার বিষয়েও পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রাখাইনদের মধ্যে অতীতে যৌথ পরিবারের সংখ্যা বেশি ছিল। কৃষিভিত্তিক জীবনে যৌথ পরিবারের গুরুত্বও ছিল। পারিবারিক দৃঢ় বন্ধনও যৌথ পরিবার টিকে থাকার অন্যতম কারণ। ছিল পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের আর্থিক স্বচ্ছলতা। এ-সমস্ত কারণে অধিকাংশ পরিবারই ছিল যৌথ। কিন্তু কালের বিবর্তনে ব্যয়ভার নির্বাহে অক্ষমতার মতো নানান সমাজবাস্তবতায় এখন যৌথ পরিবার কমে যাচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে একক পরিবার। তবে যৌথ পরিবার এখনও আছে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার নানামাত্রিকা বিচারে অনায়াসে বলা যায় যে, অতীতে এ-সমাজে যৌথ পরিবারের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। তাই দেখা যাচ্ছে, রাখাইন পরিবার বর্তমানে মূলত একটি অনু পরিবার। এখানে যৌথ পরিবারও আছে। তবে কোনো বর্ধিত পরিবার যেখানে তিন কিংবা তদূর্ধ্ব প্রজন্মের সদস্যরা একত্রে বসবাস করে এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে অনু পরিবার গঠিত। পরিবার প্রধান একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। স্বামী-স্ত্রী, বিবাহিত সন্তান যারা উপার্জনক্ষম এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের নিয়ে যৌথ পরিবার গঠিত। পরিবারের প্রধান ছাড়াও অন্য সদস্যরা উপার্জন করে পরিবার প্রধানের হাতে তুলে দেন। সব পরিবার পিতৃসূত্রীয় বংশধারার নীতিমালা অনুসরণ করে। নিম্নের ৭.১৪ নং সারণিতে গ্রামগুলোররাখাইন পরিবারের ধরন তুলে ধরা হলো।

সারণি- ৭.১৫

তিনটি গ্রামের রাখাইনদের পরিবারের ধরন

গ্রাম	মোট পরিবার	অনু পরিবার				যৌথ পরিবার			
		পরি. সংখ্যা	শতাংশ	সদস্য সংখ্যা	গড়আয়তন	পরি. সংখ্যা	শতাংশ	সদস্য সংখ্যা	গড়আয়তন

হাড়িপাড়া	১৪	৮	৫৭.১৪	৩০	৩.৭৫	৬	৪২.৮৬	২৬	৪.৩৩
মধুপাড়া	৯	৬	৭৭.৭৮	২৮	৪.৬৭	৩	২২.২২	১৭	৫.৬৭
তুলাতুলিপাড়া	৬	৫	৮৩.৩৩	২৬	৫.২০	১	১৬.৬৭	৪	৪.০০
	২৯	১৯	৬৫.৫২	৮৪	৪.৪২	১০	৩৪.৪৮	৪৭	৪.৭০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, অনুপরিবার ১৯টি অর্থাৎ ৬৫.৫২%, যৌথ পরিবার ১০টি অর্থাৎ ৩৪.৪৮%। যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। তবু এখনও বন্ধন দৃঢ়। যৌথ পরিবারের বিন্যাস অতীতের দৃঢ় পারিবারিক বন্ধনের ইঙ্গিত দেয়। যৌথ পরিবার ভেঙে কমতে কমতে ৩৪.৪৮% ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। কৃষিজীবনে যৌথ পরিবারের প্রয়োজনও ছিল। কৃষিকাজের নানা পর্যায়ে অনেক রকম শ্রমের দরকার হতো। বর্তমানে জমি নেই, কৃষিকাজ নেই, অনেক ধরনের শ্রমেরও প্রয়োজন নেই। ১৯টি অনু পরিবারের মোট সদস্যসংখ্যা ৮৪ জন। অনু পরিবারের গড় আয়তন ৪.৪২। তিনটি গ্রামের ১০টি যৌথ পরিবারের মোট সদস্যসংখ্যা ৪৭ জন। যৌথ পরিবারের গড় আয়তন ৪.৭০। হাড়িপাড়ায় ১৪টি পরিবারের মধ্যে ৮টি অর্থাৎ ৫৭.১৪% অনু পরিবার এবং ৬টি অর্থাৎ ৪২.৮৬% যৌথ পরিবার। এখানে অনু পরিবারের গড় আয়তন ৩.৭৫ এবং যৌথ পরিবারের গড় আয়তন ৪.৩৩। মধুপাড়ায় ৯টি পরিবারের মধ্যে অনু পরিবার ৬টি অর্থাৎ ৭৭.৭৮% এবং যৌথ পরিবার ৩টি অর্থাৎ ২২.২২%। এখানে অনু পরিবারের গড় আয়তন ৪.৬৭% এবং যৌথ পরিবারের গড় আয়তন ৫.৬৭। তুলাতুলিপাড়ায় ৬টি পরিবারের মধ্যে ৫টি অর্থাৎ ৮৩.৩৩% অনু পরিবার এবং ১টি অর্থাৎ ১৬.৬৭% যৌথ পরিবার। এখানে অনু পরিবারের গড় আয়তন ৫.২০ এবং যৌথ পরিবারের গড় আয়তন ৪।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গবেষণাধীন তিনটি গ্রামে অনু পরিবার বেশি, যৌথ পরিবার কম। অতীতে অনু পরিবারই কম ছিল, যৌথ পরিবার বেশি ছিল। বাঙালি সম্প্রদায়ের মতো অনু পরিবারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এখানে লক্ষণীয়। অবশ্য, কেবল বাঙালি নয়, গবেষকদের মতে প্রায় সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনু পরিবারের নিয়মই স্বাভাবিক (বেসেইন, ১৯৯৭ : ২৬ ; আহসান, ১৯৯৩: ১৩২ দ্রষ্টব্য)। তবুও আমার গবেষণা এলাকায় যৌথ পরিবারের সংখ্যা কম নয়। যৌথ পরিবারের সংখ্যা বেশি থাকার আরো একটি কারণ হলো বিয়ের বয়সসীমা। রাখাইনদের মধ্যে বাল্যবিয়ের প্রচলন নেই। বিয়ের বয়সসীমা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণত ৩৫-৪০ বছর বয়সের আগে অনেকেই বিয়ে করে না।

রাখাইন ও বাঙালিদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পরিবারের ধরনের ক্ষেত্রে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রামীণ সমাজ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণা

থেকে এ-মিল পাওয়া যায়। অধ্যাপক নাজমুল করিম (১৯৬৫) দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশে গ্রাম্য সমাজে দৃঢ় বন্ধন নিয়ে যৌথ পরিবার বজায় থাকা সত্ত্বেও তা অনু পরিবারে রূপান্তর ঘটছে এবং পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ ক্রমাগত প্রাধান্য পাচ্ছে। অধ্যাপক আফছার উদ্দীন (১৯৭৯) দেখিয়েছেন, বর্তমানে একক পরিবারে বসবাসের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবুও এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন কাঠামোতে যৌথ পরিবার ব্যবস্থাই বজায় আছে। অধ্যাপক আরেফিন (১৯৯৪) শিমুলিয়াতে অনু পরিবার বেশি দেখতে পান। সেখানে ২৫৩টি পরিবারের মধ্যে ৭৬টি যৌথ পরিবার এবং ১৭৭টি অনু পরিবারের তথ্য পান। অধ্যাপক আহসান আলী (১৯৮৯) সাঁওতালদের ২২০টি পরিবারের মধ্যে ১৫৫টি অনু পরিবার ও ৬৫টি যৌথ পরিবারের তথ্য পান। সেক্ষেত্রে হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ায় রাখাইন আদিবাসীদের পারিবারিক বন্ধন এখনও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে বলা যায়। তবে পরিবর্তনের ইঙ্গিত ক্ষীণ গতিতে বহমান তা অনুমেয়।

গবেষকদের মতে, অর্থনৈতিক বিবেচনাই হচ্ছে পরিবারের ধরনসমূহের ভিত্তি। পরিবারের উন্নয়ন চক্র পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, অনু পরিবারের থেকে যাত্রা শুরু করে এ-চক্র কর্মরত বিবাহিত সন্তানে যেয়ে শেষ হয়। অনু পরিবারে পিতাই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তানাদি নিয়ে অনু পরিবার গঠিত। তবে আমার গবেষণা এলাকায় ২টি পরিবার আছে যেগুলো অনু পরিবারের থেকে কাঠামোগতভাবে একটু স্বতন্ত্র। এ-ধরনের পরিবারকে আরেফিন (১৯৯৪) 'বৃহৎ আধা অনু পরিবার' বলে চিহ্নিত করেছেন। স্বামী-স্ত্রী, তাদের বিবাহিত ও অবিবাহিত ছেলে মেয়ে এবং কয়েকজন আত্মীয় এই পরিবারভুক্ত। বস্তুত এই পরিবারগুলো যৌথ পরিবারের মতোই– কেবল উপার্জন করা বা সদস্যদের জীবিকা নির্বাহের দায়-দায়িত্ব পরিবার প্রধানের উপর। এখানে হাড়িপাড়ার একটি বৃহৎ আধা অনু পরিবারের কেস তুলে ধরা হলো।

কেস স্টাডি ৫ : মংওন মাতবরের বৃহৎ আধা-অনুপরিবার

হাড়িপাড়ার মংওন মাতবর একটি বৃহৎ আধা অনু পরিবারের প্রধান। বর্তমানে তার বয়স ৪৭ বছর। তিনি বিবাহিত এবং এক সন্তানের জনক। তার স্ত্রীর বয়স ৩৫ বছর। স্ত্রী গৃহস্থালীর কাজ করেন। পাশাপাশি মাঝে-মধ্যে পরিবারের প্রয়োজনে তাঁতও চালান। মংওন মাতবর ভূমিহীন কৃষক। তিনি অন্যের জমি বন্ধক রেখে সেই জমিতে কৃষিকাজ করেন। তার ছেলের বয়স ১৭ বছর। সে দশম শ্রেণিতে পড়ে। মংওন মাতবরের স্ত্রীর ৩৫ বছর বয়স্কা বোন ও ১৫ বছর বয়সি ৯ম শ্রেণির স্কুলগামী ছেলে তার পরিবারের সাথে থাকে। উপরন্তু, ৭৫ বছর বয়স্ক শ্বশুরও তার পরিবারের সাথে থাকে। এই পরিবারটি একটি বৃহৎ আধা অনু পরিবারের কাঠামো তুলে ধরেছে। এখানে পরিবার প্রধানের

আয়কে কেন্দ্র করে পরিবার প্রধান তার মুখ্য পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্য অধিভুক্ত আত্মীয়দের নিয়ে একসাথে বসবাস করেন।

চিত্র-৭.৭

মংওন মাতবরের বৃহৎ আধা অনু

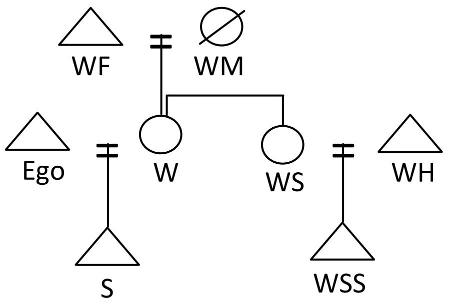

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

গবেষণাধীন তিনটি গ্রামের ২৯টি পরিবারের মধ্যে ১০টি অর্থাৎ ৩৪.৪৮% যৌথ পরিবার। যৌথ পরিবারগুলো স্বামী-স্ত্রী, আদের উপার্জনক্ষম এবং নির্ভরশীল ছেলে এবং অবিবাহিত মেয়েদের নিয়ে গঠিত। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা দক্ষিণ এশিয়ার একটি সাধারণ চিত্র (আরেফিন, ১৯৯৪: ৬০)। বাবা পরিবারের প্রধান। পরিবারের উপার্জনশীল সদস্যরা তাদের আয় বাবার হাতে তুলে দেয়। তবে পরিবারের উন্নয়নচক্রের ধারায় যৌথ পরিবার দীর্ঘসময় টিকে থাকে না (আহম্মদ, ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য)। কর্মজীবী পুরুষরা বিয়ে করলে এ-ধরনের পরিবার ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় এবং প্রত্যেক সদস্য ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের ব্যাপারে চিন্তা করে। যারফলে তার প্রতিপালনকারী পরিবার থেকে নতুন পরিবার সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করে।

দলগত আলোচনাকালে যৌথ পরিবার ভাঙার যে কারণগুলো জানা যায় তাহলো : ১. পরিবার প্রধানের পরলোক গমন, ২. একত্রে বসবাস করার অনিচ্ছা, ৩. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, ৪. উপার্জনের অসমতা, ৫. সুখী-সমৃদ্ধ জীবন গড়ার আকাঙ্ক্ষা, ৬. ছিমছাম ঝামেলামুক্ত জীবনযাপনের ইচ্ছা, ৭. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কাজের বণ্টন নিয়ে দ্বন্দ্ব, ৮. নিজের সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার বাসনা প্রভৃতি। আবার বাবা কখনো কখনো ছেলেকে আলাদা করে দেন এই ভেবে যে, ছেলে কাজকাম করে উপার্জন করতে চায় না, সুতরাং সংসার আলাদা করে দিলে ছেলে কাজকামে মনোযোগী হয়ে অধিক উপার্জনে সচেষ্ট হবে। এ-সকল কারণে রাখাইন যৌথ পরিবারে ভাঙন দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে গবেষণাধীন তিনটি গ্রামে রাখাইনদের পারিবারিক বন্ধন এখনও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে তা বলা যায়। সেখানে অনু পরিবার গঠনের প্রবণতা স্বাভাবিক গতিতে এগুচ্ছে। কেননা সুদূর অতীতে রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ জীবনের প্রাধান্য ছিল। বর্তমান

Dhaka University Institutional Repository

পরিসংখ্যান সেই ইঙ্গিতই বহন করে। এখানে একটি যৌথ পরিবারের কেস তুলে ধরা হলো, যদিও পরিবারগুলো যৌথ, তথাপি গঠন-কাঠামোগত পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

কেস স্টাডি ৬ : মোমো মাতবরের যৌথ পরিবার

মোমো মাতবর মধুপাড়ার ভূমিহীন কৃষক। বর্তমানে তার বয়স ৫৭ বছর। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। তিনি ১ কানি জমি পাট্টা বা ৭ বছরের জন্য বন্ধক রেখেছেন। ঐ জমি চাষ করে তিনি উপার্জন করেন। তাছাড়াও নদীতে মাছ ধরে আয় করেন। তার পরিবারে ৫ জন সদস্য আছে। তারা হলেন– তার স্ত্রী, দুই মেয়ে, শাশুড়ি ও মামা শ্বশুর। মেয়ে দুটির বয়স যথাক্রমে ১৬ বছর ও ৯ বছর। শাশুড়ির বয়স ৬৬ বছর, তিনি মাঝেমধ্যে তাঁতের কাজ করেন। মামা শ্বশুরের বয়স ৪৭ বছর।তিনি বিয়ে করেননি। ব্যবসা করে তিনি মাসে সাত-আট হাজার টাকা আয় করেন। এই আয়ের বড় একটা অংশ মোমোর হাতে তুলে দেন। মোমো এই পরিবারের প্রধান, যদিও তিনি শাশুড়ির যৎসামান্য আয় ও মামা শ্বশুরের আয় গ্রহণ করে সকলের সম্মিলিত আয়ে সংসার চালাচ্ছেন। মোমো মাতবরের পরিবার একটি ভিন্ন কাঠামোর যৌথ পরিবারের উদাহরণ। এখানে কেবল শাশুড়ি নয়, মামা শ্বশুরও এই পরিবারভুক্ত। এই ধরনের পারিবারিক গঠন বাঙালি সমাজের চেয়ে ভিন্নতা নির্দেশ করে।

চিত্র-৭.৮
মোমো মাতবরের যৌথ পরিবার

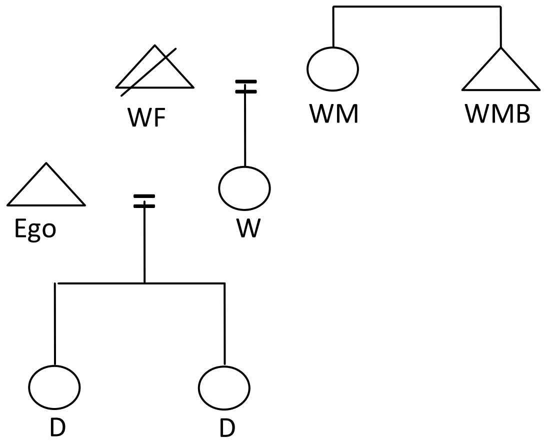

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

৭.৭.১ রাখাইন পরিবারের আকার

আকারভিত্তিতে অর্থাৎ সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার পরিবারগুলো বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রামগুলোর পরিবারসমূহকে নিম্নোক্ত চারটি ভাগে বিভক্ত

করা যায় : (১) ছোট পরিবার : সদস্য সংখ্যা ৩ বা তার কম, (২) মাঝারি পরিবার : সদস্য সংখ্যা ৪-৬ জন, (৩) বড় পরিবার : সদস্য সংখ্যা ৭-৯ জন, ও (৪) খুব বড় পরিবার : সদস্য সংখ্যা ১০ ও ততোধিক।আকারের দিক দিয়ে বেশিরভাগ পরিবার মাঝারি আকারের, সদস্য সংখ্যা ৪-৬জন। এরপর বড় পরিবার, সদস্য সংখ্যা ৭-৯জন। ছোট পরিবার সবচেয়ে কম। মূলত বড় পরিবার ভেঙে ছোট পরিবার গঠিত হয়েছে। নিম্নের সারণিতে পারিবারিক আকারের চিত্র পাওয়া যাবে।

সারণি– ৭.১৬

তিনটি গ্রামের রাখাইনদের পরিবারের আকার

পরিবারের আকার	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
ছোট পরিবার (০-৩ সদস্য)	৬	৩	২	১১	৩৭.৯৩
মাঝারি পরিবার (৪-৬ সদস্য)	৭	৪	৩	১৪	৪৮.২৪
বড় পরিবার (৭-৯ সদস্য)	১	২	১	৪	১৩.৭৮
খুব বড় পবিরার (১০ ও তদূর্ধ্ব)	-	-	-	-	-
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র– ৭.৯

তিনটি গ্রামের রাখাইনদের পরিবারের আকার

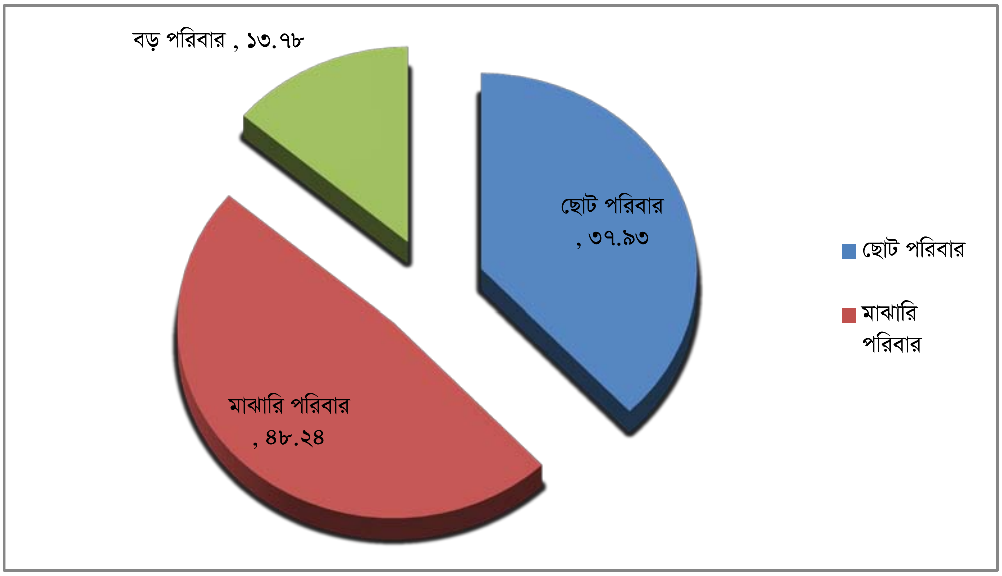

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

উপর্যুক্ত সারণি ৭.১৬ ও চিত্র ৭.৯ নির্দেশ করে যে, আকার অনুযায়ী ৪-৬ সদস্যবিশিষ্ট মাঝারি আকারের পরিবার আছে সবচেয়ে বেশি– ১৪টি অর্থাৎ ৪৮.২৪% ভাগ। ন্যূনতম ৩ সদস্য বিশিষ্ট ছোট পরিবার ১১টি অর্থাৎ ৩৪.৩৮ ভাগ। গ্রামগুলাতে ৭-৯ সদস্যের বড় পরিবার আছে মাত্র ৪টি

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ১৩.৭৯% ভাগ। ১০ কিংবা তদূর্ধ্ব সদস্য সমবায়ে গঠিত খুব বড় পরিবার একটিও পাওয়া যায়নি। দেখা যাচ্ছে যে, মাঝারি আকারের পরিবারগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌথ পরিবার।যারা একত্রে বসবাস করে এবং একই খানায় খায় এরূপ গৃহস্থালীর সদস্যদের সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারের আকার নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট যে, বেশি সদস্যের বড় ধরনের পরিবার কমে গেছে। পরিবার ছোট হওয়ার অন্যতম কারণ আর্থিক ব্যয় নির্বাহের অসামর্থ্যতা। নৃগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও যৌথ পরিবার কমে যাওয়া নির্দেশ করে যে, পূর্বের মতো যৌথ বন্ধনের আর দরকার পড়ছে না, এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনমনে তাদের পক্ষে যৌথ পরিবার টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। যৌথ পরিবারের জন্য অপেক্ষাকৃত বড় বাজেটের প্রয়োজন হয়। বড় ধরনের বাজেটের সংস্থান ও ঝাক্কি-ঝামেলা পরিহারের পক্ষে তারা দিনে দিনে অবস্থান নিচ্ছে।

৭.৮ উত্তরদাতাদের গৃহের ধরন

বিভিন্ন সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাখাইনরা মাটি থেকে পাঁচ-ছয় ফুট উঁচুতে মাচাঙের উপর কাঠের ঘর তৈরি করে। ঘরে ওঠার জন্য বিজোড় সংখ্যক ধাপের একটি কাঠের সিঁড়ি ঘরের সাথে লাগানো থাকে। ঘর তৈরির জন্য অতীতে পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে গোলপাতা, কাঠ সংগ্রহ করে ব্যবহার করতো। সাধারণত গোলপাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি দেওয়া হয়। মাচা করে ঘর তৈরির পদ্ধতি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও দেখা যায়। বিভিন্ন গবেষক মাচার উপর ঘর তৈরির দুটি কারণকে চিহ্নিত করেছেন, যথা– (১) বিষাক্ত পোকা-মাকোড়ের কামড়, হিংস্র জীব-জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া, এবং (২) সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা পাওয়া। এ-ছাড়া মাচাঙের নিচের খালি জায়গা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়, যেমন– তাঁতকল, ধানের গোলা, জ্বালানী কাঠ রাখা, চাষের সরঞ্জামাদিসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র রাখা। মাচাঙ করে বাড়ি করলে এসবের জন্য ভিন্ন ঘর তৈরির খরচ দরকার হয় না। তবে বর্তমানে বাড়ি তৈরিতে নির্মাণ-সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। তবুও অধিকাংশ পরিবারই অতীতের ঐতিহ্য অনুসারে প্রাচীন পদ্ধতিতে বাড়ি তৈরি করে। সে-ক্ষেত্রেও মিশ্র পদ্ধতি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন গৃহ নির্মাণ উপকরণ হিসেবে টিনের ব্যবহার। এটা স্পষ্টত সংস্কৃতায়ন। কারণ এটা আধুনিক ও বাঙালি সংস্করণ। অবশ্য এর অন্য কারণও পাওয়া যায়। যেমন ২০০৮ সালে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ 'সিডর'-এ প্রায় সকল ঘর পূর্ণ নয়তো আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকারি ও বিভিন্ন এনজিও সহায়তায় তা তারা মেরামত করে। নিজস্ব অর্থায়নে বাড়ি তৈরির সংগতি না থাকায় কেউ কেউ বেসরকারি সংগঠনের ত্রাণ-সাহায্য হিসেবে টিন নিয়েও বাড়ি তৈরি করেন। এর ফলে অতীত ঐতিহ্য ধরে রাখাও সম্ভব হচ্ছে না এবং গৃহ নির্মাণে মিশ্র পদ্ধতি বা উপকরণের ব্যবহার ঘটছে। আবার হিড বাংলাদেশের অর্থায়নে গৃহীত সাইক্লোন টং ঘর, রাস্তা, স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪ গ্রাম তিনটিতে কিছু টং ঘর, রাস্তা, স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও ইট বিছানো অপ্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করা হয়। সেক্ষেত্রে মাচাঙ ও কাঠের টঙ থেকে বসত বাড়ি টিনের টঙে রূপান্তরিত হয়েছে।ওগ্রামগুলোতে ১৯টি

(৬৫.৫২%) টিনের টঙ যা হিড বাংলাদেশ কর্তৃক নির্মিত ও ১০টি (৩৪.৪৮%) কাঠের টঙ ঘর আছে। নিম্নের সারণিতে রাখাইনদের বর্তমানে গৃহের ধরন তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.১৭

রাখাইনদের গৃহের ধরন

গৃহের ধরন	গ্রামভিত্তিক গৃহের সংখ্যা			মোট গৃহসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
পাকা	-	-	-	-	-
আধপাকা	-	-	-	-	-
কাঁচা	-	-	-	-	-
কাঠের টং ও টিনের চাল	১	১	১	৩	১০.৩৪
কাঠের টং ও গোলপাতার চাল	৩	৩	১	৭	২৪.১৪
টিনের টং ও টিনের চাল	৮	৪	৩	১৫	৫১.৭২
টিনের টং ও গোলপাতার চাল	২	১	১	৪	১৩.৭৯
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

মাঠ গবেষণা এপ্রিল ২০১৮

উপরের সারণি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রাখাইনদের পাকা, আধপাকা কিংবা মাটির কাঁচাঘর নেই। আদর্শ নমুনার কাঠের টং ও গোলপাতার চালের তৈরি বাড়ি ২৪.১৪%। সবচেয়ে বেশি টিনের টং ও টিনের চাল ৫১.৭২% যা বেসরকারি সহায়তায় নির্মিত। এ-ছাড়া কাঠের টং ও টিনের চাল এবং টিনের টং ও গোলপাতার চালের তৈরি বাড়ি আছে যথাক্রমে ১০.৩৪% ও ১৩.৭৯%। রাখাইনরা অত্যধিক গুরুত্বের সাথে ঘর-বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। প্রত্যেকে বাড়ির সামনে ফুলের বাগান করে। তবে এই পরিচ্ছন্নতা গ্রাম এলাকাগুলোতে লক্ষ্য করা গেলেও, শহরসংলগ্ন কুয়াকাটা এলাকায় তেমন গোছানো পরিচ্ছন্ন ভাব পাওয়া যায়নি। সেখানে ঘিঞ্জি ও অপিরচ্ছন্নতা ভাব লক্ষ্য করা গেছে।

তবে, ২০০৯ সালে গ্রামগুলো পরিদর্শনকালে গবেষক বাঙালিদের মতো দুই/তিন হাত উঁচুতে মাটির ভিত করে কাঠের কিংবা টিনের বেড়া, গোলপাতা কিংবা টিনের চাল দিয়ে তৈরি ঘর দেখতে পান। ঘরের ভিতরে দরজার সাথে প্রায় ১ গজের মতো জায়গা ফাঁকা রেখে সমস্ত ঘর জুড়ে কাঠের মাচাঙ থাকে। এ-ধরনের বাড়ি হাড়িপাড়ায় ১৪টির মধ্যে ৪টি, তুলাতুলিপাড়ায় ৬টির মধ্যে ২টি ও মধুপাড়ায় ৯টির মধ্যে ১টি। তালপাতার চাল ও টিনের বেড়ার ঘর হাড়িপাড়ায় ৫টি, মধুপাড়ায় ২টি ও তুলাতুলিপাড়ায় ২টি। টিনের বেড়া ও টিনের চালের ঘর হাড়িপাড়ায় ২টি ও মধুপাড়ায় ১টি। এই পরিবর্তন সম্পর্কে দলগত আলোচনা থেকে জানা যায়, অতীতে পূর্ব পুরুষরা হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের

হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাঠের তৈরি মাচাঙের মতো বাড়ি করতো। বর্তমানে সেই ভয় নেই। তখন বন থেকে সহজে ভালো কাঠ সংগ্রহ করে বাড়ি করা যেত। বর্তমানে ভালো কাঠের দাম খুব বেশি যা ক্রয় ক্ষমতার বাইরে এবং অতীতের মতো সহজলভ্য নয়। সেজন্য কেউ কেউ বাধ্য হয়ে ঐতিহ্য ছেড়ে দিচ্ছে। তবে বর্তমানে তারা ঐতিহ্য অনুসরণের চেষ্টা করছে, সেটা সম্ভব হচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় নির্ভরশীলতার পথ ধরে। উন্নয়ন সংস্থাগুলো নিজেরা তদারকি করে বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী। যেমন হিড বাংলাদেশের কথা আগেই বলা হয়েছে।

সারণি– ৭.১৮

একনজরে রাখাইনদের গৃহের ধরনে পরিবর্তন

দাদার আমল	বাবার আমল	উত্তরদাতার কাল	মন্তব্য
কাঠের টং ও গোলপাতার ছাউনি	কাঠের টং ও গোলপাতার ছাউনি; মাটির ভিতের উপর টিনের বেড়া ও টিনের চাল	টিনের টং ও টিনের চাল	অতীতে নিজেরা খরচ করে ঐতিহ্য অনুযায়ী বাড়িঘর বানাতো। বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা টিন দিয়ে ঐতিহ্যের অনুসরণে বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে।

স্থিরচিত্র ৭.১ : পাশাপাশি পুরাতন ও আধুনিক দুটি গৃহ

৭.৮.১ উত্তরদাতাদের গৃহের কক্ষবিন্যাস

আয়তনের দিক থেকে অতীতে রাখাইনদের বেশি কক্ষের বড় আয়তনের বাড়ি খুব বেশি না থাকলেও অধিকাংশ গৃহস্থালীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য ছিল। আর্থিক সচ্ছলতা, যৌথ পরিবার কাঠামো ইত্যাদি কারণই তার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। সাধারণত একটি রাখাইন পরিবারের ঘরে অতীতে ৬টি কক্ষ দেখাযেত। যেমন– (১) বৈঠকখানা (রায়াঞ পেঃ), (২) খাবার ঘর (খামে চঃ খ্যায়), (৩) শোয়ার

ঘর (আইছন), (৪) ভাণ্ডারখানা (ওয়ান থখ্যায়), (৫) রান্নাঘর (খামে সে বোঃ), (৬) পানি ব্যবহারের স্থান (তামযেয়) (মজিদ, ১৯৯২)। তবে বর্তমানে ছোট আয়তনের দুই কক্ষের গৃহের সংখ্যাই বেশি। বর্তমানে উত্তরদাতাদের গৃহে কক্ষের সংখ্যা নিম্নের সারণি থেকে বোঝা যাবে।

সারণি– ৭.১৯

রাখাইনদের গৃহে কক্ষের সংখ্যা

ঘরের আকার ও সংখ্যা	গ্রামভিত্তিক গৃহস্থালী			মোট গৃহসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
ছোট (২টি কক্ষ)	৯	৩	৩	১৫	৫১.৭২
মাঝারি (৩টি কক্ষ)	৪	৪	২	১০	৩৪.৮৮
বড় (৪টি ও তদূর্ধ্ব)	১	২	১	৪	১৩.৭৯
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮

উপরোক্ত সারণি অনুসারে, আয়তন অনুযায়ী ২ কক্ষবিশিষ্ট ছোট গৃহবেশি ১৫টি অর্থাৎ ৫১.৭%, ৩ কক্ষ বিশিষ্ট মাঝারি গৃহ ১০টি অর্থাৎ ৩৪.৩৮% ও ৪ কক্ষ বিশিষ্ট বড় গৃহ ৪টি অর্থাৎ ১৩.৭৯%। ছোট গৃহ বেশি হওয়ার কারণ একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। অতীতে ঘর তৈরির জায়গার অভাব ছিল না, নির্মাণ-সামগ্রীরও অভাব ছিল না। গৃহ তৈরির নানা উপকরণ বন-জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করতে পারতো। সে কারণে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের জন্য যৌথ পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী ৪-৫ কক্ষের ঘরের সংখ্যা বেশি ছিল বলে জানা যায়। তবে বর্তমানে ঘর তৈরির পর্যাপ্ত জমি না থাকা, ঘর তৈরির উপকরণের ক্রয়ক্ষমতা না থাকা ইত্যাদি কারণে অনেক কক্ষের ঘর তারা তৈরি করতে পারে না। তাছাড়া যৌথ পরিবারের অনু পরিবারের দিকে ক্রমাগ্রসরমানতাও অন্যতম কারণ।

৭.৯ রাখাইনদের জমি মালকানা

৭.৯.১ গ্রামের ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থা

আদিবাসীদের বেঁচে থাকার জন্য জমি অত্যন্ত অপরিহার্য। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কলাপাড়া উপজেলা অতীতে বাকেরগঞ্জের সুন্দরবন এলাকাভুক্ত ছিল। বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে জমিকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়। সেজন্য বাংলার ভূমি বিন্যাস ব্যবস্থার সাথে গবেষণাধীন এলাকার ভূমি বিন্যাস ব্যবস্থার তারতম্য থাকা স্বাভাবিক। উপরন্তু, বাংলার ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থা তৎকালীন ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক ছিল। বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতা এর অন্যতম কারণ। ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থার এই বৈচিত্র্যতার চিত্র পাওয়া যায় নৃবিজ্ঞানী অধ্যাপক আরেফিনের বর্ণনায়। তিনি বলেন :

> "বাংলার ভূমি বিন্যাস ব্যবস্থা ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে ভিন্নতর। অধিকন্তু, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস যেমন বেশ অস্পষ্ট তেমনই এর ভূমি বিন্যাস ব্যবস্থা। এমনকি পাঠান ও মুগল শাসনামলেও সাম্রাজ্যের অন্যান্য এলাকার ন্যায় একইরকম ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়নি কারণ বাংলা প্রদেশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য এলাকা থেকে বহু দূরবর্তী কোণে অবস্থিত ছিল। এছাড়া সরকারের অস্থিতিশীলতার কারণে একইরকম ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থার বিকাশ এখানে হয়নি। এমনকি ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে বাংলায় রাজনৈতিক অবস্থা বেশ বিশৃঙ্খল পর্যায়ে ছিল। এর ফলে বাংলার সমগ্র রাজস্ব ব্যবস্থাতেই বিশেষ করে কৃষকদের থেকে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে এক বিভ্রান্তিকর এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল।" (১৯৯৪: ৮১)

অবিভক্ত বাংলার ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থায় এই বৈচিত্র্যতার জন্য গবেষকগণ ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। যেমন সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক নাজমুল করিম ভারতবর্ষের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে মোট চারভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। সেগুলো হলো : ১. The Northern Indian or the Aryan type, ২. The Daccan type, ৩. The Bengal type, ৪. The Tribal type. (karim, 1986)

ভূমিবিন্যাসে বিদ্যমান বিশৃঙ্খলা আদিবাসীঅধ্যুষিত এলাকার ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় বর্তমান ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন ১৯৫০ সালের জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে বাংলাদেশে ২২টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলাকে জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বাইরে রাখা হয়। তাই তারা এ-আইনের সুবিধা-বঞ্চিত। এ তিন জেলার জমি সংক্রান্ত আইন আলাদা। ২০০০ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি অনুসারে পরবর্তীকালে এই এলাকার জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা হয়। যদিও কারা আদিবাসী আর কারা আদিবাসী নয়, এ-বিষয়টি বাংলাদেশে এখনো সরকারিভাবে মীমাংসিত নয়, তবুও জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে উল্লিখিত আদিবাসী ছাড়াও আদিবাসী পরিষদের দাবি অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন জেলায় অনেক আদিবাসী বসবাস করে যারা জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে অন্তর্ভুক্ত নয় (খান, ২০০৮: ১৭১)।[৫]আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংগঠন 'আদিবাসী পরিষদ' ও 'আদিবাসী ফোরাম' উভয়েই এ-সকল জেলার আদিবাসীদের এই আইনের আওতায় আনার পক্ষপাতি এবং তারা সরকারের কাছে দাবি করে আসছে। এই আইনে আদিবাসীদের জন্য বিশেষ কিছু সুবিধা নির্দেশিত হয়েছে।

১৯৫০ সালের 'জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন'র ৯৭ ধারা অনুসারে আদিবাসীদের জমি বিক্রির ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হয়। এই আইনে উল্লেখিত আদিবাসীদের জমি অ-আদিবাসীদের কাছে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণের মতো বিধি নিষেধ

আরোপ করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত আইনের ৯৭ ধারার পাঠ থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এ-ধারায় বলা হয়েছে :

"...আদিবাসী কর্তৃক জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ :

(১) সরকার সময় সময় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করতে পারেন যে, এ ধারার বিধান কোনো জেলা বা স্থানীয় এলাকার নিম্নবর্ণিত আদিবাসী সমাজ বা গোত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং এইরূপ সমাজ ও গোত্র এ ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আদিবাসী বলে গণ্য হবে এবং এরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হবে যে এ-ধারার বিধানসমূহ এরূপ সমাজ এবং গোত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। যথা : সাঁওতাল, বানিয়াস, ভূঁইয়া, ভূমিজ, দালুস, গণ্ডা, হাদি, হাজং, হো, খড়িয়া, খাওয়ার, কোরা, কোচ, মগ, মাল সুরিয়া, পাহাড়িয়া, মাচ, মান্ডা, মন্ডিয়া, ওরাং এবং তোড়ি।

(২)এই ধারায় বর্ণিত বিধান ব্যতীত কোনো আদিবাসী রায়ত কর্তৃক তার জোত অথবা এর অংশবিশেষের স্বত্ব বাংলাদেশের স্থায়ী আদিবাসী যার কাছে এরূপ জোত বা এর অংশ ৯০ ধারা মোতাবেক হস্তান্তর করা যায় তার কাছে ব্যতীত অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করা যাবে না।

(৩) কোনো আদিবাসী রায়ত আদিবাসী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে জোত বা এর অংশবিশেষ বিক্রি করতে ইচ্ছে করলে তিনি রাজস্ব কর্মকর্তার কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে পারেন। রাজস্ব কর্মকর্তা এই আইনের ৮৮ ও ৯০ ধারার বিধান সাপেক্ষে তার আবেদন বিবেচনা করে আদেশ দেবেন।

(৪) এই ধারার (৩) উপধারায় বর্ণিত প্রত্যেক হস্তান্তর রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে করতে হবে। এবং দলিল রেজিস্ট্রি ও জমি হস্তান্তরের পূর্বে দলিলের শর্ত এবং হস্তান্তরের জন্য রাজস্ব কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।...

(৭) এ ধারার বিধান লঙ্ঘনপূর্বক কোনো আদিবাসী রায়ত কোনো জমি হস্তান্তর করলে তা বাতিল হবে।"৬

উক্ত আইনে কেবল আদিবাসীদের জমি বিক্রির ক্ষেত্রে নয়, জমি বন্ধক প্রদানের ক্ষেত্রেও কিছু শর্ত আরোপ করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। যথা : "(১) আদিবাসী রায়তের জমি বন্ধকদানের ক্ষমতা কেবল 'খাই খালাসি বন্ধকে' সীমিত থাকবে। তবে বিকেবি, বিএডিসি, এবং সমবায় সমিতি হতে গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে এই শর্ত কোনো বাধা হবে না। (২) কোনো আদিবাসী এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বা নিবেশিত অন্য আদিবাসীর কাছে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ৭ বছর পর্যন্ত খাই খালাসি বন্ধক প্রদান করতে পারবেন। (৩) কোনোআদিবাসী কর্তৃক এই আইনের পরিপন্থি কোনো হস্তান্তর বৈধ হবে না।

এরূপ হস্তান্তর করা হলে রাজস্ব কর্মকর্তা লিখিত আদেশে কারণ দর্শানোর সুযোগদান সাপেক্ষে গ্রহীতাকে উচ্ছেদ করতে পারবেন। উচ্ছেদকৃত জমি তিনি হস্তান্তরকারী আদিবাসী বা তার উত্তরাধিকারের কাছে হস্তান্তর করতে পারবেন, কিংবা তা সম্ভব না হলে ঐ জমি সরকারের অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা করতে পারবেন। (৪) সার্টিফিকেট নিলাম ব্যতীত কোনো আদালত আদিবাসীর জমি নিলামে বিক্রির আদেশ দেবেন না।”৭

রাখাইনরা পটুয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে প্রথম গ্রাম নিবাস গড়ে তোলে বলে তারা দাবি করে। এ-দাবি ঐতিহাসিকভাবে সত্য প্রমাণিত। সুন্দরবন অঞ্চলের বনভূমিকে আবাদযোগ্য করে ভূমির স্বত্বাধিকারী অর্জন করেছে রাখাইনরা। তাই এই ভূমিতে তাদের প্রথম অধিকার। একে কাস্টমারি রাইট বা ঐতিহ্যগত অধিকার বলা হয়। তখন জমির উপর সাধারণ মালিকানা বা কমন ওনারশিপ ছিল। অর্থাৎ প্রতিটি পরিবার তার প্রয়োজন মোতাবেক জমি ব্যবহার করতে পারতো (চাকমা, ২০০৫: ৬৩)।

তবে ব্রিটিশ আমলেই বাংলাদেশের অন্যান্য সমতল ভূমির নৃগোষ্ঠীর মতো রাখাইনদের জমি সরকার কর্তৃক ব্যক্তি মালিকানায় দলিল করে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে মুস্তাফা মজিদ (১৯৯২: ৩০) বলেন,পটুয়াখালী অঞ্চলে ব্রিটিশসরকারের কাছ থেকে রাখাইনরা জমি পত্তনি গ্রহণ করে। এই জমি তাদের নিজস্ব ভূখণ্ড এবং চাষবাস, পশুচারণ ও বসবাসের জন্য নিজস্ব সীমারেখায় মৌখিক ও রেকর্ডকৃত বিধিবদ্ধ। ফাদার আর ডব্লিউ টিম (১৯৯২: ৪৩) বলেন, “তত্ত্বগতভাবে আদিবাসীদের সমস্ত জমি যদিও সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়, সমতলের আদিবাসীদের সৌভাগ্য যে, ব্রিটিশ শাসনামলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় দলিলবদ্ধ হয়েছে।”গবেষণাধীন গ্রাম তিনটির বর্তমান উপজেলা কলাপাড়া সম্পর্কে ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বর্ণিত হয়েছে : খেপুপাড়া ও কলাপাড়ায় অধিকাংশ রাখাইনের বাস। ঐতিহাসিকভাবেই কলাপাড়া-খেপুপাড়ার সাথে রাখাইনরা সম্পর্কিত। কলাপাড়া মূলত সুন্দরবনে আবৃত ছিল এবং এ-বনাঞ্চল বর্তমান কলাপাড়া থানা ও এর দক্ষিণাংশ বড়বাগী ও করইবাড়িয়া ইউনিয়নসমূহে বিস্তৃত ছিল। সংলগ্ন পাড়া দুটি মগ প্রধান কলা মাতব্বর ও খেপু মাতব্বরের নাম অনুসারে কলাপাড়া ও খেপুপাড়া নামে পরিচিত (*District Gazetteers* :1982: 248)।

পটুয়াখালীর বর্তমান রাখাইন অঞ্চল কলাপাড়া, গলাচিপা, বরগুনায় এভাবে ধীরে ধীরে ও অপসৃত বনভূমিতে উপকূলীয় পলিসঞ্চিত ভূমিতে রাখাইনরা বসতি বিস্তৃত করে। ব্রিটিশ সরকার রাখাইনদের দিয়ে সূচিত জঙ্গল-উদ্ধার ও পতিতাবাদ আরো ব্যাপকতর করতে প্রয়াসী হয়। ভূমির চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ করযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির এই পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকারকে চট্টগ্রাম হতে চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত পতিতাবাদ বিস্তৃতকরণে উৎসাহিত করে(আজাদ, ১৯৮৯)। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

পতিতাবাদ অত্যন্ত ব্যয়বহুল, কষ্টকর, ঝুঁকিপূর্ণ এবং সময় সাপেক্ষ ছিল বলে এই কাজকে উৎসাহিত করতে সরকারকে ভূমিতে আবাদকারদের প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হয়।কিন্তু পতিতাবাদের ব্যয়ের বাহুল্য ও সময়-সাপেক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি রাজস্ব আদায়ে সূর্যাস্ত আইনের (বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব বিক্রয় আইন, ১৮৫৯) কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আবাদকার জমিদারদের সৃষ্টি করতে হয় পত্তনি তালুক (ইসলাম, ১৯৮৫; আজাদ, ১৯৮৯)। ঝুঁকি লাঘব করা বা পুঁজির যোগানদার অথবা উভয় কারণেই আবাদকার তালুকদার সৃষ্টি করে উসত বা দ্বিতীয় ডিগ্রির তালুকদার। উসত তালুকদার সৃষ্টি করে নিম উসত বা তৃতীয় ডিগ্রির তালুকদার। এই পর্যায়ে স্বত্বের ধরনে পরিবর্তন আসে। তালুকদারী স্বত্বের পর সৃষ্টি হয় হাওলাদার, হাওলাদার সৃষ্টি করে নিম হাওলা এবং তারপর সৃষ্টি হয় উসত নিম হাওলা। এভাবে বহুস্তরে বিন্যস্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীরা সুন্দরবনে আবাদকে সম্ভব করে তোলে (মজিদ, ১৯৯২ : ১০৬)।খেপুপাড়া রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রেকর্ড অনুযায়ী, ১৯০৭ সালে কলাপাড়া ও খেপুপাড়া অঞ্চলে উপনিবেশ সূচিত হয়। দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার বনভূমি উদ্ধার করে ঐ এলাকার রাখাইনদের এই উপনিবেশেরশুরুতে অন্যত্র অপসারণ করা হয় (*District Gazetteers* :1982: 248)।

উপনিবেশের সূচনায় অর্থাৎ ১৯০৭ সালে ভূমির উপর কোনো খাজনা ছিল না। প্রথম সি এস জরিপের (ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে) পর ভূমির উপর কর আরোপিত হয়। উল্লেখ্য, বাকেরগঞ্জ জেলায় ১৯০৪-১৯১৬ সালে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৪০-১৯৪২ সালে রিভিশন হয়।চকমারিয়া ও লালুয়া ইউনিয়নগুলো ছিল মহেন্দ্রনাথ শাহ্ ও অন্যান্য এবং লালুয়া ছিল দত্তদের খাজনা আদায়কারী স্বার্থভুক্ত। এই খাজনা আদায়কারীদের স্বার্থ ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে অধিগৃহীত হয়। উল্লিখিত অঞ্চল বাদে কলাপাড়া উপজেলার অন্যান্য অঞ্চল ছিল খাসমহলভুক্ত। এ অঞ্চলের জনসাধারণ সরকার বরাবর খাজনা প্রদান করতো (মজিদ, ১৯৯২: ১০৬)।পটুয়াখালী এলাকার কলোনিজেশন সম্পর্কে রাখাইন নেতা উথুন অং জাঁ বলেন :

> "...তখন সমগ্র কলোনিজেশনে এলাকার নাম ছিল 'দি বাখরগঞ্জ-সুন্দরবন কলোনিজেশন'। বর্তমান কলাপাড়া উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন এবং আরো পশ্চিমে পাথরঘাটা উপজেলার বেশকিছু অংশ নিয়ে কলোনিজেশন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কলোনিজেশন এলাকা বহির্ভূত বড় বাইজদিয়া, বড় বালিয়াতলী ও বরগুনা উপজেলার কিছু অংশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরা ঐ এলাকার জমিদারের প্রজা হিসেবে ছিল। তারমধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ পরিবারের নেতৃস্থানীয়রা ইংরেজদের কাছ থেকে কিছু কিছু জমিদারি ইজারা নিতে সক্ষম হয়েছিল। তারা হলেন খাপড়া ডাঙ্গার ম্রাচা চৌধুরী,

Dhaka University Institutional Repository

লালুয়ার লাথায় চৌধুরী, মংখেন চৌধুরী এবং বড় বাইজদিয়ার মোচা হাওলাদার ও তাজা হাওলাদার।বাখরগঞ্জ সুন্দরবন কলোনিজেশন এলাকায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় উপজাতীয়দের প্রায় ২০০ গ্রাম গড়ে উঠেছিল। সেগুলো প্রত্যেকটি ছিল নিজ হাতে জঙ্গল কেটে আবাদ করা জমির উপর। প্রথম প্রথম জঙ্গল আবাদ করার পর বিনা খাজনায় পাঁচ থেকে দশ বছর চাষ করে ফসল ফলাতে পারত। কিন্তু পরবর্তীকালে সি. এস. সেটেলমেন্ট নামে সার্কেল সেটেলমেন্টে প্রথম দশ বছরের জন্য খাজনা ধার্য করে দেয়া হয়েছিল।" (জাঁ, ১৯৯২: ২৯)

গ্রন্থকার আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন বলেন, পূর্ব হতেই চট্টগ্রামে আরাকানিদের বসতি ছিল এবং মোগল আমলে তাদের মাথাপিছু একটি বার্ষিক কর 'মগজমা'ও নির্ধারিত ছিল। চট্টগ্রামের কালেক্টর হ্যারি ভেরেলস্ট এই 'মগজমা' তুলে দিয়ে চট্টগ্রামের দক্ষিণকূলে আরাকানিদের বসতি বাড়াতে চেষ্টা করেন (*রাখাইন রিভিউ*২০০০: ২৭-২৮)।

রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোগল সম্রাট মহামতি আকবরের আজ্ঞানুসারে মোগলাধিকৃত যাবতীয় রাজ্যের জন্য রাজস্বসচিব মহামনস্বী টোডরমল্ল সর্বপ্রথম ১৫৮২ সালে খাসের সম্পত্তি ১৯টি সরকার এবং ৬৮২টি পরগণায় বিভক্ত করেন। মোগলাধিকৃত বাকলা তখন সুবর্ণগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ৫২ পরগণায় বিভক্ত ছিল। *আইন-ই-আকবরি* থেকে জানা যায় যে, "সমগ্র বঙ্গদেশে যেভাবে পরিমাপকরতঃ কর ধার্য করা হয়েছিল, বাকলাও তদ্রুপ নিয়মান্তর্গত ছিল; তবে এই দেশ ধান উৎপাদনের প্রধান স্থান। সেজন্য ফুল্‌সী জমিতে ডাম এবং ধান কোনো কোনো স্থানে অবস্থানুরূপ আদায় হতো। বাকলার পূর্ব সীমান্তবর্তী দক্ষিণ সাহাবাজপুর তখন সরকার ফতিয়াবাদের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু সেলিমাবাদ পরগণা প্রভৃতি বাকলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহজাদা সুজা বঙ্গে সুবেদার থাকাকালে বঙ্গদেশে দ্বিতীয়বার রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন যা শেষ হয় ১৬৫৮ সালে। এই বন্দোবস্তে সমগ্র বঙ্গদেশ ৩৪টি সরকার এবং ১৩৫০টি পরগণায় বিভক্ত করা হয়।সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে ১৭০৭ সালে বঙ্গের রাজধানী ঢাকা (জাহাঙ্গীরনগর) থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। এরপর ১৭২১ সালে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ পুনরায় সমগ্র বঙ্গদেশের বন্দোবস্ত করেন। বঙ্গদেশ তখন ১৩টি চাক্‌লা এবং ১৬০০ পরগণায় বিভক্ত হয়। বাকলা তখন জাহাঙ্গীরনগর চাক্‌লার অন্তর্গত হয়ে ২৩৬টি পরগনায় বিভক্ত হয়। গ্রন্থকার রোহিনী কুমার সেন জানান, বঙ্গের শেষ মুসলমান নৃপতি নবাব কাসেম আলি খাঁ ১৭৬৩ সালে পুনরায় বন্দোবস্ত করেন। তিনি মুর্শিদকুলি খাঁ কৃত বন্দোবস্তের বিশেষ কোনো পরিবর্তন না করে খাস ভূমির কতকাংশ পরিবর্তন করেন। এতে চাক্‌লা ও জাহাঙ্গীরনগরের নাম উল্লেখ আছে; কিন্তু নতুন কোনো প্রকার বন্দোবস্ত দেখা যায় না। নবাব কাসেম আলি খাঁর বন্দোবস্তই মুসলমান রাজাদের শেষ বন্দোবস্ত। এর কিছুদিন পরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

Dhaka University Institutional Repository

সনদ গ্রহণ করে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান হয়। ইংরেজ রাজত্বের শুরুতে বোর্ড অফ রেভিনিউর আদেশানুসারে ১৭৯১ সালের ২০ মে থেকে দশশালা বন্দোবস্ত আইন প্রচলিত হয়। কিন্তু দশশালা বন্দোবস্ত ততটা কার্যে পরিণত না হওয়ায়, অতঃপর ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ও প্রচলন হয় (দ্র. চক্রবর্তী ও বাশার (সম্পা.), ২০০৪: ৯৬-৯৭)।

১৯৪৫-৫০ সাল পর্যন্ত পরিচালিত সার্ভে ও সেটেলমেন্ট অপারেশনের তথ্য অনুযায়ী পটুয়াখালী অঞ্চলের ৮৫% ভূমি রায়তদের অধীন। রায়তদের বেশিরভাগ ছিল জেলার দক্ষিণাঞ্চলে। ভূমির সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাদের অনুপস্থিতিতে বহুস্তর বিশিষ্ট মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণির জন্ম হয়। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের এক হিসেবে দেখা যায়, ১৮৭১ সালে এই স্তর ছিল ৪টি, ১৯১১ সালে ২০টি এবং ১৯৫০ সালে তা বেড়ে ৫০টিতে দাঁড়ায়(*District Gazetteers* :1982: 248)।গ্রন্থকার খোসলালচন্দ্র রায় বলেন, পরগণার বিবরণ পাঠে জানা যায়, বাখরগঞ্জের পরগণাসমূহের মধ্যে প্রায় ৯০ খানা প্রধান প্রধান জমিদারি ও প্রায় ৩৩০০ খারিজা তালুক আছে। এই সকল জমিদারি ও তালুকের অন্তর্গত কত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হকিয়তের সৃষ্টি হয়েছে তার পরিষ্কার হিসেব পাওয়া সম্ভবপর নয়।ব্রহ্মোত্তর, লাখেরাজ মহাত্রাণ, সিকিম তালুক, হুজুরী তালুক, নিম ওসত তালুক, হাওলা, নিম হাওলা, ওসত নিম হাওলা, ইজারা, মিরাশ ইজারা, মিরাশ মালগুজার, কায়েম কর্ষা, মিয়াদী কর্ষা, কর্ষা, রায়তি, জোত ইত্যাদি অনেকানেক হকিয়তের উল্লেখ দেখা যায়(দ্র. চক্রবর্তী ও বাশার (সম্পা.), ২০০৪: ৩০৯)।

৭.৯.২ গ্রামে জমির প্রকরণ

অঞ্চলভেদে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূমির শ্রেণিকরণ ও ভূমিবিন্যাস ক্যাটাগরি ভিন্ন ভিন্ন। যে কোনো গ্রামের ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করতে হলে ঐ গ্রামের জনসাধারণ কিভাবে গ্রামের ভূমির শ্রেণিকরণ এবং ভূমিবিন্যাসের ক্যাটাগরি করে তা জানা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রথমে গবেষিত গ্রামের ভূমির শ্রেণিকরণ ও ভূমির শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা গেছে গ্রামবাসীরা জমিকে চৌদ্দভাবে সনাক্ত করে। যথা : ভিটি, নাল, পুকুর, দিঘি, ডাঙা (হালট, গোপাট), বিল, আইল, মাঠ, ডোবা (কুয়া), ব্যাড়, কান্দি, থালা, উঠান ও বাগ। ‘ভিটি’ বাংলা শব্দ। ভিটি বলতে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গা এবং বাড়ি তৈরির নির্দিষ্ট এলাকাকে বুঝায়। তবে সুনির্দিষ্টভাবে ভিটি বলতে বুঝায় আবাসিক পরিবারের সংখ্যা অনুযায়ী বাসস্থান যেখানে বাড়িকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ভিটেবাড়ি গড়ে উঠতে পারে। ‘নাল’ শব্দ এসছে পালি শব্দ থেকে যা নিচু জমি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। রাখাইন গ্রামবাসী খাল শুকিয়ে চাষের জন্য ব্যবহৃত জমিকে নাল হিসেবে বিবেচনা করে। এটা সাধারণত খাস জমি। গবেষণা এলাকার সব নাল জমি অ-আদিবাসী

বাঙালিদের দখলে। 'পুকুর' পালি শব্দ। এর অর্থ পানির পুকুর। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সর্বত্রই পুকুর দেখা যায় যা দৈনন্দিন জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়। তবে বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুদের মতো রাখাইনদের বাড়িতে বাড়িতে পুকুর থাকে না। প্রতিটি পাড়ায় একটি করে পুকুর থাকে যা সার্বজনীনভাবে ব্যবহারযোগ্য। পুকুরের পানিতে নামা নিষেধ। পাত্র করে পানি পুকুর থেকে উপরে তুলে গোসলসহ সকল প্রকার কাজ সারতে হয়। 'দিঘি' হলো বেশ বড় আকারের পুকুর বা জলাশয়। বাংলাদেশের সকল গ্রামাঞ্চলের মতো রাখাইন গ্রামবাসীদের কাছে দিঘি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ডাঙা' শব্দটি গবেষণা এলাকায় হালট শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ছোট বালিয়াতলী মৌজা ম্যাপে হালটের উল্লেখ থাকলেও এবং ম্যাপে অনেক জমিকে হালট হিসেবে দেখানো হলেও গ্রামবাসীদের কাছে হালট শব্দটি পরিচিত নয়। তবে আলোচনা করে জানা যায় হালটকে তারা ডাঙা হিসেবে জানে। ডাঙা হলো ফসলের মাঠ দিয়ে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত পথ। সাধারণ রাখাইন গ্রামবাসীর কাছে হালট শব্দটি অপরিচিত হলেও মধুপাড়ার এমঙ মাতবর যিনি জমি-জমা ভালো বোঝেন তার কাছে হালট পরিচিত শব্দ এবং তিনি হালট সম্পর্কে জানেন। 'বিল' সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ জলাভূমি। গ্রামবাসী বিল বলতে জলাভূমি নির্দেশ না করে ফসল ফলানোর বিস্তৃত জমিকে একত্রে বিল বলে জানে যা অপেক্ষাকৃত একটু নিচু জায়গা। 'আইল' হলো জমির উপর তৈরিকৃত মাটির সরু ফালি যা একটি জমিকে আর একটি জমি থেকে পৃথক করে। আইল জমির নিরপেক্ষ সীমানা। 'মাঠ' হলো বসতবাড়ির সন্নিকটে ফসলের বিস্তৃত জমি যা বিলের চেয়ে একটু উঁচু জমিন। মাঠে বিলের মতো ধানপাটের চাষের চেয়ে সরিষা, শাক-সবজির চাষ বেশি হয়। 'ডোবা' ময়লা-আবর্জনা ফেলার নিচু জায়গা। ডোবায় পানি থাকে। ডোবা শব্দটি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো একই অর্থে বোঝায়। 'কান্দি' বলতে বাড়ির পাশে গাছপালা, সাক-সবজি রোপণের লক্ষ্যে জমিতে মাটি কেটে উঁচু করা অংশ। অন্যান্য এলাকায় কান্দি শব্দের প্রচলন নেই। 'ব্যাড়' বলতে বাড়ি তৈরির জন্য কান্দি উঠাতে জমির যে অংশ থেকে মাটি কেটে কান্দি তৈরি করা হয় সেই নিচু জমিকে ব্যাড় বুঝায়। ব্যাড়ে বর্ষাকালে পানি জমে থাকে।

'থালা' হলো ব্যাড়ের বৃহৎ রূপ। সাধারণত চাষবাসের স্থানে গাছপালা, সাক-সবজি রোপণের জন্য জমির ধার থেকে মাটি কেটে উঁচু করা হয়। তখন মাটি কাটা নিচু স্থানকে থালা বলে। থালায় পানি জমে থাকে। সেই পানি বিভিন্ন প্রকার রোপণের কাজে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাখাইন গ্রামবাসী ভিটেয় অবস্থিত বাড়ির পার্শ্বস্ত নিচু জমিকে ব্যাড় বলে এবং ভিটে থেকে দূরে কিংবা মাঠের নিচু জমিকে থালা বলে যা মাটি কেটে কান্দি প্রস্তুত করার ফলে তৈরি হয়। থালা আয়তনের দিক থেকেও ব্যাড়ের চেয়ে বড়। উপরন্তু, গ্রামবাসী বিলের নিচু জায়গাকেও থালা বলে যেখানে কৃষকরা আমন ধান (মোটা ধান) চাষ করে। 'কুয়া' হলো বড় রাস্তার পাশের নিচু জায়গা অর্থাৎ রাস্তা বরাবর কুয়া অবস্থিত যেখানে জ্যৈষ্ঠ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত পানি থাকে। কুয়ার পানিতে বিভিন্ন মাছ থাকে। কুয়া থেকে গ্রামবাসী ছিপ-বর্শি দিয়ে মাছ ধরে। চৈত্র মাসে কুয়ার পানি কমে এলে গ্রামবাসী

Dhaka University Institutional Repository

পানি সেচে মাছ ধরে থাকে। তবে দেশের দক্ষিণের সাতক্ষীরা জেলার লোকজন কুয়া বলতে বিলের জমিতে এক কোণায় অবস্থিত পুকুরকে বোঝায়। চাষের জমিতে পানি দেওয়ার জন্য বর্ষাকালে পানি ধরে রাখার লক্ষ্যে কুয়া কাটা হয়। কুয়ার পানিতে বিভিন্ন রকমের মিঠা পানির মাছ থাকে। প্রতি বছর চাষ শেষে শীতের শেষ দিকে কুয়া সেচে মাছ ধরা হয়। 'উঠান' শব্দটি এসছে সংস্কৃতি থেকে যার অর্থ আঙিনা বা প্রাঙ্গণ। উঠান বলতে গ্রামবাসী বাড়ির সামনের খালি জায়গাকে বোঝায় যেখানে বছরের সব সময় গৃহস্থালী ও কৃষি সম্পর্কিত কাজ করে থাকে। 'বাগ' শব্দের উৎপত্তি ফারসি থেকে। বাগ অর্থ বাগান বা উদ্যান। গ্রামবাসী বাগ বলতে উঠান বাদে বাড়ির তিনদিকের খালি জায়গাকে বুঝিয়ে থাকে। বাগে বিভিন্ন প্রকারের গাছ লাগানো হয়। এভাবে রাখাইনদের জমিকে চৌদ্দ প্রকারে সনাক্ত করতে দেখা যায়।

গ্রামগুলোর রাখাইনরা জমিকে মালিকানা, এজমালি, খাস, পত্তন বা বর্গা, বন্ধক, দান, উইল, এওজবদল, নিলাম, অধিগ্রহণ ইত্যাদি ক্যাটাগরি করে থাকে। 'মালিকানা' শব্দটি মূলত আরবি শব্দ যার অর্থ মালিক, স্বত্বাধিকারী, শাসক, প্রভু বা ভূমি মালিক। সাধারণত গ্রামবাসী ভূমির স্বত্বাধিকারী বোঝাতে মালিকানা শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। 'এজমালি' শব্দটি আরবি থেকে এসেছে যার অর্থ যৌথ উত্তরাধিকার। হাড়িপাড়ার বসতভিটে এজমালি সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত যা মাতবরের নামে দলিলকৃত। খাস বলতে ব্যক্তি মালিকানা বহির্ভূত জমিকে বুঝায়। গবেষণা এলাকার ডাঙা, কুয়া– এ ধরনের জমিকে খাস জমি বা সরকারি জমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পত্তন বা বর্গা শব্দটি দ্বারা ভাগ চাষ ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়। পত্তন ব্যবস্থায় কৃষক জমি চাষ করে কিন্তু সেই জমির মালিকানাস্বত্ব কৃষকের নয়। কৃষক জমির মালিকের সাথে এক ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে ব্যবস্থায় সে তার নিজের শ্রম ও পুঁজি খাটিয়ে চাষাবাদ করতে পারে। বিনিময়ে কৃষক চুক্তি অনুযায়ী উৎপাদিত ফসলের ভাগ জমির মালিককে দেয়। এই চুক্তির ধরন বিভিন্ন রকমের হয় যা জমির প্রকৃতি ও জমির অবস্থানের উপর নির্ভর করে। এখানে দো-ভাগা এবং তেভাগার ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও পত্তন ব্যবস্থায় ধান করোলী বলে এক ধরনের চুক্তি ব্যবস্থা চালু আছে। এই চুক্তি অনুসারে কৃষক চুক্তির সময় স্বীকার করে নেয় যে, জমির মালিককে সে জমি অনুযায়ী কানি প্রতি ৩০-৩৫ মন ধান দেবে। চুক্তির উল্লেখযোগ্য এবং কৃষকের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো প্রাকৃতিক কিংবা অন্য কোনো কারণে ফসল ভালো না হলেও জমির মালিককে চুক্তি অনুযায়ী ফসল দিতে হয়।

বন্ধক হলো বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ভূমিবন্ধকি ব্যবস্থা। 'বন্ধক' শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে যার অর্থ হলো ঋণের ক্ষেত্রে এক ধরনের নিশ্চয়তা প্রদান। গবেষণা এলাকায় বন্ধকের কয়েকটি ধরন লক্ষ্য করা যায়। যেমন : পাট্টা বা খাইখালাসি, এক সনা বন্ধক এবং বেমেদি বা কোট কওলা বা কোট বন্ধক । পাট্টার সর্বোচ্চ মেয়াদ ৭ বছর। নিয়মানুযায়ী ৭ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে জমি

Dhaka University Institutional Repository

ফেরত নিতে হলে হিসেব অনুযায়ী টাকা ফেরত দিতে হয়। আর ৬০ বছরের মধ্যে বন্ধকদাতা তার জমি ফেরত না নিলে সে এই জমি ফেরত পায় না। একসনা হলো ১ বছর মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক বন্ধকি ব্যবস্থা। বেমেদি বা কোট কওলা হলো ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে অনির্ধারিত মেয়াদের চুক্তিভিত্তিক বন্ধকি ব্যবস্থা। রাখাইন গ্রামবাসীদের যে-সকল কারণে জমি বেহাত হয় তার মধ্যে এই চুক্তিভিত্তিক বেমেদি বন্দোবস্ত অন্যতম।

দান হলো স্নেহ-ভালোবাসার প্রতিদান হিসেবে প্রিয়জনকে জমি প্রদান। আবার অনেকে পরকালে শান্তির আশায় এবং জনহিতকর কাজের জন্য জমি দান করে। দানের ক্ষেত্রে দাতার দান করার ইচ্ছে ও গ্রহীতার সম্মতি থাকতে হয়। জমি দান রেজিস্ট্রি দলিলের মাধ্যমে করতে হয়। উল্লেখ্য, দান ধর্মরিপেক্ষ। যে-কোনো ধর্মের অনুসারী যে-কাউকেও জমি দান করতে পারে। কেবল মুসলমানদের জন্য ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী এই দান ব্যবস্থার অপর নাম হেবা। উইল বলতে কোনো মৃত ব্যক্তি কর্তৃক মৃত্যুর আগে তার সম্পত্তি বিলি ব্যবস্থা করার জন্য যে ইচ্ছে ব্যক্ত করেন তা উইল। এওজবদল হলো পরস্পরের মধ্যে জমি বদল করে নেওয়া। এওজবদলের জমি একই দামের নাও হতে পারে। পরিমাণেও এক নাও হতে পারে। তাই দাম ধরে হারাহারি অংশ নেওয়া যায় কিংবা অতিরিক্ত জমির জন্য দাম দিয়ে নেওয়া যায়।

নিলাম বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন ব্যাংক ঋণ পরিশোধ না করা, ভূমি উন্নয়ন কর বাকি থাকা ও অন্যান্য কারণে জমি নিলামে চড়িয়ে অর্থ আদায় করা হয়। মামলার রায় ও ডিক্রির ভিত্তিতে খবরের কাগজে নিলাম বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সর্বোচ্চ ডাককারীর কাছে জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়। অনগ্রসর সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রাখাইন গ্রামবাসী জমির খাজনা পরিশোধের ব্যাপারে সচেতন ছিল না। ফলে দীর্ঘদিন খাজনা পরিশোধ না করার কারণে রাখাইনদের অনেক জমি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। সবক্ষেত্রে নিলাম ক্রয় করে অআদিবাসী বাঙালিরা। রাখাইন গ্রামবাসীদের যে-সকল কারণে জমি বেহাত হয়েছে জমি নিলামে ওঠা তারমধ্যে অন্যতম। গ্রামবাসীর সাথে আলাপকালে জানা যায়, খাজনা পরিশোধের বিষয়ে সতর্ক না থাকার কারণে জমি নিলামে ওঠার বিষয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা জানতো না। পরবর্তীকালে নিলাম ক্রয়কারী জোরপূর্বক জমি দখলে নেয়। আবার কখনো নিলামের বিষয় জানা গেলেও অআদিবাসীরা জমির দাম এত পরিমাণ তুলে দেয় যে, যার জমি তার ঐ পরিমাণ টাকা দেওয়ার সামর্থহীনতার কারণে সে আর উক্ত জমি কিনতে পারে না। এভাবে গ্রামসমূহের রাখাইনদের বহু জমি নিলামের মাধ্যমে অ-আদিবাসীদের হস্তগত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

'অধিগ্রহণ' বলতে সরকার কর্তৃক জমি গ্রহণ করাকে বোঝায়। যে কোনো সরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠান বা কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার অধিগ্রহণের মাধ্যমে এই জমি সংগ্রহ করে থাকে।

৭.৯.৩ গ্রামের ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা

গ্রাম গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রামের ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত আলোচনায় সেই গ্রামের ভূমির মালিকানার ধরন এবং ভূমি বিন্যাস বণ্টন স্বত্বের বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আমার গবেষণায় পরিবর্তনশীল অর্থনীতির জন্য বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আদিবাসী সমাজ কৃষি নির্ভর সমাজ। তহশিল রেকর্ড থেকে দেখা যায় গ্রাম তিনটির নব্বই ভাগ জমিই কৃষি জমি এবং অধিকাংশ জমিই নিরঙ্কুশ মালিকানাস্বত্ব শ্রেণির আওতাভুক্ত। ডাঙা (হালট) এবং কুয়াকে (ডোবা) খাস জমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উল্লেখ্য, গ্রামগুলোতে কেবল রাখাইনরা নয়, মুসলমান এবং একটি গ্রামে হিন্দুও বাস করে। তবে সমগ্র গবেষণা রাখাইনদের নিয়ে। দেখা যায়, তিনটি গ্রামের রাখাইনদের ভিটি জমি এবং তাদের ব্যবহৃত তিন গ্রামের তিনটি পুকুর যৌথ মালিকানাস্বত্ব শ্রেণির আওতাভুক্ত। এই মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য নয়। ভিটি জমিতে তারা বসত বাড়ি গড়ে তুলে বসবাস করে। ভিটি জমির মালিকানাস্বত্ব গ্রাম গঠনকারী বা স্থাপনকারী মাতবরের নামে দলিলকৃত। যেমন হাড়িপাড়া গঠন করেন চেসেউং মাতবর। হাড়িপাড়ার রাখাইনদের বসতভিটে চেসেউং মাতবরের নামে দলিল করা।[৮] মধুপাড়া গঠন করেন চালাউ মাতবর। মধুপাড়ার বসতভিটের পর্চা চালাউ মাতবরের নামে আছে।[৯] তুলাতুলিপাড়া গঠন করেন স্রেফ্রুয়ং মাতবর। তুলাতুলিপাড়ার বসতভিটে তার নামে পর্চা করা বা দলিলকৃত।[১০] তিনটি গ্রামে অল্প কিছু ওয়াকফ জমি আছে। গ্রাম তিনটির তিনটি মন্দির এবং তিনটি শশান (প্রতিটি শশানের দুটি ভাগ) এই ওয়াকফ সম্পত্তির আওতাভুক্ত। কিন্তু এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো সম্পত্তি বরাদ্দ নেই।গ্রামের আবাদযোগ্য জমি হলো বিল, মাঠ ও নাল; এবং অ-আবাদযোগ্য জমির মধ্যে রয়েছে ভিটি, পুকুর, দিঘি, ডাঙা (হালট, গোপাট), আইল, ডোবা, কুয়া ও উঠান এবং এ-জাতীয় কিছু খাস জমি অকর্ষণযোগ্য। তবে বাস্তবে অকর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ নেহাত কম। নিম্নের ২০ নং সারণিতে ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা তুলে ধরা হলো।

সারণি : ৭.২০

তিনটি গ্রামের ২০১৮ সালের ভূ-বিতরণ ব্যবস্থা

জমির শ্রেণি	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	শতকরা হার (%)
ফসলি/চাষযোগ্য	৪৪২	৪৬.৮০
স্থায়ী পতিত/অচাষযোগ্য (বার মাস)	.৫	.০৫৩
সাময়িক পতিত (খরা মৌসুম)	৩২০	৩৩.৮৮
সাময়িক পতিত (রবি মৌসুম)	১২০	১২.৭

বসত বাড়ি		৩৩	৩.৫
রাস্তা		৫	.৫৩
পুকুর		২৪	২.৫৪
	মোট	**৯৪৪.৫**	**১০০**

উৎস : মোঃ আশরাফ হোসেন, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ব্লক : ছোট বালিয়াতলী

উপরের ৭.২০ নং সারণি থেকে দেখা যায়, তিনটি গ্রামের মোট ৯৪৪.৫ হেক্টর জমির মধ্যে ফসলি অর্থাৎ সারা বছর চাষযোগ্য জমি ৪৪২ হেক্টর যা মোট জমির ৪৬.৮০%। সাময়িক পতিত জমি যা খরা মৌসুমে অব্যবহৃত থাকে এ-রকম জমির পরিমাণ ৩২০ হেক্টর অর্থাৎ ৩৩.৮৮%। আর রবি মৌসুমের সাময়িক পতিত জমি ১২০ হেক্টর অর্থাৎ ১২.৭%। দেখা যাচ্ছে রবি ও খরা এই দুই মৌসুমের সাময়িক পতিত জমির মধ্যে খরা মৌসুমে বেশি জমি অব্যবহৃত থাকে। গ্রামের অকর্ষণযোগ্য স্থায়ী পতিত জমির পরিমাণ খুবই কম মাত্র .৫ হেক্টর অর্থাৎ .০৫%। তিনটি গ্রামের বসত বাড়ির অন্তর্ভুক্ত জমির পরিমাণ ৩৩ হেক্টর অর্থাৎ ৩.৫%। রাস্তায় ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ৫ হেক্টর অর্থাৎ .৫৩%। পুকুরের জমি হলো ২৪ হেক্টর অর্থাৎ ২.৫৪%।

গ্রামের রাখাইন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। যেমন গ্রামের কতজন রাখাইন নিরঙ্কুশ জমির মালিক, কতজন বর্গাচাষী, কতজন বন্ধকি জমির মালিক প্রভৃতি জানা দরকার। এ-সকল বিন্যাসের মধ্যে নিরঙ্কুশ মালিকানা শ্রেণি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা নিরঙ্কুশ জমির মালিকানার ভিত্তিতে গ্রামবাসী নিজেদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে। দেখা গেছে, জমির বিন্যাস ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ করে ভূমির মালিকানা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জিজ্ঞেস না করলে গ্রামবাসী ভূমির অন্যান্য বিন্যাস ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করে না।

হাড়িপাড়া মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ার রাখাইনদের ভূমির উৎস হচ্ছে উত্তরাধিকার, খরিদ, বর্গাচাষ ও বন্ধকি। প্রধান উৎস হচ্ছে উত্তরাধিকারসূত্র। সাধারণত পরিবারে বাবা মারা যাওয়ার পর জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। পিতা-মাতার সম্পত্তি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয় যেটা সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বা বণ্টনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে মাঝে-মধ্যে ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। যদি পিতামাতা কোনো ছেলে বা মেয়েকে সম্পত্তির কিছু অংশ বেশি দান করে, সকলে তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে ও সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়। বাবার সম্পত্তিতে মেয়েরা সমান অধিকার পেলেও স্বামীর সম্পত্তির উপর স্ত্রীর অধিকার অনেকাংশে নির্ভর করে স্বামীর সদিচ্ছার উপর। সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার বিষয়ে তাদের কোনো লিখিত আইন-কানুন নেই। দলগত আলোচনা থেকে

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায়, তাদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীন আবাসভূমি বার্মাতে এই নিয়ম অনুসারে সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হতো, এই ভূখণ্ডে আসার পরও তারা সেই নিয়মই অনুসরণ করে আসছে।

সম্পত্তি ভাগ-বণ্টনের আরো কিছু নিয়ম-কানুন আছে। যদি কোনো সম্পত্তি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দ্বারা অর্জিত হয় তবে স্বামীর মৃত্যুর পর সে সম্পত্তির তিন-চতুর্থাংশ স্ত্রী পায় এবং এক-চতুর্থাংশ পুত্র কন্যারা সমানভাবে পায়। স্বামীর পৈত্রিক সম্পত্তি হলে স্ত্রী তার এক-চতুর্থাংশ লাভ করে, বাকি অংশ ছেলে-মেয়েরা পায়। বিধবা মায়ের মৃত্যু হলে সে সম্পত্তি পুত্র কন্যারা পায়, বিধবা মায়ের অন্যত্র বিয়ে হলে সেক্ষেত্রে পুত্র কন্যারা সম্পত্তি পায় না।গ্রামে জমির মালিক হওয়ার আর একটি প্রধান উপায় হলো জমি খরিদ করা। গ্রামের জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া বিশেষ করে রাখাইনদের জমি বাঙালিদের কাছে হস্তান্তর ভূমি উত্তরাধিকার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। রাখাইনরা জমি কিনেছে এমন কোনো তথ্য গ্রামগুলো থেকে পাওয়া যায়নি। বলা বাহুল্য, গ্রামের সমুদয় সম্পত্তি এক সময় তাদেরই ছিল। কেনা-বেচার প্রক্রিয়ায় তারা কেবল বিক্রেতা।

তিনটি গ্রামে পত্তনি চাষ পদ্ধতির গুরুত্ব আছে। এটি দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বর্গাচাষ নামে প্রচলিত। পত্তন শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে। এর অর্থ নির্দিষ্ট হারে ও মেয়াদে জমিদারের নিকট থেকে প্রাপ্ত ভূমিস্বত্ব ; জোতজমা ও প্রজাস্বত্ববিশেষ (*বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ২০১১: ৭১৪)। স্থানীয়ভাবে বর্গা চাষ পদ্ধতি পত্তন নামে পরিচিত এবং কৃষকরা পত্তন শব্দটি ব্যবহার করেন। অবশ্য বর্গা শব্দটিও তাদের কাছে পরিচিত। কয়েকজন কৃষক আছেন যারা প্রতি বছর জমি পত্তন নিয়ে চাষ করে থাকেন। সাধারণত জমির মালিক একজন কৃষকের কাছে জমি পত্তন দেয় এবং বিনিময়ে সে উৎপাদিত ফসলের শতকরা ৫০ ভাগ পায়। এটা দোভাগা পদ্ধতি। গ্রামে তেভাগা পদ্ধতিও চালু আছে। সেক্ষেত্রে জমির মালিক উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পায়। আর কৃষক পায় এক ভাগ। উল্লিখিত দুটি প্রচলিত পত্তনি প্রথা ছাড়াও গ্রামগুলোতে আরো একটি পত্তনি ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। সেটি হলো ধান করোলী। এটা এমন এক ধরনের চুক্তিভিত্তিক পত্তনি ব্যবস্থা যে, চুক্তির সময় কৃষক কানি প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান জমির মালিককে দিতে রাজি হয়। ধানের পরিমাণ নির্ধারিত হয় জমির প্রকৃতি অনুযায়ী। দেখা গেছে জমির অবস্থান ও ধরন অনুযায়ী কানি প্রতি ৩০-৩৫ মন ধান দেওয়ার চুক্তি হয়। ফসলের ফলন ভালো-খারাপ বা কৃষকের লাভ-ক্ষতি যাই হোক না কেন জমির মালিককে চুক্তি অনুযায়ী ধান দিতে হয়।

কোনো প্রকার পত্তনি ব্যবস্থাতে জমির মালিক কখনো পত্তনিদারকে পুঁজি, লাঙল বা চাষাবাদের জন্য গবাদি পশুর জোগান দেয় না। সকল প্রকার পত্তনি ব্যবস্থাই মৌখিক চুক্তি। জমির

মালিক ও কৃষকের মধ্যে কোনো লিখিত চুক্তি হয় না। সাধারণত জমির মালিক আগে থেকেই বর্গাদারকে ভালোভাবে চেনে। অভিজ্ঞ চাষীরা বর্গা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। তিনটি গ্রামের শতকরা ৮২.৭৫ ভাগ রাখাইন ভূমিহীন কৃষক। তাই রাখাইনদের মধ্যে কারো জমি পত্তনি দেওয়ার সুযোগ নেই। দক্ষরাখাইন চাষী যাদের চাষে সফলতার খ্যাতি বা নামযশ আছে এবং লেনদেনে স্বচ্ছ তারা গ্রামের বাইরের অনুপস্থিত মুসলমান ভূমি মালিক যারা শহরে বসবাস করে তাদের কাছ থেকে জমি পত্তনি নিয়ে থাকে। এই জমি মালিকরা সাধারণত ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ অথবা চাকুরিজীবি। গ্রামে বসবাসকারী বাঙালি মুসলমানদের থেকে বর্তমানে জমি পত্তন পাওয়া যায় না বলে জানা যায়। এর কারণ জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষি জমির পরিমাণ কম। ফলে গ্রামের জমি মালিকরা নিজেরা জমি চাষ করেন।

বন্ধকি হচ্ছে আরেক ধরনের ভূমিস্বত্ব যে ক্ষেত্রে ঋণ পাবার সহায়ক শর্ত হিসেবে এক খণ্ডজমিকে গচ্ছিত রেখে ঋণ নেওয়া হয়। এর ফলে বন্ধক গ্রহীতা জমির বন্ধকিস্বত্বের ভিত্তিতে ঐ জমি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগ করতে পারে। গ্রামগুলোতে তিন ধরনের বন্ধকি ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। যথা : পাট্টা বা খাইখালাসি, একসনা ও কোট বন্ধকি বা কোট কওলা । গ্রামবাসী খাইখালাসির চেয়ে পাট্টা শব্দটি বেশি ব্যবহারে অভ্যস্ত। পাট্টা বা খাইখালাসি হলো এক ধরনের বন্ধক যে ব্যবস্থায় জমি বন্ধক দিলে বন্ধক গ্রহীতা জমির দখল নিয়ে জমিতে ফসলাদি ফলিয়ে ভোগ করে। ফসল ফলালে প্রতি বছর তার কিছু লাভ হয়। ধরা হয় যে, এভাবে সাত বছর জমি ভোগ করার ফলে ধার নেওয়া টাকা শোধ হয়ে যায়। তাই পাট্টার সর্বোচ্চ মেয়াদ ৭ বছর। সরকারের পক্ষ থেকে খাই খালাসি ছাড়া অন্য কোনো প্রকার বন্ধক কৃষি জমির জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৫ ধারায় এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণ করাই এর মূল লক্ষ্য। নিয়মানুযায়ী ৭ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে জমি ফেরত নিতে হলে হিসেব অনুযায়ী টাকা ফেরত দিতে হয়। যেমন কোনো কৃষক ৩৫,০০০ টাকার বিনিময়ে এক কানি জমি বন্ধক দিল। যেহেতু পাট্টার মেয়াদ ৭ বছরের বেশি হয় না তাই কৃষকের জমির বিনিময়ে প্রতি বছর ৩৫,০০০/৭ = ৫,০০০ টাকা পরিশোধ হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া হয়। জমি বন্ধক দেওয়ার ৫ বছর পর অর্থাৎ৭ বছর পূর্ণ হওয়ার ২ বছর আগে জমি ছাড়িয়ে নিতে চাইলে কৃষককে ৫,০০০×২ = ১০,০০০ টাকা ফেরত দিতে হবে। সরকারের নিয়ম অনুযায়ী পাট্টার জমি ৬০ বছরের মধ্যে বন্ধকদাতা ফেরত না নিলে এই জমি সে আর ফেরত পায় না।

Dhaka University Institutional Repository

একসনা হলো ১ বছর মেয়াদে অর্থাৎ এক মৌসুমের জন্য চুক্তিভিত্তিক এক ধরনের বন্ধকি ব্যবস্থা। এই ১ বছরের জন্য বন্ধক গ্রহীতা জমিতে ইচ্ছে মতো চাষ করে ফলন ভোগ করতে পারে। এক বছর পর আপনা আপনি বন্ধকি জমি প্রকৃত মালিক ফেরত পায়। সাধারণত বর্তমানে একসনা বন্ধকি ব্যবস্থায় ২০,০০০ টাকার বিনিময়ে ১ কানি জমি কেবল ১ বছরের জন্য বন্ধক দিতে বা নিতে দেখা যায়।বেমেদি বন্ধক বা কোট কওলা বা কোট বন্ধক হলো ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে ১৫০ টাকার রাজস্ব স্ট্যাম্পেরেজিস্ট্রি করে অনির্ধারিত মেয়াদে এক ধরনের চুক্তিভিত্তিক বন্ধকি ব্যবস্থা। চুক্তি অনুযায়ী টাকা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকি জমি ভোগ-দখল করে থাকে। তবে ন্যূনপক্ষে ২/৩ বছরে আগে কেউ টাকা ফেরত দিয়ে জমি ফেরত নেওয়ার দাবি করতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ ন্যূনপক্ষে ২/৩ বছর পর কেউ টাকা ফেরত দিয়ে জমি নিজ দখলে নিতে পারে। উল্লেখ্য, এই চুক্তিটি সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদি হয়ে থাকে।

৭.৯.৪ তিনটি গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থা

হাড়িপাড়া মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়া এই তিনটি গ্রামের মাটির ধরন এটেল দোঁয়াশ প্রকৃতির। গ্রামের কৃষকরা উচ্চ ফলনশীল ধান অর্থাৎ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ধানসমূহ চাষের পাশাপাশি স্থানীয় বীজের ধানও চাষ করে। স্থানীয় বীজ বলতে বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত পন্থায় কৃষকরা বীজ সংরক্ষণ করে বছরের পর বছর যে ধান চাষ করে আসছে সেই ধানের বীজকে বোঝানো হচ্ছে। এছাড়া কৃষকরা মুসুরি, খেসারি, মুগ ডাল ও বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজির চাষ করে থাকে; এ বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে গবেষণাধীন তিনটি গ্রামের ২০১৭ সালে উৎপাদিত ফলনের তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণি : ৭.২১

২০১৭ সালে তিনটি গ্রামের গড় উৎপাদন ব্যবস্থা

শস্যের প্রকরণ	হেক্টর প্রতি উৎপাদন(মেট্রিক টন)
উচ্চফলনশীল ধান	২
স্থানীয় ধান	১.৪
ফেলন ডাল/ফেলু	০.৫
খেসারির ডাল	০.৪
মুগ ডাল	০.৩

Dhaka University Institutional Repository

শাক-সবজি		৬
	মোট	**১০.৬**

উৎস : মোঃ আশরাফ হোসেন, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ব্লক : ছোট বালিয়াতলী

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, ২০১৭ সালে তিনটি গ্রামে গড়ে প্রতি হেক্টরে ১০.৬ মেট্রিক টন বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। এরমধ্যে প্রতি হেক্টরে ২ মেট্রিক টন উচ্চ ফলনশীল ধান, ১.৪ মেট্রিক টন স্থানীয় ধান, ফেলন বা ফেলু ডাল ০.৫ মেট্রিক টন, খেসারির ডাল ০.৪ মেট্রিক টন, মুগ ডাল ০.৩ মেট্রিক টন ও শাক-সবজি ৬ মেট্রিক টন উৎপাদন করা হয়। সারণি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় যে, কৃষকরা হেক্টর প্রতি ২ মেট্রিক টন উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদন করে, এবং প্রায় সমপরিমাণ স্থানীয় বীজের ধান উৎপাদন করে। স্থানীয় ধানের উৎপাদন গড়ে প্রায় ১.৪ মেট্রিক টন। এই পরিসংখ্যান থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, সরকার উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল বীজের ফলন বা উৎপাদন বেশি হওয়া সত্ত্বেও কৃষকরা এখনো পর্যন্ত সমপরিমাণ স্থানীয় বীজ রোপণ করে। উচ্চ ফলনশীল বীজ রোপণ না করে স্থানীয় বীজ রোপণের কারণ সম্পর্কে আলোচনাকালে গ্রামবাসী জানায় যে, উচ্চ ফলনশীল বীজের দাম বেশি হওয়ায় তাদের পক্ষে উক্ত বীজ কিনে জমি চাষ করা সম্ভব হয় না। এজন্য তারা পরবর্তী বছর চাষের জন্য প্রত্যেক বছরের উৎপাদিত ধান থেকে কিছু ধান সংরক্ষণ করে বীজ তৈরি করে।

৭.৯.৫ রাখাইনদের জমি মালিকানা

হাড়িপাড়া মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ার জমির মালিকানার ক্ষেত্রে একটি বিষয় বলে নেওয়া প্রয়োজন। যদিও আমার গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো তিনটি গ্রামের রাখাইনদের ভূমিবিন্যাস এবং ভূমি বিতরণ ব্যবস্থা আলোচনা করা তবুও আলোচনায় অন্যান্য একক বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়নি। ১৯৫০ সালের পূর্ব পর্যন্ত গ্রামগুলোতে এক ধরনের স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছিল। গবেষক রামকৃষ্ণ মুখার্জী পূর্ব বাংলার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে পর্যালোচনা করেছেন তা বাংলার আদিবাসীদের জন্যও যথার্থ। তাঁর মতে, 'অনেক অতীত থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সমাজ ছিল নিশ্চল ; স্বনির্ভর গ্রাম সমাজ ছিল তার ভিত্তি, জমিতে কারো ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না(Mukherjee, 1957: 24)।' ব্রিটিশ আমলেই জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত এই গ্রামসমূহের আদিবাসী রাখাইনরা নিরুপদ্রব ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করেছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পরিবর্তীত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ এর পর থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। ১৯৫০-এর পূর্বে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাখাইনদের একক প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ১৯৫০-এর পর থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করে। গ্রামগুলোর বাঙালি মুসলমানদের সম্পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে ব্যাপকভাবে গ্রামের রাখাইন জনসাধারণ বার্মায় অভিবাসিত হতে থাকে। এই এলাকায় বাঙালিদের অনুপ্রবেশের ফলে জমি ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিনত হয়। জমি কেনা-বেচায় মুসলমানরা সম্পৃক্ত হয় এবং জমির দাম নিয়ন্ত্রণহীন বাজার অর্থনীতির আওতায় চলে যায়। জমির দাম কখনো দ্বিগুণ, কখনো বা একশত ভাগ বা তারও বেশি হারে বাড়তে থাকে। মূল্য বৃদ্ধির সুবিধা রাখাইনরা পায়নি, পেয়েছে বুদ্ধিমান বাঙালি অনুপ্রবেশকারী ও শহুরে ফটকাবাজরা (দেখুন : আরেফিন, ১৯৯৪)। নিম্নে ১৯৫০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এই তিনটি গ্রামের জমির মূল্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণি : ৭.২২

১৯৫০-২০১০ সাল পর্যন্ত তিনটি গ্রামের জমির মূল্য

সাল	কানি প্রতি জমির মূল্য (টাকা)	মূল্য বৃদ্ধির হার (%)
১৯৫০	৪০০	-
১৯৬০	১,১০০	১৭৫.০০
১৯৭০	২,০০০	৩৩.৩৩
১৯৮০	৩০,০০০	১৪০০.০০
১৯৯০	৬২,০০০	৪৭.৬২
২০০০	২,০০,০০০	১০০.০০
২০১০	১২,০০,০০০	৫০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মার্চ ২০১৮

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫০ এর দশকের গোড়ার দিকে এক কানি জমি (২৪০ শতক বা ৮ বিঘা) নামমাত্র মূল্যে ৪০০ টাকায় বিক্রি হতো। ১৯৬০ সালে এসে সেই মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১,১০০ টাকা হলো। অর্থাৎ ১০ বছরের ব্যবধানে এই বৃদ্ধির হার ১৭৫%। ১৯৭০ সালে যেখানে এক কানি জমির দাম ছিল মাত্র ২০০০ টাকা, সেখানে ১৯৮০ সালে এসে দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,০০০ টাকায় দাঁড়ায়। এই বৃদ্ধি অস্বাভাবিক। এক দশকের ব্যবধানে এই বৃদ্ধির হার ১৪০০%। উল্লেখ করা যেতে পারে এই সময়ে গ্রামের জমি কেনা-বেচার সাথে আদিবাসীদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। কেননা প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এরও বহু আগে জমি তাদের হাতছাড়া হতে শুরু করে যা ১৯৭০ এর দশকে পূর্ণতা পায়। তখন থেকেই এই গ্রাম তিনটির রাখাইনরা দেশ ছেড়ে বার্মায় অভিবাসন শুরু করে। ইতোমধ্যে তিন-চতুর্থাংশ রাখাইন গ্রামবাসী দেশ ত্যাগ করে বার্মায় আশ্রয় নিয়েছে।

উপরের সারণি থেকে আরো পরিষ্কার যে, ১৯৭০ সালের পরে ১৯৮০ ও ১৯৯০ সালে জমির মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তী ২০০০ ও ২০১০ সালে জমির মূল্য বৃদ্ধির

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাণ অস্বাভাবিক। এই দুই বছরে মূল্য বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১০০% ও ৫০০%। কৃষিজীবি রাখাইন গ্রামবাসী এই কেনা-বেচার সাথে যুক্ত নয় বরং জমি ততক্ষণে পণ্য হিসেবে হাত বদল হতে থাকে যার সাথে যুক্ত কৃষক নয়, শহুরে ফটকাবাজরা। রামকৃষ্ণ মুখার্জী পূর্ব বাংলার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে পর্যালোচনা করেছেন তা বাংলার আদিবাসীদের জন্যও যথার্থ। মুখার্জী বলেন (১৯৫৭: ২৪), "অনেক অতীত থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সমাজ ছিল নিশ্চল; স্বনির্ভর গ্রাম সমাজ ছিল তার ভিত্তি, জমিতে কারো ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না।" ব্রিটিশ আমলেই জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত এই গ্রামসমূহের আদিবাসী রাখাইনরা নিরুপদ্রব ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করেছে। পরিবর্তন যে হয়নি তা নয়, তবে অস্বাভাবিক গতিতে না হয়ে বরং ধীর গতিতে হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পরিবর্তীকালে দ্রুতগতিতে অবস্থার নিম্নমুখী পরিবর্তন হতে থাকে। গ্রামগুলোতে ১৯৫০-এর পূর্বে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাখাইনদের একক প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ১৯৫০ এর পর থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। একদিকে অ-আদিবাসী বাঙালি মুসলমানদের সম্পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপরদিকে ব্যাপকভাবে গ্রামের রাখাইন জনসাধারণ বার্মায় অভিবাসিত হতে থাকে। এই এলাকায় বাঙালিদের অনুপ্রবেশের ফলে জমি ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়। জমি কেনা-বেচায় বাঙালি মুসলমানরা সম্পৃক্ত হয় এবং জমির দাম নিয়ন্ত্রণহীন বাজার অর্থনীতির আওতায় চলে যায়। জমির দাম কখনো দ্বিগুণ, কখনো বা একশত ভাগ বা তারও বেশি হারে বাড়তে থাকে। মূল্য বৃদ্ধির সুবিধা রাখাইনরা পায়নি, পেয়েছে বুদ্ধিমান বাঙালি অনুপ্রবেশকারী ও শহুরে ফটকাবাজরা (দেখুন: আরেফিন, ১৯৯৪)। ১৯৭০ এর দশক থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বহিরাগত ধনী যারা পটুয়াখালী জেলা শহর এবং পার্শ্ববর্তী বরগুনা ও বরিশাল জেলা শহরের বাসিন্দা তারা এই এলাকার ভূমিতে বিনিয়োগ করতে থাকে। তারা রাখাইনদের জমি সস্তা দামে কিনতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এরা 'শহুরে ফটকাবাজ'। জমিতে বিনিয়োগ অধিকতর নিরাপদ ও লাভজনক এবং ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবীভাবে জমির দাম বেড়ে যাবে– এই ধারণায় শহুরে পেশাজীবীরা তাদের অর্থ ভূমিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে আইনবিদ, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ উল্লেখযোগ্য। এদের কেউই নিজেরা খামার পরিচালনা করতো না। সবাই গ্রামের দক্ষ কৃষকদের কাছে জমি বর্গা দিত। ক্রমান্বয়ে বৈধ ও অবৈধ নানা উপায়ে জমি রাখাইদের হাতছাড়া হয়ে তারা ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে আর বাঙালিরা হয়েছে ভূমিমালিক। নিম্নের ৭.২৩ নং সারণিতে তিনটি গ্রামের আদিবাসী ও বাঙালিদের জমি মালিকানার তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণি– ৭.২৩

রাখাইন ও বাঙালিদের মালিকানাধীন জমির বণ্টন

(একরে)

গ্রাম	রাখাইন	বাঙালি	অধিবাসীদের

	গৃহস্থালী	বসত জমি	কৃষি জমি	মোট জমি	গৃহস্থালী	বসত জমি	কৃষি জমি	মোট জমি	মোট জমি
হাড়িপাড়া	১৪	১.১০	০০	১.১০	১০৭	২২.৮৭	৮২.০০	১০৪.০০	১০৫.১০
মধুপাড়া	৯	৬.৯০	৮.৩২	১৫.২২	৫৬	৮.৬৭	৪২.৪৮	৫১.১৫	৬৬.৩৭
তুলাতুলিপাড়া	৬	১.৫১	.১৫	১.৬৬	১৪১	২৩.১২	৬৮.০০	৯১.০০	৯২.৬৬
সর্বমোট	**২৯**	**৯.৫১**	**৮.৪৭**	**১৭.৯৮**	**৩০৪**	**৫৪.৬৬**	**১৯২.৪৮**	**২৪৬.১৫**	**২৬৪.১৩**
শতাংশ	**১০০.০০**	**৫৩%**	**৪৭%**	**৬.৮১%**	**১০০.০০**	**২২.৭%**	**৭৭.৩%**	**৯৩.১৯%**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মার্চ ২০১৮

চিত্র : ৭.১০

রাখাইন ও বাঙালিদের মালিকানাধীন জমির বণ্টন

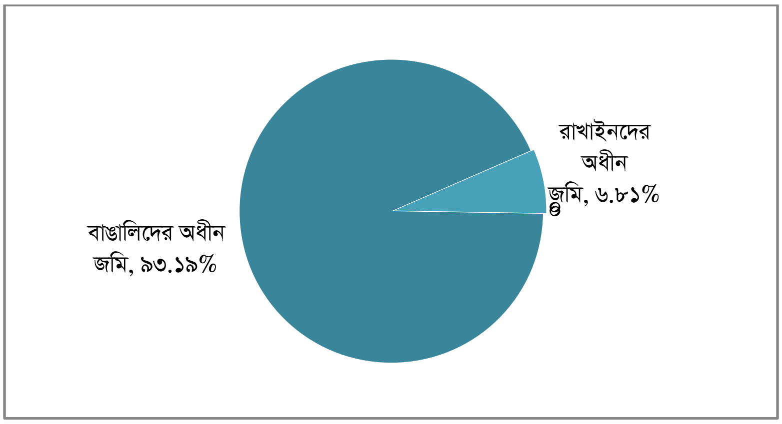

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

উপরের সারণি ৭.২৩ও চিত্র ৭.১০ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনটি গ্রামে বসবাসকারী আদিবাসী ও বাঙালিদের সর্বমোট ২৬৪.১৩ একর জমি আছে। এরমধ্যে আদিবাসী২৯টি গৃহস্থালীর মালিকানায় মোট জমি ১৭.৯৮ একর। এই ২৯ টি গৃহস্থালী মোট ৯.৫১ একর জমির উপর বসবাস করে। এই জমি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করে না। অর্থাৎ আদিবাসীদের অধীনে ব্যক্তি মালিকানাধীন চাষযোগ্য জমি আছে ৮.৪৭ একর। অপরদিকে বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুদের ৩০৪ (২৯১+১৩)টি গৃহস্থালীর অধীনে ব্যক্তি মালিকানাধীন সর্বমোট ২৪৬.১৫ একর জমি আছে। এরমধ্যে বসত জমি ৫৪.৬৬ একর, অবশিষ্ট ১৯২.৪৮ একর কৃষি জমি। রাখাইন গৃহস্থালীপিছু জমির পরিমাণ ০.৬২ একর, বাঙালিদের ০.৮১ একর। ২৩টি (৭৯.৩%) রাখাইন গৃহস্থালীর কোন কৃষি জমি নেই। বাঙালিদের ক্ষেত্রে এই হিসাব ১৯৯ গৃহস্থালী (৬৮.৩৮%)। বাঙালিদের তুলনায় রাখাইন ভূমিহীন বেশি।হাড়িপাড়ার ১৪টি গৃস্থালীর মধ্যে কারোরই কৃষি জমি নেই। অপরদিকে, এই গ্রামের ১০৭টি বাঙালি গৃহস্থালীর অধীনে ৮২ একর কৃষি জমি আছে। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, এই হাড়িপাড়াতেই ১৯৩০-এর দশকে ৭০/৮০টি রাখাইন গৃহস্থালী ছিল। চল্লিশের দশকের আগে এখানে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান-হিন্দু কারোরই বসতি স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায় না (খান, ২০০৬: ৯৮-১০০)। তুলাতুলিপাড়ার বৌদ্ধ মন্দিরের ভিক্ষু উকোয়েনডা ঠাকুর জানান,

> "তখন এসব এলাকা বনে-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। রাখাইন ছাড়া এ-এলাকায় কোনো বসতি গড়ে ওঠেনি। এ অঞ্চলে কোনো স্কুল কিংবা হাঁট-বাজার ছিল না। নিকটস্থ একমাত্র বাজার ছিল তালতলীতে। এ-এলাকার রাখাইনরা তখন নৌকা দিয়ে তালতলী বাজারে যেত। কেননা পায়ে হেঁটে যাওয়ার মতো ভালো রাস্তা-ঘাট তখন ছিল না, তাই নৌকা করেই যেতে হতো।"[১১]

১৯৪৭-এ ভারত ভাগের পর থেকে পাকিস্তান সরকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিজনিত নীতির সুযোগে এই গ্রামগুলোতে এক-দুইজন করে বাঙালিদের যে অভিবাসন শুরু হয় তা ষাটের দশকে বেগবান হয় এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে তা আরো বেশি মাত্রা পেয়ে তুলনাহীন তারতম্যের সৃষ্টি করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানি সামরিক সরকারের ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত আচরণ রাখাইন আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামগুলোতে বাঙালিদের অনুপ্রবেশে উৎসাহিত করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। বাঙালিরা নানা কৌশলে সহজ-সরল আদিবাসীদের ঠকিয়ে তাদের জমিজমা দখল করতে থাকে। ভয়-ভীতি প্রদর্শন, সন্ত্রাস, গোলযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি কারণে রাখাইনরাআর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে দারুণ উদ্বিগ্নতার মুখে আদি আবাস ভূমি বার্মায় অভিবাসিত হতে শুরু করে। এরফলে আদিবাসী ও বাঙালি জনসংখ্যার তুলনামূলক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বর্তমানে আদিবাসী ও বাঙালি জনসংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৮.৬৮ ও ৯১.৩২ ভাগ। জনসংখ্যা অভিবাসন প্রক্রিয়ার এই প্রভাব গ্রামের ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়।

সারণি থেকে আরো স্পষ্ট যে, মধুপাড়ায় ৯টি রাখাইন গৃহস্থালীর অধীনে কৃষি জমি আছে ৩৪.৮০ একর। অপরপক্ষে, ৫৬টি বাঙালি মুসলমান গৃহস্থালীর অধীনে কৃষি জমি আছে ১৬ একর। মধুপাড়ার ৯টি গৃহস্থালীর মধ্যে ৬ জন ভূমিহীন। এই গ্রামের ৩টি রাখাইন গৃহস্থালীর অধীন জমির পরিমাণ ৩৪.৮০ একর। তুলাতুলিপাড়ার ৬টি গৃহস্থালীর মধ্যে কৃষি জমি আছে মাত্র .১৫ একর। এই .১৫ একর জমি ১ জনের। অবশিষ্ট ৫টি গৃহস্থালী ভূমিহীন। অপরপক্ষে এই গ্রামে ১৪১টি বাঙালি মুসলমান গৃহস্থালীর অধীনে কৃষি জমি আছে ৬৮ একর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মধুপাড়ায় অভিবাসিত বাঙালি মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কৃষি জমির মালিক হতে পারেনি। তারা কেবল বসতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অল্প জমির মালিকানা নিয়েছে যারা সমাজের নিম্নবিত্তের মানুষ।

৭.৯.৬ জমি মালকানা ভিত্তিতে রাখাইন কৃষক শ্রেণি

Dhaka University Institutional Repository

পতিতাবাদ শ্রেণীর মধ্যস্বত্বতার ভিত্তি ছিলো প্রথা (কাস্টম), ব্রিটিশ পূর্ব যুগ থেকে যে প্রথায় পতিতাবাদ তালুক ও উপতালুক সৃষ্টি করা হতো সে প্রথা বিদ্যমান থাকে ব্রিটিশ যুগেও। অর্থাৎ যারা জঙ্গল পরিষ্কার করতো তারা তাদের আবাদভূমিতে প্রথাভিত্তিক অধিকার লাভ করতো। সে অধিকার ছিল প্রায় মালিকানার সঙ্গে তুলনীয়। জঙ্গল আবাদ ছিল অত্যধিক ব্যয়বহুল, কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ। খাঁটি অধিকার লাভ না করলে কেউ আবাদে আকৃষ্ট হবে না বিধায় আবাদকারদের দেওয়া হতো প্রথামাফিক অধিকার। বিভিন্ন অঞ্চলের আবাদকার মধ্য স্বত্বাধিকারীর ছিল বিভিন্ন পদবি। যেমন চট্টগ্রামের আবাদকাররা ছিল নোয়াবাদ তালুকদার নামে পরিচিত। আর নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুরের আবাদকারদের বলা হতো হাওলাদার। মেদিনিপুরে এদের পদবি ছিল গুণতিদার (ইসলাম, ১৯৮৫ : ৪৮-৪৯)।

জমির মালিকানা এবং জমি অধিকার আদিবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাহাড়ি বনাঞ্চলে আদিবাসীদের জমির অধিকার প্রথাসিদ্ধ বা প্রাকৃতিক। স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাসের কারণে এ অধিকার জন্মে। আদিবাসীদের দখলে আছে এমন অনেক জমির দলিল নেই। অথচ তাদের অধিকার স্বীকৃত। কোথাও কোথাও আবার ব্রিটিশ আমলে আদিবাসীরা প্রয়োজনীয় দলিলপত্র করে জমির অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পটুয়াখালীর রাখাইনরা সমতলভূমির আদিবাসী হওয়ায় সৌভাগ্যক্রমে তাদের সম্পত্তি ব্যক্তিমালিকানায় দলিলবদ্ধ হয়েছে। তারপরও অশিক্ষা ও অজ্ঞতা এবং সাম্প্রদায়িকতা ও জবরদস্তিসহ বিভিন্নভাবে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির দখল হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, পরিণামে জমি হাতছাড়া হয়েছে। জমির দখল টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যক্তিমালিকানার গুরুত্ব ও তার মূল্য সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট ও নগণ্য। তাদের অর্থনীতি ছিল গ্রাসাচ্ছাদন অর্থনীতি। ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে এই অর্থনীতি ধাপিত না হয়ে বরং তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই উৎপাদন করেই সন্তুষ্ট ছিল। ফলে তারা ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, ফসলহানি ইত্যাদি দুর্যোগের পরিণতিতে সৃষ্ট দুরাবস্থার কবলে পড়ে বা কখনো কখনো বিশেষ কারণে অর্থের প্রয়োজনে সুযোগ-সন্ধানী বাঙালিদের সহজ শিকারে পরিণত হয়।

এই গ্রামসমূহের আদিবাসীরা যেহেতু অশিক্ষিত ও আইনগত বিষয়ে অজ্ঞ, প্রতারণার শিকারে পড়ে খুব সহজেই তাদের জমি বেহাত হয়ে যায়। এ বিষয়ে প্রশাসনের কাছে সহায়তা চেয়েও আইনানুগ অনুকূল সহযোগিতা তারা পায়নি, বরং উল্টো কখনো কখনো ভূমি লুণ্ঠনকারীরা অবৈধভাবে প্রশাসনকে প্রভাবিত করে তাদের অন্যায় অন্যায্য অমানবিক কাজকে বৈধ করেছে। প্রতিকারহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রাখাইনদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে সম্পত্তি গ্রাসের বাঙালি দুর্বৃত্তদের হীনপ্রয়াস ক্রমান্বয়ে তাদের সহায়-সম্বলহীন করেছে। গ্রামের রাখাইনদের থেকে বাঙালি বিশেষত

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের কাছে জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধারায় সম্পাদিত হয়। জানা গেছে অনেক সময় কোনো কোনো রাখাইন বার্মায় অভিবাসিত হওয়ার আগ্রহ দেখিয়ে মুসলমান ক্রেতার কাছ থেকে অগ্রীম অর্থ গ্রহণ করে। পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য বার্মায় অভিবাসিত হওয়ার পর তাদের জমিজমা বিক্রি করে চলে যায়। এসব ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় বলে দর কষাকষি করে জমির প্রকৃত মূল্য তারা পেতে পারে না, বরং এ-ক্ষেত্রে যে বিক্রয় মূল্য তারা পায় তা খুবই নগণ্য। গবেষণা এলাকার রাখাইনদের জমি আরো যেসব পন্থায় বেহাত হবার বিপরীতে বাঙালিদের হস্তগত হয়েছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :১. সামান্য অর্থের বিনিময়ে রাখাইনরা বাঙালিদের কাছে জমি বন্ধক রাখতো। বন্ধকে এমন সব শর্ত জুড়ে দেওয়া থাকতো যে তারা আর জমি ফেরত নিতে পারতো না; ২.অনেক সময় বন্ধকি জমি বন্ধকগ্রহীতা বাঙালিরা নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে; ৩. জমির পরিমাণ দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হলেও বাঙালিরা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি মূল্য দলিলে উল্লেখ করে; ৪. রাখাইনরা কখনো কখনো জরুরি প্রয়োজনে সাদা কাগজে টিপ সই দিয়ে ঋণ গ্রহণ করতো। পরে দেখতে পেত সেই কাগজে বাঙালিরা পছন্দ মতো অনেক বেশি জমির বিক্রি স্বত্ব লিখে নিয়েছে; ৫.ঋণের টাকায় চাষকৃত রাখাইনদের জমির ধান জোরপূর্বক দখল করে বাঙালি দুর্বৃত্তরা কেটে নেওয়ার ফলে ঋণ পরিশোধ তো দূরের কথা নিজেদের জীবনধারণের ব্যয় নির্বাহই সম্ভব হতো না। পরিণামে জমি হস্তান্তর করতে হতো। দুষ্কৃতকারী বাঙালিদের ধান কেটে নেওয়ার তথ্য সরকারি দলিল দ্বারাও প্রমাণিত হয়। ১৯৭৬ সালে তদানীন্তন জেলা প্রশাসক জনাব আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী কর্তৃক জারিকৃত এক 'বিশেষ হুঁশিয়ারী' পত্র বিমানযোগে রাখাইন অঞ্চলে বিতরণ করা হয়। এই পত্রে বলা হয় : "পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক হিসাবে আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করিতেছি যে, অত্র জেলার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত খেঁপুপাড়া এবং আমতলী থানায় বসবাসকারী উপজাতীয়দের নিজস্ব মালিকানাভুক্ত ও নিজ চাষকৃত জমির ফসল কতিপয় দুস্কৃতকারী অনুপ্রবেশ করিয়া জোরপূর্বক এবং অবৈধভাবে কাটিয়া নিয়া উপজাতীয়দেরকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে আমি এই সকল দুষ্কৃতকারীদেরকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি যে, ভবিষ্যতে এহেন কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণকে আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া যথোপযুক্ত শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হইবে। উপরোল্লিখিত এলাকার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের প্রতি আমার আকুল আবেদন তাহারা যেন দুষ্কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিগণকে ধরিয়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করেন।" (উদ্ধৃত: মজিদ, ১৯৯২: ১৭৮)৬.খাজনার ব্যাপারে রাখাইনরা না বোঝার কারণে তাদের অনেক জোত-জমি অজ্ঞাতে নিলামে বিক্রি হয়ে গেছে। বাঙালিরা গোপনে সেই নিলাম কিনে নিয়ে পরে জমি দখল নিয়েছে। এ নিলামের ব্যাপারে তাদের জানার কথা থাকলেও তারা জানতে

Dhaka University Institutional Repository

পারতো না; ৭. কখনো কখনো নিলামের সময় বাঙালিরা অযৌক্তিক ও অনায্যভাবে জমির উচ্চদাম তুলে দেওয়ার কারণে রাখাইনদের পক্ষে নিলাম ক্রয় করা সম্ভব হতো না। ফলে তারা অত্যন্ত হতাশার সাথে পূর্বপুরুষের আবাদ করা জমি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার নীরব সাক্ষী হয়ে থাকতে বাধ্য হয়; ৮.রাজস্ব অফিসে বাঙালিরা আদিবাসীদের দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ দলিলগুলি দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের যোগসাজশে খুঁজে বের করে এবং অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে সরকারি কাগজে ভুয়া দলিল উপস্থাপন করে। পরে ঐসব জাল দলিল রাখাইনদের দেখায় এবং জমির উপর তাদের অবৈধ দখল ছেড়ে দিতে হুমকি দেয় ও দখল করে নেয়। এ সংক্রান্ত অসংখ্য সরকারি দলিল এর প্রমাণ। যেমন পটুয়াখালীর নিম্ন আদালতের ১৯৭৯ সালের ৩০ জুলাইয়ের এক রায়ে বলা হয় : “বয়নামা ও দখলনামা ভুয়া এবং বাদি জাল কাগজপত্র দিয়ে ধাপ্পা দিতে চেষ্টা করছে। বিনা শাস্তিতে এ ধরনের ব্যক্তিদের ছেড়ে দেয়া উচিৎ হবে না।” এই আদালতের অপর এক মামলার রায়ে বলা হয়েছে যে, “বাদি বয়নামা ও অন্যান্য কাগজপত্র জাল করেছে সম্পত্তি গ্রাসের জন্য। যে ব্যক্তিরা এই জাল সার্টিফিকেট নং ৮৪৪৯ কে/৫৫ তৈরী করেছে তারা দুষ্ট প্রকৃতির এবং এই দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের বিনা শাস্তিতে অব্যাহতি পাওয়া সমীচীন নয়।” (উদ্ধৃতঃ মজিদ, ১৯৯২: ১০৯)৯.ভূয়া নিলাম ও মিথ্যা রেকর্ড দেখিয়ে জমি দখল করা; ১০.জমির মালিকানা বিষয়ে রাখাইনরা নিম্ন আদালতে তাদের পক্ষে রায় পেলেও কুচক্রিরা উচ্চ আদালতে ক্রমাগত একের পর এক মামলা করতে থাকে। দরিদ্র রাখাইনদের পক্ষে এক পর্যায়ে মামলা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। একদিকে আর্থিক সংকট, অন্যদিকে ভাষার পার্থক্য, দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের অসাধুতাজনিত প্রশাসনের অসহযোগিতা –এমন সব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রভাবশালী বাঙালি দুষ্কৃতিকারীদের কাছে পেরে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং এক পর্যায়ে সাহসী এই জাতি অন্যায়ের কাছে মাতা নত করতে বাধ্য হয়। এভাবে তাদেরকে পরাস্ত করে কুচক্রিরা জমি দখল করে; ১১. রাখাইনদের দখলাধীন চাষের খাস জমি তাদের না জানিয়ে বাঙালিদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। আবার খাস জমি যেমন হালট, নাল প্রভৃতি খাস জমি রাখাইন ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হয় না; বরং প্রভাবশালী বাঙালিরা প্রভাব খাটিয়ে নামে বেনামে খাস জমির মালিকানা লাভ করে; ১২. সর্বোপরি, প্রভাবশালী বাঙালিরা ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জোরপূর্বক রাখাইনদের জমি দখল করে নেয়।

আদিবাসীদের জমি বেহাত হওয়ার বিষয়ে ফাদার আর ডব্লিউ টিম বলেন, সম্পত্তির সম্প্রদায়গত মালিকানা আইনগতভাবে বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। তার পরেও বিভিন্নভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির দখল হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। জমির দলিল টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যক্তি মালিকানার গুরুত্ব ও তার মূল্য সম্পর্কে তাদের সামান্যই ধারণা ছিল। ফলে ঝড়, বন্যা, ফসলহানি

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট দুরাবস্থায় অথবা বিশেষ কারণে অর্থের প্রয়োজনে চতুর অ-আদিবাসীদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। আদিবাসীরা যেহেতু অশিক্ষিত ও আইনগত বিষয়ে অজ্ঞ, প্রতারণার ফাঁদে খুব সহজেই তাদের জমি বেহাত হয়ে যায় (টিম, ১৯৯২: ৪৩)। সরকারি দলিলপত্রেও এভাবে জমি বেদখল হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। পটুয়াখালীর রাখাইনদের জমি বেদখল হওয়ার একটি দলিল উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। সেখানে দেখা যায়, ১৯৬৮ সালে পটুয়াখালীর খেঁপুপাড়া রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মহকুমা প্রশাসককে লিখেছিলেন, ১৯৫৮ সাল থেকে সেখানে কর্মরত তহশীলদার ও সহকারী তহশীলদারগণ খেঁপুপাড়া রেভিনিউ সার্কেল অফিসের কতিপয় কর্মচারীর যোগসাজশে দলিল জাল সম্পর্কিত হীন তৎপরতায় লিপ্ত(জাহাঙ্গীর, ১৯৮০ : ২৫৭)। এ থেকে বোঝা যায় অসহায় সংখ্যালঘু হিসেবে রাখাইনদের নিজস্ব ভূমি ক্রমে হাতছাড়া হতে থাকে ভূমি লুণ্ঠনকারী কূট-কৌশলী বাঙালিদের ক্রমাগত ভূমি কুক্ষিগত করার পরিকল্পিত অপপ্রয়াসে। এতে তারা ভূমিহীনের পরিণতি বরণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে তিনটি গ্রামের রাখাইন ও বাঙালি কৃষকদের শ্রেণি বিভাগ করা যেতে পারে। নিম্নেরসারণিতে ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে গ্রামসমূহের কৃষকদের শ্রেণিসমূহ উপস্থাপনপূর্বক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.২৪

জমি মালিকানার ভিত্তিতে রাখাইন কৃষকদের শ্রেণিবিন্যাস(একরে)

জমির মালিকানাভিত্তিক শ্রেণি	গৃহস্থালী সংখ্যা			মোট গৃহস্থালী	শতাংশ (%)	মোট জমি (একর)	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলি				
০–০.৪৯ ভূমিহীন	১৪	৫	৫	২৪	৮২.৭৫	০০	০০
০.৫০–২.৪৯ ক্ষুদ্র কৃষক	-	২	-	২	৬.৯০	৩.৯০	২২.০৩
২.৫০–৪.৯৯ মধ্য কৃষক	-	১	১	২	৬.৯০	৭.৮০	৪৪.০৭
৫.০০-উর্ধ্ব বৃহৎ কৃষক (ভূস্বামী)	-	১	-	১	৩.৪৫	৬.০০	৩৩.৯০
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০	১৭.৭০	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মার্চ ২০১৮

সারণি– ৭.২৫

জমি মালিকানার ভিত্তিতে রাখাইন ও বাঙালি কৃষকদের শ্রেণিবিন্যাস(একরে)

জমির মালিকানাভিত্তিক শ্রেণি	রাখাইন				বাঙালি			
	গৃহস্থালী	শতাংশ	মোট জমি	শতাংশ	গৃহস্থালী	শতাংশ	মোট জমি	শতাংশ
০–০.৪৯ ভূমিহীন	২৪	৮২.৭৫	০০	০০	১৯৯	৬৮.৩৮	০০	০০
০.৫০–২.৪৯ ক্ষুদ্র কৃষক	২	৬.৯০	৩.৯০	২২.০৩	৪৫	১৫.৪৬	৫২.৪২	২৮.৭৭
২.৫০–৪.৯৯ মধ্য কৃষক	২	৬.৯০	৭.৮০	৪৪.০৭	১৮	৬.১৯	৩৪.৯৮	১৯.২০

৫.০০উর্ধ্ব বৃহৎ কৃষক (ভূস্বামী)	১	৩.৪৫	৬.০০	৩৩.৯০	২৯	৯.৯৭	৯৪.৮০	৫২.০৩
	২৯	১০০.০০	১৭.৭০	১০০.০০	২৯১	১০০.০০	১৮২.২০	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মার্চ ২০১৮

চিত্র- ৭.১১

জমি মালিকানার ভিত্তিতে রাখাইন ও বাঙালি কৃষকদের শ্রেণিবিন্যাস

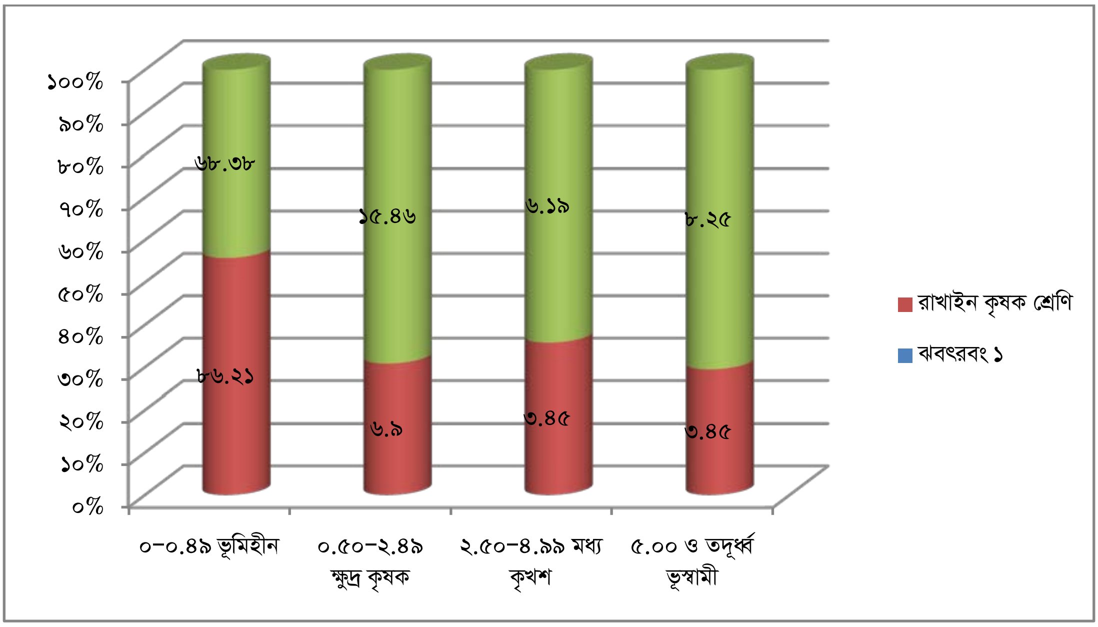

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

উপরেরসারণি৭.২৪ ও চিত্র ৭.১১ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গবেষণাধীন তিনটি গ্রামের রাখাইনদের মধ্যে ২৯টি গৃহস্থালীর ২৪টি অর্থাৎ ৮২.৭৫% ভূমিহীন, যাদের কোনো কৃষি জমি নেই; অপরদিকে বাঙালিদের ২৯১টি গৃহস্থালীর মধ্যে ১৯৯টি অর্থাৎ ৬৮.৩৮% ভূমিহীন। রাখাইনদের মধ্যে ২টি গৃহস্থালী ক্ষুদ্র কৃষক অর্থাৎ ৬.৯০%। ক্ষুদ্র কৃষকের জমির পরিমাণ ৩.৯০ একর। রাখাইনদের মোট জমির ২২.০৩% ক্ষুদ্র কৃষকের মালিকানাধীন। বাঙালিদের ৪৫টি গৃহস্থালী অর্থাৎ ১৫.৪৬% ক্ষুদ্র কৃষক। এদের আওতায় ৫২.৪২ একর জমি আছে অর্থাৎ বাঙালি মালিকানাধীন জমির ২৮.৭৭%। গ্রামগুলোর মধ্যে ২টি অর্থাৎ ৬.৯০% রাখাইন গৃহস্থালী মধ্য কৃষক, যাদেরজমির পরিমাণ ৭.৮০ একর। রাখাইনদের মোট জমির ৪৪.০৭% মধ্য কৃষকের মালিকানাধীন। বাঙালিদের ১৮টি গৃহস্থালী অর্থাৎ ৬.১৯% মধ্য কৃষক। এদের আওতায় ৩৪.৯৮ একর অর্থাৎ ১৯.২০% ভাগ জমি আছে। গ্রামের ১টি রাখাইন গৃহস্থালী অর্থাৎ ৩.৪৫% বৃহৎ কৃষক বা ভূস্বামী। ভূস্বামীর জমির পরিমাণ ৬.০০ একর, যা রাখাইন মালিকানাধীন জমির ৩৩.৯০%। বাঙালিদের ২৯টি গৃহস্থালী অর্থাৎ ৯.৯৭% বৃহৎ কৃষক বা ভূস্বামী। এদের আওতায় ৯৪.৮০ একর অর্থাৎ ৫২.০৩% ভাগ জমি আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বর্তমানে তিনটি গ্রামের রাখাইনদের অধীনে ১৭.৭০ একর অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামগুলোর মোট জমির ৮.৮৫% জমি আছে এবং বাঙালিদের অধীনে ১৮২.২০ একর অর্থাৎ ৯১.১৫% জমি আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় রাখাইনরা ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়েছে, অপরদিকে বাঙালিরা জমির মালিকানা নিয়ে উত্তরোত্তর ধনী হয়েছে। নিম্নের সারণিতে একনজরে রাখাইনদের জমি মালিকানার পরিবর্তন দেখানো হলো।

সারণি– ৭.২৬

একনজরে রাখাইনদের জমি মালিকানা পরিবর্তন

দাদার আমল	বাবার আমল	উত্তরদাতার কাল	মন্তব্য
কয়েক কানি জমির মালিক	জমির মালিকানা হ্রাস পেতে থাকে ও কেউ কেউ ভূমিহীন	সকলে পুরোপুরি ভূমিহীন	জমি বিক্রি ও ভূমি দখলকারীদের ষড়যন্ত্রে তারা ভূমিহীনতার শিকার

৭.৯.৭ রাখাইনদের ভূমিহীনতা

ভূমিহীন উত্তরদাতাদের প্রায় সকলে বাব-দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন জমি না পাওয়ার কারণেই ভূমিহীনতাকে বরণ করেছেন। একদা সকল রাখাইন পরিবারই জমির মালিক ছিল। রাখাইনদের ভূমিহীন হওয়ার প্রক্রিয়া দাদা-বাবার আমলে শুরু হয়। উপর্যুপরি বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি কারণে ফসলহীনতার কবলে পড়ে জমি বিক্রি করে বেঁচে থাকার চেষ্টা এবং বাঙালিদের জমি আত্মসাতের কারণেও অনেকে ভূমিহীন হয়ে পড়ে। কলাপাড়া বুড্ডিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রবীণ নেতা বাবু উসুয়ে হাওলাদার জানান, 'আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায় এ উপকূল এক সময় আবাদ করে তুললেও আজ আমরা অবহেলিত। বাঙালি ভূমিদস্যুদের দখলের কারণে আমাদের এলাকা ছাড়তে হচ্ছে' (হাওলাদার, ২০১১)। তবে প্রাপ্ত তথ্য মতে গবেষণা এলাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা উত্তরাধিকারসূত্রেই ভূমিহীনতা বরণ করেছেন। কেউ কেউ অল্প-বিস্তর জমি বাব-দাদার কাছ থেকে পেলেও অভাবে ও নানা চক্রান্তের মুখে জমি হারিয়ে ভূমিহীন হতে বাধ্য হয়েছেন। নিম্নের সারণি থেকে উত্তরদাতাদের ভূমিহীনতার সময়কে বোঝা যাবে।

সারণি– ৭.২৭

উত্তরদাতাদের ভূমিহীনতা কাল

উত্তরদাতাদের জমি হারানো	গৃহস্থালী সংখ্যা			মোট গৃহস্থালী	শতাংশ (%)
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলি		

নিজে জমি বিক্রি/হারিয়ে ভূমিহীন হয়েছেন	৬	৩	২	১১	৩৭.৯৩
বাব-দাদা জমি বিক্রি/হারিয়ে ভূমিহীন হয়েছেন	৮	৪	৩	১৫	৫১.৭২
প্রযোজ্য নয় (বর্তমানে জমি আছে)	-	২	১	৩	১০.৩৪
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা মে ২০১৮

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বোচ্চ ৫১.৭২% উত্তরদাতা ভূমিহীন হয়েছেন বাব-দাদার আমলে জমি খোয়ানোর কারণে। উত্তরাধিকারসূত্রে তারা কোন জমি মালিকানা লাভ করেননি। অপরদিকে উত্তরাধিকার সূত্রে জমি লাভ করেও নিজে খোয়ানোর কারণে ভূমিহীন হয়েছেন ৩৭.৯৩%। উত্তরদাতাদের মধ্যে কেবল ১০.৩৪% এর বর্তমানে ব্যক্তিমালিকানায় অল্প-বিস্তর জমি আছে। তবে তাদেরও ধীরে ধীরে জমি বিক্রি করে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে উত্তরদাতাদের আমলে যারা ভূমিহীন হয়েছেন তাদের ২৫−৩০ বছর আগে .২৫−২.৫০ কানি জমি ছিল বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। বর্তমানে ভূমিহীনতার কারণে তারা কৃষি উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ও বিজ, সার, সেচ, কীটনাশক, ঋণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা গ্রহণ করতে পারছে না।

৭.৯.৮রাখাইনদের খাসজমি প্রাপ্তি

ব্যক্তি মালিকানা বহির্ভূত জমিই খাসজমি। সাধারণত খাস জমির মালিক সরকার। গবেষণা এলাকার সকল সরকারি বা খাস জমি বাঙালিদের দখলে। কোন রাখাইন পরিবার খাসজমি ব্যবহার করার সুযোগ পায় না। গবেষক মজিদ (১৯৯২) দেখিয়েছেন, অতীতে রাখাইনদের দখলাধীন চাষের খাস জমি তাদের না জানিয়ে বাঙালিদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। খাস জমি যেমন হালট, নাল প্রভৃতি খাস জমি রাখাইন ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয় না; বরং প্রভাবশালী বাঙালিরা প্রভাব খাটিয়ে নামে বেনামে এই সব খাস জমির মালিকানা লাভ করে। রাখাইন উত্তরদাতাদের কাছে খাস জমি না পাওয়ার কারণ কি বলে মনে করেন− তা জানতে চাইলে যোগোযোগের অভাব, প্রয়োজনীয় টাকা না থাকা, ধরাকরা না থাকা, ভূমি অফিসে আত্মীয়-স্বজন না থাকা, সমাজে ক্ষমতাবান না হওয়া ইত্যাদি কারণকে চিহ্নিত করতে দেখা গেছে। নিম্নের সারণিতে খাস জমি চাষের জন্য না পাওয়ার বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে।

সারণি− ৭.২৮

খাসজমি না পাওয়ার বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমত

	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা	মোট	শতকরা হার

অভিমত	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া	গণসংখ্যা	
যোগাযোগ নেই	৪	৩	২	৯	৩১.০৩
অনেক টাকা লাগে	৩	২	১	৬	২০.৬৯
অনেক ধরাকরা লাগে	১	১	১	৩	১০.৩৪
আত্মীয়-স্বজন থাকা লাগে	১	-	-	১	৩.৪৫
ক্ষমতা লাগে	১	-	-	১	৩.৪৫
টাকা+ক্ষমতা লাগে	৩	২	১	৬	২০.৬৯
জানা নেই	১	১	১	৩	১০.৩৪
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩১.০৩% কর্তাব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ না থাকাকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই যোগাযোগ বলতে তারা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে উঠা-বসা, ভূমি অফিসের দায়িত্বরত ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক না থাকাকে বুঝিয়েছেন। ২০.৬৯% ভাগ মনে করেন খাস জমি পেতে হলে অনেক টাকা লাগে। আবার এইক সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ মনে করেন খাস জমি পেতে হলে টাকা ও ক্ষমতা উভয়ই লাগে। ৩.৪৫% মনে করেন ক্ষমতা না থাকলে খাসজমি পাওয়া যায় না। অপর ৩.৪৫% ভাগের ধারনা নিকট আত্মীয়-স্বজন না থাকলে খাস জমি পাওয়া যায় না। অনেক ধরাকরা লাগে বলে মনে করেন ১০.৩৪% উত্তরদাতা। সুতরাং ভূমিহীনতার প্রথম দিকে রাখাইনরা অল্পস্বল্প সরকারি খাসজমি ব্যবহারের সুযোগ পেলেও পরবর্তীকালে সে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় টাকা ও ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হওয়ার কারণে।

৭.৯.৯ রাখাইনদের বর্তমানে জমি নিয়ে বিরোধ

বাংলাদেশে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ খুবই কম, মাত্র ০.১২ একর (১৬ মে ২০২০: জাগোনিউজডটকম)। ভূমি দেশের অনেক সমস্যা ও সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু। চাহিদার তুলনায় জমির পরিমাণ এতই অপ্রতুল যে আবাদযোগ্য, অনাবাদী যে কোন জমিউ স্বর্ণতুল্য। এই জমির জন্য মানুষ জড়িয়ে পড়ে সংঘাত সংঘর্ষ মামলা-মকদ্দমায়। এটা দেশের সকল স্প্রদায়ের জন্য সাধারণ সমস্যা হলেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের বেলায় তা অপেক্ষাকৃত জটিল। অতীতের চেয়ে বর্তমানে ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীদের ভূমি অধিকার অধিকতর সংকুচিত। আবার পাবর্ত্য চট্টগ্রামের মতো পাহাড়ি এলাকার চেয়ে সমতল ভূমিতে নৃগোষ্ঠীদের ভূমি অধিকার প্রায় শূন্য। গবেষণা এলাকায়প্রতিবেশি বাঙালিদের সাথে রাখাইনদের জমি নিয়ে বিরোধ স্মরণাতীত কালের ঘটনা। সময়ের ব্যবধানে কোন কোন মামলা

Dhaka University Institutional Repository

হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। এসব মামলা থানা, জেলা, বিভাগীয় কোর্ট ও হাইকোর্ট বিভিন্ন স্তরে নিষ্পন্ন হয়েছে। মামলার নিষ্পত্তিতে উত্তরদাতাদের অনেকে সন্তুষ্ট, অনেকে সন্তুষ্ট নন। অনেক মামলা চলমান আছে। বাব-দাদার কালের মামলা পরবর্তী উত্তরাধিকারগণ বহন করে চলেছেন। মামলা যে তাদেরকে প্রকারন্তরে নিঃস্ব করে তা নতুন করে বলার নয়। নিম্নের সারণি থেকে এ-ধরনের চলমান মামলার তথ্য পাওয়া পাওয়া যাবে।

সারণি– ৭.২৯

জমি নিয়ে উত্তরদাতাদের চলমান মামলা

বর্তমানে মামলা চলছে	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতকরা হার
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
হ্যাঁ	৩	৫	৩	১১	৩৭.৯৩
না	১১	৪	৩	১৮	৬২.০৭

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ২৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১০ জনের অর্থাৎ ৩৭.৯৩% বর্তমানে জমি নিয়ে মামলা চালাচ্ছেন। অবশিষ্ট ৬২.০৭% এর কোন মামলা বর্তমানে নেই। মামলা পরিচালনাকারীরা সংখ্যায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। সকল ক্ষেত্রে যে রাখাইনরা বাদি তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে বাঙালিরা জমি দাবি করে কোর্টে কেস করেছেন। নিম্নের সারণি থেকে রাখাইন ও বাঙালিদের বাদি হওয়া তথ্য পাওয়া যাবে।

সারণি– ৭.৩০

জমি নিয়ে মামলাকারী

মামলাকারী	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতকরা হার
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
রাখাইন বাদি	২	৩	২	৭	২৪.১৪
বাঙালি বাদি	১	২	১	৪	১৩.৭৯
প্রযোজ্য নয়	১১	৪	৩	১৮	৬২.০৬
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চলমান মামলাগুলো রাখাইন-বাঙালি উভয়েই করেছেন। এরমধ্যে ২৪.১৪% রাখাইন বাদি হয়ে বাঙালি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন; অপরপক্ষে ১৩.৭৯% বাঙালি বাদি হয়ে রাখাইনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলা কেবল যে রাখাইন-বাঙালি তা নয়, এমন তথ্যও পাওয়া গেছে যে, জাল দলিল করে এক রাখাইন প্রতিবেশি

প্রতিবেশি অপর রাখাইনের অধিক জমি বিক্রি করে দিয়েছেন বাঙালিদের কাছে। রাখাইনদের নিজেদের মধ্যে এ-রকম একটি মামলা বর্তমানে চলমান আছে।

কেস স্টাডি ৭ : জাল দলিল করে প্রতিবেশি রাখাইনের জমি বিক্রি

তুলাতুলি পাড়ার মংখেনো মাতবরের বয়স ৪৫ বছর। তিনি পেশায় জেলে। তার ১ ছেলে ও ১ মেয়ে। ছেলের বয়স ১০ ও মেয়ের বয়স ১৩ বছর। মংখেনোর বাবা তুলাতুলিপাড়ার পূর্বপাশের সোয়া ১ কানি জমি পার্শ্ববর্তী করঞ্জাপাড়ার খঞ্চে মাতবরের সাথে এওয়জ করে চাষ করতেন। অনেক বছর চাষের পর খঞ্চে মাতবর প্রতিবেশি ক্ষমতাধর বাঙালির সাথে হাত মিলিয়ে এওয়জের জমি দিতে অস্বীকার করে। পরে জাল দলিল করে জমি নিজের নামে নিয়ে প্রভাবশালী বাঙালির কাছে বিক্রি করে দেয়। মংখেনো পরিবার জমির দখল দাবি করলে জমির বর্তমান ভোগ-দখলকারী কোর্টে যায়। সেই কেস এখনও হাইকোর্টে চলছে।

৭.১০ খাইনদের জমি বন্ধক ব্যবস্থা

জমি বিন্যাস ব্যবস্থার একটি ধরন হচ্ছে বন্ধকি প্রথা। সাধারণত বন্ধক হচ্ছে এক ধরনের দায়বদ্ধ ঋণ। বন্ধকের ক্ষেত্রে এই দায়বদ্ধতা স্থাবর বা অস্থাবর উভয় সম্পত্তি হতে পারে। গ্রামবাসী বন্ধক বলতে জমি দায়বদ্ধ রেখে ঋণ নেওয়াকে বুঝে থাকে। বর্তমানে ১৫০ (১০০+৫০) টাকা মূল্যের রাজস্ব স্ট্যাম্পের উপর স্বাক্ষর দিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি করা হয়। কখনো কখনো বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে সাদা কাগজের উপর স্বাক্ষর করে গ্রামবাসীদের চুক্তি করতে দেখা যায়। আবার এমনও দু-একটি ঘটনা আছে যে, কোনো লিখিত-পড়িত চুক্তি নয়, বরং গ্রামবাসী মৌখিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যে অতীতের লেনদেনের সুসম্পর্কের সূত্র ধরে এ ধরনের মৌখিক চুক্তি হয়ে থাকে।

সাধারণত কোনো ব্যক্তি তার এক খণ্ড জমিকে জামানত রেখে ঋণ নিয়ে থাকে। চুক্তি অনুযায়ী মূল ঋণ পরিশোধ করে বন্ধকদাতা তার জমি ফেরত নিতে পারে। যদি বন্ধক গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তাহলে জমির বন্ধকি অব্যাহত থাকে। অনেক সময় বন্ধকদাতা ঋণ পরিশোধ না করতে পারার জন্য জমি ফেরত পায় না। রাখাইনদের অনেক জমি এভাবে ঋণচক্রে আবদ্ধ হয়ে বেহাত হয়েছে। বছরের পর বছর জোতদার মহাজনের শোষণের পাকে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে থাকাই তাদের এই দুর্দশার কারণ। এ এমন এক চক্র যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়ে একবার যে ঋণের জন্য মহাজনের শরণাপন্ন হয়, তার পক্ষে কোনোদিন আর ওই ঋণচক্র থেকে মুক্তি ঘটে না। কেবল মুক্তি ঘটে সর্বস্ব খোয়ানোতে। ঋণচক্রের এই অমোঘ পরিণতি বরণ করতে হয়েছে অধিকাংশ রাখাইন গৃহস্থালীকে।

পঞ্চাশের দশকের আগে এ-সব গ্রামে বন্ধক ব্যবস্থা ছিল না। বাঙালিদের অনুপ্রবেশের পর এই প্রথা চালু হয়। বাঙালিরা মহাজনী ব্যবসা শুরু করে। তখন থেকে রাখাইনরা বিভিন্ন সময়ে জমি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করতে থাকে। তখন তাদের জমি ছিল। বন্ধক রাখতে পারতো। বর্তমানে ভূমিহীন হয়ে পড়ায় আর বন্ধক দিতে পারে না, তবে বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিয়ে কেউ কেউ জমি বন্ধক রাখেন। নিম্নের সারণিতে উত্তরদাতাদের জমি বন্ধক গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত হলো।

সারণি– ৭.৩১

উত্তরদাতাদের জমি বন্ধক গ্রহণ ও প্রদান

গ্রামের নাম	মোট গৃহস্থালী	চাষ জমির গৃহস্থালী	জমি বন্ধক দিয়েছেন		জমি বন্ধক নিয়েছেন	
			দিয়েছেন	শতাংশ (%)	নিয়েছেন	শতাংশ
হাড়িপাড়া	১৪	-	-	-	৪	১৩.৭৯
মধুপাড়া	৯	৪	১	৩.৪	৪	১৩.৭৯
তুলাতুলিপাড়া	৬	১	-	-	১	৩.৪৫
সর্বমোট	**২৯**	**৫**	**১**	**৩.৪**	**৯**	**৩১.০৩**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র : ৭.১২

উত্তরদাতাদের জমি বন্ধক গ্রহণ ও প্রদান

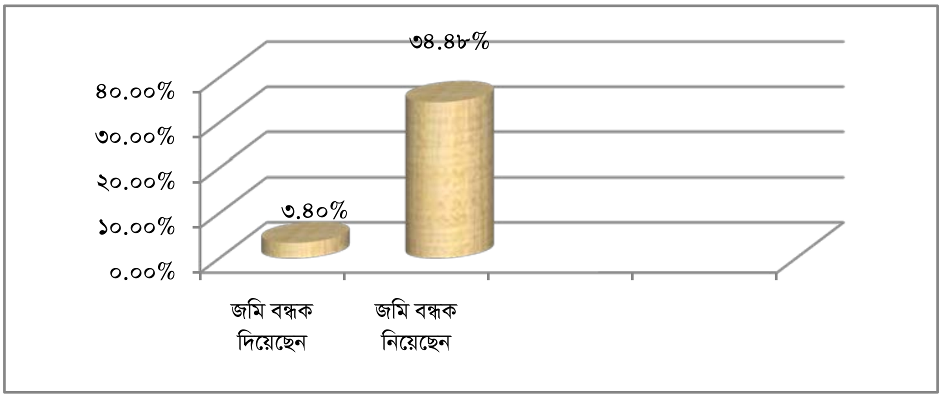

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

উপর্যুক্ত সারণি৭.৩১ ও চিত্র ৭.১২ থেকে দেখা যায় যে, ২৯ জন গৃহস্থালী প্রধানের মধ্যে জমি বন্ধক দিয়েছেন মাত্র ১ জন অর্থাৎ ৩.৪৫%। এই ১ জন নিজের চাষের জমি রেখে কিছু জমি (নিম্নে প্রদত্ত) বন্ধক দিয়েছেন। অন্যরা কেউ বন্ধক দেননি, কেননা তাদের বন্ধক দেওয়ার মতো জমিও নেই। অন্যদিকে বন্ধক নিয়েছেন ৯ জন অর্থাৎ ৩১.০৩%। যেহেতু নিজেদের চাষের মতো জমি নেই, সেজন্য তারা ঋণ গ্রহণসহ বিভিন্ন উপায়ে টাকার ব্যবস্থা করে বাঙালি জমি মালিকদের কাছ থেকে জমি বন্ধক নিয়েছেন চাষের জন্য। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে কানি প্রতি ২০,০০০–২৫,০০০ টাকায় জমি

বন্ধক রেখে তারা চাষাবাদ করে থাকেন। নিম্নের সারণিতে উত্তরদাতাদের জমি বন্ধক গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরা হলো।

সারণি : ৭.৩২

উত্তরদাতাদের বন্ধক গ্রহণ ও প্রদানকৃত জমির পরিসংখ্যান

(একরে)

জমির মালিকানা	জমি বন্ধক গ্রহণ				জমি বন্ধক প্রদান			
	বন্ধক নেয়া	মোট জমি	গণসংখ্যা	শতাংশ	বন্ধক দেয়া	মোট জমি	গণসংখ্যা	শতাংশ
.০১–.৪৯	-	-	-	-	-	-	-	-
.৫০–.৯৯	.৫, .৫	১.০	২	৬.৯০	-	-	-	-
১.০০–১.৪৯	১.০, ১.০, ১.০	৩.০	৩	১০.৩৪	-	-	-	-
১.৫০–১.৯৯	১.৫, ১.৫, ১.৫	৪.৫	৩	১০.৩৪	-	-	-	-
২.০০–২.৪৯	২.০	২.০	১	৩.৪৫	-	-	-	-
২.৫০–২.৯৯	-	-	-	-	২.০	২.০	১	৩.৪৫
সর্বমোট		**১০.৫**	**৯**	**৩১.০৩**	**২.০**	**২.০**	**১**	**৩.৪৫**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরেরসারণি থেকে দেখা যায়, তিনটি গ্রামের ২৯টি রাখাইন গৃহস্থালীর মধ্যে ৯টি অর্থাৎ ৩১.০৩% গৃহস্থালী জমি বন্ধক রেখেছেন। বন্ধক নেওয়া জমির মোট পরিমাণ ১০.৫ একর। ১টি পরিবার অর্থাৎ ৩.৪৫% জমি বন্ধক দিয়েছেন। তার বন্ধক দেওয়া জমির পরিমাণ ২.০ একর। দেখা যাচ্ছে, বেশি সংখ্যক পরিবার জমি বন্ধক রেখেছেন। সারণি থেকে বোঝা যায় .৫ একর করে মোট ১.০ একর জমি বন্ধক রেখেছেন ২টি গৃহস্থালী অর্থাৎ ৬.৯০%, ১.০ একর করে মোট ৩.০ একর ৩টি গৃহস্থালী অর্থাৎ ১০.৩৪%, ১.৫ একর করে মোট ৪.৫ একর জমি ৩টি অর্থাৎ ১০.৩৪% গৃহস্থালী, ২.০ একর ১টি অর্থাৎ ৬.৯০% গৃহস্থালী জমি বন্ধক নিয়েছেন।

বন্ধকি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তা হলো বন্ধকের সাথে যুক্ত উভয়পক্ষের ক্ষেত্র বা অবস্থান পরিবর্তন। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই গ্রামগুলোতে জমি বন্ধক দিত রাখাইনরা। আর বন্ধক নিত বাঙালিরা। ঐ সময় পর্যন্ত তাদের হাতে কিছু কিছু জমি ছিল। পরবর্তীকালে অবশিষ্ট জমিটুকুও বাঙালিদের হস্তগত হয়। যারফলে বর্তমানে তিনটি গ্রামের ৮২.৭৫% গৃহস্থালী ভূমিহীন। অতএব ভূমিহীনদের পক্ষে জমি বন্ধক রাখা প্রশ্নহীন। তবে যেহেতু তারা কৃষিজীবি সেহেতু চাষের জন্য তাদের জমি প্রয়োজন। তাই তারা জমি বন্ধক রেখে চাষ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ-সব ভূমিহীন আদিবাসী জমি বন্ধক রাখার টাকা কোথায় পায়? বেশিরভাগ বন্ধকি জমির টাকা

বেসরকারি সংগঠন থেকে গৃহীত ঋণ (পরে আলোচিত)। দলগত আলোচনা থেকে জানা যায়, বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন এই গ্রামসমূহে ক্ষুদ্র-ঋণ দিয়ে থাকে। তারা সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে জমি বন্ধক রেখে বন্ধকি জমি চাষ করে এবং কৃষি উপার্জন ও অন্যান্য উপার্জন থেকে কিস্তিতে উক্ত ঋণ পরিশোধ করে।

তিনটি গ্রামের মাত্র ১টি গৃহস্থালী ২ একর জমি বন্ধক রেখেছেন। এই গৃহস্থালী একজন ধনী কৃষক বা ভূস্বামী। তিনি কিছু জমি নিজে চাষ করেন। কিছু জমি বন্ধক রাখেন; বাকি জমি বর্গা দিয়ে চাষ করিয়ে থাকেন। বন্ধকের টাকা দিয়ে তিনি পরিবারের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহ করেন। উল্লেখ্য তিনটি গ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে কেবল একটি গৃহস্থালী বৃহৎ কৃষক বা ভূস্বামী। এবং আরো লক্ষণীয় যে, অতীতে কেবল ক্ষুদ্র কিংবা মধ্য কৃষকরা জমি বন্ধক রাখতো। সাধারণত কোনো ধনী কৃষকের জমি বন্ধক রাখার তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু গবেষণা এলাকার মধুপাড়ার এই ধনী কৃষককে জমি বন্ধক রাখতে দেখা যায়।

গবেষণা এলাকায় সুদূর অতীত থেকে তিন ধরনের বন্ধকি ব্যবস্থা চালু আছে। এগুলো হলো : পাট্টা বা খাইখালাসি, একসনা, ও বেমেদি বা কোট কওলা বা কোট বন্ধক। তবে কোট কওলা শব্দটি ২০-২৫ বছর আগে থেকে গ্রামে প্রচলিত হয়েছে বলে জানা যায়। আসলে এটি সরকারি পরিভাষা। গ্রামবাসীর কাছে বন্ধকের এই পদ্ধতিটি বেমেদি পাট্টা নামে পরিচিত। আর অধিকাংশ রাখাইন এই বেমেদি পাট্টার অধীনে নিজেদের চাষের ভূমি হারিয়ে ভমিহীনে পরিণত হয়েছে।

গ্রামবাসী খাইখালাসি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল, যদিও তারা স্থানীয়ভাবে এ-ব্যবস্থাকে পাট্টা নামে চিহ্নিত করে এবং পাট্টা শব্দ ব্যবহার করতে তারা অভ্যস্ত। পাট্টা বা খাইখালাসি হলো এক ধরনের বন্ধক যে ব্যবস্থায় জমি বন্ধক দিলে বন্ধক গ্রহীতা জমির দখল নিয়ে জমিতে ফসলাদি ফলিয়ে ভোগ করে। ফসল ফলালে প্রতি বছর তার কিছু লাভ হয়। ধরা হয় যে, এভাবে সাত বছর জমি ভোগ করার ফলে ধার নেওয়া টাকা শোধ হয়ে যায়। তাই পাট্টার সর্বোচ্চ মেয়াদ ৭ বছর। সাত বছর পর্যন্ত বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকি জমি ভোগ-দখল করতে পারে। নিয়মানুযায়ী ৭ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেও জমি ফেরত নেওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে জমি ফেরত নিতে হলে হিসেব অনুযায়ী অবশিষ্ট টাকা ফেরত দিতে হয় যা আগেও উদাহরণসহ উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় পাট্টা বা খাই খালাসির মেয়াদ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন অধ্যাপক আরেফিন শিমুলিয়াতে বিভিন্ন মেয়াদের খাই খালাসি ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। এমন কি সেখানে দুবছর মেয়াদেও খাই খালাসির চুক্তি হয় বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ধনী কৃষকেরাও তাদের 'অতিরিক্ত' জমি এক বা দুই বছরের জন্য 'খাই-খালাসী' হিসেবে বন্ধক দিত (আরেফিন, ১৯৯৪ : ১১৪)। ২০১৮ সালের মাঠ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একজন কৃষককে কানি প্রতি ২২,০০০ টাকা দরে জমি পাট্টা নিতে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা এলাকার আর এক ধরনের বন্ধকি ব্যবস্থার নাম হলো এক সনা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একজন কৃষককে কানি প্রতি ২৫,০০০ টাকা হিসেবে এক সনা ব্যবস্থায় ১ বছরের জন্য বা এক মৌসুমের জন্য জমি বন্ধক নিতে দেখা যায়। বন্ধকি জমিতে এক ফসলি রোপা আমনের কানি প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ গড়ে ৬৫ মন। ২০১৮ সালের স্থানীয় বাজার অনুযায়ী তখন প্রতি মন ধানের মূল্য ১০০০ টাকা। সে অনুযায়ী এক কানি জমির আয় হয় গড়ে ৬৫×১০০০= ৬৫,০০০ টাকা।

বেমেদি বা কোট কওলা বা কোট বন্ধক হলো ভূমি অফিসের মাধ্যমে ১৫০ (১০০+৫০) টাকার রাজস্ব স্ট্যাম্পে লিখিত-পড়িত ও সই-স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক রেজিস্ট্রি করে অনির্ধারিত মেয়াদে এক ধরনের চুক্তিভিত্তিক বন্ধকি ব্যবস্থা। চুক্তি অনুযায়ী টাকা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকি জমি ভোগ-দখল করে থাকে। তবে অন্যূন ২/৩ বছরের আগে কেউ টাকা ফেরত নেওয়ার দাবি করতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ ন্যূনপক্ষে ২/৩ বছর পর কেউ টাকা ফেরত দিয়ে জমি নিজ দখলে নিতে পারে। উল্লেখ্য এই চুক্তিটি সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদি হয়ে থাকে। গবেষণা এলাকায় ১ কানি জমির বিনিময়ে ১,৬০,০০০ টাকায় বেমেদি চুক্তি বা কোট কওলা চুক্তি করতে দেখা যায়। লক্ষ্য করার বিষয়, সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ভূমি অফিসের রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করে কোট কওলা চুক্তি করার নিয়ম। কিন্তু দেখা গেছে যে, কৃষকরা ভূমি অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রি করার পরিবর্তে নিজেরা রাজস্ব স্ট্যাম্পে স্বাক্ষরের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হয়। এর কারণ সম্পর্কে তারা জানায় যে, ভূমি অফিসে রেজিস্ট্রি করতে গেলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফি হিসেবে ভূমি অফিসে অর্থাৎ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হয়। নিজেরা বোঝাপড়া করে নিলে এই ফি-এর খরচটা বাঁচানো যায়। সেজন্য বর্তমানে কেউ ভূমি অফিসের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করে না।

গবেষণা এলাকায় এই তিন ধরনের বন্ধকির মধ্যে এক সনা বন্ধকি ব্যবস্থা সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রচলিত। বেশির ভাগ চুক্তি এক সনা বন্ধকি চুক্তি। এরপর জনপ্রিয় হলো পাট্টা বা খাইখালাশি। সবচেয়ে কম প্রচলিত চুক্তি হলো কোট কওলা বা কোট বন্ধকি। গবেষণাধীন গ্রামের আদিবাসী রাখাইনদের সর্বমোট ১১টি গৃহস্থালীকে বন্ধকি ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত দেখা যায়। এরমধ্যে ৭টি গৃহস্থালী একসনা, ৩টি গৃহস্থালী পাট্টা এবং ১টি গৃহস্থালীকে বেমেদি বা কোট কওলা বন্ধকি ব্যবস্থার অধীন চুক্তিবদ্ধ দেখা যায়।

সারণি : ৭.৩৩

একনজরে বন্ধকি ব্যবস্থার পরিবর্তন

দাদার আমল	বাবার আমল	উত্তরদাতার কাল	মন্তব্য
রাখাইনরা বাঙালিদের কাছে জমি বন্ধক দিত।	রাখাইনরা বাঙালিদের কাছে জমি বন্ধক দিত।	রাখাইনরা বাঙালিদের থেকে জমি বন্ধক নিয়ে চাষ	ভূমিহীন হওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে জমি বন্ধক নিয়ে চাষ করে।

করে।

অতীতে নির্দিষ্ট একটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বন্ধকি জমির মূল্য বৃদ্ধি পেত। তবে একবিংশ শতাব্দীতে এই মূল্য একলাফে কয়েক গুণ বেড়ে যায়। নিম্নের ২৬ নংসারণিতে তিনটি গ্রামের ১৯৮০-২০১০ সাল পর্যন্ত বন্ধকি ব্যবস্থায় জমির মূল্য তুলে ধরা হলো।

সারণি : ৭.৩৪

১৯৮০-২০১০ সাল পর্যন্ত গ্রামের বন্ধকি জমির মূল্য

(কানি প্রতি টাকায়)

সাল	বন্ধকের শ্রেণি		
	পাট্টা/খাইখালাসি	একসনা	বেমেদি পাট্ট/কোট কওলা
১৯৭০	৪,০০০	১,৫০০	৮,০০০
১৯৮০	১০,০০০	৫,০০০	২০,০০০
১৯৯০	১৬,০০০	৬,০০০	৪০,০০০
২০০০	২০,০০০	১০,০০০	৬০,০০০
২০১০	৫০,০০০	২০,০০০	১,৬০,০০০
২০১৮	১,০০,০০০	৪০,০০০	২,৫০,০০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালে ১ কানি জমি ৭ বছরের জন্য ৪,০০০ টাকায় পাট্টা রাখা হতো। ফি বছর এই মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮০ সালে ১০,০০০, ১৯৯০ সালে ১৬,০০০, ২০০০ সালে ২০,০০০, ২০১০ সালে ৫০,০০০ টাকা হয় ও ২০১৮ সালে ১,০০,০০০ টাকা। ২০১০ সালেও ৫০,০০০ টাকায় ১ কানি জমি পাট্টা পাওয়া যেত। অর্থাৎ বিগত ৮ বছরে বৃদ্ধির পরিমাণ নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক। সারণি থেকে আরো বোঝা যায়, ১৯৭০ সালে ১,৫০০ টাকায় ১ কানি জমি ১ বছরের জন্য বন্ধক রাখা হতো। ২০১৮ সালে এসে এই মূল্য দাঁড়ায় ৪০,০০০ টাকা। এক সনা বন্ধকির ক্ষেত্রে বিনিময়মূল্যের বৃদ্ধির পরিমাণ অনেকটা স্বাভাবিক। আবার বেমেদি পাট্টার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৯৭০ সালে ৮,০০০ টাকায় ১ কানি জমি সময়বিহীন বন্ধক রাখা হতো। ২০১০ সালে

Dhaka University Institutional Repository

১,৬০,০০০ টাকায় ১ কানি জমি পাওয়া যেত। ২০১৮ সালে তা ২,৫০,০০০ টাকায় দাঁড়ায়। অর্থাৎ ২০০০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত এই দুই দশকে বিনিময়মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় চারগুণ।

Dhaka University Institutional Repository

৭.১১ রাখাইনদের জমি বর্গা ব্যবস্থা

হাড়িপাড়া, তুলাতুলিপাড়া ও মধুপাড়া গ্রামে, এমনকি, আদিবাসীদের মধ্যে জমি বর্গাচাষের প্রচলন আছে। তবে স্থানীয়ভাবে বর্গাচাষ ব্যবস্থাকে পত্তন বলা হয়। গ্রামবাসী 'বর্গাচাষ' শব্দটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু তারা ভাগচাষের এ-ব্যবস্থাকে পত্তন বলে অভিহিত করে। 'পত্তন' শব্দটি তাদের কাছে সমধিক পরিচিত। এটি সংস্কৃত শব্দ যার একাধিক অর্থ পাওয়া যায়, যেমন : নির্দিষ্ট হারে ও মেয়াদে জমিদারের নিকট থেকে প্রাপ্ত ভূমিস্বত্ব; জোতজমা ও প্রজাস্বত্ববিশেষ ইত্যাদি। বাস্তবিকপক্ষে, উনিশ শতকের পঞ্চশের দশকের পূর্বে এ গ্রামগুলোতে আদিবাসীদের মধ্যে বর্গা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। সকল রাখাইন গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জমি ছিল। তখন শুধু পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন করতো। উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতো না। সেইজন্য বর্গার প্রয়োজনও হতো না। পরবর্তীকালে প্রতিবেশি বাঙালি মুসলমানরা রাখাইনদের কাছ থেকে জমি বর্গা নিয়ে চাষ করতো। পর্যায়ক্রমে জমি মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং উল্টো রাখাইনরাই বর্গাচাষীতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ার সাথে আরেফিনের (১৯৯৪) পর্যবেক্ষণের মিল পরিলক্ষিত হয়। তিনি দেখতে পান, শিমুলিয়াতে ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বর্গাচাষ ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে শিমুলিয়ার মুসলমানরা জমি মালিক বা চাষী হিসেবে বর্গাচাষ ব্যবস্থার সাথে খুব কমই জড়িত ছিল। সাধারণত মুসলমান জনগোষ্ঠীর হাতে পত্তন দেওয়ার মতো অতিরিক্ত জমি ছিল না। তৎকালে বর্গাচাষ ব্যবস্থাটি হিন্দু জনগোষ্ঠীর একান্ত এখতিয়ারভুক্ত ছিল। ১৯৬৪ সালের পরবর্তী সময়েই পরিবর্তন সূচিত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে হিন্দুদের কাছ থেকে কেবল মুসলমানদের হাতে নয় বরং শহুরে ফটকাবাজদের হাতেও জমি দ্রুত হস্তান্তর হয়। ১৯৪৫ সাল থেকে শিমুলিয়ার মুসলমান জনগোষ্ঠী তাদের জমির পরিমাণ শতকরা ৯৬ ভাগ বাড়াতে সক্ষম হয়। এরফলে মুসলমান জমি মালিকদের কাছ থেকেও বর্গা নেওয়ার মতো জমি পাওয়া যেতে থাকে।

হাড়িপাড়া, তুলাতুলিপাড়া ও মধুপাড়ার রাখাইনদের জমি হস্তান্তর পঞ্চাশের দশকে শুরু হয়ে আশির দশক অধিক চূড়ান্ত রূপ পায়। প্রকৃতপক্ষে যে-সব জমি মালিকের উদ্বৃত্ত জমি থাকে তারা পত্তন দিয়ে থাকে। আর যাদের কৃষি জমি নেই কিংবা অল্প জমির মালিক তারা পত্তন নিয়ে থাকে। কিন্তু গবেষণাধীন রাখাইন জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ গৃহস্থালী ভূমিহীন এবং কেবল ১জন বৃহৎ কৃষক ; সুতরাং তাদের অধিকাংশের জমি পত্তন দেওয়ার তেমন সুযোগ নেই। বরং তাদের কেউ কেউ মুসলমানদের থেকে জমি পত্তন নিয়ে চাষ করে। যদিও সে সংখ্যাও নগণ্য। এক যুগ আগেও তারা বর্গা জমি পেত, বর্তমানে বর্গার জমি পাওয়াও দুষ্কর বলে জানা যায়। নিম্নের ২৭ নং সারণিতে তিনটি গ্রামের রাখাইনদের ২০১৮ সালের পত্তনি চাষ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণি– ৭.৩৫

উত্তরদাতাদের জমি বর্গা গ্রহণ ও প্রদান

গ্রামের নাম	মোট গৃহস্থালী	চাষ জমির গৃহস্থালী	জমি বর্গা দিয়েছেন		জমি বর্গা নিয়েছেন	
			দিয়েছেন	শতাংশ	নিয়েছেন	শতাংশ
হাড়িপাড়া	১৪	-	-	-	১	৩.৪৫
মধুপাড়া	৯	৪	১	৩.৪৫	১	৩.৪৫
তুলাতুলিপাড়া	৬	১	-	-	-	-
সর্বমোট	**২৯**	**৫**	**১**	**৩.৪৫**	**২**	**৬.৯০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র : ৭.১৩

উত্তরদাতাদের জমি বর্গা প্রদান ও গ্রহণ

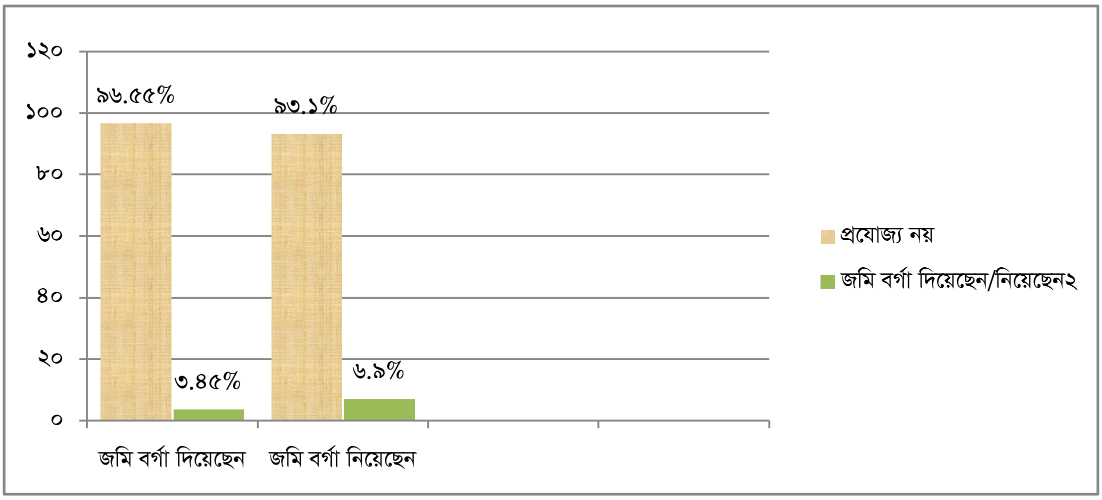

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

উপরের সারণি৭.৩৫ ও চিত্র ৭.১৩ পর্যালোচনান্তে দেখা যাচ্ছে যে, তিনটি গ্রামের ২৯টি রাখাইন গৃহস্থালীর মধ্যে জমি বর্গা দিয়েছেন ১ জন অর্থাৎ ৩.৪৫% গৃহস্থালী। অপরদিকে জমি বর্গা নিয়েছেন ২ জন অর্থাৎ ৬.৯০% গৃহস্থালী। জানা যায়, বন্ধকি প্রথার মতো পত্তনি প্রথাতেও গত শতকের পঞ্চাশের দশকে বাঙালিরা রাখাইনদের থেকে জম নিয়ে বর্গা করতো। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি রাখাইনদের হাতছাড়া হতে থাকে। ভূমিহীনে পরিণত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তখন রাখাইনরা বাঙালি মহাজনদের থেকে জমি বর্গা নিয়ে চাষ করতে থাকে। এভাবে অনেক রাখাইন পরিবার বাঙালি মুসলমান মহাজন জোতদারদের থেকে জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতো বলে জানা যায়। কিন্তু চলতি শতকে দৃশ্যপট পাল্টে যায়। এই শতকের গোড়াতেও রাখাইনরা মোটামুটি চাষের জমি বর্গা লাভে সক্ষম হতো। তবে দ্বিতীয় দশকে এসে তারা বর্গা জমি লাভে ব্যর্থ হতে শুরু করে।

বাঙালি মুসলমানরা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে জমি বর্গা দিতে শুরু করে। ফলে রাখাইনরা চাষের জমি না পেয়ে বাধ্য হয়ে ক্রমে ক্রমে কৃষিবিমুখ হতে থাকে। নিম্নের সারণিতে উত্তরদাতাদের বর্গাচাষের তথ্য সন্নিবেশ করা হলো।

সারণি : ৭.৩৬

রাখাইনদের পত্তন বা বর্গা জমি বন্টন ২০১৮

(একরে)

জমির মালিকানা	জমি বর্গা গ্রহণ				জমি বর্গা প্রদান			
	বর্গা নেয়া	মোট জমি	পরি. সংখ্যা	শতাংশ	বর্গা দেয়া	মোট জমি	পরি. সংখ্যা	শতাংশ
০–০								
.০১–.৪৯	.২০, .১৫	.৩৫	২	৬.৯০				
.৫০–.৯৯								
১.০০–১.৪৯								
১.৫০–১.৯৯								
২.০০–২.৪৯					২.০০	২.০০	১	৩.৪৫
২.৫০–২.৯৯								
৩.০০+ তদূর্ধ্ব								
সর্বমোট		**.৩৫**	**২**	**৬.৯০**		**২১.৬০**	**১**	**৩.৪৫**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, গবেষণা এলাকার ২৯টি গৃহস্থালীর মধ্যে ২টি অর্থাৎ ৬.৯% গৃহস্থালী জমি পত্তনি নিয়েছে যথাক্রমে .২ ও .১৫ একর অর্থাৎ মোট .৩৫ একর। মাত্র ১টি অর্থাৎ যা মোট গৃহস্থালীর ৩.৪৫% জমি পত্তনি দিয়েছে ২.০০ একর। পত্তনি দেওয়ার মতো জমি কেবল একজনেরই আছে। মধুপাড়ার এই গৃহস্থালী নিজের প্রয়োজন ও চাষের সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু জমি নিজের চাষের জন্য রেখে দিয়ে কিছু জমি প্রায় প্রতিবছর পত্তনি দিয়ে থাকেন।

সাধারণত জমির মালিক একজন কৃষকের কাছে জমি পত্তন দেয় এবং বিনিময়ে সে উৎপাদিত ফসলের শতকরা ৫০ ভাগ পায়। এটা দোভাগা পদ্ধতি। গ্রামে তেভাগা পদ্ধতিও চালু আছে। সেক্ষেত্রে জমির মালিক হউৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পায়। আর কৃষক পায় এক ভাগ। এই দুটি প্রচলিত বর্গা প্রথা ছাড়াও গ্রামগুলোতে আরো একটি বর্গা ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। সেটি হলো ধান করোলী। এটা এমন এক ধরনের চুক্তি যে, চুক্তির সময় কৃষক কানি প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ

ধান জমির মালিককে দিতে রাজি হয়। ধানের পরিমাণ নির্ধারিত হয় জমির প্রকৃতি অনুযায়ী। দেখা গেছে জমির অবস্থান ও ধরন অনুযায়ী কানি প্রতি ৩০-৩৫ মন ধান দেওয়ার চুক্তি হয়। ফসলের ফলন ভালো বা খারাপ অর্থাৎ কৃষকের লাভ-ক্ষতি যাই হোক না কেন জমির মালিকের কৃষককে চুক্তির ধান দিতে হয়।

কোনো প্রকার পত্তনি ব্যবস্থাতেই জমির মালিক কখনো পত্তনিদারকে পুঁজি, লাঙল বা চাষাবাদের জন্য গবাদি পশুর জোগান দেয় না। সকল প্রকার পত্তনি ব্যবস্থাই মৌখিক চুক্তি। জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে কোনো লিখিত চুক্তি হয় না। সাধারণত জমির মালিক আগে থেকেই পত্তনিদারকে ভালোভাবে চেনে ও জানে। অভিজ্ঞ, দক্ষ, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারকারী চাষীরা জমি পত্তনি পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। গ্রামের শতকরা ৮২.৭৫ ভাগ রাখাইন ভূমিহীন কৃষক। তাই রাখাইনদের মধ্যে কারো জমি পত্তন দেওয়ার সুযোগ নেই। দক্ষ চাষী যাদের চাষে সফলতার খ্যাতি বা নামযশ আছে তারা গ্রামের মুসলমান বড় কৃষক কিংবা গ্রামের বাইরের অনুপস্থিত মুসলমান ভূমি মালিকদের থেকে জমি পত্তন নিয়ে থাকে। তবে উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে রাখাইন গ্রামবাসীর কাছে এই ভূমি বিন্যাস ব্যবস্থাটি তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গ্রামগুলোতে বর্তমানে পত্তন ব্যবস্থার ব্যাপক চর্চা নেই। কেননা যেখানে ৮২.৭৫% গৃহস্থালী ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক, সেখানে মাত্র ৬.৯% গৃহস্থালী জমি পত্তন নিচ্ছে। আবার গ্রামগুলোর রাখাইনদের মধ্যে বৃহৎ কৃষক তেমন না থাকায় জমি পত্তন দেওয়ার ব্যাপারটিও খুবই সীমিত। মাত্র ৩.৪৫% গৃহস্থালী জমি পত্তন দিতে দেখা যায়।

পত্তনি ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপনের জন্য এখানে অপর একটি গবেষণার উল্লেখ করা হলো। এরেন্স ও বুর্দেন (১৯৮০: ১৬২-৬৩) দেখতে পান যে, ঝগড়াপুরের প্রায় অর্ধেক পরিবার জমি বর্গা দেওয়া কিংবা জমি বর্গা নেওয়ার সাথে জড়িত। গ্রামের মোট জমির ১৫ শতাংশ বর্গা চাষের অধীন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের মধ্যে বর্গাচাষ তুলনামূলকভাবে বেশি। দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বর্গা চাষ পাওয়া সম্ভব হয় না। ক্ষুদ্র গৃহস্থদের মধ্যে অনেকেই অবস্থার বিপাকে পড়ে জমি বর্গা দিতে বাধ্য হয়। জমি থেকে বর্গাচাষীদের উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তবুও ঝগড়াপুরে বর্গা প্রথা গুরুত্বপূর্ণ।

যেহেতু আদিবাসীরা কৃষিজীবি এবং যেহেতু তাদের নিজস্ব মালিকানায় কোনো জমি নেই সেহেতু তাদের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করার কথা। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে পরিমাণ গৃহস্থালী জমি বন্ধক রাখছে সে পরিমাণ গৃহস্থালী জমি পত্তনি নিচ্ছে না। বরং তার তুলনায় কম সংখ্যক গৃহস্থালী জমি পত্তনি নিয়েছে। অথচ তারা নিজেদের গচ্ছিত টাকা না থাকার দরুন বেসরকারি সংগঠন থেকে ঋণ নিয়ে জমি বন্ধক রাখে। এর কারণ কী? দলগত আলোচনা থেকে জানা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে জমির চাহিদা খুব বেশি। কিন্তু জমির পরিমাণ কম। সেজন্য বর্তমানে পত্তনিচাষের জন্য জমি পাওয়া যায় না। জমির মালিক বাঙালি মুসলমানরা মূলত তাদের গরিব আত্মীয়দের নতুবা আধুনিক চাষে সামর্থ্যবান বাঙালি চাষিদের কাছে জমি বর্গা দিয়ে থাকে। এটি প্রধান কারণ। অন্য দুটি কারণও জানা গেছে। এর একটি হলো বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের নানাবিধ কারণে আশানুরূপ ফসল সময়ে সময়ে না পাওয়া। কিন্তু বাড়তি উৎপাদন খরচ ঠিকই ব্যয় হয়ে যায়। অপরটি হলো উচ্চদামে বীজ ও সার ক্রয়, সময় মতো বাজারে সার না পাওয়া, শ্রমিকের মজুরি বেশি প্রভৃতি কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। এরফলে পত্তনিচাষির পত্তায় পোষায় না বলে অনেকে বর্তমানে পত্তনিচাষের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। সেজন্যও গ্রামগুলোতে রাখাইনদের মধ্যে পত্তনচাষির সংখ্যা কম।

৭.১১.১ বর্গাজমি হাতছাড়া হওয়া

‘বর্গা’ শব্দটি রাখাইনদের কাছে পরিচিত। তবে তারা বর্গা না বলে ‘পত্তনি’ বলে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে, বিশ শতকের চল্লিশের দশকে যখন বাঙালিরা এসব এলাকায় রাখাইনদের পাশাপাশি বসতি গড়তে শুরু করে, তখন তারা রাখাইনদের থেকে জমি পত্তনি নিত। পরবর্তীকালে নানা কারণে রাখাইনরা ভূমিহীন হয়ে পড়ায় এবং বাঙালি পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে জমি পুঞ্জিভূত হওয়াতে তারা বাঙালিদের থেকে জমি পত্তনি নিয়ে চাষ করে সংসারের ব্যয় নির্বাহের চেষ্টা চালায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হওয়ায়, বাঙালি মহাজনদের আত্মীয়-স্বজনদের পীড়াপীড়িতে পর্যায়ক্রমে পত্তনির জমি রাখাইনদের হাতছাড়া হতে থাকে। উপরন্তু, পত্তনি চাষে না পোষানোর কারণেও রাখাইনদের পত্তনি চাষে আগ্রহ কমে গেছে। নিম্নের সারণি থেকে পত্তনি জমি হাত ছাড়া হওয়ার বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমত কি তা জানা যাবে।

সারণি– ৭.৩৭

বর্গাজমি হাতছাড়া হওয়ার বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমত

অভিমত	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতকরা হার
	নিপুপাড়া	ঠাকুরপাড়া	এমংপাড়া		
ফসল কম হওয়া	১	১	২	৪	১৩.৭৯
বর্গাচাষির ওকুপেসি রাইট এড়ানো	-	-	-	-	-
বেগার শ্রম না দেওয়া	-	-	-	-	-
মালিক নিজে চাষ করা	২	১	১	৪	১৩.৭৯
নৃগোষ্ঠীর লোক হওয়া	২	-	১	৩	১০.৩৪

মালিক জমি নিজে করা	-	-	-	-	-
মালিকের আত্মীয়কে বর্গা দেওয়া	৫	৩	৩	১১	৩৭.৯৩
প্রযোজ্য নয়	৪	১	২	৭	২৪.১৪
	১৪	**৬**	**৯**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের ৭.৩৭ নং সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক ৩৭.৯৩% ভাগ মনে করেন বর্গা জমি হাত ছাড়া হওয়ার কারণ হলো মালিক জমি রাখাইনদের থেকে নিয়ে তার আত্মীয়কে বর্গা দেন। তাদের মধ্যে ১৩.৭৯% ভাগ মনে করেন ফসল উৎপাদন কমে যাওয়ায় মালিক জমি দিতে চায় না। অপর ১৩.৭৯% ভাগ মনে করেন মালিক জমি ফেরত নিয়ে নিজে চাষ করেন। নৃগোষ্ঠীর লোকদের জমি মালিকরা আর জমি দিতে চায় না বলে ধারণা করেন ১০.৩৪% ভাগ। জমি বর্গাচাষের ক্ষেত্রে একটা সময়গত পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়, যা নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি– ৭.৩৮

একনজরে রাখাইনদের জমি পত্তনির পরিবর্তন

দাদার আমল	বাবার আমল	উত্তরদাতার কাল	মন্তব্য
রাখাইনরা বাঙালিদের কাছে পত্তনি দিত।	রাখাইনরা বাঙালিদের থেকে পত্তনি নিত।	রাখাইনরা পত্তনি পায় না, আবার পত্তনি নেওয়া ছেড়েও দিয়েছে।	বর্তমানে পত্তনি চাষের জমি পাওয়া যায় না, চাষিরও পোষায় না।

৭.১২ গ্রামের পরিবর্তমান মজুরি ব্যবস্থা

গবেষণাধীন গ্রামগুলোতে তিন ধরনের শ্রম ব্যবস্থার তথ্য পাওয়া যায়। যথা : বিনিময়, বৈটিয়াল, বদলা বা দিন মজুর বা মুক্ত মজুর। এই তিন ধরনের শ্রমের মধ্যে শ্রমবিনিময় কেবল রাখাইনদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়। অন্য সম্প্রদায়ের সাথে শ্রমবিনিময় হয় না। অতীতে তাদের মধ্যে শ্রম বিনিময়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এটা ছিল তাদের স্বাভাবিক প্রথা। কেননা অতীতে কোনো রাখাইন শ্রমজীবী ছিল না। ফলে মধ্য কৃষক ও প্রান্তিক কৃষক সকলের মধ্যে শ্রমবিনিময় হতো। কেবল ভূস্বামী বা ধনী কৃষকরা বৈটিয়াল নিযুক্ত করতো। তবে অতীতে বদলার কোনো প্রচলন ছিল না। গবেষক সেলিনা আহসান (১৯৯৩) বান্দরবান জেলার মারমাদের (রাখাইনদের অপর শাখা) মধ্যে শ্রম বিনিময় প্রথা দেখতে পান। তিনি দেখিয়েছেন যে, মারমাদের মধ্যে শ্রমবিনিময় কিংবা নগদ অর্থের বিনিময়ে শ্রম প্রদান সচরাচর দেখা যায়। শ্রমবিনিময় তাদের মধ্যে অধিক প্রচলিত।

প্রথাগতভাবে একই গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সাধারণত জুম চাষ ও গৃহ নির্মাণের জন্য মারমারা শ্রমবিনিময় করে থাকে। কাজের মৌসুমে যখন একটি কাজ খুব স্বল্প সময়ে করার দরকার হয় কিংবা একই সাথে কয়েক ধরনের কাজ করতে হয় তখন একই গোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পরকে সাহায্য করে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের কাজ সম্পন্ন করে। সাধারণত জুম চাষের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার, সমতল ভূমিতে ধান চাষ, ধান ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার ও ধান কাটা এবং গৃহ তৈরির জন্য তারা শ্রমবিনিময় করে থাকে (Ahsan, 1993: 92)।

অতীতে হাড়িপাড়া মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ার দুই একজন জোতদার, মাতবর বাদে অধিকাংশ কৃষক নিজের জমি নিজে চাষ করতো। গ্রামের একজনের হয়তো চাষ করতে দেরি আছে কিংবা চাষের কাজ শেষ হওয়ায় হাতে অবসর সময় আছে, তখন তিনি অন্য যার কাজ শেষ হয়নি তাকে সাহায্য করে। বিনিময়ে দ্বিতীয়জনও প্রয়োজনের সময় প্রথমজনকে সাহায্য করেন। আবার একজন ঘর বাঁধছে, তখন আর একজন এসে তাকে সাহায্য করেন। কেবল একই গ্রামের কিংবা একই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে নয়, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসীর মধ্যেও এই শ্রম বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। তবে এক্ষেত্রে জ্ঞাতি-কুটুমরা বেশি অংশগ্রহণ করে এবং অংশগ্রহণকারী কোনো না কোনোভাবে জ্ঞাতি বন্ধনে আবদ্ধ। গত শতকের আশির দশক জুড়ে তাদের মধ্যে এ শ্রমবিনিময় প্রথা বজায় ছিল। বর্তমানে শ্রমবিনিময়ের প্রচলন একেবারেই কম। শ্রমবিনিময়ের জন্যও এক ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়। বাজার অর্থনীতির প্রভাবে বিনিময় শ্রমের প্রথা হারিয়ে যাচ্ছে। এর পরিবর্তে তারা শ্রম ক্রয় করে। গ্রামবাসী এখন বিভিন্ন পেশায় যুক্ত। ফলে শ্রমবিনিময় অনেকের প্রয়োজন পড়ে না।

গ্রামের রাখাইন জমি মালিকদের মধ্যে অতীতে কেবল বৈটিয়াল ব্যবস্থায় কৃষি শ্রমিক নিয়োগের প্রথা ছিল। বৈটিয়াল খাটাতো বৃহৎ কৃষক বা ভূস্বামী এবং অল্প দু একজন মধ্য কৃষক। অতীতে কোনো রাখাইন বৈটিয়াল শ্রমিক পাওয়া যেত না। কারণ তখন প্রত্যেকে নিজের জমি চাষ করতো। পটুয়াখালীর আশেপাশের এলাকা থেকে বাঙালি মুসলমানরা যেয়ে বৈটিয়াল খাটতো। বৈটিয়াল ব্যবস্থায় চাষের মৌসুমে কানি হিসেবে বৈটিয়াল নিযুক্ত করা হতো। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শ্রমিকরা একটি ফসল উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুত থেকে শুরু করে বীজ বোনা, আগাছা পরিষ্কার, নিড়ানি দেওয়া, ধান কাটা, ধান মাড়াই পর্যন্ত কাজ

করার লক্ষ্যে জমির মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতো। এরা ছিল মৌসুমি শ্রমিক। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে তারা এ-সব গ্রামে আসত। ফসল উৎপাদন শেষ হয়ে গেলে তারা প্রাপ্য বুঝে নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় চলে যেত। শ্রমিকরা কেবল একজন ভূস্বামীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হতো না, বরং এক মৌসুমে একাধিক ভূস্বামীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করতো। এর ফলে মৌসুম শেষে তারা বেশ ভালো পরিমাণ আয় নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরতে পারতো। গবেষণা এলাকায় এখনো বৈটিয়াল শ্রমের প্রচলন আছে। নিম্নে ১৯৭০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বৈটিয়াল শ্রমমূল্যের পরিবর্তন তুলে ধরা হলো।

সারণি : ৭.৩৯

১৯৮০-২০১০ সাল পর্যন্ত গ্রামের বৈটিয়াল শ্রমের মূল্য

সাল	কানি প্রতি বৈটিয়াল মূল্য (টাকা)
১৯৭০	২০০ টাকা ও ১০ কেজি চাউল
১৯৮০	৪৫০ টাকা ও ২০ কেজি চাউল
১৯৯০	১,০০০
২০০০	২,০০০
২০১০	৪,৫০০
২০১৮	১০,০০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মার্চ ২০১৮

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭০ সালে একজন বৈটিয়াল নিযুক্ত হতো ২০০ টাকা ও ১০ কেজি চাউলের চুক্তিতে। ১৯৮০ সালে একজন বৈটিয়াল নিযুক্ত হতো ৪৫০ টাকা ও ২০ কেজি চাউলের চুক্তিতে। পরবর্তীকালে বৈটিয়ালের শ্রমমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালে ১,০০০ টাকা, ২০০০ সালে ২,০০০ টাকা, ২০১০ সালে ৫,০০০ টাকা এবং ২০১৮ সালে ১০,০০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বৈটিয়াল শ্রমিকদের নগদ টাকার সাথে কিছু চাউল প্রদানেরও নিয়ম ছিল। ১৯৮০ সালের পরে চাউল প্রদানের প্রথা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৮০ এর আগপর্যন্ত গ্রামসমূহে রাখাইনদের মধ্যে শ্রম বিনিময় ও বৈটিয়াল ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। আশির দশকের শুরু থেকে বদলা বা দিন মজুর বা মুক্ত মজুরের উদ্ভব হয়। দিন মজুর বা মুক্ত মজুর স্থানীয়ভাবে বদলা নামে পরিচিত। তবে তখন কোনো রাখাইন মুক্ত মজুর পাওয়া যেত না বা কোনো রাখাইন মজুরি পেশা গ্রহণ করেনি। রাখাইনরা মজুর পেশা গ্রহণ করে নব্বই দশকের শেষের

Dhaka University Institutional Repository

দিকে। তবে তাদের সংখ্যা অনুল্লেখযোগ্য। এমন কি ২০১৮ সালে মাঠ গবেষণায় তিনটি গ্রামের ৮৪ জন পেশাজীবির মধ্যে মাত্র ১ জন অর্থাৎ ১.১৯% কে (সারণি-৭.৪৩ দ্রষ্টব্য) দিনমজুর পেশায় নিযুক্ত দেখা যায়। তাও তিনি কৃষি মজুর হিসেবে কাজ করেন। কুলি বা মাটি কাটা ইত্যাদি অন্য কোনো কাজে শ্রম বিক্রি করেন না। এছাড়া আরো ১ জনের দ্বিতীয় পেশা ছিল দিনমজুর (কৃষি মজুর)। দলগত আলোচনা থেকে জানা যায়, তারা মজুর পেশাকে ভালো চোখে দেখেন না বা সম্মানজনক পেশা মনে করে না। সেজন্য তখন কেবল গ্রামে বসবাসকারী ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বাঙালিরা মুক্ত মজুর শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো। মুক্ত মজুর ব্যবস্থা বাঙালিদের মধ্যে বহু যুগ ধরে চলে আসছে। মুক্ত মজুর ব্যবস্থায় শ্রমিকের শ্রম পণ্য। পুঁজির মালিক টাকার বিনিময়ে শ্রম ক্রয় করে। এই শ্রম বাজারেও পাওয়া যায়। দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। একজন শ্রমিক সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪–৫টা পর্যন্ত শ্রম দেয়।

অধ্যাপক আরেফিন (১৯৯৪) দেখিয়েছেন শিমুলিয়াতে তৎকালে শতকরা ৯০ জন কৃষি মজুরই অস্থানীয়। এরা সবাই মৌসুমী অভিপ্রয়ানকারী বা নিঃসম্বল মজুর। ফলে গ্রামবাসী, বিশেষ করে ধনী কৃষকরা প্রধানত বাইরের মজুরদের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে, প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০-এর আগে শিমুলিয়াতে মুক্ত মজুরের উদ্ভব ঘটেনি। সেখানে ১৯৫০ এর দিকে মিলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় মুক্ত মজুর শ্রমিকের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। জামদানি শিল্পের অবলুপ্তির কারণে বেকার হয়ে পড়াদের মধ্যে যারা মিলকারখানায় কাজ পায়নি তারা গ্রামের কৃষি মজুর হিসেবে কাজ করার চেয়ে গ্রামের বাইরে কুলি বা মাটি কাটা ইত্যাদি কাজকে পেশা বেছে নেয়। কেননা কৃষির চেয়ে এসব কাজের মজুরি বেশি। শিমুলিয়ার সাথে তিনটি রাখাইন গ্রামের পার্থক্য হলো শিমুলিয়াতে ষাটের দশকের পর থেকে মুক্ত মজুর শ্রমিকের প্রাপ্তি শুরু হয়। সেক্ষেত্রে আদিবাসী রাখাইনদের মধ্যে ব্যাপক অর্থে মুক্ত মজুর শ্রমিক পেশাজীবির উদ্ভব হয়নি। রাখাইনরা এখনো পর্যন্ত মুক্ত মজুর শ্রমের জন্য প্রতিবেশি বাঙালি মুসলমানদের উপর নির্ভরশীল। অতীতে প্রত্যেক রাখাইন নিজের জমি নিজে চাষ করতো, প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে শ্রমবিনিময় করতো। সেজন্য মুক্ত শ্রমেরও প্রয়োজন হতো না। আর যেহেতু শ্রম বিক্রি পেশাকে তারা অসম্মানজনক মনে করে সেজন্য নিজেদের মধ্যে শ্রমজীবি তৈরি হয়নি। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ সালে মাঠ গবেষণাকালে তিনটি গ্রামের ৮৪ জন পেশাজীবির মধ্যে কেবল ১ জনকে মুক্ত শ্রমিক হিসেবে এবং আরো ১ জনের ২য় পেশা হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখা গেছে, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকায় বদলার দুটি ধরন পরিলক্ষিতহয়। যথা : আপ-খোরাকি ও খোরাকি। আপ-খোরাকি বদলা বলতে দিন মজুর বা মুক্ত শ্রমিককে দুপুরের খাওয়া দেওয়া হয় এবং নগদে ২৫০ টাকা দেওয়া হয়। শ্রমিক সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত কাজ করেন। খোরাকি বলতে মুক্ত শ্রমিককে কোনো প্রকার খাওয়া দেওয়া হয় না। কেবল নগদ ৩০০ টাকা দেওয়া হয়। কাজের সময়সীমা একই। নিম্নের ২৯ নং সারণিতে ১৯৭০-২০১০ সাল পর্যন্ত বদলা বা দৈনিকভিত্তিক শ্রমের মূল্য তুলে ধরা হলো।

সারণি : ৭.৪০

১৯৭০-২০১০ সাল পর্যন্ত গ্রামের বদলা বা দৈনিক ভিত্তিক উন্মুক্ত মজুর শ্রমের মূল্য

সাল	বদলা বা দৈনিক মজুরের শ্রমমূল্য (টাকা)	
	আপ-খোরাকি	খোরাকি
১৯৭০	২০	২৫
১৯৮০	৪০	৫০
১৯৯০	৮০	১০০
২০০০	১৫০	২০০
২০১০	২৫০	৩০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মার্চ ২০১৮

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় ১৯৭০ সালে নগদ ২০ টাকা ও এক বেলা খাওয়া দিয়ে আপ-খারাকি বদলা এবং কোনোপ্রকার খাওয়া ব্যতীত কেবল নগদ ২৫ টাকায় খোরাকি বদলা পাওয়া যেত। ১৯৮০ সালে বদলার মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৪০ ও ৫০ টাকা দাঁড়ায়। এখানে শ্রমমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ টাকা ও খোরাকি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ টাকা। ১৯৯০ সালে বদলার মূল্য আরো বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ১০০ টাকা দাঁড়ায়। ২০০০ সালে বদলার মূল্য যথাক্রমে ১৫০ ও ২০০ টাকা। ২০১০ সালে আপ-খোরাকির মূল্য ২৫০ ও খোরাকির মূল্য ৩০০ টাকা। দেখা যাচ্ছে, শেষের দুই দশকে বদলার মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ আগের দশকগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। দেশের সার্বিক জাতীয় অর্থনীতির প্রতিফলন এখানে লক্ষ্য করা যায়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও সার্বিক জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে বদলার মূল্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই আপ-খোরাকি ও খোরাকি বদলা মূলত বাঙালি মুসলমান। রাখাইনদের কাছে বদলা অসম্মানজনক পেশা। সেজন্য তাদের মধ্যে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাউকে বদলা পেশাকে জীবিকানির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে দেখা যায় না।

তবে দলগত আলোচনা থেকে মাত্র ১জনকে এ-ধরনের কাজে যুক্ত থাকার কথা জানা যায়, তাও অনিয়মিত।

৭.১৩ গ্রামে কৃষি যান্ত্রিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উপকরণের ব্যবহারের প্রভাব

গত শতকের আশির দশক ও নব্বই দশকে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর চিরায়ত কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণসহ প্রতিটি স্তরেই এ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে কৃষি কাঠামো নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। বার্টুচি (১৯৭০) দেখান যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবি এবং উঁচু ও মধ্যবিত্তের শোষণে নিম্নবিত্তরা ভূমিহীনে পরিণত হয়। ওয়েস্টারগার্ড (১৯৮০) বগুড়া জেলার শেরপুরের বরিন গ্রামে গবেষণা করে দেখান, গ্রামাঞ্চলে ধনীতন্ত্রী কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটেনি এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া হলো 'নিঃস্বভবন' প্রক্রিয়া। বি. কে. জাহাঙ্গীর (১৯৯৩) কৃষক সমাজের পৃথকীকরণ, মেরুকরণ ও বিরোধের প্রক্রিয়া চিহ্নিত করেন। তৎকালীন সবুজ বিপ্লব কিভাবে শ্রেণি বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে তা নির্দেশ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে জমির উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ অসম। জমি পরিণত হয়েছে পণ্যে। অল্প সংখ্যক কৃষক ধনী, অধিকাংশই দরিদ্র। কৃষিজ উদ্বৃত্তে মূলধন পুঞ্জিভূত হয়, যার কিছু অংশ কৃষি বহির্ভূত খাতে বিনিয়োগ হয়। তাঁর মতে, এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে ঔপনিবেশিক মূলধন গঠনকে কেন্দ্র করে। অধ্যাপক আরেফিন (১৯৯৪) দেখিয়েছেন, শিমুলিয়াতে সার্বিকভাবে শহর থেকে বিনিয়োগের কারণেই কৃষি সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটেছে। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ধনী ও দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে মেরুকরণের সৃষ্টি হয়েছে। নব্য আবির্ভূত ধনী কৃষকেরা উদ্যোগী ব্যবসায়িক আচরণে মণ্ডিত। তারা কৃষিকে বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসেবে মনে করে। অধিকন্তু, বৈদেশিক মুদ্রা জমির উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলছে, দরিদ্র কৃষকরা অলাভজনক হওয়ার কারণে তাদের জমি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। তাঁর মতে, সামগ্রিক পরিবর্তন নির্দেশ করে যে, শিমুলিয়া গ্রামটি পরিশেষে তার নিজস্ব পরিচিতি হারাবে।

গত শতকের ষাটের দশকে গ্রামীণ কৃষি কাঠামোতে সবুজ বিপ্লব খ্যাত পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব গ্রামীণ সমাজের কৃষি ব্যবস্থার চিরায়ত রূপের পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করলেও হাড়িপাড়া মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ার রাখাইন কৃষি কাঠামোতে পরিবর্তনের সূচনা হয় এরও অনেক পরে– নব্বইয়ের দশক থেকে। এই সকল গ্রামের কৃষি উৎপাদনে ততদিন পর্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল না। তাদের অর্থনীতি গোষ্ঠীগতভাবে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী। উৎপাদন পদ্ধতি ছিল প্রাচীন যা পারস্পরিক সহায়তাপুষ্ট। কৃষকরা বাজার থেকে কোনো প্রযুক্তি বা কৃষি উপকরণ ক্রয় করতো না।

কৃষি উপকরণ যেমন বীজ, কীটনাশক, সেচ ব্যবস্থার প্রযুক্তি তারা নিজ গৃহ থেকে সংগ্রহ করতো। ধনী কৃষকরা ফসল রোয়া থেকে শুরু করে ফসল মাড়াই পর্যন্ত সমুদয় কাজের জন্য চুক্তিভিত্তিতে বাইরের মৌসুমী শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে চাষাবাদ করাতো। পারিশ্রমিক হিসেবে চুক্তি অনুযায়ী তাদের ধান দিত। অন্য কৃষকরা নিজেরা নিজেদের জমি চাষ করতো। তাদের মধ্যে শ্রম বিনিময়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। নব্বই দশক থেকে তাদের কৃষি কাঠামোতে আধুনিক প্রযুক্তির আংশিক বিস্তার ঘটতে থাকে। ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসতে শুরু করে। আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ফলে বাজারের সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপিত হতে থাকে। বাজার থেকে তারা যান্ত্রিক প্রযুক্তি গ্রহণ না করলেও রাসায়নিক প্রযুক্তি গ্রহণ শুরু করে। অবশ্য ধনী কৃষকরা অল্প-বিস্তর যান্ত্রিক প্রযুক্তিও গ্রহণ শুরু করে। যেমন মধুপাড়ার রাখাইন ভূস্বামীর চাষের জন্য নিজস্ব একটি ছোট ট্রাক্টর (পাওয়ারটিলার) আছে।

কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার গ্রাম তিনটির রাখাইন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন ধরনের সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে। রাসায়নিক প্রযুক্তি যেমন সার, বীজ, কীটনাশক সংগ্রহের জন্য বাজারের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। পূর্বে প্রাকৃতিক সার, বীজ, কীটনাশক তৈরি ও সংরক্ষিত হতো গৃহে। কৃষি উপকরণ ব্যয় ছিল না। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। ফলে কৃষকরা উৎপাদন ব্যয় উঠিয়ে আনার জন্য অধিক অর্থ উপার্জনের প্রয়াসে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন শুরু করে। তাদের উৎপাদিত ফসল কেনার জন্য গ্রামে পাইকাররা উপস্থিত হয়। তারাও কেবল গ্রামের বাজারে নয়, বিক্রির জন্য বিভিন্ন স্থানে নিতে থাকে।

পরিবর্তিত কৃষি ব্যবস্থায় গৃহস্থালী শ্রমের গুরুত্ব হ্রাস পায়। অথচ রাখাইনদের চিরায়ত কৃষি ব্যবস্থায় গৃহস্থালীর নারী শ্রমের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কৃষি উপকরণ বীজ, সার, কীটনাশক প্রস্তুতে সার্বিকভাবে যুক্ত ছিল নারীরা। নারী শ্রম প্রসঙ্গে মুস্তাফা মজিদ (১৯৯২) জানিয়েছেন, অতীতে দুধের শিশুকে বুকে বেঁধে রাখাইন নারীদের সচরাচর মাঠের কৃষি কাজে দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে রাখাইন নারীদের মাঠের কাজে দেখা যায় না। এ-সম্পর্কে দলগত আলাপ-আলোচনাকালে জানা যায় যে, বাঙালি মেয়েরা মাঠে কৃষি কাজ করে না। এর প্রভাব পড়েছে রাখাইন সমাজে। আবার রাখাইন মেয়েরা মাঠে কর্মরত থাকাকালে বাঙালি পুরুষরা তাদের দিকে অহেতুক এক নজরে তাকিয়ে থাকতো। যেহেতুরাখাইন নারীরা ঐতিহ্যগত স্বল্পবসনে থাকে তাই তারা বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। উপরন্তু মাঠের নির্জন পরিবেশে কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে থাকে। এ সমস্ত কারণে পর্যায়ক্রমে নারীরা মাঠের কৃষি শ্রম থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়। তবে কৃষিতে শ্রম বিনিময়ের প্রথা একবারে উঠে যায়নি। আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য এখনো তাদের মধ্যে স্বল্পমাত্রায় শ্রম বিনিময়

প্রথা প্রচলিত আছে। পারস্পরিক শ্রম বিনিময়ের প্রচলিত প্রথাকে পরিত্যাগ করে বাইরে থেকে শ্রমিক নিয়োগ করছে। নিম্নের কেস স্টাডি থেকে একজন রাখাইন কৃষকের মিশ্র কৃষি পদ্ধতি অবলম্বনের চিত্র পাওয়া যায়। এই কেস স্টাডির মাধ্যমে রাখাইন গ্রামসমূহের সনাতনী কৃষি ব্যবস্থায় সাধিত পরিবর্তন অনুধাবন করা যাবে।যেমন কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষকের জমি বন্ধক ও পত্তন নেওয়া, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণ হিসেবে লাঙল-গরু-মইয়ের পাশাপাশি পাওয়ারটিলার ও ধান মাড়াইকলের ব্যবহার, স্থানীয় বীজের পাশাপাশি উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার, অধিক ফলনের জন্য উন্নত সার ব্যবহার, পোকমাকড় মারার জন্য কীটনাশক ব্যবহার, জমিতে শ্রম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈটিয়াল শ্রমের পাশাপাশি বদলা বা মুক্ত শ্রমিক নিয়োগ এবং উৎপাদিত শস্যের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে এই কেস-স্টাডি থেকে জানা যাবে।

কেস-স্টাডি৮ : মিশ্র পদ্ধতির সমন্বয়ক কৃষক মহেন চিং মাতবর

মহেন চিং মাতবর হাড়িপাড়ার একজন স্বচ্ছল ভূমিহীন দক্ষ কৃষক। প্রতিবছর তিনি বিভিন্নভাবে সংগৃহীত কয়েক কানি জমি বিভিন্ন ব্যবস্থায় চাষ করেন। ২০১৭ সালে তিনি মোট ২ কানি জমি চাষ করেন। এর মধ্যে ১ কানি বন্ধকি জমি। এক সনা চুক্তিতে বন্ধক রেখেছেন ৪০,০০০ টাকায়। জমির মালিক কলাপাড়া শহরে থাকেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। তিনি কৃষিতে অনুপস্থিত জমির মালিক। এই জমি তার বাবা মহেন চিং মাতবরের দাদার কাছ থেকে ক্রয় করেন ষাটের দশকে। সেই যোগসূত্রে মহেন চিংয়ের বাবা দীর্ঘদিন এই জমি বর্গা নিয়ে চাষ করেছেন। বর্তমানে তিনি বার্ধক্যগত কারণে কাজকর্ম করেন না। কিন্তু জমির মালিক বর্তমানে জমি বর্গা না দিয়ে বন্ধক দিতে রাজি হয়। সেজন্য জমির মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী মহেন চিং জমি বন্ধক নেন। কেননা গ্রামে জমির চাহিদা খুব বেশি থাকায় জমি পাওয়া দুষ্কর। পুরোনো সম্পর্কের কারণেই তিনি এই জমি পান। মহেন চিং মাতবর কয়েক বছর ধরে বন্ধক নিয়ে চাষ করছেন। প্রতি বছর বন্ধক নবায়ন (মৌখিক) করতে হয় বা নতুনভাবে টাকা পরিশোধ করে বন্ধক নিতে হয়।

মহেন চিং এক সনা বর্গা চুক্তিতে জমি নেন ১ কানি। এই বর্গা জমি তেভাগা চুক্তিতে গৃহীত। অর্থাৎ উৎপাদিত ধানের তিন ভাগের দুই ভাগ জমির মালিকের। এই জমির মালিকও কৃষিতে অনুপস্থিত। তিনি ব্যবসায়ী। কলাপাড়া উপশহরে থাকেন। মহেন চিং একজন দক্ষ কৃষক। তার কাছ থেকে মালিক আশানুরূপ ফসল পায় বলে তাকে জমি বর্গা দেয়। গ্রামে এখন বর্গা চাষের জন্য জমি পাওয়া যায় না। এর কারণ হলো ফসলি জমির পরিমাণ কমে যাওয়া। ফলে বর্গা পাওয়ার জন্য গ্রামে

প্রতিযোগিতা আছে। আবার জমির মালিকরা প্রয়োজনের তাগিদে নিজেরা শ্রমিক দিয়ে চাষ করাচ্ছেন।

মহেন চিং ধান রোয়ার জন্য ৪ জন শ্রমিক নিযুক্ত করেন। এদের ২ জন রাখাইন ও ২ জন বাঙালি মুসলমান। এই ৪ জনকে তিনি বৈটিয়াল শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ তারা এক ফলন বা এক মৌসুমের জন্য মহেন চিং মাতবরের ৪ কানি কৃষি জমি চাষের লক্ষ্যে জমি প্রস্তুত করা এবং বীজ রোপণ করা পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ। এজন্য প্রত্যেকে ১০,০০০ টাকা করে পাবেন। অর্থাৎ ২ কানি জমিতে ধান রোপণ পর্যন্ত কৃষক মহেন চিংয়ের শ্রমিক বাবদ খরচ ১০,০০০×২= ২০,০০০ টাকা। অতীতে বৈটিয়াল শ্রমিক নিযুক্ত হতো জমি প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে ধান মাড়াই করে তা গোলায় তোলা পর্যন্ত কৃষির যাবতীয় কাজ করার জন্য। কিন্তু বর্তমানে পুরো মৌসুমের জন্য বৈটিয়াল পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে আংশিক কাজের জন্য স্বল্প সময়ের নিমিত্ত বৈটিয়াল নিযুক্ত করে। জমি চাষের ক্ষেত্রে তিনি পুরাতন ও আধুনিক উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। যেমন দেড় কানি জমি চাষ করেন ট্রাক্টর দিয়ে। এজন্য কানি প্রতি ৫০০০ টাকা হিসেবে মোট ৭,৫০০ টাকা ট্রাক্টর ভাড়া বাবদ পরিশোধ করতে হয়। খরচ বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য অবশিষ্ট আড়াই কানি জমি পুরাতন পদ্ধতি লাঙল-গরু-শ্রমিক দিয়ে চাষ করান। তার নিজস্ব গরু ও লাঙল আছে। এ বাবদ তার কোনো খরচ হয়নি।

মহেন চিং ভালো ফলন প্রাপ্তির লক্ষ্যে এই ২ কানি জমিতে প্রতি বস্তা ১,৩০০ টাকা দরে ৮ বস্তা ইউরিয়া সার, ১,৬০০ টাকা দরে ৪ বস্তা টিএসপি সার এবং ১,৪৫০ টাকা দরে ১ বস্তা এমপি (লাল) সার ব্যবহার করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সার সম্পর্কিত মাঠ গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে মহেন মাতবরের দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধানের চারা একটু বড় হওয়ার পর জমিতে সার দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কৃষি মৌসুমে প্রতি বছর বাংলাদেশে সারের সংকট দেখা দেয়। দাম বেশি দিয়েও কৃষকরা প্রয়োজনীয় পরিমাণে সার পায় না। এই চাপ সামাল দিতে স্থানীয় প্রশাসন ও কৃষি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের তৎপর থাকতে দেখা যায়। কৃষকরা লাইন ধরে সারাদিন রোদের মধ্যে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে প্রয়োজনের অর্ধেক সারও পায় না। কলাপাড়া শহরের স্থানীয় ডিলার তার দোকানের সামনে প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কৃষি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রত্যেক কৃষককে অল্প-স্বল্প করে সার দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়।সার সংকট সম্পর্কে গবেষণাধীন ছোট বালিয়াতলী ব্লক সুপারভাইজার জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলামের সাথে আলাপ করে জানতে পারি যে, সরকার থেকে ডিলারদের অনুকূলে কিস্তিতে বা কয়েক দফায় সার বরাদ্দ দেওয়া হয়। কৃষকরা আগপিছ করে চারা না রোপণ করে বরং প্রায় একই সময়ে রোপণ করে। ফলে একই সময়ে তাদের সারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এক কিস্তিতে বরাদ্দের বেশি সার ডিলারদের উত্তোলনের সুযোগ নেই। ফলে সারের সংকট দেখা

Dhaka University Institutional Repository

দেয়। ব্লক সুপারভাইজার আরো জানান যে, এছাড়াও পূর্ববর্তী কিস্তিতে ডিলাররা বরাদ্দের তুলনায় কম সার উত্তোলন করে। কেননা তখন কৃষকদের সারের দরকার হয় না। ফলে কম বিক্রি হয়। এজন্য তারা বরাদ্দ অপেক্ষা কম সার তোলে। এটিও সার সংকটের অন্যতম কারণ। তবে মহেং মাতবর আগের মাসেই টাকা ম্যানেজ করে স্থানীয় বালিয়াতলী বাজার থেকে ১০ বস্তা সার কিনে রাখেন, তখন সারের সংকট ছিল না। এই সচেতনতার জন্য তিনি এলাকায় একজন দক্ষ কৃষক হিসেবে সুপরিচিত। তিনি ২ কানি জমির ধান কাটা ও ধান মাড়াইয়ের জন্য১ জন রাখাইন নিযুক্ত করেন এই চুক্তিতে যে, ২ কানি জমির উৎপাদিত ধানের ৯ ভাগের ১ ভাগ ধান তিনি পাবেন। ধান মাড়াইয়ের জন্য আধুনিককালের ধান মাড়াই কল ব্যবহার করা হয়।

দেখা যাচ্ছে, মহেন চিং একই সাথে বন্ধকি জমি ও বর্গা জমি চাষ করছেন। তিনি যেমন আধুনিক প্রযুক্তি কৃষিতে প্রয়োগ করছেন তেমনি পুরাতন পদ্ধতিও ব্যবহার করছেন। যেমন জমি চাষের জন্য ট্রাক্টর ব্যবহার করছেন আবার লাঙল-গরুও ব্যবহার করছেন। তিনি একই সাথে বৈটিয়াল ও বদলা বা দিন মজুর শ্রমিক নিয়োগ দিচ্ছেন এবং উৎপাদিত ফসলের নয় ভাগের এক ভাগ দেওয়ার সত্ত্বেও শ্রমিক নিয়োগ দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে তার কৃষিতে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী সনাতন বা পুরাতন পদ্ধতি আশ্রয়ের তথ্য পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে কৃষি খরচ বেড়ে যাওয়ায় পত্তায় পোষায় না বলে ভবিষ্যতে তিনি চাষ করবেন না বলে জানান।

সারণি : ৭.৪১

এক নজরে কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন

দাদার আমল	বাবার আমল	উত্তরদাতার কাল	মন্তব্য
প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষি কাজ।	প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষি কাজ।	প্রাচীন ও আধুনিক পদ্ধতির সমন্বয়সাধন।	খরচ বৃদ্ধি পাওয়া ও উৎপাদন কম হওয়ায় তারা কৃষিবিমুখ হচ্ছেন।

৭.১৪ রাখাইনদের পেশা

ভূমি মালিকানা উপাত্ত থেকে বোঝা যায় যে, গবেষণা এলাকার অধিকাংশ রাখাইন দরিদ্র। কৃষিভিত্তিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং কৃষিকাজ একমাত্র ও প্রধান জীবিকা হওয়া সত্ত্বেও কৃষি ব্যবস্থায় বর্তমানে পুরো বছরের কর্মসংস্থান না হওয়ার কারণে জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য কর্মসংস্থান অবলম্বন করতে হচ্ছে। তাদেরকে বাইরের কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দিতে হচ্ছে। অথচ রাখাইনরা সংস্কার বিমুখ, ঐতিহ্যপ্রিয়, নতুন কোন পেশা গ্রহণে অনিচ্ছুক ও সনাতনি পেশার ধারক। দীর্ঘকাল তারা কায়ক্লেশে জীবনযাপন করলেও পেশা পরিবর্তন করেনি (মজিদ, ১৯৯২; খান, ২০০৬)। কিন্তু পুরাতন পেশার উপর নির্ভর করে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ধীরে ধীরে গ্রামবাসীদের বেঁচে থাকার জন্য

কৃষিভিন্ন নতুন নতুন কর্মসংস্থানের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রজন্ম নতুন নতুন পেশা গ্রহণ করে খাপ খাওয়াতে সচেষ্ট। নিম্নের সারণিতে উত্তরদাতাদের পেশার ধরন তুলে ধরা হলো।

]সারণি– ৭.৪২

রাখাইন গৃহস্থালী প্রধানদের পেশা

ক্রমিক	পেশার ধরন		গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	পেশা - ১	পেশা - ২	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
১	কৃষি	-	৫	২	১	৮	২৭.৫৯
২	কাঠমিস্ত্রি	-	১	১	-	২	৬.৯০
৩	কবিরাজি	-	১	-	-	১	৩.৪৫
৪	ছোট ব্যবসা	-	১	-	-	১	৩.৪৫
৫	দোকানদারি	-	১	-	-	১	৩.৪৫
৬	মাছ ধরা	-	-	৩	২	৫	১৭.২৪
৭	ধর্মগুরু	-	-		১	১	৩.৪৫
৮	কৃষি	মাছধরা	২	১	১	৪	১৩.৭৯
৯	কৃষি	মাছ চাষ*	-	১	-	১	৩.৪৫
১০	কৃষি	দোকান	১	-	-	১	৩.৪৫
১১	কৃষি	মাছব্যবসা	১	-	-	১	৩.৪৫
১২	নির্ভরশীল	-	১	১	১	৩	১০.৩৪
			১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮। * বাড়ির পুকুরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মাছ চাষ।

উপর্যুক্ত সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বর্তমানে গৃহস্থালী প্রধানদের মধ্যে মাত্র মাত্র ৮ জন অর্থাৎ ২৭.৫৯% কৃষিতে নিযুক্ত, ৫ জন অর্থাৎ ১৭.২৪% মাছ ধরার কাজে সংযুক্ত। এছাড়া ২ জন কাঠমিস্ত্রি, ১ জন করে যথাক্রমে কবিরাজি, ছোট ব্যবসা, দোকানদারি কাজে নিযুক্ত। তাদের কেউ কেউ দ্বৈত পেশায় নিযুক্ত। যেমন ৪ জন কৃষি ও মাছ ধরা এবং ১ জন করে যথাক্রমে কৃষি ও মাছ চাষ, কৃষি ও দোকান, কৃষি ও মাছ ব্যবসার মতো দ্বৈত পেশায় নিযুক্ত। উপরন্তু তিনটি গ্রামের প্রত্যেকটিতে ১ জন করে মোট ৩ জন নির্ভরশীল পরিবার প্রধান যাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রায় শতভাগ কৃষিনির্ভরশীল জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও ২৯ জনের মধ্যে মাত্র ৮ জন একমাত্র অপার্জন উৎস হিসেবে কৃষি কাজ করছেন। বাকিরা নানান পেশায় নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন। সুতরাং, পেশার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য মাত্রায় কৃষি থেকে অকৃষি খাতে শ্রম স্থানান্তর ঘটেছে। অতীতে দুর্যোগকালেও ভিন্ন পেশা না গ্রহণ করায় তারা নিঃস্ব-রিক্ত হয়েছে, অনন্যোপায় হয়ে অনেকে দেশ ত্যাগ করেছে, কিন্তু পেশা পরিবর্তন করে টিকে থাকার চেষ্টা করেনি (মজিদ, ১৯৯২)। তবে বর্তমানে টিকে টাকার প্রচেষ্টায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে, স্বজাতির পুরানো সংস্কার ছেড়ে নানান

Dhaka University Institutional Repository

পেশা গ্রহণ করছে।পেশার এই পরিবর্তন অভিভাবক বা উত্তরদাতাদের চেয়ে বর্তমান প্রজন্মের রাখাইনদের মধ্যে বেশি ঘটেছে। সারণি ৭.৪৩ থেকে দেখা যায়, গবেষণা এলাকার অনেক রাখাইন অধিবাসী তাদের পূর্বপুরুষের আদি পেশা কৃষিকাজ ছেড়ে বর্তমানে নতুন নতুন নানারকম পেশায় নিয়োজিত, যা এককালে প্রায় অসম্ভব ছিল। তিনটি গ্রামের মোট জনসংখ্যা ১৩১ জনের মধ্যে ৬২ জন অর্থাৎ ৬১.৮৩% কোন না কোন কর্মে সম্পৃক্ত। এই ৬২ জন পেশাজীবির মধ্যে মাত্র ১০ জন অর্থাৎ ৭.৬৩% কৃষি কাজে নিয়োজিত। এছাড়া আরো ৮(৫.১১%) জনের প্রধান পেশা কৃষি, যাদের পাশাপাশি বিভিন্নরকমের দ্বিতীয় পেশা আছে। অর্থাৎ ২৬.১৮% কর্মজীবী পুরুষ কৃষি কাজে নিয়োজিত। বাকি ৪৭.৬৪% অকৃষি পেশায় নিয়োজিত আছে। ৫৩ জন সদস্য অর্থাৎ ৪০.৪৫% নির্ভরশীল। কর্মক্ষম বেকার ৮ জন অর্থাৎ ৬% । গবেষণা এলাকায় ৬২ জন পেশাজীবীর মধ্যে ৫ জন অর্থাৎ ৩.০৫% দোকানদারি পেশায় নিয়োজিত। মূলত তাদের মুদির দোকান এবং উক্ত দোকান নিজেদের পাড়ায় অবস্থিত বিধায় এগুলোর ব্যবসায়িক পরিধি খুবই সীমিত। তবে পাকা রাস্তার পাশে হওয়ায় পথচারীদের অনেকে জিনিস খরিদ করে। এরমধ্যে পান, সিগারেট, বিস্কুট, কোমল পানীয় উল্লেখযোগ্য। তবে তুলাতুলি পাড়ার একটি দোকান বেশ বড় এবং অনেক মালামাল আছে। হাড়িপাড়ার একজন দোকানদার সুপারি পাইকারি কিনে তা কেটে পাইকারি দরে স্থানীয় বাজারের একটি দোকানে সরবরাহ করে। এছাড়াও গ্রামসমূহে ২ জন কাঠমিস্ত্রি, ১ জন কবিরাজ, ১ জন শিক্ষক, ২ জন চাকুরে, ১ জন দিনমজুর, ১ জন ব্যবসায়ী, ১ জন ধর্মগুরু ও ১ জন সেবক আছে। গ্রামে ৬.১১% লোক তাঁত চালান। অতীতে প্রতিটি পরিবারে তাঁতকল ছিল। বর্তমানে তাঁত শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ায় অনেকে পিতৃপুরুষের এই ঐতিহ্যবাহী পেশা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। নিম্নের সারণি রাখাইনদের পেশা পরিবর্তন অনুধাবনে সহায়ক হবে।

সারণি- ৭.৪৩

রাখাইন গৃহস্থালী সদস্যদের পেশা

ক্রম	পেশার ধরন		গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	পেশা- ১	পেশা- ২	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
১	কৃষি	-	৭	২	১	১০	৭.৬৩
২	কাঠমিস্ত্রি	-	১	১	-	২	১.৫৩
৩	কবিরাজি	-	১	-	-	১	০.৭৬
৪	ছোট ব্যবসা	-	১	-	১	২	১.৫৩
৫	দোকানদার	-	২	-	২	৪	৩.০৫
৬	মাছ ধরা	-	২	৪	২	৮	৬.১১
৭	ধর্মগুরু	-	-		১	১	০.৭৬

৮	সেবক	-	-	-	২	২	১.৫৩
৯	চাকরি	-	-	২	-	২	১.৫৩
১০	তাঁতকাজ		১	১	-	২	১.৫৩
১১	মাছব্যবসা	-	২	-	-	২	১.৫৩
১২	দর্জি	-	২	-	-	২	১.৫৩
১৩	গার্মেন্টশ্রমিক	-	-	২	-	২	১.৫৩
১৪	শিক্ষকতা	-	১	-	-	১	০.৭৬
১৫	দিনমজুর	-	-	১	-	১	০.৭৬
১৬	বাইকচালক	-	২	-	-	২	১.৫৩
১৭	গৃহিণী	-	১১	৬	২	১৯	১৪.৫০
১৮	কৃষি	মাছধরা	২	২	১	৫	৩.৮২
১৯	কৃষি	মাছ চাষ	-	১	-	১	০.৭৬
২০	কৃষি	দোকান	১	-	-	১	০.৭৬
২১	কৃষি	মাছব্যবসা	১	-	-	১	০.৭৬
২২	শিক্ষকতা	দর্জি	-	১	-	১	০.৭৬
২৩	কাঠমিস্ত্রি	দিনমজুর	২	১	-	৩	২.২৯
২৪	গৃহিণী	তাঁত	২	২	২	৬	৪.৫৮
২৫	বেকার	-	২	২	৫	৯	৬.৮৭
২৬	শিক্ষালয়গামী	-	১০	১০	৮	২৮	২১.৩৭
২৭	নির্ভরশীল	-	৩	৭	৩	১৩	৯.৯২
			৫৬	**৪৫**	**৩০**	**১৩১**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮ (মাসব্যাপী সংগৃহীত তথ্য)

রাখাইনদের মধ্যে শ্রমজীবী শ্রেণির অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও তা অনুল্লেখযোগ্য। কেবল ১ জনকে মজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখা যায়। তিনি অন্যের কৃষি জমিতে টাকার বিনিময়ে চাষাবাদের কাজে শ্রম দিয়ে থাকেন। সাধারণত জমিতে সকাল ৮.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত শ্রম দিতে হয়। এজন্য একদিনের পারিশ্রমিক বাবদ ৩৫০ টাকা পান। অতীতে শ্রমিকের কাজ কেবল নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে বর্তমানে নিজ সম্প্রদায়ের বাইরেও টাকার বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করে। অতীতে এ অঞ্চলে বাঙালি বসতি গড়ে ওঠার আগে কৃষিকাজে নিয়োজিত অধিকাংশ শ্রমিক ছিল বহিরাগত। তারা মৌসুমী শ্রমিক হিসেবে ফসলের মৌসুমে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে এ-এলাকায় এসে কৃষি শ্রমিকের কাজ করত। তখন প্রত্যেক রাখাইনের কৃষি জমি ছিল। প্রয়োজনের তাগিদে প্রত্যেককে কৃষি কাজ করতে হতো এবং নিজেরা নিজেদের জমি চাষ করত। ফলে অধিক জমির মালিকদের বহিরাগত শ্রমিক নিযুক্ত করতে হতো। বর্তমানে স্থানীয় প্রতিবেশিদের মধ্যে শ্রমিক পাওয়া যায়। তবে গবেষণা এলাকায় কোনো মহিলা শ্রমিক পাওয়া যায়নি।

৬২ জন পেশাজীবী রাখাইনের মধ্যে ১৮ জনকে দ্বৈত পেশা গ্রহণ করতে দেখা গেছে। এদের মধ্যে ৫ জনের ১ম পেশা কৃষি ও ২য় পেশা ধীবর, ৪ জনের ১ম পেশা ধীবর ও ২য় পেশা কৃষি, ৫ জনের ১ম পেশা গৃহিণী এবং এদের মধ্যে ৪ জনের ২য় পেশা তাঁতি ও ১ জনের দর্জি, ২ জনের ১ম পেশা কৃষি ও ২য় পেশা যথাক্রমে দোকানদারি ও ব্যবসা, ১ জনের ১ম পেশা শিক্ষকতা ও ২য় পেশা দর্জি। হাড়িপাড়ার নিপু মাতবর বছর দশেক আগে ঢাকায় মহাখালির নিউ ডিওএইচএস এলাকায় একটি গার্মেন্টেসে বাইং হাইজে চাকুরি করতেন। কয়েক বছর চাকুরি করার পর তিনি উক্ত চাকুরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে এসে প্রথমে অন্যের জমি লিজ নিয়ে ঘের (মাছের চাষ) করেন। কিন্তু ব্যবসা লাভজনক না হওয়ায় তিনি ঐ ঘের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে মাছ ধরার কাজ শুরু করেন ও পাশাপাশি কৃষি কাজও করেন। মূলত নিপু মাতবর মৌসুমী জেলে। ভাল মাছ পড়ার মৌসুমে বিশেষ করে বর্ষাকালে সমুদ্রে মাছ ধরতে যান।

গবেষণা এলাকায় ১৯ জন নারী অর্থাৎ জনসংখ্যার ১৪.৫০% গৃহিণী হিসেবে সংসারের কাজে নিয়োজিত। গৃহিণীরা শিশুদের লালন-পালন, রান্নাবান্না, গবাদি পশু পালন করে। রাখাইন নারীরা সারাদিন কর্ম তৎপর থাকে। সংসারের নানান কাজসহ ক্ষেতের ফসল বাড়িতে আনার পর প্রক্রিয়াকরণের সকল কাজ করে। তারা বাড়ির আশেপাশে শাক-সবজির চাষও করে। তবে তাদের শ্রম অর্থমূল্যে বিবেচিত হয় না। রাখাইন নারীদের কর্ম তৎপরতা থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, অতীতে রাখাইন সমাজ মাতৃপ্রধান ছিল। এ প্রথা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। তবে তার সাক্ষ্য এখনও তাদের জীবনধারার মধ্যে দেখা যায়। অতীতে প্রত্যেক রাখাইন পরিবারে প্রত্যেক বয়স্ক মেয়ে তাঁত বুনতো। ঐতিহ্যগতভাবেই রাখাইন মেয়েরা গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি আদিকাল থেকে এই কাজ করে আসছে। গৃহস্থালীর কাজ ছাড়াও ক্ষেত-খামারের কাজে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করত। বিশেষ করে আউশ-আমন মৌসুমে ক্ষেতের বীজ তোলা, বীজ বপন, এমনকি হাল চাষেও তারা অংশ নিত। কোলে দুধের শিশু কাপড়ে ঝুলিয়ে অনেক রাখাইন নারীকেই হাল ধরতে দেখার দৃশ্য সাধারণ ব্যাপার ছিল। পিয়ারে বেসেইনে, সুভাষ দত্ত, মাবুদ খান, মুস্তাফা মজিদ প্রমুখের গবেষণা থেকে এ-তথ্য পাওয়া যায়। দলগত আলাপকালেও এ তথ্য জানা যায়। কিন্তু পাকিস্তানি আমলে ষাটের দশকের গোড়ার দিক থেকে এ এলাকায় বাঙালিদের উপস্থিতিতে রাখাইন মেয়েদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ সীমিত হতে শুরু হয়। বর্তমানে তারা গৃহিণীর কাজ করে থাকে। পাশাপাশি হাট-বাজারও করে থাকে। মাঠে ফসল উৎপাদনের কোনো কাজ করে না।

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি গ্রামে ৬.১১% মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত থাকতে দেখা গেছে। এ ছাড়াও ৩.৮২% দ্বৈত পেশা হিসেবে ধীবর পেশাকে জীবিকা নির্বাহের উপায় করে নিয়েছে। যদিও খাল-বিল-নদী-সমুদ্রের বিশাল জলরাশি তাদের চারদিক ঘিরে আছে কিন্তু রাখাইনরা অতীতে কখনো ধীবরবৃত্তি গ্রহণ করত না। বিশেষ করে জীবিকার প্রয়োজনে মাছ ধরাকে তারা পেশা হিসেবে নেয়নি। বড়জোর সখ করে কিংবা গৃহস্থালীর নৈমিত্তিক প্রয়োজনে কখনো কখনো তারা মাছ ধরত। তবে, সকল সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ধীবরবৃত্তি গ্রহণে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। এ পেশাকে তারা নিকৃষ্ট জনের কাজ মনে করত। এজন্য রাখাইন পরিবারগুলোর মাঝে ভূমিহীনতা ও মারাত্মক বেকার সমস্যা দেখা দেওয়ায় প্রথমদিকে তারা মাছ ব্যবসার সাথে নিজেদের জড়িত করেনি। বর্তমানে বাস্তব জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে কেউ কেউ সেই ঐতিহ্য থেকে সরে এসে মাছ ধরার পেশায় নিজেদের যুক্ত করেছে। মাছ ধরার ভালো সময় হলো অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এ সময় সমুদ্রে পানি কম থাকে। মার্চ মাসে ভালো মাছ ধরা পড়ে। কিন্তু এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাছের অমৌসুম। এ-সময় মাছ ধরা কষ্টকর হয়ে পড়ে। জেলেরা কঠোর পরিশ্রম করেও এ সময় আশানুরূপ মাছ ধরতে পারে না। ফলে জেলে পরিবারগুলোকে বছরের এই সময়ে কষ্টে দিন কাটাতে হয়।সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এক সময়ের কৃষিভিত্তিক জনগোষ্ঠী তাদের পূর্ব পুরুষের আদি পেশা ছেড়ে বিভিন্ন নতুন নতুন পেশা গ্রহণ করছে। এই অকৃষি পেশায় নিয়োজিতদের বেশির ভাগই গ্রামের বাইরে থেকে নগদ অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি– ৭.৪৪
একনজরে রাখাইনদের পেশা পরিবর্তন

দাদার আমল	বাবার আমল	উত্তরদাতার কাল	মন্তব্য
কৃষি, কাঠমিস্ত্রি, কবিরাজি, ধর্মগুরু, সেবক, তাঁতকাজ, শিক্ষকতা, গৃহিণী ইত্যাদি	কৃষি, কাঠমিস্ত্রি, কবিরাজি, ধর্মগুরু, সেবক, তাঁতকাজ, শিক্ষকতা, গৃহিণী ইত্যাদি	কৃষি, কাঠমিস্ত্রি, কবিরাজি, ধর্মগুরু, সেবক, তাঁতকাজ, শিক্ষকতা, গৃহিণী, মাছব্যবসা, দর্জি, ছোট ব্যবসা, দোকানদার, মাছধরা, চাকরি, গার্মেন্টশ্রমিক, দিনমজুর, মোটর বাইকচালক ইত্যাদি।	অন্য গ্রামে ইলেকট্রিক মিস্ত্রির পেশা গ্রহণের তথ্যও জানা যায়।

গ্রামগুলোর মধ্যে কেবল ১.৫৩% এর একক পেশা কাঠমিস্ত্রি। আবার কাঠমিস্ত্রি ও দিনমজুরের মতো দ্বৈত পেশায় নিযুক্ত আছেন মাত্র ২.৫৩%। অথচ গবেষণায় দেখা যায়, অতীতে কারিগরি বিদ্যায় রাখাইনরা পারদর্শি ছিল এবং অনেকে এ পেশায় যুক্ত ছিল। কাঠ ও বেতের দ্বারা তারা ধান ভাঙানোর মতো নানান যন্ত্র ও জিনিসপত্র তৈরি করতো। তাদের বাড়িঘর নির্মাণ কৌশল বেশ উন্নত ছিল। ইমারত নির্মাণ ক্ষেত্রেও ছিল নিজস্ব শৈলী। তারা এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শী ছিল (চাকমা, ২০১৩ : ৪৪২)। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক দৈনতা, রুচির পরিবর্তন ইত্যাদিনানা কারণে এ-ধরনের নির্মাণ শৈলীর প্রয়োগ নেই। তাই এ–ধরনের কারিগরি পেশায় কেউ যুক্ত হচ্ছে না।

দেখা গেছে কৃষির সাথে ঐতিহ্যগত সংযুক্তি, রক্ষণশীল মনোভাব, আধুনিকায়নে অনাগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে রাখাইন গ্রামবাসী গত শতকের নব্বই দশকের পূর্ব পর্যন্ত পেশা পরিবর্তন করেনি। তবে একদিকে বাধ্য হয়ে, অন্যদিকে বাঙালি সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও আন্তঃসাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে তাদের মৌলিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম নব্বই দশকের পর পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়। ভূমি এক সময় তাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। কৃষি কাজের বাইরে কিছু করার প্রয়োজনও পড়েনি। সেই ভূমি কালের পরিক্রমায় বর্তমানে এসে মূল্যবান ও দুর্লভ সম্পদে পরিণত হয়েছে। এই মূল্যবান ও দুর্লভ সম্পদের সহজলভ্যহীনতা রাখাইন গ্রামবাসীদের ভূমি বিযুক্ত পেশায় নিযুক্ত হতে বাধ্য করেছে।

রাখাইন ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প যা রাখাইন নারীরা পরিচালনা করতো তা বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গৃহস্থালী অর্থনীতিতে এই তাঁতশিল্পের বর্তমানে কোনো ভূমিকা নেই। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ভূমিকা রাখছে রাখাইনদের ভূমিহীনতা ও তাঁত শিল্পের বিলুপ্তি। এরফলে তারা

Dhaka University Institutional Repository

নতুন নতুন পেশা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। অন্যান্য পেশার মধ্যে রয়েছে যেমন ধীবর, দোকানদার, কাঠমিস্ত্রি, কবিরাজ, শিক্ষকতা, চাকুরি, দিন মজুর, ব্যবসা, দর্জি, প্রভৃতি। পেশার এই পরিবর্তনের ফলে তাদের সামগ্রিক জীবনে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে একই কথা বলেছেন রাজা দেবাশিষ রায়। তিনি বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপক সংখ্যক আদিবাসী তাদের চিরাচরিত আদি পেশা পরিবর্তনের পথে যা বড় ধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধনে ভূমিকা রাখছে(Roy, 2002)।এর ফলস্বরূপ সামাজিক গোত্রভিত্তিক এবং সম্প্রদায়মুখী আদিবাসী কাঠামোর একটি নতুন সামাজিক কাঠামোতে উত্তরণ ঘটেছে। এই কাঠামো ব্যক্তি অথবা পরিবার কেন্দ্রিক কাঠামো যা শিল্প বিপ্লবের ফলস্বরূপ আবির্ভূত হয়। এই পর্যায়ে তাদের উৎপাদন আস্তে আস্তে বাজার কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে।

এই পরিবর্তন গ্রামসমূহের অনুন্নয়নের স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সহায়ক হচ্ছে। গ্রামের রাখাইন যুবকদের নিয়ক্রিয়তা পরিহার, আত্মসচেতনতার উন্মেষ ও পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গি বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নের অন্তরায়গুলো অপসারিত হচ্ছে। যেমন অতীতে শিক্ষিত যুবকরা চাকুরি করা প্রয়োজন মনে করতো না। তাদের ধারনা ছিল, চাকুরি করা মানে অন্যের হুকুম তামিল করা যা তারা অভ্যস্ত নয়। ধনী পিতা-মাতার ছেলেরা এ-ধরনের চিন্তা পোষণ করতো।এদের অনেকে বাড়িতে বসে জমাজমি ও কৃষি কাজ তদারক করতো। আবার কেউ কেউ ধনী আদুরে কন্যা বিয়ে করে নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতো (খান, ২০০৬: ৪৩)। এই মানসিকতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। একটা বিশেষ আর্থ-সামাজিক নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় তাদের মধ্যে এ ধরনের মানসিকতা বিরাজ করতো। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন জীবনব্যবস্থার সাথে তাদের খাপ খাওয়াতে হচ্ছে এবং সেজন্য পুরাতন ধ্যান-ধারণা পরিহার করে সময়োপযোগী কর্মপন্থা গ্রহণে তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। এরফলে গ্রামসমূহের সামগ্রিক অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসছে এবং তারা দারিদ্রতার চক্র থেকে ক্রমশ নিজেদের মুক্ত করতে সামর্থ হচ্ছে। গবেষক নাজমুন নাহার লাইজু (২০১১) দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়ের লোকজন বর্তমানে ব্যাপক হারে পেশা পরিবর্তন করছেন। তবে সেক্ষেত্রে তাদের অধিকাংশই সামাজিক সম্মানের দিকটি বিবেচনায় নিয়েছেন। আর রাখাইনরা উপায়হীনতার সম্মুখে পিতৃপুরুষের কৃষি পেশাকে ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। রাখাইনদের পেশা পরিবর্তন ও এ-ক্ষেত্রে বাইরের পুঁজির অনুপ্রবেশের একটি কেস-স্টাডি নিম্নে তুলে উপস্থাপন করা হলো।

কেস-স্টাডি৯ : নিপু মাতবরের মাছ ধরার পেশা গ্রহণ ও এক্ষত্রে পুঁজির অনুপ্রবেশ

Dhaka University Institutional Repository

হাড়িপাড়ার নিপু মাতবরের বয়স ৪৮ বছর। স্ত্রী ও এক পুত্র মিলে তার তিন জনের সংসার। স্ত্রীর বয়স ৩৫ ও ছেলের বয়স ১৫ বছর। ছেলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। বর্তমানে তিনি কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। উল্লেখ্য, উপকূলীয় অঞ্চল হওয়ায় সমগ্র পটুয়াখালী এলাকা জুড়ে জেলে সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ঐতিহাসিক পেক্ষাপট খুবই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। অন্যান্য সকল আদিবাসীর মতো এ সম্প্রদায় অনেকটা বাঁচার তাগিদে এ পেশাকে বরণ করে এবং এ পেশায় ক্রমান্বয়ে লোক বাড়তে থাকে। উপকূল অধ্যুষিত এবং নদ-নদী পরিবেষ্টিত হওয়ায় এবং মৎস্য সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িয়ে পড়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় তেমন না থাকায় অনেক লোক এ পেশায় জড়িত হয়। তথাপি গবেষণাধীন গ্রামের রাখাইনদের কাছ থেকে জানা যায়, তারা সুদূর অতীত থেকে এ পেশাকে নিকৃষ্টজনের পেশা হিসেবে জেনে আসছে। ফলে ব্যাপক দরিদ্রতার কবলে পড়ে অনন্যোপায় হয়েও সকল সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তারা এ-কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেনি (মজিদ, ১৯৯২)। আশির দশক পর্যন্ত এ মনোভাব তাদের মধ্যে তীব্রভাবে বহাল থাকে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে এসে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসে। ভূমিহীনতা, কৃষিকাজের সুযোগের অভাব, প্রাচীন কৃষি পদ্ধতিতে আশাতীত অনুৎপাদন, সর্বোপরি বাঁচার তাগিদে পরিবার-পরিজনদের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে শেষ পর্যন্ত তাদের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ছেড়ে দিয়ে কেউ কেউ মাছ ধরাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বর্তমানে তাদের সংখ্যা আরো বেড়েছে। তবে মাছ ধরার তথ্য প্রদানে তাদের মধ্যে এক ধরনের অনুদারতা পরিলক্ষিত হয়। যাই হোক, নিপু মাতবর মাছের ব্যবসাসূত্রে মৌড়ুবির এক গদির (আড়ত) মালিক থেকে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে ১,০০,০০০ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো অল্প কিছু দিন বাদে শুরু হতে যাওয়া অর্থাৎ আসন্ন মাছের মৌসুমে সমুদ্র থেকে ধৃত মাছ ঐ মালিকের আড়তে বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করতে হবে। এই টাকা থেকে দিপু মাতবর ৭০,০০০ টাকা দিয়ে একটি পুরাতন ইঞ্জিন চালিত বোট কেনেন। এই বোট সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে মেরামতের জন্য আরো ২০,০০০ টাকা খরচ হয়। বোটটি ঠিকঠাক করার পর দিপু মাতবরসহ ৮ সদস্যের একটি জেলের দল সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। ২৫ দিনব্যাপী মাছ ধরে সেই মাছ বিক্রি করে তারপর সকলে বাড়ি ফেরে। এই যাত্রায় প্রায় ১ লক্ষ২০ হাজার টাকার মাছ বিক্রি হয়। এই আয় থেকে বাজার বাবদ ২২,০০০ টাকা, বোট মেরামত বাবদ ৫,০০০ টাকা, তেল খরচ বাবদ ৮,০০০ টাকা সর্বমোট ৩৫,০০০ টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট (১,২০,০০০-৩৫,০০০) ৮৫,০০০ টাকার ৮.৫ ভাগের ১.৫ ভাগ অর্থাৎ ১৫,০০০ টাকাগ্রহণ করেন বোটের মালিক নিপু মাতবর। অবশিষ্ট ৮৫,০০০-১৫,০০০= ৭০,০০০ টাকা ৭ জন জেলে সমানভাবে ভাগ করে নেন। অর্থাৎ প্রত্যেক জেলে ৭০,০০০÷৭ = ১০,০০০ টাকা করে ভাগে পান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেশের প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালিদের সাথে একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় তাদের

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক কার্যক্রমে পুঁজি অনুপ্রবেশ করছে এবং বাজার অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় কারণেই অর্থনেতিক জীবন ব্যবস্থার এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এবং এ-ক্ষেত্রে তারা আড়ত মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ সহায়তা লাভের উপর নির্ভরশীল। মাছ বিক্রির ক্ষেত্রেও তারা স্বাধীন নয়, মাছ ঋণ প্রদানকারী আড়ত মালিকের কাছে মাছ বিক্রি করতে বাধ্য থাকেন।

৭.১৫ রাখাইনদের উপার্জন

রাখাইনদের মধ্যে অতীতে কেউ বেকার থাকতো না। এর কারণ ছিল কৃষিভিত্তিক সমাজে ছোটবেলা থেকেই সকল ছেলে-মেয়ে সাধ্যমতো কাজেকর্মে জড়িয়ে যেত। ছেলেরা খেতে-খামারে মা-বাবার সাথে কাজকর্মে যোগ দিত। মেয়েরা গৃহকর্মের পাশাপাশি মা-বাবার সাথে খেত-খামারে ও বাড়িতে বুননের কাজে যুক্ত হতো। কালের পরিক্রমায় সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। রাখাইনদের সেই কৃষিজমিও নেই, তাই কৃষি-কাজকর্মও আগের মতো নেই। বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নেই তাঁতকল ও তাঁতের কাজ। অথচ তাঁতের কাজের মাধ্যমে প্রত্যেক পরিবার কম-বেশি উপার্জন করতে পারতো। তাই এ-সমাজে অতীতে সবাই কম-বেশি উপার্জন কাজে জড়িত থাকলে বর্তমানে চিত্র নিছক তেমনটি নয়। ছোটবেলা থেকে কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার সেই প্রথা এখন প্রচলিত নেই। কেউ কেউ কাজের অভাবে বেকারও আছেন। নিম্নের সারণিতে রাখাইন সদস্যদের মধ্যে উপার্জনকারী ও অ-উপার্জনকারীর তথ্য প্রদান করা হলো।

সারণি– ৭.৪৫
রাখাইনদের উপার্জন

উপার্জন অবস্থা	গৃহস্থালী			মোট	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
উপার্জনকারী	৩০	২০	১২	৬২	৪৭.৩৩
অ-উপার্জনকারী	২৬	২৫	১৮	৬৯	৫২.৬৭
	৫৬	৪৫	৩০	১৩১	১০০.০০

উৎস : মাঠগবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনটি গ্রামের নারী, শিশু, বৃদ্ধ সকলকে হিসেবের আওতায় এনে দেখা যাচ্ছে মোট ১৩১ জন সদস্যের মধ্যে উপার্জন করছে ৬২ জন অর্থাৎ ৪৭.৩৩%। উপার্জনহীন অবস্থায় আছে ৬৯ জন অর্থাৎ ৫২.৬৭%। অতএব অর্ধেকেরও বেশি লোক উপার্জনের বাইরে অবস্থান করছে, যারা উপার্জনকারী ব্যক্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল। গ্রাম তিনটিতে কোন বড় ব্যবসায়ী রাখাইন নেই। উচ্চশিক্ষিত কোন বড় চাকুরেও নেই। তিনটি গ্রামের মধ্যে মাত্র একজন বড় কৃষক আছে। অল্প-স্বল্প কৃষিকাজ, মাছ ধরা ও বিক্রির মতো ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতায় সম্পৃক্ত অনেকে। সুতরাং তাদের মাসিক আয় শহরের কিংবা মফস্বল শহরের

মতো নয়।স্থানীয় পর্যায়ের স্বল্প আয়ই তাদের অবলম্বন। নিম্নে তাদের মাসিক পারিবারিক আয়ের তথ্য উপস্থান করা হলো।

সারণি– ৭.৪৬

উত্তরদাতাদের মাসিক পারিবারিক আয়

আয় (টাকা)	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
৫০০০–৭০০০	৩	১	২	৬	২০.৬৯
৭০০১–৯০০০	৬	১	১	৮	২৭.৫৯
৯০০১–১১০০০	২	২	১	৫	১৭.২৪
১১০০১–১৩০০০	১	২	১	৪	১৩.৭৯
১৩০০১–১৫০০০	-	১	১	২	৬.৯০
১৫০০১–১৭০০০	২	১	-	৩	১০.৩৪
১৭০০১–১৯০০০	-	১	-	১	৩.৪৫
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র– ৭.১৪

উত্তরদাতাদের পারিবারিক মাসিক আয়

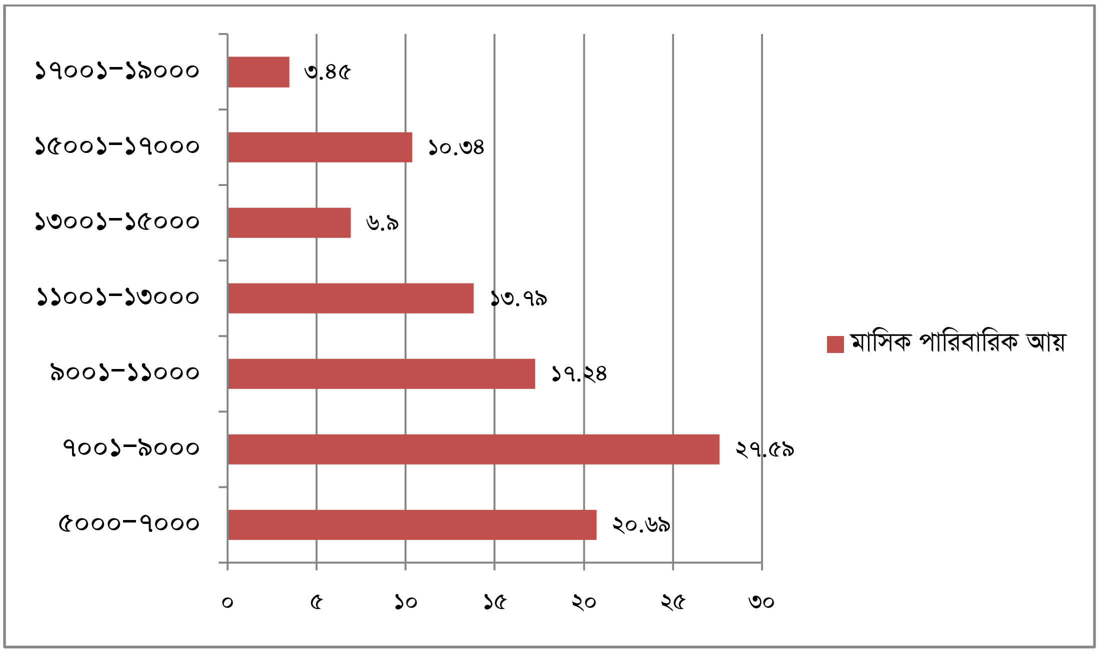

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণি ৭.৪৬ ও চিত্র ৭.১৪ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাখাইন পরিবারের মাসিক গড় আয় ১১০০০ টাকা। সদস্যদের মাথাপিছু আয় ২৫০০ টাকা। যেখানে দেশের জাতীয় মাথাপিছু আয় ১২৭১ ডলার, সে তুলনায় নিতান্ত কম। জাতীয় পর্যায়ের মাথাপিছু আয় ও রাখাইনদের মাথাপিছু আয় নির্দেশ করে যে, তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়েনি। সর্বাধিক সংখ্যক ৮টি অর্থাৎ ২৭.৬% পরিবারের গড় আয় ৭০০১-৯০০০ টাকার মধ্যে। এরপর ৬টি অর্থাৎ ২০.৬৯% পরিবারের মাসিক গড় আয় ৫০০০-৭০০০ টাকা। সর্বোচ্চ ১৯০০১-২১০০০ টাকা আয় করে মাত্র ১টি পরিবার অর্থাৎ ৩.৪৫%। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বর্তমানে রাখাইন একটি পরিবার মাসিক যে আয় করেন তা দিয়ে পরিবারের স্বাভাবিক ব্যয় নির্বাহ কঠিন ব্যাপার। কেননা দেশের প্রবৃদ্ধির উন্নয়নে দ্রব্যমূল্যের দাম অনেক বেড়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের শিক্ষা, চিকিৎসা, ঔষধ, পোশাক ইত্যাদি ব্যয় মেটানো সম্ভব নয়। এজন্য তারা নানাভাবে সরকার ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উপর সহায়তার লাভের জন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

৭.১৬ রাখাইনদের পারিবারিক মাসিক ব্যয়

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বাজার অর্থনীতির প্রভাবে রাখাইন সহজ-সরল জীবনেও ব্যয় বেড়েছে। প্রাত্যহিক ব্যয় ছাড়াও যুক্ত হয়েছে প্রযুক্তিগত ব্যয়। কিন্তু উপার্জন কম তাই সঞ্চয় নেই। অল্প উপার্জন দিয়ে জীবনের ব্যয় নির্বাহ দুষ্কর হয়ে পড়ছে। পরিবার প্রধানরা ব্যর্থ হচ্ছেন সদস্যদের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেও। এজন্য সময়ে সময়ে তারা সরকারি-বেসরকারি নানান সাহায্য-সহযোগিতার আশায় থাকেন। নিম্নের সারণি থেকে রাখাইনদের মাসিক পারিবারিক ব্যয় অনুধাবন করা যাবে।

সারণি- ৭.৪৭

উত্তরদাতাদের মাসিক পারিবারিক ব্যয়

আয় (টাকা)	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
৫০০০-৭০০০	৫	১	৩	৯	৩১.০৩
৭০০১-৯০০০	৫	২	-	৭	২৪.১৪
৯০০১-১১০০০	২	১	২	৫	১৭.২৪
১১০০১-১৩০০০	-	৩	-	৩	১০.৩৪

১৩০০১-১৫০০০	২	১	১	৪	১৩.৭৯
১৫০০১-১৭০০০	-	১	-	১	৩.৪৫
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র- ৭.১৫

উত্তরদাতাদের পারিবারিক মাসিক ব্যয়

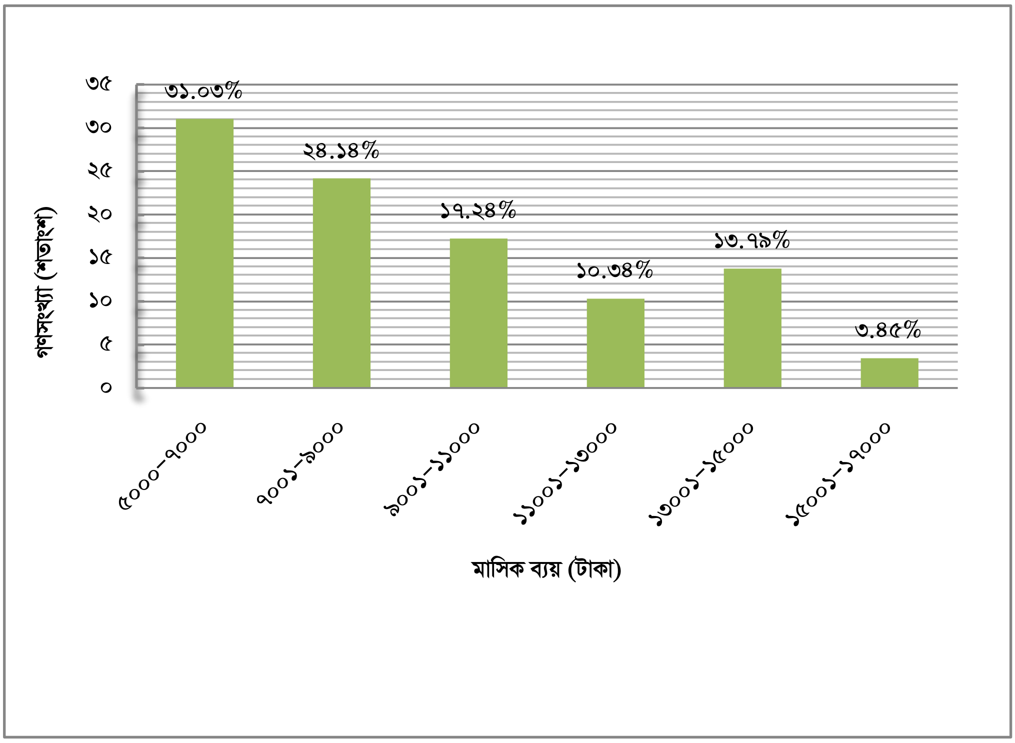

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

উপরের সারণি ও চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বাধিক ৯টি অর্থাৎ ৩১%পরিবার মাসে গড়ে ব্যয় করে ৫০০০-৭০০০ টাকা। এরপর ৭টি অর্থাৎ ২৪.১৪% পরিবার ব্যয় করে ৭০০১-৯০০০ টাকা। ১৭.২৪% পরিবারের গড় ব্যয় ৯০০১-১১০০০ টাকা। ১৩.৭৯% পরিবার গড়ে ব্যয় করে ১৩০০১-১৫০০০ টাকা। তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫০০১-১৭০০০ টাকা ব্যয় করে মাত্র ১ টি পরিবার অর্থাৎ ৩.৪৫%। ব্যয় নির্ভর করে আয়ের উপর। আয় কম হওয়ায় তারা প্রয়োজন মতো ব্যয় করতে পারে না। জীবন নির্বাহের প্রয়োজনে তারা ঋণ গ্রহণ করে কোনরকম জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছে। খাওয়া-পরা ছাড়া কোনরকম স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে পারে না। জীবনের অন্যান্য সখ পূরণ করতে পারে না। ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো পড়ালেখা করাতে পারে না। অর্থাৎ জীবনের নানা রং অনুভব করা সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। কোনরকমে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাই তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.১৭ রাখাইনদের সঞ্চয়

রাখাইনরা যা আয় করে তা দিয়েই কোন রকমে জীবন নির্বাহ করে। তাই অধিকাংশ রাখাইন পরিবারের কোন সঞ্চয় থাকে না। বলতে গেলে আয় ও ব্যয় সমান সমান। অর্থাৎ আয় অনুসরণে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে জীবনযাপন করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাড়তি খরচ জোগান দিতে কিছুটা দায়দেনা হয়ে পড়লে বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ তুলে পরিশোধের মাধ্যমে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে থাকে। এভাবেই তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। নিম্নের সারণিতে রাখাইন সঞ্চয়কারীগণের তথ্য সন্নিবেশিত হলো।

সারণি– ৭.৪৮

উত্তরদাতাদের সঞ্চয়

সঞ্চয় অবস্থা	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
সঞ্চয় আছে	৫	৪	২	১১	৩৭.৯৩
সঞ্চয় নেই	৯	৫	৪	১৮	৬২.০৭
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র– ৭.১৬

উত্তরদাতাদের সঞ্চয়

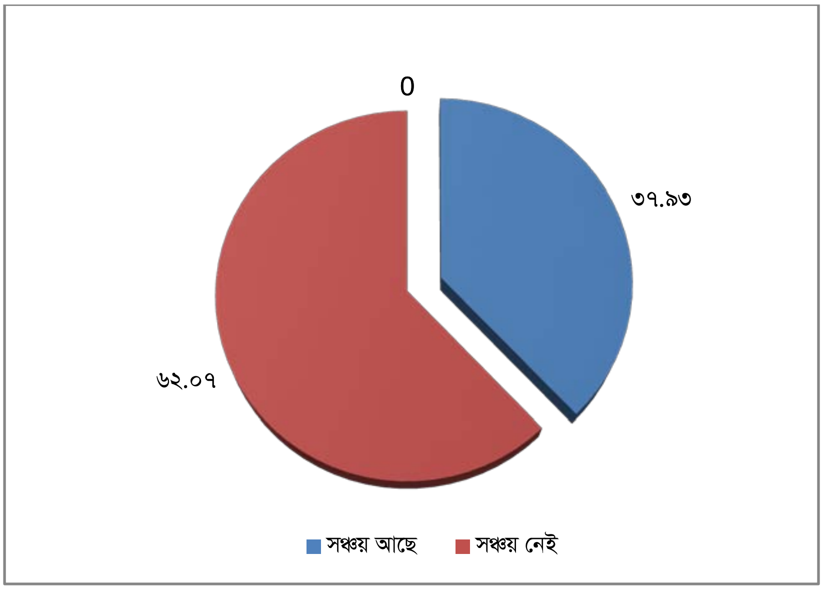

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

উপরের সারণি থেকে এটা পরিষ্কার যে, ২৯ জন তথ্যদাতার মধ্যে বেশির ভাগের কোন মাসিক সঞ্চয় থাকে না। যৎসামান্য সঞ্চয় করেন মাত্র ১১ জন অর্থাৎ ৩৭.৯৩%। সাক্ষাৎকার জানা যায় নানা কষ্ট ও

Dhaka University Institutional Repository

ত্যাগ স্বীকার করে তারা সামান্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু বাস্তব কারণে এই স্বল্প সঞ্চয় বেশি দিন টিকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না; খরচ করতে বাধ্য হন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৮ জনের অর্থাৎ ৬২% এর কোন সঞ্চয় থাকে না।পারিবারিক ব্যয় মিটিয়ে সঞ্চয় করা তাদের সাধ্যে কুলায় না। সঞ্চয় না থাকা তাদের জীবনের উদ্বেগ ও ভয়ভীতিজনিত অনিশ্চয়তাকে নির্দেশ করে। সঞ্চয়হীনতা মানসিক শক্তিহীনতার নামান্তর। কেননা তারা আকস্মিক কোন ঘটন-অঘটনে পরিস্থিতি সামাল দিতে অসামর্থ্য। নিম্নের সারণি থেকে তাদের মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ জানা যাবে।

সারণি– ৭.৪৯

উত্তরদাতাদের পারিবারিক মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ

সঞ্চয় (টাকা)	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
১০০০ পর্যন্ত	৩	১	২	৫	১৭.২৪
১০০১–২০০০	৪	২	১	৬	২০.৬৯
২০০১–৩০০০	১	২	-	৩	১০.৩৪
৩০০১–৪০০০	-	-	-	১	৩.৪৫
৪০০১–৫০০০	-	-	-	-	-
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ২০.৬৯% গৃহস্থালীর মাসিক সঞ্চয় থাকে ১০০১-২০০০ টাকা। এরপর ১৭.২৪% গৃহস্থালীর সঞ্চয় ১০০০ টাকার মধ্যে। ১০.৩৪% গৃহস্থালীর সঞ্চয় থাকে ২০০১-৩০০০ টাকা। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মাত্র ১ জন অর্থাৎ ৩.৪৫% এর সঞ্চয় হয় ৩০০১-৪০০০ টাকা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪০০১ টাকার ঊর্ধ্বে কোন গৃহস্থালীর সঞ্চয় থাকে না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, রাখাইনদের সঞ্চয়ের তথ্য নিরাশাজনক। উদ্বৃত্ত অর্থ না থাকায় সঞ্চয় মনেবৃত্তি নিরাশ করে রেখেছে। পুঁজি তৈরি হচ্ছে না। পুঁজি না থাকার কারণে কোন উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করতে পারে না। পুঁজির অপ্রতুলতা উদ্যোক্তার মানসিকতাকে হতাশার দিকে ধাবিত করে রেখেছে। আর্থ-সামাজিক স্বচ্ছলতার জন্য অর্থ সঞ্চয়ন, বিনিয়োগ, সঞ্চালন ও নিরাপত্তার সচেতনতার অভাব স্পষ্ট। সঞ্চয় না থাকায় তারা নানা কারণে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা থেকে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হন। এই ঋণ তারা উৎপাদন কাজে ব্যয় করতে পারে না, বরং পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যয় মেটান। এভাবে তারা নির্ভরশীলতার দুষ্টচক্রে আবদ্ধ থেকে দিনাতিপাত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭.১৮ উত্তরদাতাদের তফসিলি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট

গবেষণাধীন গ্রাম তিনটি প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ায় আশপাশের স্থানীয় বাজারগুলোতে দেশের কোন তফসিলি ব্যাংকের শাখা নেই। একমাত্র থানা সদর কলাপাড়ায় বেশ কয়েকটি তফসিলি ব্যাংকের শাখা আছে। থানা সদরের সঙ্গে মোটামুটি তাদের যোগাযোগ থাকলেও ২৯জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ১ জনের অর্থাৎ ৩.৪৫% এর তফসিলি ব্যাংকে একাউন্ট আছে। বাকি ২৮ জনের অর্থাৎ ৯৬.৫৫% কারোরই কোন ব্যাংক একাউন্ট নেই। ব্যাংক একাউন্ট না থাকাও তাদের সঞ্চয়হীনতাকে নির্দেশ করে। সঞ্চয়হীনতা নির্দেশ করে তাদের কোনরকমে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাকে। নিম্নের সারণিতে উত্তরদাতাদের ব্যাংক একাউন্টের তথ্য সন্নিবেশ করা হলো।

সারণি– ৭.৫০

উত্তরদাতাদের তফসিলি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট

অ্যাকাউন্ট	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
অ্যাকাউন্ট আছে	-	১	-	১	৩.৪৫
অ্যাকাউন্ট নেই	১৪	৮	৬	২৮	৯৬.৫৫
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

৭.১৯ পানির উৎস

পানির অপর নাম জীবন। অতীতে রাখাইন গ্রামবাসীর যৌথ পুকুরই ছিল পানির উৎস হিসেবে একমাত্র ভরসা। এজন্য প্রত্যেক রাখাইন পাড়ায় একটি করে যৌথ পুকুর আছে। তবে ধনী রাখাইনদের ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুরও আছে। যেমন মধুপাড়ায় একজন উত্তরদাতার, যিনি বড় কৃষক, ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি পুকুর আছে। যৌথ পুকুর ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীকিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলে, যেটা বাঙালিদের ক্ষেত্রে কখনও দেখা যায় না। কেউ পুকুরে নেমে গোসল করতে পারে না। সেক্ষেত্রে পাত্র দিয়ে পানি কাটিয়ে ডাঙায় তুলে গোসল করতে হয়। এ প্রথা এখনও কার্যকর আছে, কোন ব্যত্যয় হয়নি। তবেবর্তমানে পুকুরের ব্যবহার অনেক কমে গেছে। সরকার ও এনজিও পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে টিউবয়েল ও ডিপ-টিউবয়েল বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে গ্রামবাসী এই টিউবয়েল ও ডিপ-টিউবয়েলে প্রাত্যহিক যাবতীয় কাজ করে থাকে। তবে রান্নার জন্য কখনও কখনও নারীদের পুকুর থেকে পানি আনতে দেখা গেছে। গোসলের জন্য কদাচিৎ কেউ পুকুরে যান। ডিপ টিউবয়েল বসানো হয়েছে বেশি দিন হয়নি, ৪ বছর আগে। এর আগে গ্রামবাসীর

ব্যবহারের জন্য এনজিও-এর পক্ষ থেকে প্রত্যেক গ্রামে অগভীর নলকূপ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার ছাড়াও ওয়াল্ড ব্যাংক ও কারিতাস নলকূপ সরবরাহ করে। ডিপ-টিউবয়েলের পানিতেও অল্প-বিস্তর আয়রন আছে। সেজন্য মাঝে মাঝে নানান পেটের পীড়া দেখা দেয় বলে দলগত আলোচনা থেকে জানা যায়।নিম্নের সারণিতে রাখাইন অধিবাসীদের ব্যবহৃত পানির উৎসের মালিকানার ধরন উপস্থাপন করা হলো।

সারণি– ৭.৫১

রাখাইনদের পানির উৎস

পানির উৎসের ধরন	গ্রামভিত্তিক সংখ্যা			মোট সংখ্যা
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া	
ব্যক্তি মালিকানাধীন অগভীর নলকূপ	২	১	১	৪
ব্যক্তি মালিকানাধীন গভীর নলকূপ	-	-	-	-
সরকারি যৌথ গভীর নলকূপ	১	১	১	৩
এনজিও যৌথ গভীর নলকূপ	১	১	-	২
ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর	-	১	১	২
যৌথ পুকুর	১	১	১	৩

মাঠ গবেষণা এপ্রিল ২০১৮

দেখা যাচ্ছে যে, তিনটি গ্রামের ৪ জন উত্তরদাতার ব্যক্তি মালিকানাধীন অগভীর নলকূপ আছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন গভীর নলকূপ নেই কারো। গ্রাম তিনটিতে সরকারিভাবে স্থাপিত যৌথ গভীর নলকূপ আছে ৩টি। দুটি গ্রামে এনজিও স্থাপিত যৌথ গভীর নলকূপ আছে ২ টি। দুটি গ্রামে ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর আছে ২টি। প্রত্যেক গ্রামে ১টি করে ৩টি যৌথ পুকুর আছে।খাবার পানির সমস্যা দূরিকরণে তিনটি গ্রামে সরকার, ওয়াল্ড ব্যাংক, কারিতাসের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের যৌথ ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।এতে তারা বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারছে। ফলে পানিবাহিত অনেক রোগ থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছে।

৭.২০উত্তরদাতাদের স্বাস্থ্য অবস্থা

জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য নির্ভর করে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের উপর। অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্যের সাথে স্বাস্থ্যের পরিপূরক সম্পর্ক আছে। পুষ্টিকর খাদ্য শরীরে রোগ প্রতিরোধ করে। গবেষণা এলাকায় দেখা গেছে, উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ৬.৯০ ভাগ ব্যতীত বাকি সকলেই কোন না কোন রোগে আক্রান্ত। সারণি৭.৩৫ পর্যালোচনায় দেখা যায়, সর্বাধিক ২০.৬৯% লোক প্রেসারে ভুগছেন। ১৭.২৪%

লোকের ডায়বেটিস আছে। ১৩.৭৯% করে লোক হার্টের সমস্যা ও গ্যাসটিক আলসারে আক্রান্ত। ৬.৯০% করে লোক যথাক্রমে শ্বাসকষ্ট, চোখে কম দেখা ও কোষ্টকাঠিন্য সমস্যা বহন করছে। রোগের এ-ধরনের প্রাদুর্ভাব থেকে তাদের শরীরে পুষ্টি ঘাটতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। খাওয়া-পরা ভরণপোষণের আস্থাহীনতাজনিত উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে কোনরকমে খেয়ে পরে বেঁচে থাকায় এই জনগোষ্ঠী প্রোটিন ঘাটতির শিকার। নিম্নের সারণিতে উত্তরদাতাদের রোগে ভোগার তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণি– ৭.৫২

উত্তরদাতাদের শারিরীক সমস্যা

শারিরীক সমস্যা	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
হাঁটুতে বাতের ব্যথা	১	১	-	২	৬.৯০
হার্ট সমস্যা	২	১	১	৪	১৩.৭৯
কোমর/মাজায় ব্যথা	১	-	-	১	৩.৪৫
প্রেসার	২	২	২	৬	২০.৬৯
শ্বাসকষ্ট	১	১	-	২	৬.৯০
ডায়াবেটিস	২	২	১	৫	১৭.২৪
গ্যাস্টিক আলসার	২	১	১	৪	১৩.৭৯
কোষ্টকাঠিন্য	১	-	-	১	৩.৪৫
চোখ	১	-	১	২	৬.৯০
প্রযোজ্য নয়	১	১	-	২	৬.৯০
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

মাঠ গবেষণা এপ্রিল ২০১৮

৭.২০.১ উত্তরদাতাদের চিকিৎসা গ্রহণ

রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা জটিল, কঠিন ও দুর্বিসহ পরিণতি থেকে রোগীকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু সচেতনতার অভাব ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক অক্ষমতার জন্য উত্তরদাতাদের মধ্যে চিকিৎসা গ্রহণে অনীহা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর্থিক অক্ষমতার কারণে পুষ্টিহীনতাজনিত নানা রোগে তারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সুচিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না। তবে অতীতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কবিরাজি ও

ঝাঁড়-ফুঁক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হতো, বর্তমানে এসবে তাদের বিশ্বাস কমে গেছে। গবেষক মুহম্মদ আবদুল জলিল (১৯৯১: ৮৭) দেখিয়েছেন, সাঁওতালরা অসুখ-বিসুখের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাম্য কবিরাজির উপর বেশি নির্ভরশীল হয়। তবে রাখাইনরা বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণে বিশ্বাসী। কিন্তু চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক তথ্য উঠে আসে। রোগাক্রান্তদের অনেকে কোন প্রকার চিকিৎসা গ্রহণ করেন না। এ-অবস্থাকে রোগ পুষে রেখে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগের নামান্তর বলা যায়। নিচের সারণিতে তাদের চিকিৎসা গ্রহণের তথ্য তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৫৩

রোগের চিকিৎসা গ্রহণ

চিকিৎসা গ্রহণ	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
চিকিৎসা নিয়েছেন	১০	৬	৪	২০	৬৮.৯৭
চিকিৎসা নেননি	৩	২	২	৭	২৪.১৪
প্রযোজ্য নয়	১	১	-	২	৬.৯০
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮

চিত্র– ৭.১৭

রোগের চিকিৎসা গ্রহণ

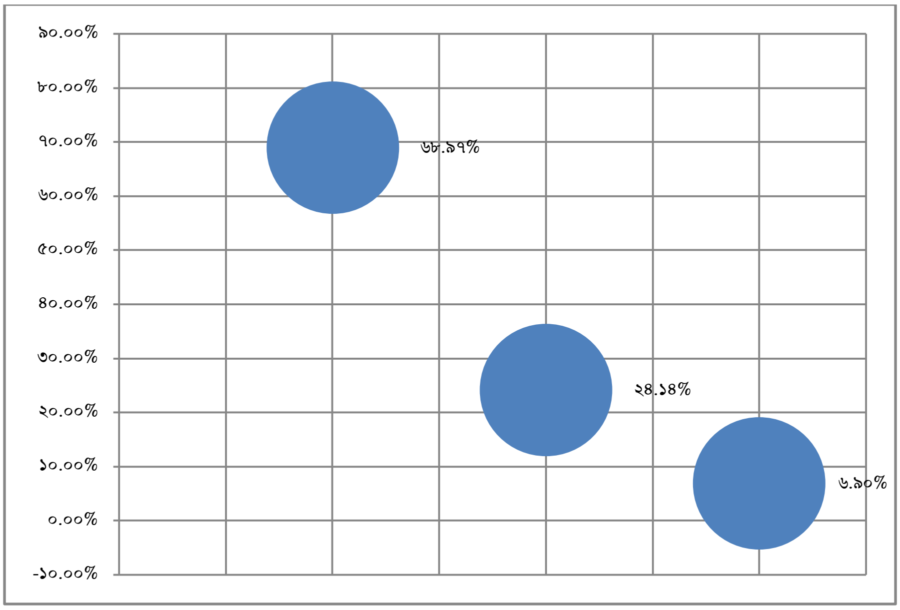

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

উপরিউক্ত সারণি ৭.৫৩ ও চিত্র ৭.১৭ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ৬৮.৯৭% উত্তরদাতা বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ২৪.১৪% কোন প্রকার চিকিৎসাই নেননি। চিকিৎসা না নেওয়ার মূল কারণ আর্থিক সংগতিহীনতা। এমনিতে তারা ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করে জীবনযাপন করে। তার উপর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে সংসারকে আরো দুরাবস্থার মধ্যে ফেলতে চান না তারা। সেজন্য কিছুটা কষ্ট হলেও যতক্ষণ চিকিৎসা না নিয়ে পারা যায় ততক্ষণ ভালো বলে মনে করেন।

আবার যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন তারা যথাযথ ও আধুনিক চিকিৎসা নিচ্ছেন না। পূর্বেই দেখানো হয়েছে উত্তরদাতাদের প্রায় সবাই প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্ট, বাত ইত্যাদি নানান রোগে ভুগছেন। কিন্তু তারা চিকিৎসা গ্রহণ করেন অনিয়মিতভাবে। উত্তরদাতারা যে ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করেন নিম্নের সারণিতে তা উপস্থাপন করা হলো।

সারণি–৭.৫৪

রোগের চিকিৎসাকরণ

চিকিৎসা মাধ্যম	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
ঢাকা মেডিকেল	১	১	-	২	৬.৯০
জেলা সরকারি হাসপাতাল	১	১	-	২	৬.৯০
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	২	১	১	৪	১৩.৭৯
বেসরকারি ক্লিনিক	-	-	-	-	-
স্থানীয় ফার্মেসি	৩	২	২	৭	২৪.১৪
কবিরাজি	২	১	১	৪	১৩.৭৯
হোমিওপ্যাথি	১	-	-	১	৩.৪৫
ঝাঁড়-ফুঁক	-	-	-	-	-
প্রযোজ্য নয়	৪	৩	২	৯	৩১.০৩
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮

রোগের চিকিৎসাকরণ সংক্রান্ত উপরোক্ত সারণি-তথ্য থেকে দেখা যায়, সর্বাধিক ২৪.১৪% উত্তরদাতা স্থানীয় ফার্মেসিত চিকিৎসা সেবা নেন।স্থানীয় ফার্মেসি থেকে চিকিৎসা নেওয়ার কারণ হলো, একদিকে সরকারি হাসপাতাল দূরে; অন্যদিকে পরামর্শ ফি দিতে হয় না। আবার যাতায়াত খরচও বেচে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কেবল ওষুধের টাকা দিলেই চলে। সেজন্য তারা ফার্মেসির পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ কিনে খেয়ে থাকেন। উত্তরদাতাদের ১৩.৭৯% উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নেন। অপর ১৩.৭৯% স্থানীয় কবিরাজি চিকিৎসা গ্রহণ করেন। ৬.৯০% করে চিকিৎসা নিয়েছেন যথাক্রমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা সরকারি হাসপাতাল থেকে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নেন ৩.৪৫%। অবশ্য তাদের একটি বৃহৎ অংশ অর্থাৎ ৩১.০৩% চিকিৎসা সেবা গ্রহণের বাইরে অবস্থান করছে। তথ্য নির্দেশ করে, তাদের কেউই বেসরকারি ক্লিনিকে যান না। আর্থিক অসংগতির কারণে উন্নত সেবা গ্রহণে তারা অক্ষম। তবে লক্ষ্যণীয় যে, কেবল কবিরাজি ও ঝাঁড়ফুঁকের চিকিৎসাকরণের প্রাচীন মন-মানসিকতা থেকে তাদের উত্তরণ ঘটেছে। যেজন্য তাদের কেউ কেউ সুদূর ঢাকা মেডিকেলে এসে চিকিৎসা নিয়েছেন।

সারণি– ৭.৫৫

একনজরে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে পরিবর্তন

দাদার আমল	বাবার আমল	উত্তরদাতার কাল	মন্তব্য
ঝাঁড়-ফুঁক, পানিপড়া ও কবিরাজি চিকিৎসা	ঝাঁড়-ফুঁক, পানিপড়া ও কবিরাজি চিকিৎসা	আধুনিক অ্যালাপ্যাথিক চিৎিসা	অর্থকষ্টে চিকিৎসা গ্রহণে অনীহা

৭.২১ গর্ভধারণকালে নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

গর্ভধারণ সম্পর্কিত অজ্ঞতার জন্য অনেক সময় নানা ধরনের কুসংস্কার নারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। গর্ভধারণকারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া খুবই প্রয়োজন। এজন্য গর্ভধারণের পরপরই গর্ভবতী নারীর গর্ভকালীন যত্নের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার যাতে তিনি গর্ভকালীন যত্নে থাকেন এবং কোনো জটিলতা দেখা দিলে তার প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সম্ভব হয়। এভাবে মা ও গর্ভকালীন শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অনেকটাই নিশ্চিত করা যায়। যেমন এলকোহল, ক্যাফেইন, ধুমপান থেকে দূরে থাকা, শরীরে হরমোন ঘটিত পরিবর্তনে সতর্ক হওয়া, রক্তচাপের তারতম্য পরীক্ষা করা, গ্যাসের সমস্যা, বুক জ্বালা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা, অধিক উত্তেজনা পরিহার করা, ধৈর্য ধারণ করা, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, ঘুমানোর চেষ্টা করা, কাজের ফাঁকে ফাঁকে হালকা বিশ্রাম গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চলা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ খাওয়া জরুরি। কিন্তু গবেষণা এলাকায় প্রাপ্ত তথ্য হতাশাজনক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনরকম ডাক্তারি পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি। নিম্নের সারণিতে নারীদের বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে গর্ভধারণকালে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছিল কিনা সেই তথ্য তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৫৬

গর্ভধারণকালে নারীদেরডাক্তারি পরামর্শ প্রদান

ডাক্তারি পরামর্শ প্রদান	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
হ্যাঁ	১	১	২	৪	১৩.৭১
না	২	১	২	৫	১৭.২৪
প্রযোজ্য নয়	১১	৭	২	২০	৬৮.৯৭
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮

গর্ভবতী মায়েদের জন্য ডাক্তারি পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনায় পাওয়া যায় যে, ১৭.২৪% কোন ডাক্তারি পরামর্শ নেননি। অন্যদিকে পরামর্শ নিয়েছেন মাত্র ১৩.৭১%। সমতল ভূমির অধিবাসী এবং আশপাশে বাঙালি অধ্যুষিত গ্রাম হওয়া সত্ত্বেও গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে না থাকার কারণ হলো অসচেতনতা ও আর্থিক ব্যয়ভারের ভীতি। তবে যারা চিকিৎসা নিয়েছেন তাতেও গ্রামবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপন করা যায়। নিম্নের সারণিতে গর্ভধারণকালে মায়েরা কি ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়েছেন সে তথ্য তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৫৭

গর্ভধারণকালে মায়েদের চিকিৎসাকরণ

স্বাস্থ্যসেবার ধরণ	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১	১	২	৪	১৩.৭৯
বেসরকারি ক্লিনিক	-	-	-	-	-
পাস করা ডাক্তার	-	-	-	-	-
স্থানীয় ফার্মেসি	১	-	-	১	৩.৪৫
গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার	-	-	-	-	-
হোমিওপ্যাথি	-	-	-	-	-
কবিরাজি	-	-	-	-	-
ঠাকুর, গুরু, পুরোহিত	-	-	১	১	৩.৪৫
সাধারণ গ্রাম্য দাই	১	১	১	৩	১০.৩৪

প্রযোজ্য নয়	১১	৭	২	২০	৬৮.৯৭
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮

গর্ভবতী নারীর চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা নিয়েছেন ১৩.৭৯%। ঠাকুর-পুরোহিতের পানিপড়া ইত্যাদি গ্রহণ করেন ৩.৪৫%। সাধারণ গ্রাম্য দাইয়ের পরামর্শ নিয়েছেন ১০.৩৪%। সন্তান প্রসবে তাদেরই সহায়তা নেওয়া হয়। সরকারি হাসপাতাল দূরে হওয়ায় অনেকে সেখানে যান না। তবে কেউ বেসরকারিভাবে ডাক্তারি পরামর্শ গ্রহণ করেননি। প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ায় বিভিন্ন বেসরকারি যেমন এনজিও ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ইত্যাদি স্বাস্থ্যসেবার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেনি।

৭.২১.১ গর্ভবতী নারীদের বিশেষ খাবার প্রদান

গর্ভাবস্থায় একজন মা ও তার শিশুর সুস্থতার জন্য দরকার হয় একটি সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থার। গর্ভস্থ শিশুর সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা নির্ভর করে মায়ের সঠিক খাদ্য ব্যবস্থার ওপর। একটি শিশু সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য মায়ের প্রতিদিন প্রায় ৩০০ ক্যালরি অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। স্বাস্থ্য বিধি অনুযায়ী ক্যালসিয়াম, আয়রন বা লৌহ জাতীয় খাদ্য, ভিটামিন সি, ফলিক এসিড, ভিটামিন এ, ক্যালরিযুক্ত খাদ্য, পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ও পানি জাতীয় খাবার নিয়ম করে ডাক্তারি পরামর্শ অনুযায়ী গর্ভবতী মায়ের খাওয়া প্রয়োজন। রাখাইন গর্ভবতী মায়েরা গর্ভধারণকালে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা জানার জন্য বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে যে-সকল মায়েরা গর্ভধারণ করেছেন তাদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাতে দেখা যায় রাখাইন নারীদের নিয়মিত খাবারের বাইরে অতিরিক্ত কোন খাবারের ব্যবস্থা করা হয়নি। এ-বিষয়ে তারা পুরোপুরি অসচেতন তেমন নয়। আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকেই তাদের জন্য অতিররিক্ত খাবারের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি বলে জানা যায়। নিম্নের সারণিতে মায়েদের পাঁচ বছরের মধ্যে গর্ভধারণকালে বিশেষ ধরনের কোন খাবার প্রদান করা হয়েছিল কিনা তার তথ্য তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৫৮

গর্ভধারণকালে মায়েদের বিশেষ ধরনের খাবার প্রদান

বিশেষ খাবার প্রদান	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
হ্যাঁ	১	-	১	২	৬.৯০

না	২	২	৩	৭	২৪.১৪
প্রযোজ্য নয়	১১	৭	২	২০	৬৮.৯৭
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮

উপরের সারণিতে প্রদত্ত শেষ গর্ভধারণকালে মায়েদের বিশেষ ধরনের খাবার প্রদান সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মাত্র ৬.৯০% উত্তরদাতা অতিরিক্ত খাবার দিয়েছেন। ২৪.১৪% কোন অতিরিক্ত খাবারের ব্যবস্থা নেননি। অপরদিকে একটি বৃহৎ অংশ, ৬৮.৯৭% বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে গর্ভধারণের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। এই-অংশটিও সম্পৃক্ত থাকলে যে আশানুরূপ তথ্য পাওয়া যেত বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত থেকে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এ-অবস্থা তাদের আর্থ-সামাজিক অবনমনকে চিহ্নিত করে।

৭.২২ শিশুদের শারীরিক সমস্যা

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যগত গুরুতর সমস্যার মধ্যে অপুষ্টি অন্যতম। শিশু অপুষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন উপরের দিকে রয়ে গেছে। এক হিসেব অনুযায়ী পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের দুই-তৃতীয়াংশ অপুষ্টিতে ভোগে। খাদ্য ঘাটতি, বেকারত্ব ও কাজের সমস্যা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সমস্যা প্রভৃতি অপুষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।[১২] এসবের প্রভাবে রাখাইন শিশুরা নানা ধরনের রোগ-বালাইয়ের শিকার। অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশুদের শ্বাসকষ্ট, জ্বর, চর্মরোগ, কৃমি সমস্যা মতো নানা সমস্যায় ভুগতে দেখা গেছে। নিম্নের সারণিতে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশুদের রোগে ভোগার চিত্র পাওয়া যাবে।

সারণি– ৭.৫৯

শিশুদের শারিরীক সমস্যা

শারিরীক সমস্যা	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
সর্দি-কাশি-জ্বর	১	১	১	৩	১০.৩৪
পেটের সমস্যা ও পায়খানা	-	-	১	১	৩.৪৫
চর্মরোগ	১	-	১	২	৬.৯০
চোখের অসুখ	১	-	-	১	৩.৪৫
কানের অসুখ	-	-	১	১	৩.৪৫
কৃমি	-	১	-	১	৩.৪৫
প্রযোজ্য নয়	১১	৭	২	২০	৬৮.৯৭
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

শিশুরা কি ধরনের রোগে ভুগছে সে সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যায় শতকরা ১০.৩৪ জন সর্দি-কাশি-জ্বরে আক্রান্ত। চর্ম রোগে ভুগছে শতকরা ৬.৯০ ভাগ। এ-ছাড়া পেটের গোলমাল ও পায়খানা, চোখের সমস্যা, কানের সমস্যা ও কৃমির সমস্যায় ভুগছে শতকরা ৩.৪৫ জন করে। শিশুদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কম। যেজন্য তারা নানান রোগের জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না। এক্ষেত্রে অতীতের তুলনায় প্রকোপ যে খুব বেশি কমেছে তা বলা যাবে না।

৭.২২.১শিশুদের শারিরীক সমস্যায় চিকিৎসা গ্রহণ

রোগাক্রান্ত শিশুদের যথাযথ চিকিৎসা করানো জরুরি। এতে বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে তাদের রক্ষা করা সম্ভব হয়। যথাসময়ে চিকিৎসা না করানোর ফলে কোন কোন সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে কিন্তু গবেষণাধীন গ্রামে অসুস্থ শিশুদের যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হয় না। নিম্নের সারণিতে অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসা প্রদানের তথ্য দেওয়া হলো।

সারণি– ৭.৬০

শিশুদের শারিরীক সমস্যায় চিকিৎসা প্রদান

চিকিৎসা প্রদান	গ্রামভিত্তিক চিকিৎসা গ্রহণকারী			মোট গ্রহণকারী	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
হ্যাঁ	২	১	৩	৬	২০.৬৯
না	১	১	১	৩	১০.৩৪
প্রযোজ্য নয়	১১	৭	২	২০	৬৮.৯৭
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮

উপরের সারণির তথ্য অনুযায়ী রোগগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে ২০.৬৯% এর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। বাকি ১০.৩৪% কোন প্রকার চিকিৎসা গ্রহণ করে না। অথচ শিশুদের সুষ্ঠু, সুস্থ, সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য চিকিসা দেওয়া জরুরি। চিকিৎসা না করানোর কারণ হলো আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থা। রোগাক্রান্ত শিশুদের মধ্যে যাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে তাদের চিকিৎসাও যথাযথ নয়। এদের অনেকের এমবিবিএস ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়াই স্থানীয় ফার্মেসির পরামর্শসহ নানান অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা দওয়া হয়। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকাতে তারা চিকিৎসা না করাতে পারাকে নিয়তি হিসেবে মেনে নেয়।নিম্নের সারণিতে রোগে আক্রান্ত অসুস্থ শিশুদের জন্য কি ধরনের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয় তার তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণি– ৭.৬১

রোগাক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা মাধ্যম

চিকিৎসা মাধ্যম	গ্রামভিত্তিক রোগাক্রান্ত শিশুর সংখ্যা			মোট রোগাক্রান্তের সংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
সরকারি হাসপাতাল	১	-	১	২	৬.৯০
বেসরকারি ক্লিনিক	-	-	-	-	-
স্থানীয় ফার্মেসি	১		২	৩	১০.৩৪
কবিরাজি	-	১	-	১	৩.৪৫
ঝাঁড়ফুঁক	-	-	-	-	-
হোমিওপ্যাথি	-	-	-	-	-
চিকিৎসা হয়নি	১	১	১	৩	১০.৩৪
প্রযোজ্য নয়	১১	৭	২	২০	৬৮.৯৭
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮

উপরে প্রদত্ত মাঠ গবেষণার তথ্য অনুসারে রোগাক্রান্ত শিশুদের মধ্যে স্থানীয় ফার্মেসি থেকে চিকিৎসা দিতে দেখা গেছে ১০.৩৪% এর। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয় ৬.৯০% এর। শতকরা ৩.৪৫ জন শিশুর কবিরাজি চিৎিকসা দেওয়া হয়। শিশুদের কাউকে ঝাঁড়ফুঁকের চিকিৎসা দেওয়া হয়নি, যা তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির পরিচায়ক। বেসরকারি ক্লিনিকে শিশুদের কাউকেই চিকিৎসা করানো হয় না। প্রশিক্ষিত এমবিবিএস ডাক্তার ব্যতীত স্থানীয় ওষুধ বিক্রেতা থেকে চিকিৎসা পরামর্শ নেওয়ার কারণ কোন পরামর্শ ফি দিতে হয় না। এরফলে অনেক সময় শিশুদের জীবনের ঝুঁকি থেকে যায়। আর্থিক অভাব-অনটন তাদেরকে শিশুদের জন্য ঝুঁকি নিতে বাধ্য করে। তবে অতীতের তুলনায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে কারো কারো সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণকে এক ধরনের উত্তরণ বলা যায়।

৭.২৩ শৌচাগার ব্যবস্থা

স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার রোগমুক্ত জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য। রাখাইনরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হলেও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাঘর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব ছিল। এমনকি এখনও নিরাপদ স্যানিটারি ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে গড়ে ওঠেনি। কোন কোন শৌচাগারের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর নয়। তবে শৌচাগার ব্যবস্থায় বেশ পরিবর্তন ও উন্নয়ন হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

প্রচেষ্টায়। শৌচাগার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত, যৌথ কাঁচা, যৌথ স্যানেটারি, নিজস্ব স্যানেটারিতে রূপান্তর ঘটেছে। এরফলে শৌচাগারজনিত রোগ-ব্যাধির প্রকোপ কমে গেছে। বর্তমানে ৮২.৭৬%উত্তরদাতা স্যানেটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। নিজেদের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় এগুলো সরকারিভাবে ও এনজিও সহায়তায় নির্মিত হয়েছে। এরমধ্যে গ্রামগুলোতে সরকার কর্তৃক ১৪টি ও এনজিও কর্তৃক ১০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপিন করা হয়েছে। ২০১১ সালে গবেষক যখন উক্ত গ্রামগুলো পরিদর্শন করেন তখন সেখানে রাখাইন গ্রামবাসীদের যৌথভাবে কাঁচা অস্বাস্থ্যকর পায়খানাঘরের ব্যবহার লক্ষ্য করেন। কিন্তু ২০১৮ সালের মাঠ গবেষণায় প্রত্যেক পরিবারকে নিজস্ব স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহার করতে দেখা যায়, যার অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত।নিম্নের সারণিতে রাখাইন গৃহস্থালীদের ব্যবহৃত শৌচাগারের ধরন সম্পর্কিত চিত্র পাওয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি– ৭.৬২
উত্তরদাতাদের শৌচাগার ব্যবহার

শৌচাগারের ধরন	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
উন্মুক্ত	-	-	-	-	-
কাঁচা	২	১	১	৪	১৩.৭৯
স্যানিটারি	১২	৭	৫	২৪	৮২.৭৬
আধ-পাকা	-	১	-	১	৩.৪৫
পাকা	-	-	-	-	-
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৮২.৭৬% উত্তরদাতা স্যানিটারি ল্যাটিন ব্যবহার করছে। কাঁচা শৌচাগার ব্যবহার করে ১৩.৭৯%, আধ-পাকা শৌচাগার ব্যবহার করে ৩.৪৫%। কাঁচা পায়খানাঘরের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর নয়। এখানে কেউ পাকা পায়খানাঘর ব্যবহার করেন না।প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে হাড়িপাড়ার ৮টি, তুলাতুলিপাড়ায় ২টি ও মধুপাড়ায় ৪টি মোট ১৪টি অর্থাৎ ৪৮.২৮% স্যানিটারি শৌচাগার সরকারিভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত। আবার হাড়িপাড়ার ৪টি, তুলাতুলিপাড়ায় ৩টি ও মধুপাড়ায় ৩টি মোট ১০টি অর্থাৎ ৩৪.৪৮% স্যানিটারি শৌচাগার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) কর্তৃক নির্মিত। এ থেকে তাদের নিজেদের সামর্থ্যহীনতা ও নির্ভরশীলতার চিত্র পরিষ্কার হয়। উল্লেখ্য, রাখাইনদের স্যানিটেশন পরিস্থিতি বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মতোই নাজুক। যেমন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্রাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের গবেষণা প্রতিবেদন ২০১৩-এর তথ্য মতে সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে স্যানিটেশন কভারেজ ২৪.২%, যেখানে বাংলাদেশের স্যানিটেশন কভারেজ বিবিএস ২০১১-এর তথ্যমতে ৬২.৩ শতাংশ (মিন্‌স, ২০১৯) ।

সারণি– ৭.৬৩

একনজরে উত্তরদাতাদের শৌচারগার ব্যবস্থার রূপান্তর

দাদার আমল	বাবার আমল	উত্তরদাতার কাল	মন্তব্য
উন্মুক্ত স্থানে প্রক্ষালন	উন্মুক্ত স্থানে প্রক্ষালন	সরকারি-বেসরকারি সহায়তায় কাঁচা স্যানিটারি ব্যবহার	সহায়তা নির্ভর পরিবর্তন

৭.২৪ এনজিও সম্পৃক্ততা

গবেষণা এলাকায়বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থা (এনজিও) রয়েছে। এনজিওগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। তবে পাশাপাশি স্বাস্থ্য, বৃক্ষরোপণ, মৎস চাষ, গরু-ছাগল পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি উন্নয়ন কার্যক্রম চালালেও সেসব ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততার তথ্য তেমন পাওয়া যায়নি। সেক্ষেত্রে রাখাইনদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহীত উদ্যোগ সঠিক কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে বলে প্রতীয়মান হয় না। নিচের সারণিতে উত্তরদাতাদের এনজিও সম্পৃক্ততার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৬৪

উত্তরদাতাদের এনজিও সম্পৃক্ততা

এনজিও সম্পৃক্ততা	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
এনজিও সম্পৃক্ততা আছে	১৩	৮	৬	২৭	৯৩.১০
এনজিও সম্পৃক্ততা নেই	১	১	-	২	৬.৯০
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র– ৭.১৮
উত্তরদাতাদের এনজিও সম্পৃক্ততা

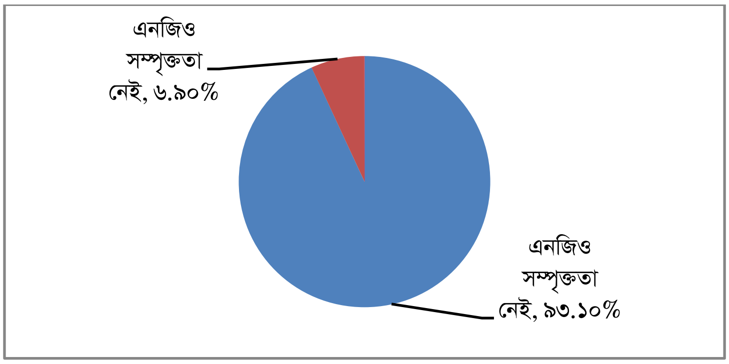

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

উপরের সারণি ৭.৬৩ ও চিত্র ৭.১৮ থেকে বোঝা যায়, ৯৩.১০% উত্তরদাতা এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত। কেবল ৬.৯০% এর কোন এনজিও-সম্পৃক্ততা নেই। এই চিত্র তাদের ব্যাপকভাবে এনজিও-সম্পৃক্ততাকে চিহ্নিত করে। তাদের আর্থ-সামাজিক অস্বচ্ছলতা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। কারণ তারা

মূলত ঋণ গ্রহণের জন্য এনজিও'র সাথে যুক্ত হয়েছেন। সাধারণ গ্রামীণ দরিদ্র লোকেরা অন্য কোথাও সাহায্য-সহযোগিতা পায় না বলে তারা এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে থাকে।

৭.২৪.১ এনজিও সম্পৃক্ততার কারণ

আগেই বলা হয়েছে, অধিকাংশ উত্তরদাতা ঋণ পাওয়ার আশায় বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানগুলোর নানামুখী কার্যক্রম থাকলেও কেবল ঋণ সহায়তা লাভ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ, অনুদান প্রাপ্তির জন্য তারা এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। তারা বিশ্বাস করে এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত না হলে কাঙ্ক্ষিত সাহায্য পাওয়া যায় না। নিচের সারণিতে উত্তরদাতাদের এনজিও সম্পৃক্ততার কারণের তথ্য দেওয়া হলো।

সারণি– ৭.৬৫
এনজিও সম্পৃক্ততার কারণ

কারণ	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
ঋণ	৭	৪	৩	১৪	৪৮.২৪
অনুদান লাভ	৩	২	১	৬	২০.৬৯
শিশুশিক্ষা সহায়তা	-	-	-	-	-
বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ	৩	২	১	৬	২০.৬৯
স্বাস্থ্য সুবিধা	-	-	-	-	-
আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি	-	-	-	-	-
টিউবওয়েল সুবিধা	-	-	-	-	-
নারী পুনর্বাসন	-	-	-	-	-
গৃহনির্মাণ সহায়তা	-	-	-	-	-
খাসজমি প্রাপ্তি	-	-	-	-	-
প্রযোজ্য নয়	১	১	১	৩	১০.৩৪
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৪ জন অর্থাৎ ৪৮.২৪% ঋণ লাভ, ৬ জন অর্থাৎ ২০.৬৯% বিভিন্ন অনুদান যেমন নগদ টাকা, সেলাই মেশিন, গরু-ছাগল, টিন ইত্যাদি প্রাপ্তি ও অপর ৬ জন অর্থাৎ ২০.৬৯% বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেমন মেক্যানিক্যাল প্রশিক্ষণ, মৎস্য চাষ, গরু-ছাগল পালন ইত্যাদি প্রশিক্ষণ

গ্রহণের জন্য এনজিওর সদস্য হয়েছেন। এনজিও-র উপর নির্ভরশীলতা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। এ-নির্ভরশীলতা ঋণচক্র ও দারিদ্র্যচক্রের সঙ্গে পরিপূরকভাবে সম্পর্কিত।

৭.২৪.২ এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ

অতীতের মহাজনী ঋণের বেড়াজাল থেকে রাখাইনরা বের হতে পারলেও জড়িয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বন্ধনে। দেখা গেছে ২৯ জনের মধ্যে ২৭ জনই ঋণ নিয়েছেন। অর্থাৎ ঋণ গ্রহণকারীর হার ৯৩.১০%। ঋণ গ্রহণ করেননি মাত্র ২ জন অর্থাৎ ৬.৯০%। ঋণগ্রহীতাদের সকলেই বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছেন। উপরন্তু ১ জন অর্থাৎ মাত্র ৩.৩৪% সরকারি ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ নিয়েছেন। অনেকের ক্ষেত্রে একাধিক ঋণ গ্রহণের তথ্য পাওয়া গেছে। ৫ জন গৃহস্থালীকে ২টি সংস্থা থেকে ঋণ নিতে দেখা গেছে। এই ঋণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যথাযথ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে কেবল পারিবারিক ব্যয় মিটানোর কাজে লাগানো হয়। কিন্তু উপার্জন বৃদ্ধি না পাওয়ায় তারা ঋণের চক্র থেকে বের হয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারছেন না। এনজিওদের সুদের হার চড়া। সকল এনজিওকে ন্যূনপক্ষে ১৩% সুদ প্রদান করতে হয়। অনেকের সুদের হার আরও বেশি। ঋণ গ্রহণ তাদের নির্ভরশীলতার বন্ধনকে মজবুত করেছে। এরফলে তারা অনুন্নয়নের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। নিচের সারণি থেকে উত্তরদাতাদের ঋণ গ্রহণের চিত্র পাওয়া যায়।

সারণি– ৭.৬৬

উত্তরদাতাদের ঋণ গ্রহণ

ঋণ গ্রহণ	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
ঋণ নিয়েছেন	১৩	৯	৫	২৭	৯৩.১০
ঋণ নেননি	১	০	১	২	৬.৯০
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

৭.২৪.৩ উত্তরদাতাদের গৃহীত ঋণের পরিমাণ

পূর্বেই বলা হয়েছে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ২ জন ব্যতীত বাকি ২৭ জনই কোন না কোন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তারা সর্বনিম্ন ১০,০০০–সর্বোচ্চ ৬৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়েছেন। উত্তরদাতারা জানান, ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে তারা সতর্ক থাকেন। কেননা ভবিষ্যতে ঋণ প্রাপ্তির আশায় সময় মতো কিস্তি পরিশোধ করে দেন। এজন্য এনজিও ঋণ পেতে তাদের সমস্যা হয় না। প্রায় ৩৬ কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে তারা ঋণ পেতে পারেন। এক্ষেত্রে তাদের কোন ভোগান্তি

Dhaka University Institutional Repository

পোহাতে হয় না। উত্তরদাতারা আশা, কারিতাস, গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক ও আরডিএ (রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি) থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন বলে জানান। নিচের সারণিতে উত্তরদাতাদের গৃহীত ঋণের চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৬৭
উত্তরদাতাদের গৃহীত ঋণের পরিমাণ

গৃহীত ঋণ	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
০০০০১-১০,০০০	১	-	-	১	৩.৪৫
১০,০০১–২০,০০০	৫	২	১	৮	২৭.৫৯
২০,০০১–৩০,০০০	৩	৩	৩	৯	৩১.০৩
৩০,০০১–৪০,০০০	-	১	-	১	৩.৪৫
৪০,০০১–৫০,০০০	২	২	১	৫	১৭.২৪
৫০,০০১–৬০,০০০	১	১	-	২	৬.৯০
৬০,০০১ ও তদূর্ধ্ব	১	-	-	১	৩.৪৫
	১৩	৯	৫	২৭	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র– ৭.১৯
উত্তরদাতাদের ঋণ গ্রহণ

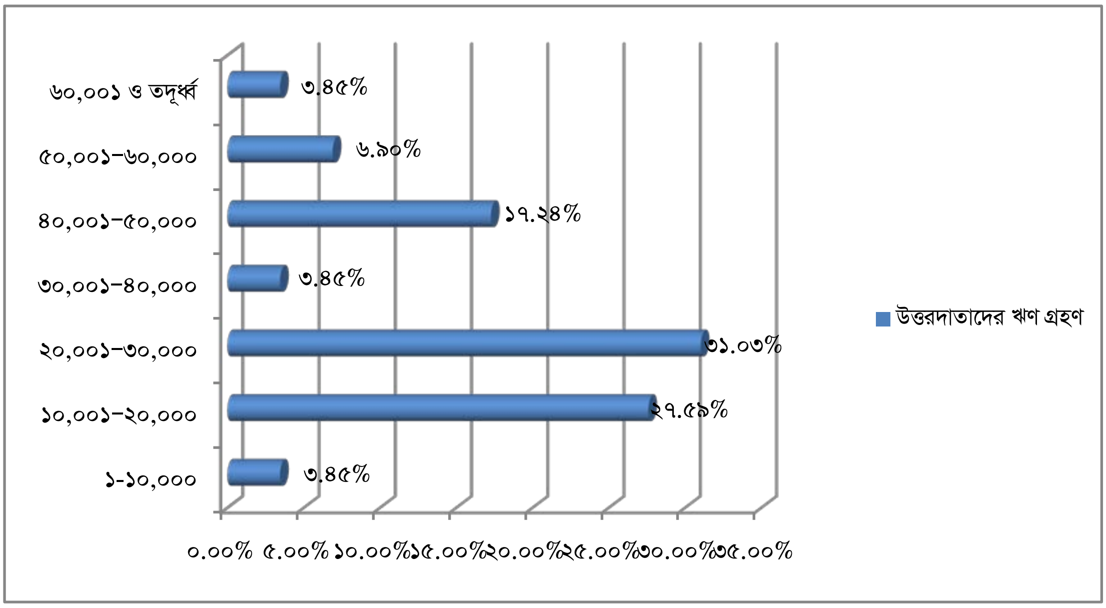

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

গবেষণায় দেখা গেছে, বেশির ভাগ ঋণ গ্রহীতা স্বল্প পরিমাণ ১০,০০১-২০,০০০ টাকা ও ২০,০০১-৩০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন, যারা মোট গৃহস্থালীর যথাক্রমে ২৭.৫৯% ও ৩১.০৩%। এই দুই শেণিতে গণসংখ্যা বেশি হওয়ার বাস্তব কারণ দ্বিবিধ। একদিকে ঋণ গ্রহীতারা সতর্ক থাকেন যাতে করে গৃহীত ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারেন। অপরপক্ষে, এনজিও-কর্মীরাও বেশি টাকা ঋণ

হিসেবে দেয় না, কারণ অবশেষে যদি তা পরিশোধ করতে না পারে। তাই পরিশোধ করার ক্ষমতা বিবেচনায় রেখে তারা ঋণ প্রদানের পরিমাণ নির্ধারণ করে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, ৪০,০০১-৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন ৫ জন অর্থাৎ ১৭.২৪%। সর্বনিম্ন ১০,০০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৬০,০০১ টাকার অধিক ঋণ নিয়েছেন মাত্র ১ জন করে অর্থাৎ মাত্র ৩.৪৫% করে। সর্বোচ্চ ঋণ গ্রহীতা দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছেন। মূলত উচ্চমাত্রার ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই কম, মাত্র ৩.৪৫%।

৭.২৪.৪ উত্তরদাতাদের গৃহীত ঋণের ধরন

বেসরকারি সংস্থাগুলো বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদান করে। যেমন কৃষি, গাভি পালন, ছাগল পালন, মৎস্য চাষ, বিভিন্ন ব্যবসা ইত্যাদি নানা ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে। তবে সাক্ষাতে জানা গেছে গৃহীত ঋণ সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয় করেছেন অল্প কয়েকজন মাত্র। অধিকাংশ উত্তরদাতাই প্রাত্যহিক জীবনধারণের নানা পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে ঋণের টাকা ব্যয় করে থাকেন। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য দেখিয়ে তারা ঋণ গ্রহণ করেন, কেউ কেউ সে উদ্দেশ্যে টাকা ব্যয় না করে অন্য ব্যয় নির্বাহ করেন। নিচের সারণিতে উত্তরদাতাদের ঋণ গ্রহণের ধরনের চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৬৮

উত্তরদাতাদের গৃহীত ঋণের ধরন

ঋণের ধরন	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
কৃষি ঋণ	২	২	১	৫	১৭.২৪
গাভি ঋণ	২	১	-	৩	১০.৩৪
ছাগল ঋণ	-	-	১	১	৩.৪৫
মৎস্য ঋণ	-	১	-	১	৩.৪৫
ব্যবসা ঋণ	৪	১	১	৬	২০.৬৯
কৃষি+গাভি ঋণ	২	১	-	৩	১০.৩৪
কৃষি+ব্যবসা ঋণ	৩	২	১	৬	২০.৬৯
কৃষি+তাঁত ঋণ	-	১	১	২	৬.৯০
প্রযোজ্য নয়	১	-	১	২	৬.৯০
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, সর্বাধিক ২০.৬৯% করে উত্তরদাতা ঋণ নিয়েছেন ব্যবসা এবং কৃষিকাজ ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে। ঋণ নিয়েছেন মোট ১১ জন অর্থাৎ ৩৭.৯৩%। তাদের মধ্যে কৃষি ও গাভি ঋণ নিয়েছেন ১০.৩৪%, কৃষি ও ব্যবসা ঋণ নিয়েছেন ২০.৬৯%, কৃষি ও তাঁত ঋণ নিয়েছেন ৬.৯০%। কৃষি ঋণ নিয়েছেন ৫ জন অর্থাৎ ১৭.২৪%, গাভি ঋণ নিয়েছেন ১০.৩৪%, ছাগল ঋণ ও মৎস ঋণ নিয়েছেন ৩.৪৫% করে। কেউ কেউ গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে জমি বন্ধক রেখে চাষ করেছেন।

৭.২৪.৫ এনজিও সহায়তায় জীবনের পরিবর্তন

বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানুষ এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এসবের মধ্যে তাদের স্বাধীনতা বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয় বৃদ্ধি, অভাব দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, পারিবারিক চাহিদা পূরণ, পরিবারের সদস্যদের পড়াশুনা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, জীবনযাপন স্বাভাবিক রাখা, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি নানান উদ্দেশ্য থাকে। তবে দারিদ্র্য সকল উদ্দেশ্যকে একটি উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করে ফেলে– তাহলো অভাব দূরীকরণ। অন্য উদ্দেশ্যগুলো দরিদ্রতার কাছে ম্লান থেকে যায়। যেজন্য মাঠ গবেষণাকালে গৃহীত ঋণ জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন আনতে সহায়তা করছে উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে,সর্বাধিক উত্তরদাতা অভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন বলে জানান। কিন্তু উপার্জন বৃদ্ধি না পাওয়ায় তারা ঋণের চক্র থেকে বের হয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত অভাব থেকেই যাচ্ছে।সর্বাধিক ৩৪.৪৮% ঋণ গ্রহীতা মনে করেন অভাব দূর করতে চেষ্টা করাই ঋণ নেওয়ার কারণ। ২৭.৫৯% মনে করেন ঋণের টাকা আয় বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে। সঞ্চয় বৃদ্ধি, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও জীবনযাপন স্বাভাবিক রাখতে ঋণ নেন ৬.৯০% করে। পারিবারিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করছে বলে মনে করেন ১০.৩৪%। তবে তরা ঋণ নিয়ে যে চেষ্টাই করে থাকুক না কেন, তা দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই নয়। কারণ ঋণ পরিশোধ করতে তারা গলদঘর্ম হন। চলমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও চাহিদা পূরণের উপায় হিসেবে পুনরায় ঋণ নিয়ে থাকেন। এভাবে ঋণচক্রে আবদ্ধ থেকে তারা এনজিও-নির্ভরশীল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

নিচের সারণি থেকে ঋণ গ্রহণ তাদের জীবনে কি পরিবর্তন সংঘটনে সহায়তা করছে বলে উত্তরদাতারা মনে করেন তার চিত্র পাওয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি– ৭.৬৯
এনজিও সহায়তায় জীবনের পরিবর্তন

পরিবর্তনের ধরন	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
স্বাধীনতা বৃদ্ধি	-	-	-	-	-
আয়বৃদ্ধি	৪	৩	১	৮	২৭.৫৯
সঞ্চয় বৃদ্ধি	১	১	-	২	৬.৯০
অভাব দূরীকরণ	৫	৩	২	১০	৩৪.৪৮
নারীর ক্ষমতায়ন	-	-	-	-	-
পারিবারিক চাহিদা পূরণ	১	১	১	৩	১০.৩৪
পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা	১	-	১	২	৬.৯০
সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি	-	-	-	-	-
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	-	-	-	-	-
জীবনযাপন স্বাভাবিক রাখা	১	১	-	২	৬.৯০
পরিবেশ সংরক্ষণ	-	-	-	-	-
প্রযোজ্য নয়	১	-	১	২	৬.৯০
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

৭.২৫ বিদ্যুৎ ব্যবহার

জীবনমান পরিবর্তনে বিদ্যুতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্ব শর্ত বিদ্যুতের সহজলভ্যতা। ৩টি গ্রামের মধ্যে হাড়িপাড়ায় পল্লিবিদ্যুতায়ন হলেও অপর দুটি গ্রাম মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ায় পল্লিবিদ্যুৎ নেই। তবে তুলাতুলিপাড়ায় এক বছর হয়ে গেছে পল্লিবিদ্যুতের সংযোগ প্রদানের জন্য রড-সিমেন্টের ঢালাই খুঁটি বসানো হয়েছে। এখনও খুঁটিতে বিদ্যুতের তার লাগানো হয়নি। হাড়িপাড়ার ১৪টি গৃহস্থালীর মধ্যে ৪টি সম্পূরক হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে। পল্লিবিদ্যুৎ সংযোগ হওয়ার আগে থেকে তারা সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছেন। অন্যরা পল্লিবিদ্যুতের সংযোগের পর সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার বাদ দিলেও তারা বাদ দেননি। অপর গ্রাম দুটিতে সকল গৃহস্থালী সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। এই দুটি গ্রামে এখনও পল্লিবিদ্যুৎ যায়নি। সারণি৭.৭০ তিনটি গ্রামের উত্তরদাতাদের বিদ্যুতের ব্যবহার নির্দেশ করে।

সারণি– ৭.৭০

উত্তরদাতাদের সৌরবিদ্যুৎ ও পল্লিবিদ্যুৎ ব্যবহার

বিদ্যুৎ ব্যবহার	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
পল্লিবিদ্যুৎ	১০	-	-	১০	৩৪.৩৮
সৌরবিদ্যুৎ	-	৯	৬	১৫	৫১.৭২
পল্লিবিদ্যুৎ+সৌরবিদ্যুৎ	৪	-	-	৪	১৩.৭৯
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

সারণি ৭.৬৯ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ৩৪.৩৮% উত্তরদাতার ঘরে পল্লিবিদ্যুৎ আছে। সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করেন ৫১.৭২%। পল্লিবিদ্যুৎ ও সৌরবিদ্যুৎ দু' ধরনের বিদ্যুতের ব্যবহার আছে ১৩.৭৯% এর ঘরে। সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যাই বেশি। বিদ্যুৎ ব্যবহারের আগ্রহ রাখাইনদের আধুনিক জীবনযাপনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রমাণ করে। বিদ্যুৎ না থাকলে টিভি, মোবাইল কিছুই ব্যবহার করা যায় না। এই দু'টি প্রযুক্তি দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাত্রা পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মোবাইলে বর্তমানে কথা বলা, গান শোনা, মুভি দেখা, খবর পড়া, টিভি দেখা ইত্যাদি সম্ভব হচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রামের সাথে শহর ও প্রবাসের যোগাযোগ বৃদ্ধি করেছে। প্রবাসে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যবহার সম্পর্কিত একটি কেস স্টাডি এই অধ্যায়ে পরে তুলে ধরা হয়েছে।

৭.২৬ চিত্তবিনোদনের মাধ্যম

গ্রামীণ আদিবাসী সমাজে মানুষের অবসর সময় কাটানোর অন্যতম মাধ্যম খেলাধুলা করা, গানবাজনা শোনা, গল্পগুজব করা, হাটেবাজারে ও দোকানপাটে যাওয়া প্রভৃতি। প্রত্যেক সমাজেই চিত্তবিনোদনের নানা পন্থা থাকে। এগুলোর কোন কোনটি দৈহিকভাবে শরীর-স্বাস্থ্যের উপযোগী, কোন কোনটি মনের প্রশান্তি জোগায়। রাখাইনদের ঐতিহ্যবাহী অনেক খেলাধুলা আছে। সকল প্রকার খেলাধুলা শরীরচর্চার উপায় হিসেবে স্বাস্থ্য ভালো রাখে। খেলাধুলা দেখাও মনের জন্য একপ্রকার বিনোদন। আবার নাচ, গান, যাত্রা, নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপভোগ মনে প্রশান্তি আনে।

Dhaka University Institutional Repository

মন ভালো থাকলে শরীরও ভালো থাকে। তবে বর্তমানে চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। নিম্নের সারণিতে রাখাইন গ্রামবাসীর বর্তমানে অবসর সময় কাটানোর মাধ্যমগুলো তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৭১

উত্তরদাতাদের বিনোদনের মাধ্যম

চিত্তবিনোদনের মাধ্যম	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
প্রতিবেশির সঙ্গে আড্ডা	৪	৩	১	৮	২৭.৫৯
আত্মীয়ের বাসায় যাওয়া	-	-	-	-	-
হাটবাজারে যাওয়া	৩	১	-	৪	১৩.৭৯
স্থানীয় দোকানে বসা	২	২	১	৫	১৭.২৪
ক্লাবে যাওয়া	-	-	-	-	-
সমিতিতে যাওয়া	-	-	-	-	-
খেলাধুলা করা	-	-	-	-	-
রেডিও শোনা	১	-	১	২	৬.৯০
টিভি দেখা	২	১	১	৪	১৩.৭৯
জাল বোনা	২	২	১	৫	১৭.২৪
শিল্প সংস্কৃতির চর্চা করা	-	-	-	-	-
মন্দিরে প্রার্থনা করা	-	-	১	১	৩.৪৫
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি নির্দেশ করে যে, সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা প্রতিবেশির সঙ্গে আড্ডা দিয়ে অবসর সময় কাটান। এদের সংখ্যা শতকরা ২৭.৫৯ জন। শতকরা ১৩.৭৯ জন হাটবাজারে গিয়ে ও শতকরা ১৭.২৪ জন পাড়ার নিকটবর্তী স্থানীয় দোকানে বসে গল্পগুজব করে সময় কাটান। জাল বুনে সময় পার করেন শতকরা ১৭.২৪ জন। টিভি দেখে অবসর সময় কাটান শতকরা ১৩.৭৯ জন। রেডিও শোনেনশতকরা ৬.৯০ জন। মন্দিরে প্রার্থনা করেন শতকরা ৩.৪৫ জন। উত্তরদাতাদের কেউই আত্মীয়ের বাসায় যাওয়া, ক্লাবে বসা, সমিতিতে বসা, খেলাধুলা করা কিংবা শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা করেন না। দেখা যাচ্ছে, রাখাইনদের জীবনেও সময়ের সাথে সাথে বিনোদন মাধ্যমে পরিবর্তন এসেছে। বিনোদনের তেমন কোন পুরনো ব্যবস্থা বর্তমানে নেই বললেই চলে। বর্তমানে তাদের শরীরচর্চার খেলাধুলা একেবারেই নেই। অথচ সুস্থ সবল দেহ ও মন সুন্দর জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য। অতীতে সে-সবের যথেষ্ট আয়োজনও ছিল। গৃহে ও মাঠে অনেক খেলার প্রচলন ছিল। ঐতিহ্যবাহী অনেক খেলাধুলা প্রায় উঠে গেছে (চাকমা, ২০১৩: ৪৩৭)। গ্রামে অতীতের মতো

Dhaka University Institutional Repository

ফুটবল খেলা হয় না। অনেকে বিকেল বেলার মতো অবসর সময়ে ফুটবলসহ নানা খেলায় অংশ নিতো, অনেকে দর্শক হতো। বর্তমানে সেসব খেলাধুলা নেই। তাই খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ নেই; খেলা দেখে উপভোগেরও সুযোগ নেই। অতীতে পাশা, দাবা, নির্বাণ বা লুডু, ফুটবল, বেতের তৈরি বল, হাডুডু, নৌকাবাইচ, কুকিযুদ্ধ প্রভৃতি খেলা হতো। কিন্তু বর্তমানে হয় না বলে জানা যায়। নিকটস্থ খেলার মাঠ না থাকাকে কেউ কেউ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অতীতে রাখাইন ছেলেমেয়েরা এমন অনেক ধরনের খেলায় মেতে থাকতো যে-সবের বর্তামানে প্রচলন নেই, যেমন- 'আফোঃ আফোঃ জাতুঃ রে লে', 'তেং খাঃ ছু গ্রিঃ তেং খা ফওয়াং', 'ওয়েং গ্রি পেৎ পেৎ ওয়েং', 'খেৎ কাউ ছি', 'অবৌত্তোনধেং', 'বান তাঃধেং' 'কুড়িচি কাউতেং', 'অংলু ছিং ধেং', 'চিঃ ঠো ধেং', 'খ্রাং লুং কাজেৎতেং', 'তেং খুং ধেং', 'ঈনাঃ তারাঃ হোওয়া ধেং', বুচি সংমা কাজেৎতেং', 'টাইবু টাইবু কাজেৎ তেং', 'চক্রা ওয়েন ধেং', 'ক্রাইশে লাই তেং', 'ডো থো ধেং', 'আথৌশে পেই তেং', 'ডো কাজেৎ তেং', 'ধোঃ কা জেৎ ধেং' প্রভৃতি খেলা বর্তমানে সচরাচর খেলতে দেখা যায় না। তবে বর্তমান প্রজন্মের ছেলেরা ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করে। তাদের মধ্যেও মোবাইলে গেম খেলার আগ্রহ দেখা যায়। এটাকে অভিযোজনের ফল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এছাড়া আগে রেডিও শোনার সংস্কৃতি ছিল। বর্তমানে খুব অল্প সংখ্যক লোক রেডিও শোনেন। জনসচেতনতা তৈরিতে রেডিও'র ভূমিকা অপরিসীম। অথচ বর্তমানে এর কার্যকারিতা নেই। রেডিও'র প্রয়োজন অনেক তরুণরা মোবাইল থেকে মিটিয়ে থাকে। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বর্তমানে কম যাতায়াত হয় বলে জানা গেছে। কারণ হিসেবে জানা যায়, মোবাইলে খোঁজ-খবর রাখা সম্ভব হচ্ছে। এজন্য বেড়াতে যাওয়া কমে গেছে। গ্রামে সাংস্কৃতিক আয়োজনও নেই। অতীতে গ্রামে গ্রামে যাত্রা হতো, গান-বাজনা হতো। এখন হয় না। সংস্কৃতির এ-সব আয়োজন উঠে যাওয়ায় সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশ ও বিনোদন লাভ সম্ভব হচ্ছে না।

৭.২৭ তাঁত মালিকানা

গবেষণাধীন গ্রাম তিনটির রাখাইনদের আদি ও প্রধান পেশার মধ্যে তাঁত অন্যতম। কারো কারো প্রধান পেশা থাকলেও তাঁতের পেশা সবসময় সম্পূরক হিসেবে বজায় ছিল। মূলত নারীরা বেশি তাঁত চালাত। যুগ যুগ ধরে রাখাইনরা প্রত্যেকের ঘরের নিচে তাঁত বসিয়ে তাঁতশিল্প গড়ে তুলেছিল। অতীতে কোনো কোনো গৃহস্থালীর ২/৩টি তাঁতকলও ছিল। কাঠের তৈরি দোতলা বিশিষ্ট ঘরের নিচে তাঁত বসিয়ে কাপড় বুনতে হয় বলে নিচ তলায় চারদিকে সাধারণত খোলা রাখা হয়। বর্তমানে অধিকাংশ তাঁতকল বন্ধ। সেই তাঁতকল এখনো কোনো কোনো বাড়িতে অব্যবহৃত অবস্থায় কালের

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাখাইনদের জীবনে তাঁতশিল্পের গভীর প্রভাব সম্পর্কে তাদের সমাজে প্রচলিত একটি প্রবাদ থেকে অনুমান করা যায়– "একজন তাঁতীর মৃতদেহ জ্বালানী কাঠ ছাড়াই তার তাঁত-সরঞ্জামাদি দিয়ে সৎকার করা যায়।" প্রবাদটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে, একটি তাঁতকলে কাঠ ও বাঁশের অনেক প্রকারের অঙ্গ থাকে। সেইসব উপাদান দিয়ে একজন মৃত তাঁতির সৎকার সম্ভব, অতিরিক্ত কাঠের প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া, রাখাইনদের তাঁতশিল্পের সমৃদ্ধির স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নানা অনুষঙ্গে। তাঁতশিল্পকে ঘিরে তাঁত নৃত্য, লোককথা ও নাটক যেমন তাদের সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারকে ঋদ্ধ করেছে তেমনি সংস্কৃতিও বহন করে চলেছে তাদের তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধির ইতিহাসকে।

অতীতে গ্রামের নারীরা হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে কাপড় বুনে অর্জিত অর্থ দিয়ে একদিকে পরিবারকে স্বচ্ছল করে তুলতো, অন্যদিকে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল রাখতো। গ্রুপ ডিসকাশন থেকে জানা যায়, অতীতে রাখাইন মেয়েরা বাধ্যতামূলক তাঁত প্রশিক্ষণ নিত। তারা তাঁত বুননে অত্যন্ত পটু ছিল। এককালে তাঁত বুনতে জানে না এমন যুবতী বা নারী রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরল ছিল। নকশা করা লুঙ্গি, গামছা, থামি, চাদর, শাল, থলে প্রভৃতির কাজ গ্রামের প্রত্যেকে না জানলেও সাধারণ কাপড় বুনতে জানতোসবাই । আরো জানা যায়, অতীতে বিয়ের জন্য পাত্রী খোঁজার সময় তাঁতে পটুদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয় অভিভাবকদের মাথায় থাকতো। অথচ তাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প পেশা বর্তমানে বিলুপ্তির স্মারক মাত্র। হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ায় বর্তমানে ৬২ জন পেশাজীবীর মধ্যে কেবল ১০ জন অর্থাৎ ১১.৯০% তাঁত চালায়। নিম্নের সারণিদ্বয়ে রাখাইনদের অতীত তাঁত মালিকানা এবং বর্তমানে তাঁতের ব্যবহারের চিত্র দেখানো হয়েছে।

সারণি– ৭.৭২

উত্তরদাতাদের অতীত তাঁত মালিকানা

অতীত তাঁত মালিকানা	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
১টি তাঁতকল ছিল	৬	৩	২	১১	৩৭.৯৩
২টি তাঁতকল ছিল	৫	৪	২	১১	৩৭.৯৩
৩টি তাঁতকল ছিল	৩	২	২	৭	২৪.১৪
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

সারণি– ৭.৭৩

উত্তরদাতাদের তাঁতের বর্তমান অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

তাঁতের বর্তমান অবস্থা	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
১টি তাঁতকল চালু	১	১	১	৩	১০.৩৪
২টি তাঁতকল ছিল	-	১	২	৩	১০.৩৪
৩টি তাঁতকল চালু	-	-	-	-	
তাঁতকল বন্ধ	১৩	৭	৩	২৩	৭৯.৩২
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি ৭.৭২ থেকে দেখা যায়, রাখাইনদের ২৯জন গৃহস্থালীর মধ্যে ৩৭.৯৩ শতাংশের অতীতে ১টি করে তাঁতকল ছিল। অপর ৩৭.৯৩ শতাংশের ২টি করে তাঁতকল ছিল। তাদের মধ্যে ২৪.১৪ শতাংশের ৩টি তাঁতকল ছিল। সারণী থেকে এটা পরিষ্কার যে, তাদের প্রত্যেকের ঘরে তাঁতকল ছিল। আবার সারণি ৭.৭৩ থেকে দেখা যায়, বর্তমানে তিনটি গ্রামের প্রত্যেকটিতে মাত্র ১টি করে তাঁতকল চালু আছে অর্থাৎ ১০.৩৪%। দুটি গ্রামে ৩জনের ২টি করে তাঁতকল চালু আছে অর্থাৎ ১০.৩৪%। তবে কারোরই ৩টি তাঁতকল চালু নেই। অপরদিকে তাঁত বন্ধ আছে ৭৯.৩২% এর।বর্তমানে যারা তাঁতের কাজ করে তারা সীমিতভাবে উৎপাদন করে। কেউ কেউ কেবল নিজেদের ব্যবহারের জন্য তাঁত চালায়। বাজারের সাথে পেরে না ওঠার কারণে তাঁতশিল্প প্রায় একরকম বন্ধ অবস্থায়।এই তাঁতশিল্প বিলুপ্তির বহুবিধ কারণ জানা যায়। দলগত আলোচনা থেকে জানা যায়, গার্মেন্টস শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে তাদের তাঁতশিল্প বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান যুগের নতুন নতুন উন্নত ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্র চালিত তাঁত দ্বারা প্রস্তুতকৃত কাপড় হাতে বোনা কাপড়ের চেয়ে অনেক উন্নত ও টেকসই। আবার বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংমিশ্রিত রঙ সনাতন পদ্ধতিতে সংমিশ্রিত রঙের চেয়ে অনেক উন্নত। বিদ্যুৎ চালিত তাঁতে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ কাপড় তৈরি করা যায় এবং খরচের দিক থেকেও কম। একদিকে দিন দিন রঙ, সুতা ও রাসায়নিক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে হাতে বোনা কাপড়ের চাহিদা হ্রাস পায়। এছাড়া অবাধে বিদেশ থেকে আসা কাপড় সস্তায় বিক্রি হওয়ায় সবাই সে দিকে ঝুঁকে পড়ে। উপরন্তু, দেশের অভ্যন্তরে কাঁচামালের সংকট, মূলধনের অভাব, ব্যাংক থেকে উপযুক্ত পরিমাণে ঋণ সংগ্রহে জটিলতা, সরকারের পৃষ্টপোষকতার অভাব– এসব কারণে তাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প বিলুপ্তির সম্মুখীন।

দলগত আলোচনাকালে কেউ কেউ গুরুত্ব দেন যে, মিয়ানমারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতায় তাদের তাঁতশিল্পের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ১৯৫০-এর পূর্ব পর্যন্ত তাঁতে তৈরি কাপড় তারা মিয়ানমারে বিক্রি করতো। মিয়ানমারে তাদের কাপড়ের চাহিদা ও বাজার ছিল। পাকিস্তান সরকার কড়াকড়ি আরোপ করায় মিয়ানমারের সাথে অতীতের সহজ যোগাযোগে ছেদ পড়ে এবং তাদের তৈরি পোশাকের বাজারও সীমিত হয়ে যায়। সর্বোপরি তাদের এই তাঁতশিল্প রক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানের মতো সুষ্ঠু, পরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদি কোনো সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা

হয়নি। এরফলে ঐতিহ্যবাহী এই তাঁতশিল্প আজ মৃতপ্রায়। এর পরিণতিতে গ্রামগুলোর এককালের কর্মজীবি আত্মনির্ভরশীল রাখাইন নারীরা বর্তমানে বেকার ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে চলেছে। এই বেকারত্ব সরাসরি প্রভাব ফেলছে গ্রামের ও দেশের অর্থনীতিতে। যে অল্প দুই একজন এখন তাঁতের কাজ করে তারা সারাদিন পরিশ্রম করেও ১০০ টাকা উপার্জন করতে পারছে না। ফলে তাদের মধ্যেও এই আদি পেশার প্রতি একধরনের অনীহা তৈরি হচ্ছে। এই কারণে ভবিষ্যতে তাদের সমাজ থেকে এই তাঁতশিল্প পুরোপুরি বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

রাখাইনদের তাঁতশিল্প ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তারা সকলে কৃষিতে নিযুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের যেটুকু জমি ছিল তা পুরোপুরি অবলম্বন করেও উদ্বৃত্ত উৎপাদন, এমনকি জীবিকা নির্বাহও সম্ভব হয়নি। তাদের জীবনমান ক্রমান্বয়ে অনুন্নত হতে থাকে। রাখাইনদের তাঁতশিল্প ধ্বংসের যে প্রভাব তার সাথে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে বাঙালিদের তাঁতশিল্প ধ্বংসের প্রভাবের মিল লক্ষ্য করা যায়। আঠারো শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ডে ভারতীয় সুতিকাপড় নিষিদ্ধ করা হয়। ভারতীয় সকল সুতিপণ্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপ করা হয়। দেশীয় উৎপাদন বন্ধ হতে থাকে। হাজারো কাপড় শ্রমিক বেকারত্ব বরণ করে। ১৮১৪ সাল থেকে শুরু করে ১৮৮৪ সাল নাগাদ ব্রিটেনে রফতানি ৫ লাখ পিস থেকে নেমে মাত্র ৬৩,০০০ পিসে এসে দাঁড়ায়। ১৭৮৭ সালে যেখানে ঢাকাইয়া মসলিনের রফতানি ছিল ৩০ লাখ টাকা, ১৮১৭ সালে এর সমস্তই বন্ধ হয়ে যায় (করিম, ২০১১: ১২৭)। এর পরিণতি প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরু বলেন, "বেকার হয়ে যাওয়ার ফলে এসব শিল্পীরা বিপুল হারে দেউলিয়া হতে থাকে এবং কারিগরদের কোন কাজ ছিল না, কোন চাকরি তারা পায়নি এবং তাদের প্রাচীন শিল্পসত্তা ক্রমশ অকার্যকর হয়ে পড়ে। পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদের ভূমিতে কাজে নেমে যায়, যেটুকু জমি ছিল তাদের তাতেই। জমিকে পুরোপুরি অবলম্বন করেও তারা লাভের মুখ দেখতে পায়নি। শেষ পর্যন্ত জমি তাদের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এই দায় বাড়তে থাকে এবং এর সঙ্গে বেড়ে যায় দেশের দারিদ্র্য এবং মানসম্পন্ন জীবনব্যবস্থা অবিশ্বাস্যভাবে নিচে নেমে যায়।" (উদ্ধৃতি : করিম, ২০১১: ১২৭-২৮) যে-সকল রাখাইন তাঁত বন্ধ করে পুরোপুরিভাবে কৃষিতে নিযুক্ত হয়, তারা শেষ পর্যন্ত কৃষিতেও টিকে থাকতে পারেনি। ফসল কম উৎপাদন হওয়া, প্রাকৃতিক কারণে ফসল নষ্ট হওয়া, উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে কৃষিকে অবলম্বন করে টিকে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। দায়-দেনা পরিশোধ করতে গিয়ে শেষ সম্বল জমিটুকু বেচে দিয়ে বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

উল্লেখ্য, রাখাইনরা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে। সাধারণত মেয়েরা আ-থোংখে (৯ হাত লম্বা রঙিন সেলাইবিহীন নিম্নাংশের পরিধেয়, থামি, আংজি (ব্লাউজ) পরিধান করে। পুরুষরা লুঙ্গি, ধূতি, গেঞ্জি, জামা পরিধান করে। তবে বর্তমানে ছেলেরা বাঙালিদের মতো লুঙ্গি, প্যান্ট, শার্ট পরিধান করলেও মেয়েরা নিজেদের পোশাক পরে। কোন কোন নারী সালোয়ার কামিজ পরিধান করে।

সে সংখ্যা অনুল্লেখ্য। আগে গ্রামগুলোতে নিজেদের তাঁতকলে বানানো পোশাক পরলেও বর্তমানে তাঁত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের বাইরের বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়। গবেষক ক্ষেত্র গবেষণাকালে দেখতে পান, কক্সবাজার থেকে কাপড় ব্যবসায়ী ৫৭ বছর বয়সি মোঃ সিরাজুল ইসলাম একদিন বিকেলে হাড়িপাড়ার নিপু মাতবরের বাড়িতে আসেন। এই বাড়িতে রাত্রে অবস্থান করেন। পরের দিন বারান্দায় তার সওদা সামগ্রী নিয়ে বসেন। তখন গ্রামের নারী পুরুষরা এসে তার কাছ থেকে প্রয়োজন মতো কাপড় ও অন্যান্য মনিহারি-কসমেটিক্স জিনিস কিনে নিয়ে যান। এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, সিরাজুল ইসলাম প্রায় ২৫ বছরের অধিককাল ধরে এ ব্যবসায় যুক্ত। তিনি কক্সবাজার থেকে বার্মায় উৎপাদিত রাখাইনদের জিনিস নিয়ে পটুয়াখালী-বরগুনায় আসেন। পটুয়াখালীতে কলাপাড়ায় এলে হাড়িপাড়ায় নিপু মাতবরের বাড়িতে ওঠেন। নিপু মাতবরের পরিবারের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিপু মাতবরের বাড়িতে থেকে নিকটবর্তী রাখাইন গ্রামগুলোতে জিনিসপত্র বিক্রি করেন। তিনি ৩-৪ মাস পর পর আসেন এবং কয়েকদিন করে থেকে যান। রাখাইনরা তার কাছ থেকে নগদের পাশাপাশি বাকিতেও জিনিসপত্র ক্রয় করেন এবং পরবর্তীকালে সুবিধামতো সময়ে পরিশোধ করেন। স্বল্প লাভে জিনিস বিক্রি করেন বলে রাখাইনরাও তার কাছ থেকে জিনিস ক্রয় করেন। সিরাজুল ইসলাম খুবই মিশুক ও সদালাপী প্রকৃতির মানুষ। মুসলমান হয়েও তিনি বহু বছর ধরে রাখাইনদের সাথে ব্যবসা করে যাচ্ছেন। গবেষকের সাথেও তার আন্তরিকতা তৈরি হয় এবং তিনি গবেষককে কক্সবাজারে তার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ ও অনুরোধ জানান।

৭.২৮ গবাদি পশুর মালিকানা

কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী হওয়ায় অতীতে রাখাইন গ্রামবাসী ঘরে ঘরে নানান গবাদি পশু পালন করতো। কিন্তু বর্তমানে পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতিতে অনেকেরই কোন গৃহপালিত প্রাণী নেই। অতীতে কমবেশি সকল গৃহস্থালীরই গরু, মহিষ, ছাগল,হাঁস-মুরগিথাকত। অনেকেরই পর্যাপ্ত সংখ্যক মহিষ ছিল বলে জানা গেছে। অনেকে ভেড়া পালত, কেউ কেউ শুকর পালত। বর্তমানে কেউ আর ভেড়া ও শুকর পালে না। নিচের সারণিতে বর্তমানে রাখাইনদের গবাদি পশুর মালিকানার তথ্য দেওয়া হলো।

সারণি– ৭.৭৪

রাখাইন গৃহস্থালীদের গবাদি পশুর মালিকানা

গবাদি পশু	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
গরু	৮	৪	২	১৪	৪৮.২৪
ছাগল	৪	৩	৫	১২	৪১.৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ভেড়া	-	-	-	-	-
মহিষ	২	২	১	৫	১৭.২৪
শুকর	-	-	-	-	-
মোরগ-মুরগি	১০	৬	৪	২০	৬৮.৯৭
হাঁস	৩	২	১	৬	২০.৬৯

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, ৬৮.৯৭ শতাংশ গৃহস্থালী মোরগ-মুরগি পালন করে। চাষের প্রধান অবলম্বন গরু পালনকারীর শতকরা হার ৪৮.২৪। ছাগল আছে ৪১.৩৮ শতাংশের। অতীতে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের ভেড়া ছিল। বর্তমানে কারো ভেড়া নেই। মহিষ আছে কেবল ১৭.২৪ শতাংশের। অথচ অতীতে প্রত্যেক গ্রামে বড় বড় মহিষের গোট ছিল। অনেকে মহিষ পালতেন। বর্তমানে তারা মহিষ পালা ছেড়েই দিয়েছেন। গরু-মহিষ পালন ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আগের মতো বিলে যত্রতত্র গবাদি পশু ছেড়ে রেখে খাওয়ানো যায় না। বেঁধে রেখে খাওয়ালে গরুর পেট ওঠে না। মাঠে আগের মতো ঘাসও থাকে না। খড়-বিচুলি-ভুসি কিনে খাওয়ানোও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এজন্য অনেকে গরু পালন ছেড়ে দিয়েছে। কেউ কেউ জমি চাষের সময় অন্যের কাছ থেকে গরু ধার করে অথবা ভাড়ায় গরু নিয়ে জমি চাষ করে। আবার অনেকে সম্পূর্ণভাবে কৃষিবিযুক্ত পেশায় জড়িয়ে পড়ায় গরু পালনের ঝামেলা সহ্য করতে চায় না। তবে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে দু-তিন জন ছাগল পালন করেন।

৭.২৯ কৃষি যন্ত্রপাতির মালিকানা

অতীতে কৃষিজীবী রাখাইনদের সকল গৃহস্থালীর কমবেশি নানান কৃষি যন্ত্রপাতি ছিল। প্রত্যেক গৃহেই লাঙল, জোয়াল, কোদাল, মই, ছেনা, কাঁচি, খন্তা, দাউ, কুড়াল প্রভৃতি কৃষিযন্ত্র থাকতো। কিন্তু বর্তমানে কৃষিকাজ কম। কোন কোন পরিবারের কৃষির সাথে ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। যারা অল্প-বিস্তর কৃষিকাজে যুক্ত তাদের কারো কারো আর্থিক অসংগতির কারণে কৃষিযন্ত্রপাতি নেই। প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যের কাছ থেকে ধার নিয়ে কাজ সারেন। নিচের সারণিতে রাখাইনদের কৃষিযন্ত্রের মালিকানার চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৭৫

কৃষি যন্ত্রপাতির মালিকানা

কৃষি যন্ত্রপাতি	গ্রামভিত্তিক মালিকানা			মোট মালিকানা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
লাঙল	৫	৫	৩	১৩	৪৪.৮৩
জোয়াল	৪	৫	৩	১২	৪১.৩৮

কোদাল	৫	৪	৪	১৩	৪৪.৮৩
মই	৩	৩	৩	৯	৩১.০৩
ছেনা	৩	৪	৩	১০	৩৪.৪৮
কাঁচি	৩	৩	২	৮	২৭.৫৯
খন্তা	৩	২	২	৭	২৪.১৪
দাউ	৯	৬	৫	২০	৬৮.৯৭
কুড়াল	৫	৫	৪	১৪	৪৮.২৪
ধান মাড়াই কল	১	-	-	১	৩.৪৫

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

সারণি ৭.৭৫ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, লাঙল ও কোদাল আছে ৪৪.৮৩ শতাংশ গৃহস্থালীর। জোয়াল আছে ৪১.৩৮ শতাংশের। মই আছে ৩১.০৩ শতাংশের। দাউ আছে ৬৮.৯৭ শতাংশের। কুড়াল আছে ৪৮.২৪ শতাংশের। তিনটি গ্রামের রাখাইনদের মধ্যে কেবল ১ জনেরআধুনিক ধান মাড়াইয়ের কল আছে ১টি। ছেনা, কাচি, খন্তা প্রভৃতির মালিক খুব কমসংখ্যক গৃহস্থালী। খন্তা আছে মাত্র ২৪.১৪ শতাংশের। মূলত কৃষি কাজের সময় তারা একে অন্যের থেকে কৃষিযন্ত্রপাতি ধার নিয়ে কাজ করে থাকে। নিজেদের পর্যাপ্ত কৃষি কাজ না থাকা, কৃষি জমি ছেড়ে দেওয়া, কৃষিযন্ত্রের দাম বেড়ে যাওয়া, কৃষিযন্ত্র কেনার টাকা না থাকা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে অনেকের আর কৃষিযন্ত্রপাতি নেই। এক্ষেত্রে তারা পরস্পরে নির্ভরশীল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।

৭.৩০ আসবাবপত্রের মালিকানা

রাখাইনরা খুব সহজ-সরল ও আড়ম্বরহীন সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এজন্য তাদের গৃহে তেমন কোন আসবাবপত্র দেখা যায় না। প্রায় প্রত্যেক গৃহে মাচাঙের নিচে বা ঘরের পাতাটনের নিচে বসার জন্য টেবিল-চেয়ার-টুল থাকে। সাধারণত উঁচু করে কাঠের নির্মিত টং ঘরের কাঠের পাটাতনে তারা ঘুমায়। এজন্য পৃথক চৌকি ও খাট ব্যবহার করে না। জিনিসপত্র রাখার জন্য অতীতে কাঠের বাক্স ব্যবহার করত, বর্তমানে কেউ কেউ টিনের বাক্স ব্যবহার করে। জামা-কাপড় রাখার জন্য কেউ কেউ আলনা ব্যবহার করে। নিচের সারণিতে তাদের আসবাবপত্র ব্যবহারের তথ্য প্রদান করা হলো।

সারণি– ৭.৭৬

আসবাবপত্রের মালিকানা

আসবাবপত্র	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
টেবিল	১০	৫	৪	১৯	৬৫.৫২
চেয়ার	১৩	৬	৪	২৩	৭৯.৩১

টুল	৫	২	-	৭	২৪.১৪
কাঠের আলমারি	২	১	১	৪	১৩.৭৯
টিনের আলমারি	২	১	-	৩	১০.৩৪
কাঠের বাক্স	৬	৪	২	১২	৪১.৩৮
টিনের বাক্স	৮	৫	৪	১৭	৫৮.৬২
চৌকি	৩	৪	২	৯	৩১.০৩
খাট	-	১	-	১	৩.৪৫
আলনা	৭	৫	৩	১৫	৫১.৭২
প্লাস্টিক সেলফ	৩	২	১	৬	২০.৬৯

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৭৯.৩১ শতাংশের গৃহে চেয়ার আছে। টুল আছে ২৪.১৪ শতাংশের। টেবিল আছে ৬৫.৫২ শতাংশের। চৌকি ব্যবহার করে ৩১.০৩ শতাংশ। টেবিল, চেয়ার, টুল, চৌকি, সাধারণত টংঘরের নিচে থাকে। সেখানে বসে গল্প-গুজব, নাস্তা করা, কাজকর্ম প্রভৃতি সেরে থাকেন। এগুলোর অবস্থা খুবই শীর্ণ। কাঠের ও টিনের বাক্স আছে যথাক্রমে ৪১.৩৮ ও ৫৮.৬২ শতাংশের। আলনা ব্যবহার করেন ৫১.৭২ শতাংশ। প্লাস্টিকের সেলফ আছে ২০.৬৯% এর। টিনের বাক্স মূলত বাঙালিদের সংস্কৃতি থেকে গৃহীত।আগে কেবল কাঠের বাক্স ব্যবহার করতো। প্লাস্টিকের সেলফ ব্যবহারও সংস্কৃতিয়ানের প্রভাবজাত।

৭.৩১ রাখাইন গৃহস্থালীদের ইলেকট্রনিক সামগ্রীর মালিকানা

সময়ের আবর্তে রাখাইনদের মাঝে ইলেকট্রিক দ্রব্যের ব্যবহার শুরু হয়েছে। প্রযুক্তির সংশ্লিষ্টতা ছাড়া জীবন কাটানো এখন প্রায় অসম্ভব ও অকল্পনীয়। তাই অনেকেই মোবাইল ব্যবহার করছেন। টিভি দেখছেন। আগে রেডিও ছিল অনেকের। বর্তমানে নেই। রেডিও'র কাজটি অবশ্য এখন মোবাইলেই সারা যায় তা বলাই বাহুল্য। তরুণরা নানান মুভি ও নৃত্য-গান দেখার কাজ মোবাইলেই করে থাকে। নিচের সারণিতে বর্তমানে তাদের ইলেকট্রিক সামগ্রী ব্যবহারের চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৭৭

গৃহস্থালীদের ইলেকট্রনিক সামগ্রীর মালিকানা

ইলেকট্রনিক সামগ্রী	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
টিভি	৫	২	১	৮	২৭.৫৯
রেডিও	১	১	১	৩	১০.৩৪

মোবাইল	১১	৬	৪	২১	৭২.৪২
ক্যাসেট প্লেয়ার	-	-	-	-	-
সিডি	-	-	-	-	-
ভিসিডি/ডিভিডি	-	-	-	-	-
	১৭	৮	৬	৩২*	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

গবেষণায় এলাকায় ২৭.৫৯ শতাংশ উত্তরদাতার টিভি আছে। মোবাইল আছে অর্ধেকের বেশি উত্তরদাতার কাছে, শতকরা হার ৭২.৪২। রেডিও ব্যবহারকারী ১০.৩৪ শতাংশ। সিডি ও ডিভিডি কেউ ব্যবহার করে না। তবে অতীতে কয়েকজনের ভিসিডি ছিল বলে উত্তরদাতাদের কেউ কেউ জানান। প্রযুক্তির ব্যবহার তাদের বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেছে, পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যয়। অতীতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকায় এসব ইলেকট্রনিক দ্রব্য ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু এসবের প্রতি তাদের তেমন কোনো আকর্ষণও ছিল না। এই আকর্ষণ তৈরি হয়েছে বিগত দেড়-দুই দশক ধরে। সৌর বিদ্যুতের সুবিধা তাদের চিরায়ত অভ্যাস বদলে দিয়েছে। জীবনযাপনে ব্যয় বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করেছে। তবে পারস্পরিক যোগাযোগ সহজতর করেছে। প্রসংগত, মোবাইলে দেশ-বিদেশে যোগাযোগের কথা বলা যায়। মোবাইল ব্যবহার করে তারা নিত্য দিনের যোগাযোগের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি দূর-দূরান্তের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। মোবাইলে প্রবাসে যোগাযোগের একটি কেস-স্টাডি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

কেস-স্টাডি ১০ : অং মাতবরের প্রবাসে মেবাইলে যোগাযোগ

অং মাতবর (ছদ্মনাম) হাড়িপাড়ায় বাস করেন। তাঁর বয়স ৪৮ বছর। তাঁর দুই সন্তান। এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে বড়। বয়স ২৪ বছর। মেয়ে ছোট। বয়স ১৬ বছর। ছেলে-মেয়ে বর্তমানে মিয়ানমারে থাকে। ছেলে ১২ বছর আগেবার্মায় চলে যায়। সেখানে খালার বাসায় থেকে পড়াশুনা করে।পড়াশুনা শেষ করে সে বর্তমানে মিয়ানমারস্থ বাংলাদেশের প্রাণ কোম্পানিতে মার্কেটিংয়ের চাকরি করছে। মেয়েটিও ৭ বছর আগে মিয়ানমারে চলে গেছে। সেও সেখানে পড়ালেখা করছে। অং মাতবরের স্ত্রী ১-২ বছর অন্তর মিয়ানমারে গিয়ে ওদের সাথে দেখা করে আসে। দেখাসাক্ষাতের কাজটি স্ত্রীই করেন। তবে তিনি পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে বৈধভাবে মিয়ানমারে যান না। মূলত কক্সবাজার থেকে নৌকাযোগে মিয়ানমারে যান। এতে করে কম খরচে যাওয়া যায়। বর্তমানে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে শীতল পর্যায়ে রয়েছে। মিয়ানমারের আরাকান থেকে রোহিঙ্গাদের জোর করে বাংলাদেশে বিতাড়নের পর উভয় দেশের সম্পর্কের অবনতি

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে। উভয় দেশের সীমান্তে সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে। সেজন্য অবৈধভাবে সেখানে যাওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে। তবে না যেতে পারার জন্য তারা মোটেও বিচলিত নন। বর্তমানে প্রায় প্রতিদিন মোবাইলে ভিডিও কলের সংযোগে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তাদের কথা হয়। এজন্য তাদের আর ১-২ বছর পরপর যেতে হচ্ছে না এবং না যেতে পারলেও তাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় থাকতে হয় না। ইচ্ছে হলেই খোঁজ-খবর নেওয়া কিংবা যে-কোন আনন্দ-বেদনা শেয়ার করতে পারছেন। এতে করে তারা চিন্তামুক্ত থেকে কাজেকর্মে মনোযোগ দিতে পারে। প্রযুক্তি তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

৭.৩২ প্রাকৃতিক দুর্যোগে (সিডর) ক্ষতি

উপকূলবর্তী এলাকা হওয়ায় গ্রামগুলোতে ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় তাদের আর আতঙ্কিত করে না। প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হন তারা। বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিনা?– এমন প্রশ্নের জবাবে প্রায় সকল উত্তরদাতা ২০০৭ সালে সংঘটিত সিডরের কথাই স্মরণ করেন। কেননা সিডরের ভয়াবহতা এখনও তারা ভুলতে পারেননি। সিডরের সময় তাদের বেশিরভাগ বাড়িঘর পুরোপুরি বিনষ্ট হয়। অধিকাংশ বাড়িঘরের চাল বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। মাত্র কয়েকটি ঘর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব ঘরের বেড়া নষ্ট হয়ে যায়। নিম্নের সারণিতে সিডরে তাদের বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৭৮
প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডরে বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি

দুর্যোগ (সিডর)	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
বসতঘর আংশিক ভেঙে পড়া	৩	২	১	৬	২০.৬৯
বসতঘর তিন-চতুর্থাংশ ভেঙে পড়া	৪	২	১	৭	২৪.১৪
বসতঘর সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া	৫	৩	৩	১১	৩৭.৯৩
প্রযোজ্য নয় (বসতঘর অক্ষত থাকা)	২	২	১	৫	১৭.২৪
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র– ৭.২০
প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত

Dhaka University Institutional Repository

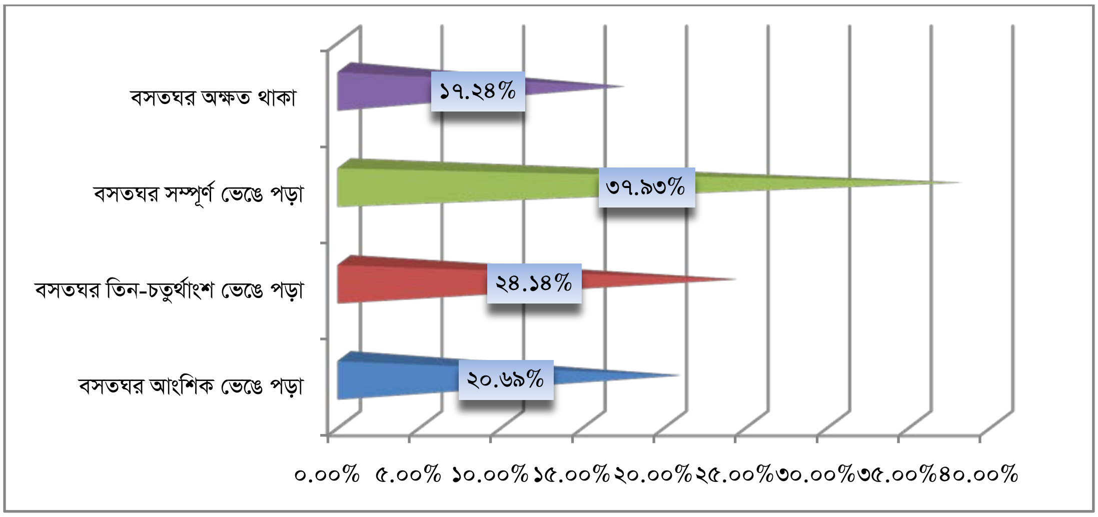

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, ২০০৭ সালের সিডরে ৩৭.৯৩% বসতবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। এছাড়া ২০.৬৯% আংশিকভাবে, ২৪.১৪% তিন-চতুর্থাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অক্ষত থাকে মাত্র ১৭.২৪%। সিডরে ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ হলো গৃহের দুর্বল কাঠামো। আর আর্থিক অসংগতির কারণে মজবুত কাঠামোয় বাড়ি তৈরি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়ে উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা এক রকম হতাশাই ব্যক্ত করে জানান, সে সময় কোন কোন এনজিও থেকে চাল-ডাল দেওয়া হয়। এ-ছাড়া তাদের কেউ কেউ ঘর তৈরির জন্য ক্যাশ ৫০০০ টাকা অনুদান লাভ করেন। এই অনুদানের টাকা নতুন ঘর তৈরির মতো পর্যাপ্ত না হওয়ায় কেউ কউ অভাব মেটাতে দৈনন্দিন পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যয় করে ফেলেন বলে জানা যায়। গৃহনির্মাণে নিজেদের সামর্থ্য না থাকায় সরকারি-বেসরকারি সহায়তার উপর নির্ভর করা তাদের নির্ভরশীলতা জনিত অনুন্নয়নকে নির্দেশ করে, যা থেকে তারা বের হয়ে আসতে পারছে না। গবেষক ২০০৯ সালে গবেষণা এলাকা পরিদর্শনকালে লালুয়া ইউনিয়নের লালুয়া গ্রামে অবস্থানকালে আলাপচারিতায় জানতে পারেন, সিডরের রাতে হঠাৎ করে বাঁধ ভেঙে রামনাবাদ চ্যানেলের পানি হুহু করে গ্রামে ঢুকে পড়ে। মুহূর্তে ঘরবাড়ি পানিতে ডুবে যায়। পরিবারের লোকজন ঘরের চালের উপর আশ্রয় নেয়। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ১৭ নভেম্বর দেশে সংঘটিত প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় সিডরে উপকূলীয় জনপদগুলো মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। সরকারি হিসেবে ৩৩৪৭ জন নিহত, ৫৫,২৮২ জন আহত ও ৮৭১ জন নিখোঁজ হয়। এছাড়া অন্যান্য সহায়-সম্পদের বেশুমার ক্ষতি হয়।

৭.৩৩উত্তরদাতাদের বঞ্চনা অনুভব

বিভিন্ন সময়ে রাখাইনরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এই বঞ্চনা বিশেষ করে প্রশাসনিক পর্যায়ে বেশি। যে-কোন ধরনের বিচারের ক্ষেত্রে তারা পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করে থাকেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৬২.০৭%-এর মতো অর্ধেকের বেশি উত্তরদাতা বঞ্চনা অনুভব করেন। কেবল ২০.৬৯% বঞ্চনা অনুভব করেন না বলে জানান। এ-বিষয়ে জবাবদানে বিরত থাকেন ১৭.২৪%। নিম্নের ৭.৭৭ নং সারণিতে এ-সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৭৯

উত্তরদাতাদের বঞ্চনা অনুভব

বঞ্চনা অনুভব	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	নিপুপাড়া	মধুপাড়া	তুলিতুলিপাড়া		
বঞ্চনা অনুভব করেন	৮	৬	৪	১৮	৬২.০৭
বঞ্চনা অনুভব করেন না	৩	২	১	৬	২০.৬৯
জবাব নেই	৩	১	১	৫	১৭.২৪
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র– ৭.২১

উত্তরদাতাদের বঞ্চনা অনুভব

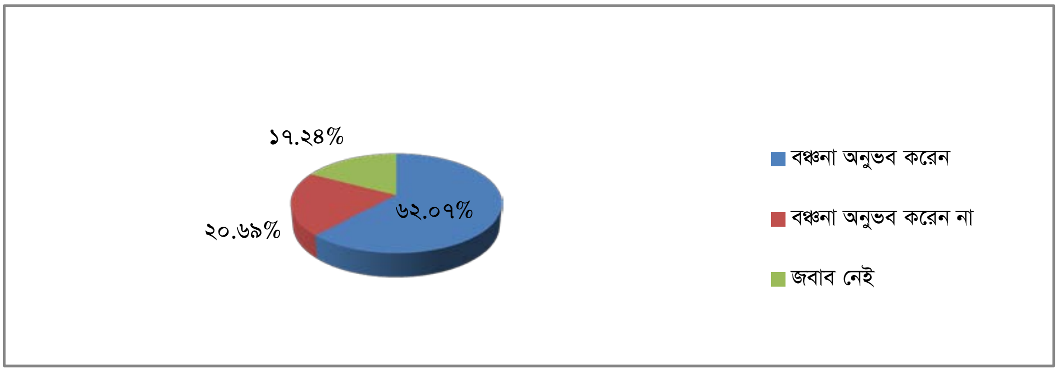

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

রাখাইনরাদৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে নানা পর্যায়ে যেমন ব্যক্তি, সমাজ, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন বলে মনে করেন। তবে রাষ্ট্রের থেকে বঞ্চনার অভিযোগ নেই।নিম্নে উত্তরদাতাদের বঞ্চনা অনুভবের ধরনসমূহ তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৮০

উত্তরদাতাদের বঞ্চনার ধরন

Dhaka University Institutional Repository

বঞ্চনা অনুভব	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
ব্যক্তি পর্যায়ে	২	১	১	৪	১৩.৭৯
সমাজ পর্যায়ে	১	১	১	৩	১০.৩৪
ইউনিয়ন পর্যায়ে	৩	১	১	৫	১৭.২৪
উপজেলা পর্যায়ে	৩	৩	২	৮	২৭.৫৯
জেলা পর্যায়ে	২	২	-	৪	১৩.৭৯
রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে	-	-	-	-	-
জবাব নেই	৩	১	১	৫	১৭.২৪
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

উপরের সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সর্বাধিক ২৭.৫৯% উত্তরদাতা উপজেলা পর্যায়ে বঞ্চিত হয়েছেন বলে মত দেন। উল্লেখ্য, উপজেলা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একক। ব্যক্তি ও জেলা পর্যায়ে বঞ্চনার কথা বলেছেন ১৩.৭৯% করে উত্তরদাতা। নানারকম বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন ক্ষেত্রে সঠিক বিচার পাওয়ার সম্ভাবনায় তাদের আস্থা হারিয়ে গেছে। নানান প্রভাব তাদের হতাশাগ্রস্ত করেছে। অর্থ-ক্ষমতার প্রভাব ও আমলাতন্ত্রের মেলবন্ধন এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ন্যায্য বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের হতাশাগ্রস্ত করেছে।

৭.৩৪ প্রতিবেশি বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রতিবেশি বাঙালিদের সাথে রাখাইনরা মিলেমিশে বসবাস করে। পরিজন ও বন্ধু এবং প্রতিবেশী স্থানীয় অনেকে নিত্যদিন রাখাইন পাড়ায় যাতায়াত করে। গল্পগুজবে মেতে ওঠে। গবেষক ক্ষেত্র গবেষণাকালীন পার্শ্ববর্তী গ্রামের কয়েকজন বাঙালি মুসলমানকে মাঝে-মধ্যে হাড়িপাড়ায় যাতায়াত করতে দেখেন। পাশের আইমপাড়ার জসিমউদ্দীন (বয়স ৪৯) ও চর নজিরের আল-আমিনের (বয়স ৩৪) সঙ্গে হাড়িপাড়ার মহেনচিং মাতবরের একত্রে ওঠাবসা-খাওয়ার মতো বন্ধুত্বের সম্পর্ক। নিপু মাতবরের সঙ্গেও গাঢ় সম্পর্ক। এছাড়া স্থানীয় দোকানে ও নিকটবর্তী বাজারে বাঙালিদের সাথে তাদের ওঠাবসা স্বাভাবিক প্রকৃতির বলেই গবেষকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। বালিয়াতলী বাজারের ছোট একটি ফার্মেসির মালিক ও স্থানীয় সাংবাদিকঝুনু কবীর (বয়স ৪৭)নিপু মাতবরের বন্ধু। তবে দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নানারকম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে। দীর্ঘদিনের চিন্তা-চেতনা লালনপালনে এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, যেটা সরল চোখে বোঝা যায় না। কিন্তু পক্ষ-বিপক্ষের সকলে কম-বেশি তা আঁচ করতে পারেন। যেমন ২০১১ সালে গবেষণা এলাকা পরিদর্শনকালে পটুয়াখালী-ঢাকাগামী সাকুরা পরিবহনের কলাপাড়া কাউন্টারে টিকিট কাটার একপর্যায়ে কাউন্টার ম্যানেজার আলাপকালে

Dhaka University Institutional Repository

গবেষককে আকস্মিক প্রশ্ন করে জানতে চান, "রাখাইনরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন তা জানতে পারলেন?"এতে গবেষক কতক বিস্মিত হন। কেননা, বিষয়টি সম্পর্কে সে পরিপূর্ণ অবগত। কিন্তু তার এ-স্বনির্মিত প্রশ্নে কোন আন্তরিকতা ছিল না, বরং ছিল ব্যঙ্গ ও পরিহাসের ভাব। যেন রাখাইনরা দেশ থেকে চলে গেলেই তার জন্য ভালো হবে। যাই হোক, রাখাইনদের প্রতি বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গির ভালোমন্দের মিশ্র তথ্য ওঠে এসেছে গবেষণা থেকে। নিচের সারণি থেকে এ-বিষয়ে উত্তরদাতাদের মনোভাব সহজে বোঝা যাবে।

সারণি–৭.৮১

প্রতিবেশি বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গি

দৃষ্টিভঙ্গি	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
ভালো	৫	৩	২	১০	৩৪.৪৮
ভালো না	৩	৩	২	৮	২৭.৫৯
মোটামুটি	৫	২	২	৯	৩১.০৩
জবাব নেই	১	১	-	২	৬.৯০
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, ২০১৮

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৩৪.৪৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করে তাদের প্রতি বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গি ভালো। ২৭.৫৯% মনে করে ভালো না। ৩১.০৩% এর ধারণা মোটামুটি। জবাবদানে বিরত থাকেন ৬.৯০%। জবাবদানে বিরত থাকাটা এক ধরনের কৌশল। এটা না ভালো, না খারাপ অবস্থাকে যেমন নির্দেশ করে, তেমনি প্রকৃত তথ্য প্রদানে অপারগতাকেও নির্দেশ করে। গবেষক গ্রুপভিত্তিক আলোচনাকালে জানতে পারেন কোন কোন বাঙালি রাখাইনদের এড়িয়ে চলে। রাখাইনদের সাথে মিশতে চায় না। অনেকে তাদের হেয় চোখে দেখে থাকেন। এ সম্পর্কে তাহান বলেন, প্রভাবশালী বাঙালিরা তাদের সভ্য বলে মনে করে না। তারা খুবই হেয় চোখে দেখে। জঙ্গলের অধিবাসী না হয়েও, সমতল ভূমির মানুষ হয়েও স্থানীয় বাঙালিদের ভাষায় তারা জংলী বলে বিবেচিত (মজিদ, ১৯৯২: ১৩৪)। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা হাতে গোনার মতো নিতান্তই কম। বিষয়টি গবেষক নিজেও লক্ষ্য করেন। এ-সংক্রান্ত একটি কেস-স্টাডি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

কেস-স্টাডি১১:মুসলমান কলিমের প্রতিবেশি রাখাইনদের এড়িয়ে চলা

Dhaka University Institutional Repository

কলিম (ছদ্মনাম) বাঙালি মুসলমান। তার বয়স ৪৫ বছর। গায়ের রং কালো। মুখে বেশকালো দাঁড়ি। হাড়িপাড়ার রাখাইন পল্লির দক্ষিণ সীমানা বরাবর তার ঘর। গবেষক লক্ষ্য করেন, তিনি মাঝে মাঝে হাড়িপাড়ার ডিপ টিউবওয়েল থেকে কলস কিংবা বালতিতে করে পানি নিয়ে যান। এসময় তিনি পারতপক্ষে কারো সাথে কথা বলেন না। আশেপাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনও না। কাছে-ধারে রাখাইন কেউ কেউ দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকলেও তিনি তাদের সাথে কথা-বার্তা বিনিময় করেন না। নিজে নিজে পাত্রে পানি ভরে নিয়ে চলে যান। তার এ-ধরনের আচরণে রাখাইনরা মনে কিছুটা কষ্ট পান। মহেন মাতবরের মতে, রাখাইনরা মনে করে যে, কলিম তাদের গরীব ও অন্য জাতিগোষ্ঠীর লোক হিসেবে এড়িয়ে চলেন। কলিম তাদের সাথে কথাবার্তা বললে তারাও আগ্রহ নিয়ে তার সাথে ভাব-বিনিময় করতে পারতো। অথচ নিকট প্রতিবেশি হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে কোনরকম আলাপচারিতা নেই। রাখাইনরা মনে করেন, তিনি রাখাইনদের বোধহয় ঘৃণা করেন, যেজন্য তাদের এড়িয়ে চলেন। তাদের সাথে মিশতে চান না। তা না হলে নিকটতম প্রতিবেশি এভাবে তাদের দীর্ঘকাল ধরে এড়িয়ে চলে কেন? এ থেকে রাখাইনদের প্রতি কোন কোন বাঙালি প্রতিবেশির মনোভাব যে যথেষ্ট ইতিবাচক নয় তা প্রতীয়মান হয়।

৭.৩৫ রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর দেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কোন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে তাদের আস্থা অর্জনের তেমন কোন নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং বিভিন্ন সময়ে তাদের দলীয় অবস্থান নৃগোষ্ঠীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছে। বিশেষ করে ধর্মীয় দলগুলো এদের প্রতি দারুণভাবে বিরুদ্ধ। যার ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি তাদের ভরসা তৈরি হয়নি। এর প্রতিফলন রাজনৈতিক দলের প্রতি রাখাইনদের ধারণাতে প্রতিফলিত হয়। রাখাইনদের প্রতি স্থানীয় রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন তা জানতে চাওয়ার জবাবে প্রাপ্ত তথ্যে সে সত্যই বের হয়ে আসে। নিম্নের সারণিতে সে চিত্র পাওয়া যায়।

সারণি– ৭.৮২

রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি

দৃষ্টিভঙ্গি	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গুসংখ্যা	শতাংশ
	নিপুপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
ভালো	৩	৩	২	৮	২৭.৫৯
ভালো না	৪	৪	২	১০	৩৪.৪৮
মোটামুটি	৬	২	১	৯	৩১.০৩

জবাব নেই	১	-	১	৩	১০.৩৪
	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র– ৭.২২

রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি

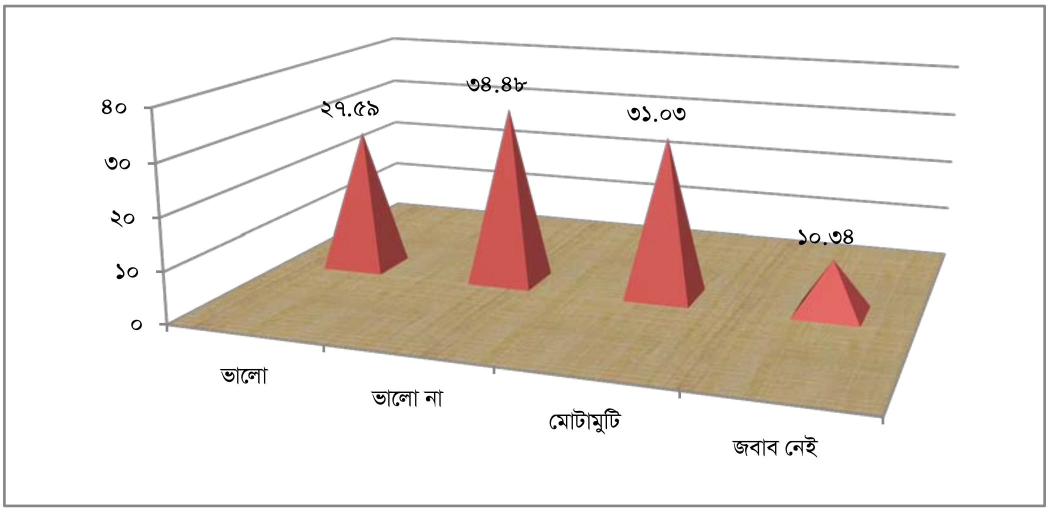

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

সারণি ৭.৮০ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক ৩৪.৪৮% মনে করেন রাখাইনদের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নয়। তাদের মধ্যে ৩১.০৩% মনে করেন দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটি। দৃষ্টিভঙ্গি ভালো মনে করেন ২৭.৫৯%। জবাব দেননি ১০.৩৪%। যারা ভালো বলে মত দেন তাদের কেউ কেউ বুদ্ধির উত্তর দিয়েছেন বলে গবেষকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর যাতে করে তাদের প্রতি কোন সন্দেহের সৃষ্টি না হয় এ-ব্যাপারে তারা সতর্ক। অধিকাংশ উত্তরদাতা মোটামুটি বলার পক্ষে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ অবলোকন করেছেন যে, দেশে যখন কোন রাজনৈতিক দল সরকারের বাইরে বিরোধী পক্ষে অবস্থান করে তখন নৃগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি দেখায়, সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করে, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে নৃগোষ্ঠীর পক্ষে বিবৃতি দেয়। কিন্তু যখন তারা ক্ষমতাসীন দল হয়ে ওঠে তখন তারা নৃগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়ার বিরুদ্ধাচরণ করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবকাল থেকে নৃগোষ্ঠীর লোকেরাএ-অভিজ্ঞতা লাভ করে আসছে। আর এর প্রতিফলন ঘটেছে উত্তরদাতাদের জবাবদানের মধ্যে।

৭.৩৬ নারীদের চলাফেরা ও কাজকর্মে সমস্যা

রাখাইন সমাজে নারীর অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ় ও মর্যাদাপূর্ণ। তাদের মধ্যে লিঙ্গ-বৈষম্য নেই। নারী-পুরুষে সমান মর্যাদা ভোগ করে। রাখাইন এলাকায় বাঙালিদের অভিবাসনের ফলে অতীতে রাখাইন নারীদের চলাফেরায় নানান সমস্যা ভোগ করতে হয়েছে। মাঠে কৃষিজমিতে কাজ করতে গিয়ে শারীরিক নির্যাতনেরও শিকার হয়েছেন কেউ কেউ (মজিদ, ১৯৯২)। তবে বর্তমানে এ-অবস্থার উন্নতি হয়েছে। গবেষক সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আলাপচারিতা থেকে জানতে পারেন যে, বর্তমানে নারীদের রাস্তাঘাটে, হাটবাজারে, দোকানপাটে চলাচল ও কেনাকাটা করতে তেমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। আর ভূমিহীনতার কারণে নারীদের আগের মতো মাঠে কাজ করতে হয় না। সেজন্য নির্জনতার সুযোগে প্রতিবেশিদের দুর্ব্যবহার ও শারীরিক নির্যাতনের অবকাশও নেই। নারীদের চলাফেরা ও কাজকর্ম করতে সমস্যা হয় কিনা সে সম্পর্কিত উত্তরদাতাদের অভিমত নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি– ৭.৮৩

নারীদের চলাফেরা ও কাজকর্মে সমস্যা বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমত

সমস্যা	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	নিপুপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
সমস্যা হয়	২	২	১	৫	১৭.২৪
সমস্যা হয় না	১০	৫	৩	১৮	৬২.০৭
কম-বেশি সমস্যা হয়	২	২	২	৬	২০.৬৯
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

নারীদের চলাফেরা ও কাজকর্মের সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ ৬২.০৭% উত্তরদাতা জবাব দেন সমস্যা হয় না মর্মে। সমস্যা আছে বলে মনে করেন ১৭.২৪%। অল্প-স্বল্প সমস্যা আছে বলে জানান ২০.৬৯%। তথ্য অনুযায়ী তাদের কিছুটা রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া পায়। তারা নারীদের চলাফেরায় নিরাপত্তার বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত নন। পশ্চাতে তাদের মধ্যে নানারকম ভীতি ক্রিয়াশীল আছে বলে প্রতীয়মান হয়। গভীরভাবে ভেবে দেখলে যেটা মনে হতে পারে, তাদের নারীদের ঐতিহ্যগত স্বল্প বসনের কারণে বাঙালিদের সামনে তারা পুরোপুরি নিঃসংকোচ নন। এরফলে তারা বাইরের কাজকর্ম থেকেও নিজেদের কিছুটা গুটিয়ে রাখার চিন্তা করে থাকতে পারেন। গবেষক লক্ষ্য করেন, হাড়িপাড়ার নিপু মাতবরের স্ত্রী বাড়িতে

Dhaka University Institutional Repository

থাকাকালে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী থামি ও লুঙ্গি পরিধান করে থাকেন। তবে যখন বাড়ির বাইরে অন্যত্র কোথাও কাজে যান তখনতিনি বাঙালিদের মতো সেলোয়ার-কামিজ পরিধান করেন। অবশ্য গবেষক স্থানীয় বালিয়াতলী বাজারে সকাল-বিকেল কয়েকজন নারীকে নিজেদের পোশাক পরিধান অবস্থায় সওদা করতে দেখতে পান যা খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে।

৭.৩৬.১ নারীদের কর্ম সংযুক্তি

কৃষিজীবি সমাজ হিসেবে রাখাইন নারীদের অতীতে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কৃষি-সম্পৃক্ত নানান কাজে ব্যস্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।চাষবাস ও রুটিরুজির সংস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিশ্রমী কাজ মেয়েদের উপর ন্যস্ত ছিল (Sattar, 1983)। বন-জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের কাজও নারীরা করতো। তাছাড়াও প্রত্যেক নারী তাঁতের কাজে যুক্ত ছিল। কখনও কখনও নারীরা পুরুষের চেয়ে অধিক পরিশ্রম করে জীবনধারণ করতো। বর্তমানে কৃষিকাজ নেই, তাঁতও নেই। সমতল ভূমি হওয়ায় বন-জঙ্গল উজাড় হয়ে গেছে। তাই গৃহস্থালী কাজ ব্যতীত নারীরা প্রায় কর্মহীন। আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতিতে কর্মসংযুক্তিহীনতায় নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারছে না। নারীরা পূর্বের মতো কাজেকর্মে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারছে কিনা– এই প্রশ্নের জবাবে ৭৯.৩১% উত্তরদাতা ‘না’ সূচক জবাব দেন। মাত্র ২০.৬৯% মোটামুটি পারছে বলে মত দেন। তবে সম্পূর্ণ ‘হ্যাঁ’ বাচক জবাব পাওয়া যায়নি। নিচের সারণিতে তিনটি গ্রামের রাখাইন নারীদের কাজেকর্মে ভূমিকা পালন সম্পর্কিত মতামতের তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি– ৭.৮৪
কাজকর্মে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা পালনের বিষয়ে উত্তরদাতাদের অভিমত

ভূমিকা পালন	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
ভূমিকা রাখতে পারছে	-	-	-	-	-
ভূমিকা রাখতে পারছে না	১১	৭	৫	২৩	৭৯.৩১
মোটামুটি	৩	২	১	৬	২০.৬৯
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

বলা বাহুল্য, ভূমিহীনতা এই নৃগোষ্ঠীর নারীদের কর্মবিযুক্তিকরণে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। ভূমি না থাকায় নানান ধরনের ফসল ফলনের জন্য যে নানামুখী কাজ করতে হয় তা আর বর্তমানে প্রয়োজন পড়ে না। আবার তাঁতও অলাভজনক হওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারও ঘটেনি যে তারা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাকরি করবে। এই অবস্থায় নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিতান্ত সীমিত। আয়-বর্ধকহীন পারিবারিক কাজ যেমন রান্নাবান্না, সন্তান পালন ইত্যাদির মধ্যে তাদের কার্যক্রম সীমিত।

৭.৩৭ পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালন

গৌতম বুদ্ধের অনুসারী বাংলাদেশের রাখাইনরা মূলত হীনযান বা থেরবাদী। তারা বরাবরই তাদের ইতিহাস, শিল্প, কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত। তাদের উৎসব পার্বণ সচরাচর পূর্ণিমা তিথিতে হয়ে থাকে। উৎসবে থাকে নানা আয়োজন। কিন্তু আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থায় পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় অনেক উৎসব আয়োজন কমে গেছে। বিভিন্ন উৎসবের নানান প্রথা উঠে গেছে। জন্ম, মৃত্যু,বিবাহ প্রভৃতি পারিবারিক উৎসব; নবান্ন, বর্ষবরণ (সাংগ্রেং পোয়ে), রথোৎসব ইত্যাদি সামাজিক উৎসব; বুদ্ধ পূর্ণিমা, বর্ষাবাস (আষাঢ়ী পূর্ণিমা), আশ্বিনী পূর্ণিমা, কঠিন চিবর দান প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসব অতীতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপিত হতো। থাকতো নানা আয়োজন। বিবাহের মতো পারিবারিক উৎসবে রাখাইনরা অতীতে নানা আয়োজন ও প্রথা-প্রক্রিয়ায় পনেরো দিন ধরে মেতে থাকত। আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়া আয়োজন নানা পর্ব ও আনন্দময় ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে পনেরো দিন পর সমাপ্ত হতো। নবজাতক জন্মের পর আঁতুর ঘরে প্রসূতি মায়ের পাঁচদিন

অবস্থানকালে থাকতো নানা পর্ব। ছেলেমেয়েরা গৃহের পাশে পাশা খেলে সারারাত কাটিয়ে দিত। চলতো উপহার সামগ্রী প্রদান ও আপ্যায়ন। পঞ্চম দিনে বিহারে খাবার দানসহ এলাকার লোকজনদের মধ্যাহ্নভোজ দেওয়া হতো। শিশুর নামকরণ, মেয়েশিশুর কর্ণছেদন ইত্যাদি পারিবারিক নানান উৎসবে আনুষ্ঠানিকতা থাকতো। কিন্তু বর্তমানে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে অনেক প্রথা অনুসৃত হয় না।জনসংখ্যা কমে যাওয়া ও আর্থিক সামর্থ্য হারানো প্রভৃতি আয়োজন সংক্ষিপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। চিড়া, বিন্নি ভাত ও রকমারি পিঠার পরিবেশনে পালিত নবান্ন উৎসব; জলকেলি, নৌকা বাইচ, বলীখেলার সমবায়ে সাংগ্রেং উৎসব ইত্যাদি সামাজিক উৎসব বর্তমানে আগের মতো বিশাল আকারে হয় না। ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন সকল বয়সের নারী পুরুষ বিহারে যায়। প্রত্যুষে পুষ্পপূজা, জলপূজা, মধ্যাহ্নে আহারপূজা, সংঘদান, সন্ধ্যায় প্রদীপপূজা করা হয়। এলাকায় এলাকায় শোভাযাত্রা, ভিক্ষুদের পিণ্ডদান, বুদ্ধকে চন্দনজলে স্নান, ধর্মীয় কোরাস, ধর্মদেশনা অনুষ্ঠিত হয়। বুদ্ধের অনুশাসন পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল ইত্যাদি প্রতিপালিত হয়। মঞ্চস্থ করা হয় ধর্মীয় নাটক। প্রবারণা পূর্ণিমায় দিবস শুরুর সাথে সাথে প্রত্যুষে পুষ্পপূজা, জলপূজা, মধ্যাহ্নে আহারপূজা, সংঘদান ও সন্ধ্যায় প্রদীপপূজা করা হয়। বয়স্করা বিহারে অবস্থান করে উপোসথ গ্রহণ করে। রঙিন ফানুস বাতি উড়ানো হয়। বিহারাকৃতির 'প্রেছেট' নির্মাণ করে তা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়। কঠিন চিবর দানে নির্বাচিত ভিক্ষুকে রাখাইন নারীরা রাত ১২টা থেকে ভোর ৬টার মধ্যে তৈরিকৃত চীবর ছাড়াও ভিক্ষুর পরিধেয় অন্যান্য পোশাক, বই-পুস্তক, কলম-পেন্সিল, তোয়ালে, সেন্ডেল, ছাতা, সাবান ইত্যাদি দেওয়া হয়। প্রায় সপ্তাহব্যাপী পাড়ায় পাড়ায় চলে তরুণ-তরুণীদের বনভোজনের আনন্দ-ফূর্তি। তবে এক সময়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এসব উৎসব পালিত হয়ে থাকলেও বর্তমানে এসবের আয়োজনে ভাটা পড়েছে (অং, ২০০৩: ১৫২)। নিচের সারণি থেকে অতীতের মতো সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসব পালনে বর্তমানে সক্ষমতার বিষয়ে রাখাইনদের মতামত তুলে ধরা হলো।

সারণি– ৭.৮৫

পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালন

পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালন	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
হ্যাঁ	-	-	-	-	-
না	৮	৫	৪	১৭	৫৮.৬২
মোটামুটি	৬	৪	২	১২	৪১.৩৮

	১৪	৯	৬	২৯	১০০.০০

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র– ৭.২৩

পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালন

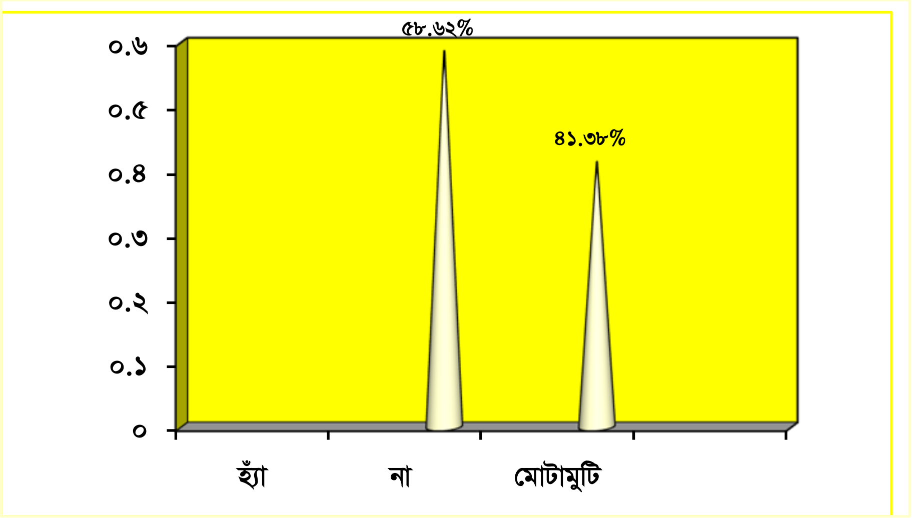

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের কেউই বর্তমানে উৎসব, আচার-অনুষ্ঠানসমূহ আগের মতো পালন করতে পারছেন বলে মত দেননি। বরং সরাসরি পারছেন না বলে মত দিয়েছেন অর্ধেকের বেশি, শতকরা হারে ৫৮.৬২ জন। তাদের মধ্যে ৪১.৩৮% মোটামুটিভাবে পালন করতে পারছেন বলে মনে করেন। এই জনগোষ্ঠীর অতীতের জৌলুসপূর্ণ সকল উৎসব আয়োজন দিনে দিনে মলিন হচ্ছে, তারাবর্তমানে নিজেদের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানগুলো আনন্দমুখরতা সহকারে পালন করতে পারছে না।

আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থায় পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনেক উৎসব আয়োজন কমে গেছে। আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থার কারণে হাড়িপাড়ার ও মধুপাড়ার মন্দির দুটিতে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ীভাবে পুরোহিত বা ঠাকুর রাখা সম্ভব হয় না। কেবল বড় বড় উৎসবে আমন্ত্রণ করে তুলাতুলি থেকে ঠাকুর আনা হয়। পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন উৎসবের নানান প্রথা উঠে গেছে। বিবাহের মতো পারিবারিক উৎসবে রাখাইনরা অতীতে নানা আয়োজন ও প্রথা-প্রক্রিয়ায় পনেরো দিন ধরে মেতে থাকত। পনেরো দিন পর আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়া আয়োজন সমাপ্ত হতো। বর্তমানে অনেক প্রথা অনুসৃত হয় না। বিয়ে আয়োজন সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে জনসংখ্যা কমে যাওয়া ও আর্থিক সামথ্য হারানোর কারণে। কোন কোন সাংস্কৃতিক আচরণ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হচ্ছে জীবনযাপনে

সয়ঘটিত পরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। যেমন অতীতে পরিশ্রান্ত পথিকের বিশ্রাম ও সাময়িক আশ্রয়ের জন্য প্রত্যেক গ্রামে রাস্তার ধারে নির্মিত চোংঘর এখন আর নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জনবসতির আধিক্য, পানীয়জলের সহজলভ্যতা, ভূমির স্বল্পতা ইত্যাদি নানা কারণে এই সংস্কৃতি এ-অঞ্চলে বিলীন হয়েছে।

৭.৩৮ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে সন্তুষ্টি

সময়ের পরিক্রমায় রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমাবনমনে অধিকাংশই অখুশি। এই অসন্তুষ্টি তারা প্রকাশ্যে স্বীকারও করেন। যদিও আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোন কোন সূচকে যেমন শিক্ষা, বাড়িঘর, স্যানিটারি, খাবার পানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। দেখা গেছে ৫১.৭২% উত্তরদাতা বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্টি নয়। সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ১৩.৭৯ শতাংশ। বর্তমান অবস্থা ভালোও না, মন্দও না, তবে মোটামুটি বলে মত দিয়েছেন ২৭.৫৯ শতাংশ। মন্তব্য প্রদানে বিরত থাকেন ৬.৯০ শতাংশ। এক্ষেত্রে যদি অসন্তুষ্টি, মোটামুটি ও মন্তব্য না-করাদের একত্রে হিসেব করা হয় তাহলে দেখা যাবে বিরাট অংশ অর্থাৎ ৮৬.২১% উত্তরদাতা বর্তমান জীবনযাপনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন না। নিচের সারণি থেকে এ-অনুমান স্পষ্ট হবে।

সারণি– ৭.৮৬

বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় উত্তরদাতাদের সন্তুষ্টি

সন্তুষ্টির অবস্থা	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
সন্তুষ্ট	২	১	১	৪	১৩.৭৯
সন্তুষ্ট নয়	৮	৪	৩	১৫	৫১.৭২
মোটামুটি	৩	৩	২	৮	২৭.৫৯
জবাব নেই	১	১	-	২	৬.৯০
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র– ৭.২৪

পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালনে সন্তুষ্টি

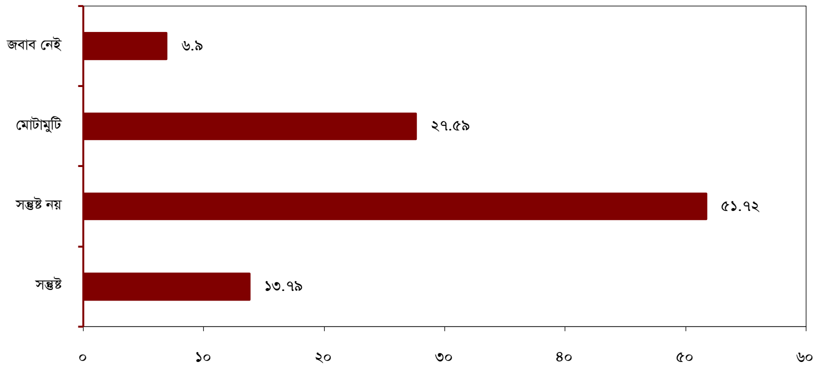

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

৭.৩৯ অভিবাসনের সম্ভাবনা

রাখাইনদের বাংলাদেশ থেকে আরাকানে অভিবাসন নতুন কিছু নয়। এ-প্রক্রিয়া অল্প-বিস্তর চলমান আছে। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলাই অভিবাসনের কারণ। যেজন্য দেখা গেছে, যেজন্য দেখা গেছে, গত ১৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে দৈনিক *প্রথম আলো* পত্রিকার বরাতে জানা যায়, মিয়ানমার সরকার থেকে ঘরবাড়ি ও জায়গাজমি পাওয়ার আশ্বাসে থানচি ছেড়ে ৩১ পরিবার রাখাইনে চলে গেছে। গবেষণার লক্ষ্য অনুযায়ী বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বসবাস করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছে কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে জানতে পারা যায়, অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন সমস্যা থাকবে, কষ্ট করে হলেও থাকতে হবে। তাই বসবাসের সম্ভাবনা না থাকার কারণ নেই। তবে কেউ কেউ এ-ব্যাপারে দারুণ হতাশা ব্যক্ত করেন। দেখা গেছে, উত্তরদাতাদের ৫৫.১৭% মনে করেন ভবিষ্যতে বসবাস অসম্ভব হয়ে উঠবে না। তবে এক অংশ মনে করেন বসবাস অসম্ভব হয়ে উঠবে, তাদের শতকরা হার ২৪.১৪। অবশ্য তাদের বড় একটা অংশ জবাব দানে বিরত থাকেন, শতকরা হার ২০.৬৯। অনুমান করা যায়, তারা ভবিষ্যতে এ-দেশে বসবাস কঠিন হয়ে পড়ছে বলে টিকে থাকার বিষয়ে নিঃসন্দেহ নন। নিচের সারণি থেকে উত্তরদাতাদের মনোভাব স্পষ্ট হবে।

সারণি– ৭.৮৭

ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়ছে কিনা

অসম্ভব কিনা	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	নিপুপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
হ্যাঁ	৩	২	২	৭	২৪.১৪

না	৮	৫	৩	১৬	৫৫.১৭
জবাব নেই	৩	২	১	৬	২০.৬৯
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

রাখাইনদের বার্মায় অভিবাসনের পরিণামে তারা দ্রুত সংখ্যাস্বল্পতার দিকে ধাবিত। এমনিতেই রাখাইনদের মধ্যে প্রচলিত একটা বিশ্বাস হলো, কোন জায়গায় বসবাসের চতুর্দিকে বাঁধ নির্মিত হলে সে জায়গা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যায়। শত শত বছর ধরে এই সমাজে এতদ্‌বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রবাদের প্রচলন আছে যে–

'ছ্রেগ্রী ছেকে মানিলিগে সংগ্রি স্রংগ্রি টিংলিমে।
ত্র্যেন ফো মাহৌ বরাবৌনেহ লাঃলিমে।
আনাউমাহ ত্র্যেন্‌ফ্যু, আরেহ মাহ্ ডাঃজা।
ত্র্যেনফ্যু মাহ মল্যুলীগে চুয়েন ফ্রাইলিমে।
ডাঃজাকো নেলোঃলাঃলিঃ শানত্যালিমে।' (অং, ২০০৩)

প্রবাদটির বাংলা অর্থ হলো, 'বড় বাঁধ নির্মাণ হলে বড় খাল নদী ভরাট হবে। সেখানে আর বসবাস করিও না। জাহাজ নয়, সমুদ্রগামী পালের বড় নৌকা যোগে যেতে হবে। পশ্চিমে পাতানো চাটাই, পূর্বে শাণিত ঢাল তলোয়ার, শাণিত তলোয়ার ঢালের পাড়া দিয়ে যাবে, শান্তি হবে। কিন্তু চাটাইয়ের উপর হেলান দিয়ে আরাম করলে দুঃখ পাবে (তাহান, ১৯৭৮)।' রাখাইনরা কমবেশি এ-প্রবাদের প্রতি দুর্বল। মাঠ গবেষণাকালে হাড়িপাড়ার মহেন মাতবর অভিবাসনের সম্ভাবনার বিষয়ে উল্লিখিত প্রবাদটির কথা গবেষককে জানিয়ে বলেন, যাবার ইচ্ছে হয়তো নেই, তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। হয়তো প্রবাদ সত্য হতেও পারে।'অনেকেমনে করেন তাদের জীবনে, 'উল্লিখিত প্রবাদ প্রবচনটি যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে। হাজার হাজার রাখাইন পরিবার জাহাজে বা ট্রলারে নয়, সামুদ্রিক মাছ শিকারের পাল তোলা বড় নৌকাযোগে বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে দুঃখ যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছে পৈতৃক ভূমি আরাকানে।' ক্ষেত্রগবেষণার তথ্যানুযায়ী নির্ভরশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমাবনয়নে অনেকে ভবিষ্যতে বার্মায় পাড়ি দিতে বাধ্য হতে পারে বলে জানান। এদের সংখ্যা শতকরা ১৭.২৪ ভাগ। মাতৃভূমি পরিত্যাগের ইচ্ছে নেই অর্ধেক জনগোষ্ঠীর অর্থাৎ ৫১,৭২% এর। ৩১.০৩% এর কোন জবাব না থাকা ভবিতব্যের উপর নির্ভরতাজনিত দোদুল্যমানতা নির্দেশ করে,

যারা থাকা না-থাকার ব্যাপারে সুনিশ্চিত নন। নিচের সারণিতে তাদের ভবিষ্যতে জন্মভূমি ত্যাগের সম্ভাব্যতার তথ্য পাওয়া যায়।

সারণি– ৭.৮৮

জন্মভূমি পরিত্যাগের সম্ভাবনা

সম্ভাবনা	গ্রামভিত্তিক গণসংখ্যা			মোট গণসংখ্যা	শতাংশ
	হাড়িপাড়া	মধুপাড়া	তুলাতুলিপাড়া		
আছে	২	২	১	৫	১৭.২৪
নেই	৮	৪	৩	১৫	৫১.৭২
জবাব নেই	৪	৩	২	৯	৩১.০৩
	১৪	**৯**	**৬**	**২৯**	**১০০.০০**

উৎস : মাঠ গবেষণা, মে ২০১৮

চিত্র– ৭.২৫

জন্মভূমি পরিত্যাগের সম্ভাবনা

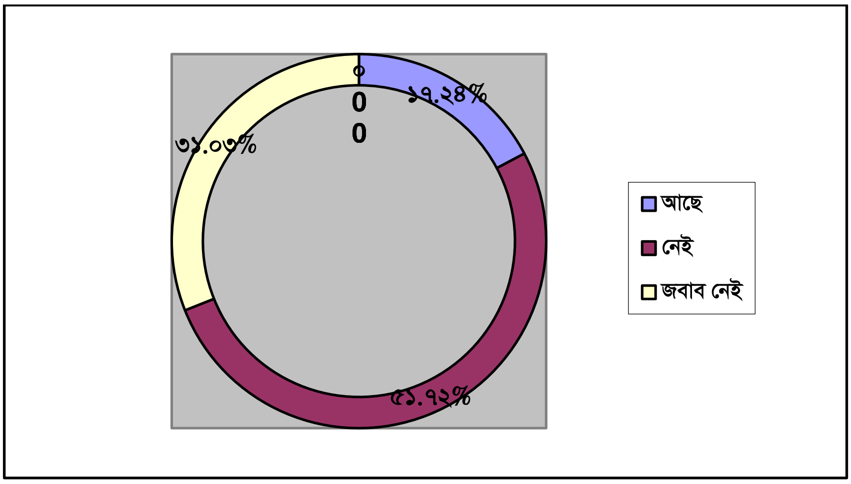

উৎস : মাঠ গবেষণা ২০১৮-এ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

সর্বশেষ ২০১৭ সালে মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গা বিতাড়ন ও বার্মা সরকারের বাংলাদেশের রাখাইনদের আশ্রয় প্রদানের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের কয়েকটি অঞ্চল থেকে রাখাইনদের বার্মায় অভিবাসনের ঘটনা ঘটেছে। অভিবাসনে কেবল সাধারণ পরিবারগুলো যাচ্ছে তা নয়, মাতবরদেরও তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে।*প্রথম আলো* পত্রিকায় ১৩ মার্চ ২০১৮ তারিখের খবর অনুসারে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কার্বারিও রয়েছেন। দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতিকালে থোয়াইচিং পাড়ার কার্বারি থোয়াইচিং মারমা *প্রথম আলো*'র বান্দরবান প্রতিনিধিকে জানান, "বিভিন্নজনের কাছ থেকে তাঁরা শুনেছেন রাখাইনে গেলে মিয়ানমার সরকার

ঘরবাড়ি ও জায়গাজমি দেবে। এজন্য তাঁরা চলে যাচ্ছেন। এছাড়া দুর্গম এই পাড়ায় খাবারের সংকট রয়েছে। জুমচাষ করে যা ধান পেয়ছেন তার পুরোটাই দাদনদারদের দিতে হয়েছে। আবার একটি পরিবেশবাদী সংস্থার লোকজন এসে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জুমচাষ করতে, বাঁশ কাটতে তাঁদের নিষেধ করে গেছে। সবকিছু ভেবে তিনি পরিবার নিয়ে রাখাইনে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

৭.৪০ লোক-সংস্কৃতির বিলুপ্তি

'লোক-ই যখন সঙ্কটে তার সংস্কৃতিও সঙ্কটে থাকবে এ আর নতুন কি?' (অরিজিৎ, ২০১৬: ৯৭) নির্ভরশীল সকল সমাজের সমাজকাঠামোর সন্ধান পাওয়া যায় তাদের ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদ, কাহিনি, গীতিকা, সংগীত, সংস্কার, আচার, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান ইত্যাদি লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির সকল শাখাতেই। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে রাখাইনদের লোকসংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে, যা ছিল শ্রমজীবী মানুষের একান্ত আপনার; জড়িত ছিল মেহনতি মানুষের শ্রমের সাথে, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সাথে, মুক্তির আকুলতার সাথে সম্পৃক্ত। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের বিপুল অবসরে নির্মিত গোষ্ঠীবদ্ধ শিল্প– যেখানে প্রতিটি মানুষই শিল্পী, শিল্পীই শ্রোতা, শ্রোতাই শিল্পী(অরিজিৎ, ২০১৬)। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশহীনতা ও আর্থ-সামাজিক অনুন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কিত। শিল্প-সাহিত্যের উন্নয়নে জীবনব্যবস্থার সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, যা শিক্ষার মানসিকতা তৈরি করে, জীবনীশক্তিকে প্রেরণা প্রদানপূর্বক প্রবাহমান রাখে। রাখাইনদের অনেক লোকসংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন- বস্তুগত লোকসংস্কৃতি, লোকপোশাক-পরিচ্ছদ, লোকস্থাপত্য, লোকসংগীত, লোকবাদ্যযন্ত্র, লোকউৎসব, লোকমেলা, লোকাচার, লোকখাদ্য, লোকনাট্য, লোকক্রীড়া, লোকপেশা, লোকপ্রযুক্তি, ধাঁধাঁ, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি। পোশাকের কথা বলা যায়। বর্তমানে বাঙালিদের মতো অনেক রাখাইন মেয়ে সালোয়ার কামিজ ও ছেলেরা ফুলপ্যান্ট পরিধান করছে। অনেক রাখাইন মনে করেন, এতে তাদের ঐতিহ্য ক্ষুণ্ন হচ্ছে ও আদিমতা হারাচ্ছে। যাত্রা (জাই পোয়ে) ও জনপ্রিয় নৃত্যনাট্যের বর্তমানে প্রচলন নেই। রাখাইনরা সংগীতপ্রিয়। তাদের সকল উৎসবের প্রধান অঙ্গ সংগীত। সংগীতের জন্য নানারকম বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো। এমনকি মালেশিয়া থেকে গোলাকার ঢোল (ছেইন-ওয়েইন) আনা হতো। এসব সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র অপসৃত প্রায়। বিলীন হয়েছে রাখাইন রাধাপোয়ে উৎসব। লোকসংস্কৃতির ওপর ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে অর্থনীতি। কেননা অর্থনীতিই সমাজের ভিত্তি। এই ভিত্তি তৈরি করে সমাজের উপরিকাঠামো। গোটা সমাজের মনন, জ্ঞানচর্চা, ভালো-খারাপ বিচার, তার সংস্কৃতি। তাই অর্থনীতির ব্যাপক রদবদলে সাংস্কৃতিক ভাঙন-পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াটি নিয়ত ক্রিয়াশীল। রাখাইনদের লোকসংস্কৃতি নানাভাবে বাঙালি গ্রামীণ লোকশিল্প দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। হারিয়ে যাচ্ছে তাদের লোক সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি। অধিকাংশ

Dhaka University Institutional Repository

লোকসংস্কৃতির আঙ্গিকগুলো প্রায় সবই যৌথ কৃষির সাথে সম্পর্কিত। অতীতে কৃষিই ছিল উৎপাদনের মূল ক্ষেত্র। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমদান বাদ দিয়েও যথেষ্ট সময় থাকতো শ্রমজীবী মানুষের হাতে। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সেই অলস সময় জন্ম দিয়েছে গোষ্ঠীবদ্ধ শিল্পের। যেমন আদিবাসীদের সমাজে শ্রমের সাথে শ্রমজীবীর একাত্মতা বোধের জন্যই শ্রমের তালে তালে কিংবা শ্রমের সমাপ্তিতে জন্ম নিত লোকগান। কিন্তু বর্তমানে তারা শ্রম প্রক্রিয়ার সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন; উৎখাত হচ্ছে কৃষিসহ অন্যান্য নিজস্ব গ্রামীণ পেশা থেকে। আবার, সংস্কৃতি পরিবেশনার মাধ্যমগুলো যেমন মঞ্চনাটক, বেতার, টিভি, সিনেমা, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন প্রভৃতি গোষ্ঠী থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে একা বানায়। আস্বাদন করতে শেখায় একা একা। তার ভূমিকা কর্মহীন ভোগের। এর নির্মাণে তার অংশগ্রহণ নেই। লোকসংস্কৃতি বেঁচে থাকে অনেক মানুষের মধ্যে, গোষ্ঠীর মধ্যে পুনরুৎপাদনে। ব্যক্তিবাদ, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা গ্রাস করছে লোকসংস্কৃতির পরিসর। এভাবে ধীরে ধীরে রাখাইনদের লোক-সংস্কৃতির অনেক উপাদানের বিলুপ্তি ঘটছে।

৭.৪১ রাজনৈতিক সংগঠনে পরিবর্তন

সমতল ভূমির অন্তর্গত ও বৃহত্তর বাঙালি সমাজের সংস্পর্শে আসা এবং সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ায় কেবল রাখাইনদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার ওপরই প্রভাব পড়েনি, তাদের চিরাচরিত গ্রাম-শাসন ব্যবস্থা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিধিও দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছে। বিমলেন্দু মজুমদার (২০০৪) ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট ব্লকের ভারত-ভুটান সীমান্তে অবস্থিত টোটো পাড়া গ্রামের টোটো নৃগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণায় তাদের রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপক পরিবর্তনকে তুলে ধরেছেন। তেমনি রাখাইনদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তন স্পষ্ট। অতীতের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, একটি রাখাইন সমাজের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক স্তম্ভ ছিল মাতবর। একজন মাতবর সমাজে দ্বৈত ভূমিকা পালন করেন। তিনি যেমন পাড়ার সমস্যাবলি সরকারের তথা স্থানীয় প্রশাসনের নজরে আনেন; তেমনি সরকারের বিভিন্ন নীতি সমাজের লোকদের মধ্যে প্রচার করে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। এ-উভয় দায়িত্ব তিনি পালন করেন। মাতবর পাড়ার সমস্যা ও সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখেন। পাড়ার ছোট-খাটো ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেন। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সরকারকে সহযোগিতা করা তার অন্যতম কর্তব্য। বিভিন্ন প্রকার পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তবে বর্তমানে প্রত্যেক সমাজে মাতবরের পদে একজন নামেমাত্র আছেন ঠিকই, কিন্তু অতীতের সেই ভূমিকা পালনের সুযোগ আর নেই। স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতবরদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে (খান, ২০০৬: ৩০)। বর্তমানে তেমন

কোন ভূমিকা পালনের সুযোগ না থাকায় তারা প্রায় মর্যাদা ও গুরুত্বহীন। যে-কোন সমস্যায় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিংবা স্থানীয় প্রশাসন মূল ভূমিকা পালন করে।সমতল ভূমিতে বাঙালির সঙ্গে একত্রে বসবাসের কারণে নিজস্ব পৃথক ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা মাতবরী প্রথা কার্যকরভাবে টিকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বরং তারা ধীরে ধীরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ আমলে স্থানীয়ভাবে এলাকাভিত্তিক রাখাইনদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। পঞ্চায়েত গঠনের সময় গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিকে পঞ্চায়েতে সম্পৃক্ত করা হতো। পঞ্চায়েতে স্থানীয় বিবাদ-বিসম্বাদ এবং বিধি-নিষেধ লংঘনের বিচার ও সমাধা করা হতো। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র চালু হওয়ার পর রাখাইনদের কেউ কেউ ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার ও চেয়ারম্যান হয়েছেন। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর বাঙালিরা সংখ্যাগুরু ও রাখাইনরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ায় স্থানীয়ভাবে মেম্বার-চেয়ারম্যান হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

৭.৪২ জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব

আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল আইপিসিসি'র (Intergovernmental Panel on Climate Change) চতুর্থ মূল্যায়ন অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তন অর্থাৎ পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রস্ফীতি এবং এর বিরূপ প্রভাবে প্রথম সারির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম (আহমদ, ২০০৮)। যে-ধরনের বন-নদী পরিবেশে রাখাইনরা পটুয়াখালী এলাকায় বসতি গড়ে তুলেছিল বর্তমানে তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বন-জঙ্গল উজাড় হয়ে গেছে। অতীতে পরিবেশকে বদলে ফেলার কর্মকাণ্ড ছিল স্বল্পমাত্রায়, প্রক্রিয়াটা ছিল মন্থর। বেশিরভাগটাই চলতে হতো পরিবেশের উপর নির্ভর করে। ফলে প্রকৃতি-মানুষে ভারসাম্যে যেটুকু সমস্যা হতো তা ছিল নিয়ত পূরণীয়। বাঙালিদের অনুপ্রবেশের পর শুরু হয় প্রকৃতির উপর আধিপত্য কায়েম করার যুগ, আশেপাশের পরিবেশটা দ্রুত পাল্টে ফেলার যুগ, যার ভিত্তি রচিত হয় জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে সর্বজনীন সম্পত্তি থেকে ব্যক্তিমালিকানার আওতায় নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে (কর, ২০১৬: ৭০)। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রাখাইনরা মুক্ত নয়। দলগত আলোচনা থেকে জানা যায়, তাপমাত্রা বেড়ে অসহনীয় মাত্রায় পৌঁছে গেলে টিনের টঙের মধ্যে থাকা অসম্ভব হলে পড়লে গ্রামবাসী বিভিন্ন গাছতলায় বসে ঝিমায়। অত্যধিক তাপে খেতে-খামারের কাজে যেতেও অনীহা দেখায়। বর্তমানে বৃষ্টি চলমান অবস্থায় কৃষকরা বজ্রপাতের ভয়ে খেত-খামারে না থেকে বাড়িতে অবস্থান করে। বিভিন্ন সময়ে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের মতো পরিস্থিতি তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে

Dhaka University Institutional Repository

তুলছে। এসবের পৌনপুনিকতা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিবৃষ্টি, তাপদাহ, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ইত্যাদি নানান দুর্যোগের কারণে জনগোষ্ঠী হারাচ্ছে কর্মঘণ্টা-কর্মদিন ও শারীরিক সুস্থতা। এসবের প্রভাব পড়ছে তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনব্যবস্থায়।

৭.৪৩নিরাপত্তার অবাধবোধ

রাখাইনদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন নিরাপত্তার অভাব দেখা গেছে, তেমনি তাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অভাব বোধও পরিলক্ষিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অভাব সম্প্রতি তাদের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে যখন মিয়ানমান থেকে মুসলিম রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে বিতাড়ন করা হয়। যদিও এসবের সঙ্গে তাদের কোনরকম সম্পৃক্ততা নেই, তারা বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে, তবুও ঘটনাচক্রে তাদের নিগৃগীত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এসময় প্রতিবেশী মুসলমানরা তাদের যেমন বাঁকা চোখে দেখেছে, তেমনি তারাও প্রতিবেশীদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। দলগত আলোচনাকালে জানা যায়, ২০১৭ সালে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা বিতাড়নের ঘটনার পর অত্র এলাকার একজন রাখাইন কলাপাড়া থেকে ইজিবাইকে করে অন্যযাত্রীদের সঙ্গে বালিয়াতলী ঘাটে আসার কালে তাকে পথিমধ্যে ইজিবাইক থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। তবে স্থানীয় বিবেকবান লোকদের হস্তক্ষেপে ঘটনাটি আরো অপ্রীতিকর অবস্থায় পৌঁছেনি। এরপর থেকে রাখাইনরা বেশ অনিরাপত্তায় ভুগতে থাকেন বলে জানান।

এমনকি গবেষক যখন প্রথমদিন তুলাতুলি পাড়ায় যান, সঙ্গে নিপু মাতবর ও মহেনচিং মাতবর থাকা সত্ত্বেও, একজন তথ্যদাতা কথা না বলার জন্য ইস্ততভাবে এড়িয়ে মন্দিরে চলে যান। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করি। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে আসেন। কিন্তু ব্যস্ততা দেখাতে থাকেন। ঠিক সে সময় তার স্ত্রীও গ্রাম থেকে বাসায় এসে পৌঁছান। তারা উভয়ে কথা বলতে অনীহা দেখাচ্ছে বুঝতে পেরে আমার সঙ্গী দু'জন, যারা তাদের পূর্ব পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ, তাদেরকে আমার পড়াশুনা ও গবেষণার কথা বুঝিয়ে বলাতে তারা আশ্বস্ত হন। কথা প্রসঙ্গে তারা জানান, মিয়ানমার থকে রোহিঙ্গাদের বিতাড়নের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তুলাতুলিপাড়াসহ আশপাশের আরো অনেক গ্রামে সরকার পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। তখন সাংবাদিকরা এ-সকল গ্রামে গিয়ে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে জানতে চাইলে তারা ইতিবাচক জবাব দিলেও পরে স্থানীয় যুবকরা এসে তাদের সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার জন্য শাসিয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতেনিষেধ করে যায়। এতে করে তারা প্রচণ্ডভাবে উদ্বিগ্ন ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। যেজন্য তারা

Dhaka University Institutional Repository

বাইরের কারো সাথে কথা বলতে নারাজ। এসকল ঘটনা থেকে তাদের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

টিকা

১. দলভিত্তিক আলোচনাকালে মধুপাড়ার এমং মাতবর (বয়স ৫০) জানান যে, মংসি মাতবরের (বয়স ৬৯) পরিবার গত বছর (২০১৭) গ্রাম ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বরগুণার তালতলীতে চলে গেছে। তারিখ : ২০ মে ২০১৮। স্থান : এমং মাতবরের বাড়ির প্রাঙ্গণ। সময় : বিকেল ৬:০০ টা।

২. দলভিত্তিক আলোচনাকালে তুলাতুলিপাড়ার মং তেন চি কবিরাজ (বয়স ৫৪) গবেষককে এই তথ্য জানান। তারিখ : ২৪ মে ২০১৮। স্থান : মং তেন চি কবিরাজের বাড়ির প্রাঙ্গণ। সময় : বিকেল ৫:৩০ টা।

৩. হাড়িপাড়ার দক্ষিণ প্রান্তের রাস্তার মুখে স্থাপিত ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা আছে : "হাড়িপাড়া ১০ নং বালিয়াতলী ইউনিয়ন সাইক্লোন টং ঘর, রাস্তা, স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ প্রকল্প ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন জেলা প্রশাসক জনাব অমিতাভ সরকার। তারিখ ২৮ নভেম্বর ২০১৪।" হিড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এই প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

৪. ১৯৫০ সালের জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে উল্লিখিত ২২টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী হলো– (১) সাঁওতাল, (২) বানিয়াস, (৩) ভূঁইয়া, (৪) ভূমিজ, (৫) দালুস, (৬) গণ্ডা, (৭) হাদি, (৮) হাজং, (৯) হো, (১০) খরিয়া, (১১) খারওয়ার, (১২) কোরা, (১৩) কোচ (ঢাকা বিভাগ), (১৪) মগ (পটুয়াখালী জেলা), (১৫) মাল, (১৬) সুরিয়া, (১৭) পাহাড়িয়া, (১৮) মাচ, (১৯) মাণ্ডা, (২০) মণ্ডিয়া, (২১) ওড়াং, ও (২২) তোড়ি।

৫. বাংলাদেশ আদিবাসী পরিষদের মতে, জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন বহির্ভূত অন্যান্য আদিবাসীগুলো হলো– ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, নেত্রকোনা, গাজীপুর, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার জেলার 'গারো'; রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, সিলেট, রাজবাড়ি, চাঁদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম জেলার 'ত্রিপুরা'; বান্দরবান জেলার 'খিয়াং', 'পাংখু', 'খুমি' এবং 'ম্রো'; ময়মনসিংহ, রাজশাহী, গাজীপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, শেরপুর জেলার 'রাজবংশী'; দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাঁও এবং পাবনা জেলার 'মালো' ও 'উরাও'; রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার 'লুসাই'; বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার 'চাক'; কক্সবাজার, বরগুনা, পটুয়াখালী জেলার 'রাখাইন'; মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ জেলার 'খাসি'; কুষ্টিয়া, নাটোর, ঝিনাইদহ, খুলনা, যশোর জেলার 'বাগদি'; রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলার 'মাহাতো'; ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা, সিলেট, সুনামগঞ্জ জেলার 'হাজং'; রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া জেলার 'মাহালী'; রাজশাহী, দিনাজপুর, গাজীপুর জেলার 'ক্ষত্রিয় বর্মণ'; মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার 'মণিপুরি'; রাজশাহী ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার 'কর্মকার'; রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলার 'মুসহর', 'রাই', 'মুরিয়ার' ও 'তুরি'; রাজশাহী ও সিলেট জেলার 'কোল'; সিরাজগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার 'বেদিয়া'; রাঙামাটি ও সিলেট জেলার 'অহমিয়া'; পাবনা জেলার 'সিং'; সিলেট জেলার 'খণ্ড', 'পাত্র'; রাঙামাটি জেলার 'গোর্খা'; রাজশাহী জেলার 'পাহান', 'রাজুয়াড়' প্রভৃতি। (দেখুন : খান, ২০০৮: ১৭১)

৬. বিস্তারিত দেখুন : *The State Acquisition and Tenancy Act, 1950*, East Bengal Act xxviii of 1951, B. G. Press, Dhaka, p. 101-3

৭. **পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩**

৮. দলভিত্তিক আলোচনাকালে হাড়িপাড়ার মহেন চিং মাতবর (বয়স ৪৭) গবেষককে এই তথ্য জানান। তারিখ : ২৮ মে ২০১৮। স্থান : হাড়িপাড়ার নিপু মাতবরের বাড়ির প্রাঙ্গণ। সময় : বিকেল ৫:০০ টা।

৯. দলভিত্তিক আলোচনাকালে মধুপাড়ার এমং মাতবর (বয়স ৫০) এই তথ্য দেন। । তারিখ : ২২ মে ২০১৮। স্থান : এমং মাতবরের বাড়ির প্রাঙ্গণ। সময় : বিকেল ৬:০০ টা।

১০. দলভিত্তিক আলোচনাকালে তুলাতুলিপাড়ার মং তেন চি কবিরাজ (বয়স ৫৪) গবেষককে এই তথ্য দেন। তারিখ : ২৪ মে ২০১৮। স্থান : মং তেন চি কবিরাজের বাড়ির প্রাঙ্গণ। সময় : বিকেল ৫:৩০ টা।

১১. উকোয়েনডা ঠাকুরের (বয়স ৭২) সাক্ষাৎকার। স্থান: তুলাতুলি মন্দির। তারিখ: ২৮ এপ্রিল ২০১৮, সময় : বিকেল ৫.৩০ টা।

১২. বিস্তারিত দেখুন : “বাংলাদেশে স্বাস্থ্য”, ইন্টারনেট : https://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশে-স্বাস্থ্য

তথ্য নির্দেশ

Ali, A. (1989). *Santals of Bangladesh*, Institute of Social Research and Applied Anthropology, Midnapur, W.B

Ali, J. I. (2017). "Language situation and linguistic diversity of Bangladesh", in *Mother Language*, Vol. 1, Num. 1, International Mother Language Institute, Dhaka

Ahsan, S. (1993. *The Marmas of Bangladesh*, HRDP, BARC, Dhaka

Aziz, K. M. A. (1979). *Kinship in Bangladesh*, ICDDRB, Dhaka

Bernot, L. (1953). "In the Chittagong Hill Tracts", *Pakistan Quarterly*, (3)

Biswas, A. A. (1996). ‘Ethnography of a Coastal People of Bangladesh’ (Unpublished Ph. D. Thesis), Department of Sociology, University of Dhaka, Dhaka

Government of Bangladesh. (1982). *District Gazetteers : Patuakhali*, B. G. Press, Dhaka

Government of Bangladesh. (1951). *The State Acquisition and Tenancy Act, 1950,* East Bengal Act xxviii of 1951, B. G. Press, Dhaka

Karim, A. K.N. (1980). "The Dynamix of Bangladesh Society", Delhi

…………….. (1986). "Max Weber's Theory of Prebendalization and Bengal Society", *Bangladesh Sociological Review*, The Bangladesh Sociology Association, Vol. 1, NO. 1

Khan, A. M. (1999). *The Maghs A Buddist Community in Bangladesh*, UPL, Dhaka

Mukherjee, R. (1957). *The Dynamics of Rural Society- Study of the economic Structure in Bengal Villages,* Akademic verlag, Berlin

Murdoc, G. P. (1949). *Social Structure,*.The Macmillan Company, New York

Pati, B. (2011). *Adivasis of Colonial India*, Indian Council of Historical Research, India

Rahaman, M. M. (2013). *Plain Land Indigenous People of Bangladesh Development Toward Ending Poverty,* Shrabon Prokashani, Dhaka

Roy, R. D. (2002). "Social, Economic and Cultural Aspects of the Chittagong Hill Tracts" in Tripura, M.(ed.), *LandCultural & Indigenous peoples,* Zabarang Kalyan Samity, Khagrachari

Sattar, A. (1983), *In The Sylvan Shadows*, Bangla Academy, Dhaka

Strauss, L. (1952). "Kinship System of Three Chittagong Hill Tribes", *South Western Journal of Anthropology*, Spring

Yeo, S. (1963). *His Life and Nations*, New York

Westergard, T. (1979). *Boringram: An Economic and Social Analysis of a Village in Bangladesh*, Rural Development Academy

অং, মং বা, (২০০৩), *বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা*, চট্টগ্রাম

অরিজিৎ, (২০১৬), "লোকসংস্কৃতিতে আগ্রাসনের কয়েকটি দিক", দ্র. চক্রবর্তী, দীপংকর (সম্পা.), *অনীক*, পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা

আজাদ, লেলিন, (১৯৮৯), *ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষি কাঠামো*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

আরেফিন. হেলালউদ্দিন খান, (১৯৯৪), *শিমুলিয়া বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল কৃষি কাঠামো*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আহমদ, কাজী খলীকুজ্জামান, (২০০৮), "টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা

ইসলাম, সিরাজুল, (১৯৮৫), *ভূমি সংস্কার ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

এরেন্স, ইয়েনেকা ও বুর্দেন, ইওস ফান, (১৯৮০), *ঝগড়াপুর গ্রামবাংলার গৃহস্থ ও নারী*, গণস্বাস্থ্য প্রকাশনা, ঢাকা

কর, সবুজ, (২০১৬), "পণ্য-সর্বস্ব পুঁজিবাদী সংস্কৃতি ও পরিবেশ", দ্র. চক্রবর্তী, দীপংকর (সম্পা.), পূর্বোক্ত

করিম, এ কে নাজমুল, (১৯৬৫), *চেঞ্জিং প্যাটার্নস অব এন ইস্ট পাকিস্তান ফ্যামিলি*, উইমেন ইন দ্যা নিউ এশিয়া, ইউনেস্কো, প্যারিস

করিম, নাজমুল, (২০০৮), *পরিবর্তনশীল সমাজ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

করিম, নেহাল, (২০১১), *বাংলাদেশের উন্মেষ ও বিকাশ*, পারিজাত প্রকাশনি, ঢাকা

খান, আবদুল মাবুদ, (১৯৮৩), "পটুয়াখালী জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়", দ্র. *CILO*, A Journal of History Department, Vol. 1, Jahangirnagar University, Dhaka

খান, আবদুল মাবুদ, (২০০৬), *পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

খান, মোঃ নজরুল ইসলাম, (২০০৮), *ভূমি আইনের সহজ পাঠ*, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ, ঢাকা

গোস্বামী, কাননবিহারী, (১৪১৫), "আত্মীয়-কুটুম্ব : প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে", দ্র. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ২০ বর্ষ ৪ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা

চক্রবর্তী, তপংকর ও বাশার, সিকদার আবুল (সম্পা.), (২০০৪), *বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস*, আনন্দধারা, ঢাকা

চক্রবর্ত্তী, রতন লাল, (১৯৯৮), *সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, (১৪১৫), "জ্ঞাতি নাম", দ্র. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, পূর্বোক্ত

চাকমা, মঙ্গল কুমার ও অন্যান্য, (২০১৩), *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা*, ২য় খণ্ড, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

চাকমা, শরদিন্দু শেখর, (২০০৫), *পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বিপন্ন মানবতা*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা

চৌধুরী, আব্দুল হক, (১৯৯৫), "বৃহত্তর চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহের মঘ বা মারমা উপজাতি", দ্র. *প্রবন্ধ বিচিত্রা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

জলিল, মুহম্মদ অবদুল, (১৯৯১), *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান, (১৯৯৩), *ডিফারেনসিয়েশন, পোলারাইজেশন এন্ড কনফ্রনটেশন ইন রুরাল বাংলাদেশ*, সেন্টার ফর সোসাল স্টাডিজ, ঢাকা

জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান (অনূ.), (১৯৮০), *সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

জাঁ, উথুন অং, (১৯৯২), "বাংলাদেশের উপকূলীয় রাক্ষাইনদের জীবন সংগ্রাম", *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ঢাকা

টিম, ফাদার আর ডব্লিউ, (১৯৯২), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, ঢাকা

তাহান, (১৯৭৮), *বাংলাদেশের উপজাতি রাক্ষাইন*, পটুয়াখালী

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, (১৯৮৬), *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

নাসরীন, জোবাইদা, (২০১৯), "সংখ্যালঘুর ভাষা রক্ষার দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের", *প্রথম আলো*, ৯ আগস্ট, ঢাকা

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান, (১৪১৫), "আত্মীয়-ব্যবস্থা : মেচ সমাজ", দ্র. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, পূর্বোক্ত

প্রথম আলো, (২০১৮), ১৩ মার্চ, ঢাকা

বসু, রাজশ্রী, (১৪১৫), "জ্ঞাতি-কুটুম", দ্র. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, পূর্বোক্ত

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (২০১০), দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী,ঢাকা

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (২০১১), চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বার্টুচি, পিটার জে, (১৯৯২), *অস্পষ্ট গ্রাম*, ন্যাসনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, ঢাকা

বেসেইন, পিয়েরে, (১৯৯৭), *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (অনু. : সুফিয়া খান)

মজুমদার, বিমলেন্দু, (২০০৪),"টোটো জনজাতির আর্থ-সামাজিক বিবর্তন", দ্র. দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.),*আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

মজুমদার, বিমলেন্দু,(২০০৪), "টোটো জনজাতির গ্রামসংগঠন", দ্র. দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.), পূর্বোক্ত

মজিদ, মুস্তাফা, (১৯৯২),*পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মিন্‌স, আন্না, (২০১৯), "ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা চর্চা ও সংরক্ষণ", *যুগান্তর*, ৯ আগস্ট, ঢাকা

যুগান্তর, (২০১৯), ৯ আগস্ট,ঢাকা

রাখাইন রিভিউ, (২০০০), ভলিউম-৩, রাখাইন বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, কক্সবাজার

রায়, খোসলালচন্দ্র, (২০০৪), *বাকরগঞ্জের ইতিহাস*, দ্র.চক্রবর্তী,তপংকর ও বাশার,সিকদার আবুল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

লাইজু, নাজমুন নাহার, (২০১১), *বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

সেন, রোহিনী কুমার,(২০০৪), *বাকলা*, দ্র. তপংকর চক্রবর্তী ও সিকদার আবুল বাশার (সম্পা.), পূর্বোক্ত

হক, আজিজুল, (২০০৬), *বাংলাদেশের সাঁওতাল সংস্কৃতির পরিবর্তন : ক্রিয়াশীল উপাদানের প্রভাব* (অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস), আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

হাওলাদার, উত্তম কুমার, (২০১১), "রাখাইনদের বৌদ্ধ মন্দির", *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৪ জানুয়ারি,ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

সার-সংক্ষেপ ও উপসংহার

৮.১ সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংস্কৃতি সমৃদ্ধময় দেশ। বাঙালি সংস্কৃতি ছাড়াও অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য, জাতিগত ঐতিহ্য, শিল্প ও ললিতকলা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এদের মধ্যে মঙ্গোলীয় মহাজাতিভুক্ত নরগোষ্ঠীর মানব রাখাইন অন্যতম। রাখাইনরা মূলত রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা পেতে সুদূর অতীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথ ধরে পার্শ্ববর্তী বার্মা ও আরাকান থেকে অভিবাসিত হয়ে বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে। পটুয়াখালীতে এদের আগমন ঘটে প্রথমত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের রামু থেকে এবং দ্বিতীয়ত সরাসারি আরাকান থেকে। একদা দেশের সর্বত্র এরা মগ অভিধায় সাধারণ নামে পরিচিত ছিল। অনেক গবেষকের মতে, পর্তুগিজ জলদস্যুদের সহযোগী মগ নামীয় দস্যুদের সাথে আঠারো শতকে আগত রাখাইনদের কোন সম্পর্ক ছিল না। মগ নামটি তারা মোটেই পছন্দ করে না। বরং এক জাতিগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য এলাকা বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলায় বসতি স্থাপনকারীরা নিজেদের মারমা এবং সমুদ্র উপকূলীয় সমতল ভূমি বরিশাল, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার সর্ব দক্ষিণাঞ্চল ও কক্সবাজার জেলায় বসতি স্থাপনকারীরা নিজেদের রাখাইন নামে পরিচয় দিয়ে থাকে এবং এই নামে পরিচয় দিতে তারা পছন্দ করে। এদেশে আসার পর তারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পৃথক জাতিগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে। বহু শতাব্দীর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের স্তর পেরিয়ে তারা বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। নানান পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে নানান প্রভাব পড়েছে।

রাখাইনরা পটুয়াখালীর উপকূলীয় সুন্দরবন অঞ্চলের বনভূমিকে আবাদযোগ্য করে ভূমির স্বত্বাধিকারী অর্জন করে এই ভূমিতে প্রথম অধিকার লাভ করে যাকে ঐতিহ্যগত অধিকার (customary right) বলা হয়। জমির উপর সাধারণ মালিকানা ছিল। প্রতিটি পরিবার তার প্রয়োজন মোতাবেক জমি ব্যবহার করতে পারতো। কৃষিকাজ ও বনজসম্পদের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে তাদের স্বনির্ভর অর্থনীতি। ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশের অন্যান্য সমতল ভূমির আদিবাসীদের মতো রাখাইনদের জমি সরকার কর্তৃক ব্যক্তি মালিকানায় দলিল করে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৯৪১ সালে প্রথম এ এলাকায় ভূমির উপর করারোপ করে। গ্রামসমূহের রাখাইনদের জমি সৌভাগ্যক্রমে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি মালিকানায় দলিলবদ্ধ হলেও জমির দখল টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যক্তিমালিকানার গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে ধারণা না থাকায় সম্পত্তির দখল হুমকির সম্মুখীন হয়। তাদের গ্রাসাচ্ছাদন অর্থনৈতিক জীবনে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, ফসলহানি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিণতিতে সৃষ্ট দুরাবস্থার কবলে পড়ে, আবার কখনো কখনো বিশেষ কারণে অর্থের প্রয়োজনে তারা সুযোগ-সন্ধানী বাঙালিদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। অশিক্ষিত ও আইনগত বিষয়ে অজ্ঞ গ্রামবাসী প্রতারণার শিকারে পড়ে খুব সহজেই জমি হারায়। প্রশাসনের কাছে সহায়তা চেয়েও যথেষ্ট আইনানুগ অনুকূল সহযোগিতা তারা পায়নি, উল্টো কখনো কখনো ভূমি লুণ্ঠনকারীরা অবৈধভাবে প্রশাসনকে প্রভাবিত করে তাদের অন্যায় অন্যায্য অমানবিক কাজকে বৈধ করেছে। একদিকে প্রতিকারহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে কৌশলে রাখাইনদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে সম্পত্তি গ্রাসের বাঙালি দুর্বৃত্তায়নের চক্রান্তে ক্রমান্বয়ে তারা সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে। জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এখনও অনেক পুরাতন কেস আদালতে বিচারাধীন আছে। বর্তমানে তারা অধিকাংশই ভূমিহীন। পক্ষান্তরে তারা চাষের জন্য কোন খাসজমি লাভ করতে পারে না।

গবেষণাধীন হাড়িপাড়া, মধুপাড়া ও তুলাতুলিপাড়ায় আদিবাসী ও বাঙালি উভয় জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। রাখাইনরা গ্রামগুলোর গোড়াপত্তন করে এবং অতীতে গ্রামগুলোতে শুধু রাখাইনরা বাস করত। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে এ-সব এলাকায় বাঙালিদের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তা তীব্র হতে থাকে। পরবর্তীকালে অধিক অভিবাসনে দেশের প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালিদের সংখ্যাধিক্য ঘটে ও রাখাইনরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে সংখ্যাহীন হয়ে পড়ছে। তিনটি গ্রামে দীর্ঘদিন নতুন কোন রাখাইন গৃহস্থালীর সৃষ্টি হয়নি।

রাখাইনদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সামাজিক সংগঠনগুলোর বন্ধন প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালিদের সাথে পারস্পরিক অবস্থান ও মিথস্ক্রিয়ার ফলে দেশের পাহাড়ি অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীর মতো অতটা দৃঢ়ভাবে কার্যকর নেই, ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে পড়ছে। যেজন্য বর্তমানে একটি পাড়ায় রাখাইনদের একাধিক গোত্রের লোকের বসবাস দেখা যাচ্ছে, যেটা অতীতে সম্ভব ছিল না। গবেষক কাজী তবারক হোসেন সাঁওতালদের মধ্যেও অনুরূপ আর্থ-সামাজিক নানান পরিবর্তন দেখতে পান প্রতিবেশি বাঙালিদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে (Hossain, 2008)।

গ্রামের রাখাইন জনগোষ্ঠীর পরিবার প্রথায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অনেক ক্ষয়িত অবশেষ এখনো বিদ্যমান থাকলেও পিতৃতান্ত্রিকতা প্রবল হয়ে বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। অতীতে গৃহস্থালী, কৃষিকাজ, তাঁতকাজে নারীর ভূমিকা ছিল প্রধান। তখন রাখাইন নারীরা অর্থনৈতিকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

স্বাবলম্বী ও স্বাধীন ছিল। বর্তমানে নারীদের স্বাধীনতা থাকলেও কাজ নেই, আয় নেই তাই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা নেই। অথচ রাখাইন নারীরা পুরুষের চেয়েও পরিশ্রমী।

গ্রামগুলোতে অতীতে রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ জীবনের প্রধান্য ছিল। বর্তমানে বাঙালিদের মতো অনু পরিবারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। গবেষণা এলাকায় যৌথ পরিবারের সংখ্যা প্রায় অনু পরিবারের সমান। অতীতের বৃহৎ পরিবারের স্থলে বর্তমানে মাঝারি আকারের পরিবারের সংখ্যা বেশি, যা ভবিষ্যতে একক পরিবারের দিকে ক্রমাগ্রসরমান।

আর্থিক দুরাবস্থার কারণে রাখাইন যুবকদের মধ্যে বিয়ের আগ্রহ কম। রাখাইন সমাজে ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিয়ের নিয়ম ও সমাজ সমর্থন না থাকলেও প্রেমজনিত কারণে প্রতিবেশি বাঙালি সম্প্রদায়ের সাথে বিয়ের ঘটনা ঘটছে। এমনকি নানান বাস্তবতায় বর্তমানে রাখাইন ও মারমা, রাখাইন ও চাকমাদের মধ্যে বিয়ে সমাজের সম্মতিতেই হচ্ছে। বিয়ের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অতীতে বিয়ের ৩ দিন বা সর্বাধিক ৭ দিন পর বর-কনের বাসর রাত করার রেওয়াজ ছিল। ইদানীং বিয়ের রাতেই নব-দম্পতির বাসর রাত হয়ে থাকে। সামাজিক সম্পর্কের এই পরিবর্তন অর্থনৈতিক অবনমন ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবপ্রসূত। বিয়ের নানা পর্বের আচার-প্রথাও দিন দিন লোপ পেয়েছে।

গ্রামবাসীদের অধিকাংশ ক্ষুদ্র কৃষক, তাই তারা সনাতন পদ্ধতিতে যৎসামান্য চাষবাস করে। তবে দুই-একজনকে সনাতন ও আধুনিক উভয় পদ্ধতিতে চাষ করতে দেখা গেছে।

কৃষিভিত্তিক সমাজ হিসেবে কৃষিকাজ একমাত্র ও প্রধান জীবিকা হওয়া সত্ত্বেও কৃষি-নির্ভরতায় উৎপাদনের নিম্নহার, সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ, মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরতা, খরা-বন্যা-জলোচ্ছ্বাস-ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে ফসলহানির ফলশ্রুতিতে দারিদ্র্যের কবলে পড়ে জমি বিক্রি করে ভূমিহীনে পরিণত হওয়া, কৃষিকাজে পুরো বছরের কর্মসংস্থান না হওয়া, কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে গৃহস্থালীর সারা বছরের অন্নসংস্থান না হওয়া, বর্গাজমি না পাওয়া, জমি বন্ধক নিয়ে চাষে না পোষাণো, কৃষি উৎপাদনে খরচ বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে রাখাইন জনগোষ্ঠীকে নতুন নতুন কর্মসংস্থান অবলম্বন করতে হচ্ছে, বাইরের কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দিতে হচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য ধীরে ধীরে বাইরের কর্মসংস্থানের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাচ্ছে। অথচ অধিকতর ঐতিহ্য চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার দৃঢ় বাসনায় দীর্ঘকাল রাখাইনরা অকৃষি খাতে পেশার প্রসারে অনাগ্রহী ছিল। এমনকি বাংলাদেশে ষাটের দশকে কৃষিতে সবুজ বিপ্লব ঘটলেও তাদের কৃষিতে স্বল্প-বিস্তর আধুনিকায়নের ছোঁয়া লাগতেও বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত সময় লেগেছে। জমা-জমি হারিয়ে বাঁচার জন্য অনেকে অভিবাসিত হয়ে বার্মায় চলে গেছে, কিন্তু ভিন্ন পেশা গ্রহণ করেনি। পিতৃপুরুষের আদি ও পরিচিত পেশার প্রতি ঐতিহ্যানুরাগ ও নির্ভরতা, নতুন পেশা গ্রহণের

ক্ষেত্রে এক ধরনের অনিশ্চয়তা, আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থান, অন্য সম্প্রায়ের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস, পুরাতন মূল্যবোধ প্রভৃতি কারণে ভূমিজ কৃষিকাজ ব্যতীত নতুন পেশা গ্রহণে তারা বিরত থেকে দারিদ্রসীমার নীচে জীবনযাপন করতে থাকে। গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শেষ দিক থেকে তাদের মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে এবং অনেকে ধীরে ধীরে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করছে। নিকৃষ্টজনের কাজ বিবেচনায় দুশো বছরের অধিক সময় ধরে নিজেদের দূরে রাখলেও বর্তমানে বাস্তব জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে কেউ কেউ সেই ঐতিহ্য থেকে সরে এসে ধীবর পেশায় যুক্ত হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে মাছের ব্যবসায় পুঁজির অনুপ্রবেশে মালিক-শ্রমিক শ্রেণীসম্পর্ক গড়ে উঠার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে এবং নির্ভরশীল অর্থনীতির প্রসার ঘটছে। বর্তমান প্রজন্ম মাছ ব্যবসা, দোকানদার, কাঠমিস্ত্রি, কবিরাজ, শিক্ষকতা, চাকুরি, দিন মজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দর্জি, মোটরবাইক চালক ও ইলেকট্রিক ম্যাকানিকের মতো নতুন পেশা গ্রহণ করছে, অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন জীবনব্যবস্থার সাথে তাদের খাপ খাওয়াতে হচ্ছে এবং সেজন্য পুরাতন ধ্যান-ধারণা পরিহার করে সময়োপযোগী কর্মপন্থা গ্রহণে তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। এভাবে রাখাইনদের অর্থনীতি পরিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তন তাদের সামগ্রিক জীবনাচরণের উপর প্রভাব ফেলেছে যা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে।

আশির দশক পর্যন্ত গ্রামগুলোতে জমি বন্ধক দিত রাখাইনরা। বন্ধক নিত বাঙালিরা। ঐ সময় পর্যন্ত তাদের হাতে কিছু কিছু জমি ছিল। বর্তমানে তারা ভূমিহীন। ভূমিহীনদের পক্ষে জমি বন্ধক রাখা অবান্তর। তবে যেহেতু তারা কৃষিজীবি সেহেতু চাষের জন্য তাদের জমি প্রয়োজন। তাই কেউ কেউ বেসরকারি সংগঠন থেকে ঋণ নিয়ে জমি বন্ধক রেখে চাষ করে। ১৯৫০-এর পূর্বে এ গ্রামগুলোতে পত্তনি ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। ১৯৫০-এর পর প্রতিবেশি বাঙালি মুসলমানরা রাখাইনদের কাছ থেকে জমি বর্গা নিয়ে চাষ করতো। পর্যায়ক্রমে জমি মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং রাখাইনরা বর্গাচাষীতে পরিণত হয়। গ্রামের অধিকাংশ রাখাইন গৃহস্থালী ভূমিহীন; সুতরাং তাদের জমি পত্তনি দেওয়ার সুযোগ নেই। তাদের কেউ কেউ মুসলমানদের থেকে জমি পত্তনি নিয়ে চাষ করে। এ উভয় ব্যবস্থা তাদের অর্থনীতিকে নির্ভরশীল করে তুলেছে। গ্রামগুলোতে একসময়ের খুব প্রচলিত শ্রমবিনিময় প্রথা বিলুপ্তপ্রায়। গ্রামবাসী এখন বিভিন্ন পেশায় যুক্ত। ফলে শ্রমবিনিময় অনেকের প্রয়োজন পড়ে না। প্রয়োজনে তারা শ্রম ক্রয় করে। অতীতে রাখাইন সমাজে শ্রম বিনিময়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এটা ছিল তাদের স্বাভাবিক প্রথা। কোনো রাখাইন শ্রমজীবী ছিল না। ফলে মধ্য কৃষক ও প্রান্তিক কৃষক সকলের মধ্যে শ্রমবিনিময় হতো। কেবল ভূস্বামী বা ধনী কৃষকরা বৈটিয়াল নিযুক্ত করতো। তখন বদলার কোনো প্রচলন ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সংকটে। অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি তাঁতশিল্প বর্তমানে বিলুপ্তির স্মারক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁতের কাজ করে তারা সারাদিন পরিশ্রম করেও ১০০ টাকা উপার্জন করতে পারছে না। তাই তাঁতের কাজের প্রতি আর কারো আগ্রহ নেই।

গ্রামসমূহের অর্ধেক রাখাইন আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার অভাবে তারা সমাজে ভালো অবস্থান তৈরি করতে পারে না। তবে শিক্ষার হার বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তর অতিক্রমের পর তারা ঝরে পড়ে। শতভাগ রাখাইন নিজেদের রাখাইন ভাষায় কথা বলে, তবে নতুন প্রজন্ম শিক্ষার অভাবে লিখতে পারে না। এতে তাদের নিজস্ব ভাষার বর্ণমালা হারিয়ে যাচ্ছে।

রাখাইন জনগোষ্ঠীর অর্ধেক উপার্জনে যুক্ত। বাকি অর্ধেক নির্ভরশীল। অধিকাংশের মাসিক গড় আয় ও ব্যয় সমান। উদ্বৃত্ত আয় না থাকার ফলে সঞ্চয় থাকে না। কেবল একজন ব্যতীত কারোরই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। কারো কারো আয়ে ঘাটতি থাকে। ঋণ-দেনা করে সংসার চালায়।

রাখাইনদের বাড়িঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে নব্বইয়ের দশকে আর্থিক অবনমনের বাস্তবতায় মাটির উঁচু ভিতের উপর ঘর করার মতো বাঙালিয়ানা প্রভাব অল্পবিস্তর অনুপ্রবিষ্ট হলেও বর্তমানে বেসরকারি সহায়তায় অতীতের ঐতিহ্য অনুসারে মাটি থেকে পাঁচ/সাত ফুট উঁচুতে কাঠের পাতাটন বা মাচাঙের উপর টিন দিয়ে বেড়া ও চাল তৈরি করে বাড়ি বানানো হচ্ছে। কাঠের মাচাঙের উপর কাঠের বেড়া ও গোলপাতার ছাউনি দিয়ে ঘর তৈরি তাদের ঐতিহ্য।

অতীতে পুকুরের পানিই তাদের একমাত্র উৎস ছিল। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি গভীর-অগভীর নলকূপের পানি ব্যবহার করে। তবে রান্নার কাজে পুকুরের পানি ব্যবহার করে। শৌচাগার ব্যবস্থায় সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন প্রচেষ্টায় পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত, যৌথ কাঁচা, যৌথ স্যানেটারি, নিজস্ব স্যানেটারিতে রূপান্তর ঘটেছে।

গৃহস্থালী প্রধান প্রায় সকলে কোন-না-কোন শারিরীক সমস্যায় ভুগলেও তাদের অর্ধেক কোন প্রকার চিকিৎসা গ্রহণ করে না। নারী ও শিশুদের বেলায়ও একই চিত্র। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বীকৃত ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই স্থানীয় ক্লিনিক থেকে ওষুধ নিয়ে চিকিৎসা করে থাকে। গর্ভধারণকালে নারীদের জন্য বিশেষ কোন খাবারের ব্যবস্থা করা হয় না। অর্ধেক নারীকে ডাক্তারী সেবা দেওয়া হয় না। প্রচলিত গ্রাম্য চিকিৎসা দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রায় সকল গৃহস্থালী প্রধান এনজিও-এর সাথে ঋণ গ্রহণ কার্যক্রমে যুক্ত। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন তারা এনজিও-নির্ভর হয়ে পড়েছে। এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে তারা নানারকম কাজকর্ম করার চেষ্টা করে থাকে। পুরনো দিনের মতো এই ঋণচক্র থেকে তারা বের হতে পারছে না।

অতীতে প্রতিটি গৃহে গৃহপালিত পশু গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাস, মুরগি থাকতো। বর্তমানে অর্ধেক পরিবারে গৃহপালিত প্রাণী নেই। মহিষ একেবারেই নেই। অতীতে সকলের কৃষি যন্ত্রপাতি ছিল। কৃষি কাজে বিযুক্তি ঘটায় বর্তমানে কারোরই পরিপূর্ণভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি নেই।

বর্তমানে অনেক গৃহে বিনোদনের জন্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র যেমন রেডিও, টিভি, ক্যাসেট প্লেয়ার ও যোগাযোগের আধুনিক প্রযুক্তি মোবাইল ব্যবহার করছে। অতীতে এসবের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ ছিল না। উপরন্তু, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকায় এসব ইলেকট্রনিক দ্রব্য ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। এই আকর্ষণ খুব সম্প্রতি তৈরি হয়েছে। সৌর বিদ্যুতের সুবিধা তাদের চিরায়ত অভ্যাস বদলের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে হাড়িপাড়ায় পল্লিবিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে। এসব তাদের পারিবারিক দৈনন্দিন ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ আয় বৃদ্ধির হার কম হওয়ায় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অতীতের মতো খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্ত-বিনোদনের তেমন কোন পন্থা না থাকায় গল্পগুজব ও মোবাইল ব্যবহার একমাত্র বিনোদন মাধ্যম হয়ে উঠছে।

রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে রাখাইন সমাজের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক স্তম্ভ ছিল মাতবর। মাতবর পাড়ার সমস্যা ও সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখা, পাড়ার ছোট-খাটো ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সরকারকে সহযোগিতা করা, বিভিন্ন প্রকার পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা রাখতেন। ব্রিটিশ আমলে স্থানীয়ভাবে এলাকাভিত্তিক রাখাইনদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। পঞ্চায়েত গঠনের সময় গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিকে পঞ্চায়েতে সম্পৃক্ত করা হতো। পঞ্চায়েতে স্থানীয় বিবাদ-বিসম্বাদ এবং বিধি-নিষেধ লংঘনের বিচার ও সমাধা করা হতো। বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতবরদের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। তেমন কোন ভূমিকা পালনের সুযোগ না থাকায় তারা প্রায় মর্যাদা ও গুরুত্বহীন। সমতল ভূমিতে বাঙালির সঙ্গে একত্রে বসবাসের কারণে নিজস্ব পৃথক ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা মাতবরী প্রথা কার্যকরভাবে টিকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বরং তারা ধীরে ধীরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গৃহস্থালী প্রধানরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে বঞ্চনা অনুভব করেন। প্রতিবেশি বাঙালিরা তাদের প্রতি উত্তম দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে না। রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রেও তাদের একই মনোভাব। তাদের প্রাচীন লোক-সংস্কৃতি বিলুপ্তপ্রায়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অধিক উষ্ণতায় তাদের কর্মস্পৃহা লোপ পাচ্ছে। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থায় তারা সন্তুষ্ট নয়। তাদের অনেকে ভবিষ্যতে বাব-দাদার ভিটে ছেড়ে বার্মায় অভিবাসন করতে বাধ্য হবেন বলে শঙ্কিত আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২ উপসংহার

রাজনৈতিক কারণে আঠারো শতকের শেষ পাদে বার্মা থেকে বাংলাদেশে অভিবাসিত রাখাইনরা গত শতকের পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত কৃষি ও অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে পুরো বছরের ভরণ-পোষণের চাহিদা মেটানোর মতো স্বাবলম্বী ও স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে প্রতিবেশি বাঙালিদের আগ্রাসী মনোভাব, ভূমি আত্মসাৎ, ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ, প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগহীনতা– নানা কারণে রাখাইনদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী জীবনে ছেদ পড়ে, যা ওই শতকের শেষ পাদে এসে তাদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু ও বিপর্যস্ত করে তোলে। রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমাবনমনে সবচেয়ে বেশি প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে এসব এলাকায় বেশি সংখ্যায় বহিরাগতের প্রবেশ। বহিরাগতরা পর্যায়ক্রমে তাদের জমির মালিক হয়েছে। এ-অবস্থার প্রতিকারহীনতায় তারা জীবিকা অন্বেষণে পথহারা ও বেদনাক্রান্ত হয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী হবার প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, আগ্রহ ক্রমশ হারিয়ে ফেলে ভূমিহীন বেকারত্বকে তীব্রতর করে তোলে। যেমনটি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনাতে বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে ঘটেছে (করিম, ২০০৮)। ভূমিহীনতার সমান্তরালে ছড়িয়ে পড়ে নিরঙ্কুশ দরিদ্রতা। দারুণ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও নিজস্ব সংস্কৃতির গণ্ডিকে আঁকড়ে ধরে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় রাখাইনরা নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, তারা সম্প্রদায়গত বৃত্তি ধরে রাখার পুরাতন মানসিকতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট। বাজারভিত্তিক বন্ধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে এবং স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধির ফলে রাখাইন ও বাঙালিদের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে রাখাইন গ্রামবাসীর মূল্যবোধ, জীবনাচরণ, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে। দেশের প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালিদের সাথে একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় বাজার অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় কারণেই আর্থ-সামাজিক জীবনব্যবস্থার এই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বাহ্যিক কারণ যেমন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ, আদিবাসী এলাকায় বাঙালিদের অনুপ্রবেশ ও বসতি স্থাপন এবং বাজার শক্তির প্রভাব; আভ্যন্তরীণ কারণ যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে বহির্জগতের জ্ঞান লাভ, আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মূলধন ফেরত পাওয়া ও মুনাফার গুরুত্ব, জীবনাচরণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, মূল্যবোধের ধারণার পরিবর্তন, আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ ও উপকরণ ব্যবহার প্রভৃতি কারণে রাখাইনদের আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন ঘটছে। বর্তমান যুগে বিশ্বায়নের প্রভাব, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ও শিক্ষার কারণে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে চিকিৎসা, বাসস্থান, পয়ঃপ্রণালীর মতো আর্থ-সামাজিক কোন কোন দিকের গুণগত মান নির্ভরশীলতা প্রক্রিয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

অল্পবিস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সার্বিক জীবনযাত্রায় ঘটেছে ক্রমাগত অবনতি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মুখে নিজেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ায় যেভাবে তারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে, নিজেদের জমিজমা হারিয়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর অবস্থায় বাজার অর্থনীতি ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যয়বহুল জীবননির্বাহে অসামর্থ্য হচ্ছে তাতে এ-এলাকায় তাদের জাতিসত্তা টিকে থাকার বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখে নিজেদের সামর্থ্য হারিয়ে তারা সরকারি-বেসরকারি সহায়তা-নির্ভর জীবনযাপন করছে। অর্থাৎ তাদের নানাবিধ সমস্যার সঙ্গে এক বিশেষ প্রক্রিয়া যুক্ত, যা তাদের প্রান্তিক থেকে আরো প্রান্তিক করে দিচ্ছে। এটা হলো নির্ভরশীলতার প্রক্রিয়া। এমন অবস্থায় সময়ে সময়ে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটনে, যেমন দেশে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা কিংবা স্মরণকালের মিয়ানমার থেকে বিপুল সংখ্যায় রোহিঙ্গা বিতাড়নে সঞ্চারিত সাম্প্রদায়িক ভীতিজনিত কর্মপ্রবাহহীনতা তাদের জীবনকে ব্যাপকভাবে সংকটাপন্ন করে তুলছে। টিকে থাকাই তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ছে। শেষ অবধি অনেকেই পরিস্থিতির শিকার হয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করছে, যার পরিণতিতে গত বছর পার্শ্ববর্তী কানকুনি পাড়ার শেষ রাখাইন পরিবারটি ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাওয়ায় গ্রামটি রাখাইনশূন্য হয়েছে। পার্শ্ববতী অপর একটি গ্রাম আউমপাড়া ১৫ বছর আগেই একই পরিণতির শিকার। এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দেশত্যাগের ঘটনা থেমে নেই। ১৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত "থানচি ছেড়ে রাখাইনে ৩১ পরিবার" শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী বান্দরবানের থানচির দুর্গম এলাকার কয়েকটি পাড়া থেকে মারমা ও ম্রোদের ৩১ টি পরিবার দেশ ছেড়ে চলে গেছে এবং আরো কিছু পরিবার দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মিয়ানমার সরকার থেকে ঘরবাড়ি ও জায়গাজমি পাওয়ার আশ্বাসে এভাবে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাওয়া থেকে তাদের আর্থিক অনিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়। রাখাইনরাও এভাবে একে একে নীরবে দেশ ত্যাগ করাকে নিয়তি ও পরিস্থিতির শিকার হিসেবে মেনে নিচ্ছে। পরিণতিতে গ্রামগুলো তথা দেশ হারাবে বহু বছরের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সম্ভার ও গৌরব এবং বৈচিত্র্যহীন সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটবে, যেমনটি পাসকেল উল্লেখ করেছেন :

> "The unity which was not based on diversity was tyranny and diversity that did not lead to unity has sometimes led to suppression of diversity while the wood was sometimes lost for the trees." (উদ্ধৃত : Anisuzzaman & Khan, 2012)

এ-অবস্থায় পটুয়াখালীর রাখাইন জাতিসত্তার অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, প্রথা ও রীতিনীতি চর্চার সুযোগ করে দিতে হবে। দেশের প্রকৃত উন্নয়নের স্বার্থে রাখাইনদের মধ্যেও উন্নয়নের

Dhaka University Institutional Repository

ধারা সমভাবে প্রভাবিত হতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের নিজেদের উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি পৃষ্টপোষকতা যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি চেষ্টা করতে হবে তাদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার। সরকারি ন্যায় বিচারের বিস্তার ঘটাতে হবে। এজন্য সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হলে রাখাইনরা বেঁচে থাকার স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে ২০৪০ সালের সরকারি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনপূর্বক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অগ্রযাত্রায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। নতুবা স্বকীয়তা হারানোর তীব্র বঞ্চনা ও অভাবের তাড়নায় দেশ ত্যাগে বাধ্য হওয়া থেকে তাদের রোখা যাবে না।

৮.৩ সুপারিশসমূহ

এই গবেষণায় রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ও জীবনাচরণের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নে বেশকিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো :

ক. নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রথম ও প্রধান শর্ত ভূমি। তাই কৃষিজীবী রাখাইনদের অবশ্যই ভূমির মালিকানা দিতে হবে।

খ. রাখাইনদের জমি সংক্রান্ত আদালতে বিচারাধীন মামলাগুলো ন্যায়ানুগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

গ. রাখাইনদের চাষের জন্য সরকারিভাবে জমি বরাদ্দ করা এবং বীজ, সার, সেচের জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে।

ঘ. রাখাইনরা যাতে চাষের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাস জমি বরাদ্দ পেতে পারে সরকারকে তার বন্দোব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাখাইন অধ্যুষিত এলাকার স্কুলসমূহে রাখাইন ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা দরকার।

চ. স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের গুরুত্ব দিয়ে নারীর জন্য নিরাপদ প্রসব, মাতৃকালীন ও প্রসবকালীন স্বাস্থ্যসেবা, শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

ছ. নারীদের তাঁতশিল্পে পুনরায় আগ্রহী করে তুলতে উদ্দীপনা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

জ. তাঁতশিল্পের জন্য সহজ শর্তে নামমাত্র সুদে ঋণের সহজলভ্যতা, কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণসহ এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঝ. রাখাইনদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের প্রতি ভোক্তাদের আকর্ষণ করার লক্ষ্যে পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎপাদকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঞ. নারীদের কর্মক্ষেত্রে গমনে যে-সকল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সে-সব দূরীকরণের জন্য সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

ট. রাখাইনদের মধ্যে মাছ চাষের জন্য খাস জলাশয় বরাদ্দ দিতে হবে।

ঠ. রাখাইন মৎসজীবীদের বিনা সুদে কিংবা নামমাত্র সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা দরকার। এক্ষেত্রে ভয়ভীতির অবসান ঘটানোও জরুরি।

ড. রাখাইনদের বসতবাড়ি-সংলগ্ন খালি জায়গায় বিভিন্ন সাক-সবজি চাষ ও বৃক্ষাদি রোপনে প্রণোদনা দেওয়া যায়।

ঢ. গৃহপালিত পশুপালনে উৎসাহিত করা এবং প্রণোদনা দেওয়া যায়।

ণ. নির্বাচন কিংবা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় রাখাইনদের আক্রান্ত হওয়ার ভীতি দূরীকরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তার প্রতি আস্থা অর্জনে সরকারি-বেসরকারি কার্যকর ভূমিকা পালন করা দরকার।

ত. পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিজস্ব সংস্কৃতি মোতাবেক করতে পারে সেজন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

থ. নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা করে বিনোদন লাভের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

দ. রাখাইন লোকসংস্কৃতি চর্চা ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

ধ. রাখাইনদের প্রতি প্রতিবেশি বাঙালিদের মনোভাব যাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ হয় সেজন্য উদ্দীপক ও সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার।

ন. রাজনৈতিক দলের প্রতি যাতে তাদের আস্থা অর্জিত হয় সেজন্য দলগুলোর পক্ষ থেকে কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

প. রাখাইনদের বঞ্চনা অনুভবের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফ. মাতৃভূমির প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসায় উদ্ভাসিত করার জন্য উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

ব. রাখাইনদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে বিনা সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

সর্বোপরি, রাখাইনদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। রাখাইন এলাকাগুলোর নীতি, পরিকল্পনা, কৌশলপত্র, বার্ষিক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাখাইনদের

অংশগ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করা, যাতে করে এ-সকল কাজে এলাকাগুলোর রাখাইনরা অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সফলতা অর্জনে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে পারে।

তথ্যনির্দেশ :

Anisuzzaman, & Khan, S. (2012). *Cultural Diversity*, Bangla Academy, Dhaka

Hossain, K. T. (2008). “The Santals of Bangladesh: An Ethnic Minority in Transition”, available at: http://anthropology-bd.blogspot.com/2008/07/santals-of-bangladesh-ethnic-minority.html

করিম, এ কে নাজমুল, (২০০৮), *পরিবর্তনশীল সমাজ: ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ*, ইউপিএল, ঢাকা

প্রথম আলো, (২০১৮), ১৩ মার্চ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- এক

রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর শুমারি জরিপ প্রশ্নমালা

অনুসূচি নং:
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী:
তারিখ :

১. আপনার নাম:...পিতা/মাতার নাম :..

ঠিকানা: গ্রাম .... ডাকঘর............... মৌজা .... মোবাইল.......................

২. বয়স : .... ৩. বৈবাহিক অবস্থা: বিবাহিত/অবিবাহিত ৪. গোত্র/অন্যান্য : .... ৫. ধর্ম: ....

৬. পরিবার/ গৃহস্থালী তথ্য :

নং	সদস্যদের নাম	প প্র সঙ্গে সম্পর্ক	বয়স	লিঙ্গ পুরুষ/ নারী		শিক্ষা	পেশা ১/২		আয়	মন্তব্য

৭. ভূমি সংক্রান্ত তথ্য :

ভূমির পরিমাণ (একর)	ভূমির ধরন ১		ভূমির ধরন ২		মন্তব্য
	মালিকানা	এজমালি (বিবরণ)	কৃষিজমি	বসতবাড়ি	

৮. জমি বর্গা দিয়েছেন ? পরিমাণ :
খ. বর্গা নিয়েছেন ? পরিমাণ :
গ. উৎপাদনের বিবরণ :

৯. জমি বন্ধক দিয়েছেন ? পরিমাণ :
খ. জমি বন্ধক নিয়েছেন ? পরিমাণ :
গ. উৎপাদনের বিবরণ :

১১. অন্যান্য সম্পদ :
ক. গবাদি পশু :
খ. জিনিসপত্র :
১. আসবাবপত্র :
২. ইলেকট্রনিক্স :
৩. কৃষি যন্ত্রপাতি :
৪. অন্যান্য :

১২. আপনার মাসিক পারিবারিক আয় কত?.................

১৩. আপনার বাসগৃহ সম্পর্কে বলুন : নিজস্ব / সরকারি / ভাড়া / অন্যান্য

১৪. আপনার বাসগৃহের ধরন :

১৭. আপনার গৃহে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে কি ? হ্যাঁ / না

১৯. অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য :
ক. স্থানান্তর করেছেন কি না ? হ্যাঁ/ না
খ. হ্যাঁ হলে, কত বছর ও কোথা থেকে ?
গ. স্থানান্তরের কারণ কি?...

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

পরিশিষ্ট- দুই

রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর
সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা

অনুসূচি নং:
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী:
তারিখ :

১. আপনার নাম:..পিতা/মাতার নাম :...

ঠিকানা: গ্রাম .... ডাকঘর............... মৌজা .... মোবাইল.......................

২. বয়স : .... ৩. বৈবাহিক অবস্থা: বিবাহিত/অবিবাহিত ৪. গোত্র/অন্যান্য : .... ৫. ধর্ম: ....

৬. পরিবার/ গৃহস্থালী তথ্য :

নং	সদস্যদের নাম	প প্র সঙ্গে সম্পর্ক	বয়স	লিঙ্গ পুরুষ/ নারী	শিক্ষা	পেশা ১/২	আয়	বর্তমান আবাসস্থান	মন্তব্য

৭. আপনি রাখাইন ভাষা বলতে পারেন? হ্যাঁ/না। লিখতে পারেন? হ্যাঁ/না

৮. আপনি বাংলা ভাষা বলতে পারেন? হ্যাঁ/না। লিখতে পারেন? হ্যাঁ/না

৯. স্কুলে রাখাইন ভাষায় শেখানো হয় কিনা? হ্যাঁ/না

১০. বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতিতে আপনি কি সন্তুষ্ট? হ্যাঁ/না। না হলে কারণ কী?

১১. প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা দূরীকরণে আপনার কোন মতামত থাকলে বলুন.......................................

১২. পূর্বের মতো স্থানীয় টোলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ/না, না হলে কারণ কি?...........................

১৩. স্কুল/কলেজ-উপযুক্ত কোন সন্তান আছে যে/যারা স্কুল/কলেজে যায় না : হ্যাঁ/না । হ্যাঁ হলে-

নং	নাম	বয়স	সর্বশেষ শিক্ষা	কতদিন যায় না	কারণ: অর্থনৈতিক/দূরত্ব/উৎসাহের অভাব/অল্প বয়স/অন্যান্য

১৪. আপনি কি স্থানান্তর করেছেন? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে, কত বছর আগে ....ও কোথা থেকে.............

১৫. ভূমি সংক্রান্ত তথ্য : ভূমি আছে/নেই। আছে হলে-

ভূমির পরিমাণ (একর)	জমির ধরন ১		মালিকানা		মালিকানা প্রাপ্তি	মন্তব্য
	কৃষিজমি	বসতবাড়ি	ব্যক্তিগত	এজমালি (বিবরণ)	উত্তরাধিকার/ক্রয়/খাস/অন্যান্য	

১৬. আপনি নিজে কোন জমি বিক্রি করেছেন? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে, কত বছর আগে--- ও কি পরিমাণে.........

১৭. আগে আপনার কি পরিমাণ জমি ছিল? ক. ২০ বছর আগে................খ. ৩০ বছর আগে..................

গ. ৪০ বছর আগে..................

১৮. ভূমিহীন হলে, ভূমিহীন হওয়ার কারণ কী? বিস্তারিত বলুন?

১৯. বর্তমানে খাস জমি ভোগ করছেন কি না ? হ্যাঁ/না, হ্যাঁ হলে কি পরিমাণ...........কত বছর ধরে..........

Dhaka University Institutional Repository

২০. খাস জমি না পাওয়ার কারণ কি? ....

২১. ভূমি নিয়ে আপনার কোন সমস্যা বা বিরোধ হয়েছিল? হ্যাঁ/না

২২. কি ধরনের বিরোধ...

২৩. উক্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি হয় কিভাবে? গ্রাম্য সালিশ/ ইউনিয়ন পরিষদ/ থানা/ জেলা

২৪. ভূমি সমস্যার সমাধান সন্তোষজনক হয়েছিল? হ্যাঁ/না

২৫. আপনার কোন জমি বেদখল হয়েছে কি? হ্যাঁ/না

২৬. জমি বেদখল হবার কারণ কি? মামলায় হেরে যাওয়া/মামলা জিতেও দখল না পাওয়া/অনাদিবাসীদের জোরদখল/জমি খাস হওয়া/অন্যান্য..

২৭. আপনি কোনরকম হয়রানিমূলক মামলার শিকার হয়েছেন কি? হ্যাঁ/না, হ্যাঁ হলে কি ধরনের?................

২৮. আপনি কারো বিরুদ্ধে কোন মামলা করেছেন? হ্যাঁ/না, হ্যাঁ/না, হ্যাঁ হলে কি ধরনের?.......................

২৯. জমি বর্গা দিয়েছেন ? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের বিবরণ:...............................

৩০. জমি বর্গাদানের কারণ কী?...

৩১. জমি বর্গা নিয়েছেন ? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের বিবরণ: ....

৩২. জমি বর্গা নেওয়ার কারণ কী?..

৩৩. বর্গা জমির শর্ত কী? ফসল অর্ধেক/খরচ চাষির/সুসম্পর্ক রাখতে হয়/হালের বলদ থাকতে হয়/বেগার খাটতে হয়/ অন্যান্য

৩৪. অতীতে বর্গা জমি হাতছাড়া হলে- কারণ কী? ফসল কম হওয়া/ বর্গাচাষির অকুপেশনাল রাইট এড়ানো/ বেগার না দেওয়া মালিক নিজে চাষ করবে/আদিবাসী হওয়ার জন্য/ জমি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য/অন্যান্য

৩৫. জমি বন্ধক দিয়েছেন ? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে জমির পরিমাণ ও ফসল ভাগের হিসাব কেমন? ....

৩৬. জমি বন্ধক নিয়েছেন ? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে জমির পরিমাণ ও ফসল ভাগের হিসাব কেমন ? ....

৩৭. রাখাইন শ্রমিকরা বাঙালিদের সমান মজুরি পান কিনা? হ্যাঁ/না

৩৮. নারী শ্রমিকরা সমান মজুরি পান কিনা? হ্যাঁ/না

৩৯. তাঁত আছে? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কয়টি? ১/২/৩

৪০. বর্তমানে তাঁত চালু আছে? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কয়টি ....? উৎপাদন ও উপার্জন সম্পর্কে বলুন ....

৪১. বর্তমানে তাঁত বন্ধ থাকলে তা কত বছর ধরে বন্ধ?.................

৪২. তাঁত বন্ধ থাকার কারণ বলুন? ....

৪৩. অতীতে কয়টি তাঁত ছিল? ১/২/৩/৪

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. বিভিন্ন প্রকার সম্পদ :

ক. গবাদি পশু : গরু- , মহিষ- , ছাগল- , ভেড়া- , শূকর- , হাঁস- , মুরগি- , অন্যান্য-

খ. জিনিসপত্র :

১. আসবাবপত্র : টেবিল/চেয়ার

২. ইলেকট্রনিক্স : রেডিও, টিভি, সিডি, মোবাইল

৩. কৃষি যন্ত্রপাতি: কোদাল/লাঙল/মই/কাস্তে/খুরপি/নিড়ানি/সাধারণ স্প্রেয়ার/মাড়াইকল/পাম্প/গরুর গাড়ি

৪. অন্যান্য : ঢেঁকি, রিক্সা, সেলাই মেশিন.............

৪৫. আপনার মাসিক পারিবারিক আয় কত?.................

৪৬. আপনার মাসিক পারিবারিক ব্যয় কত?..................

৪৭. আপনার মাসিক সঞ্চয় কত?..................

৪৮. আপনার পরিবারে কর্মক্ষম কেউ বেকার আছে কিনা? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে

নং	নাম ও সম্পর্ক	বয়স	শিক্ষা	কতদিন বেকার	কারণ

৪৯. আপনার বাসগৃহ সম্পর্কে বলুন : নিজস্ব/সরকারি/ভাড়া/অন্যান্য

৫০. আপনার বাসগৃহের ধরন : পাকা/আধপাকা/কাঁচা/ কাঠের বেড়া টিনের চাল/কাঠের বেড়া গোলপাতা চাল/ টিনের বেড়া ও চাল/মাটির দেয়াল গোলপাতা চাল/মাটির দেয়াল টিনের চাল/বেড়াবাড়ি/অন্য রকম........

৫১. আপনার বাসগৃহে কয়টি কক্ষ আছে : ১/২/৩/৪ /৫/অধিক

৫২. আপনার গোসলখানার ধরন : পাকা/আধপাকা/কাঁচা/পুকুর/টিউবওয়েল/অন্যান্য

৫৩. ব্যবহৃত পানীয় জলের উৎস সম্পর্কে বলুন: নলকূপ/গভীর নলকূপ/কূপ/পুকুর/নদী/বৃষ্টি/অন্যান্য

৫৪. নলকূপ/গভীর নলকূপ স্থাপনের মালিকানা: ব্যক্তিগত/যৌথ/সরকারি/এনজিও

৫৫. পয়ঃপ্রণালির ধরন : কাঁচা/উন্মুক্ত/স্যানেটারি/আধা পাকা/পাকা/অন্যান্য

৫৬. পয়ঃপ্রণালির স্থাপনের মালিকানা: ব্যক্তিগত/যৌথ/সরকারি/এনজিও

৫৭. আপনার গৃহে সরকারি/পল্লি/সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে কি ?

৫৮. বর্তমানে কোন শারীরিক সমস্যা বা রোগে ভুগছেন কী? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে রোগের নাম বলুন................

৫৯. রোগের জন্য চিকিৎসা নিচ্ছেন? হ্যাঁ/না?

৬০. হ্যাঁ হলে কি ধরনের চিকিৎসা নিচ্ছেন? সরকারি/বেসরকারি/কবিরাজি/স্থানীয় ক্লিনিক/হাতুড়ে ডাক্তার/ঝাঁড়ফুঁক/অন্যান্য

৬১. বিগত ৫ বছরের মধ্যে গর্ভধারণকালে গর্ভবর্তী মায়ে কোন প্রকার ডাক্তারি পরামর্শ গ্রহণ করেছিল? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কোন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছিলেন? সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র/বেসরকারি ক্লিনিক/পাসকরা ডাক্তার/হাতুড়ে ডাক্তার/কবিরাজি/হোমিওপ্যাথি/স্থানীয় দাই মা/অন্যান্য

৬২. গর্ভধারণকালে মায়ের জন্য বিশেষ কোন খাবার দেওয়া হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ/না

৬৩. অনূর্ধ্ব ৫ বছরের শিশু বর্তমানে কি ধরনের শারিরীক সমস্যায় ভুগছে: ডায়রিয়া/নিউমনিয়া (শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত)/জ্বর/চর্মরোগ/ হাম/চোখের অসুখ/কাশি/কৃমি/

Dhaka University Institutional Repository

৬৪. অনূর্ধ্ব ৫ বছরের রোগাক্রান্ত শিশুর কোনপ্রকার চিকিৎসা দেওয়া হচ্চে কিনা/হ্রাঁ/না। হ্যাঁ হলে, কোথায়– সরকারি হাসপাতাল/বেসরকারি ক্লিনিক/স্থানীয় ফার্মেসি/কবিরাজি/হোমিওপ্যাথি/প্রযোজ্য নয়

৬৫. গত ১বছরের মধ্যে পরিবারের কেউ নিম্নের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন কিনা?- জেলা হাসপাতাল/মা ও শিশু স্বাস্থ্যকল্যাণ কেন্দ্র/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র/স্কুল স্বাস্থ্যকেন্দ্র/স্যাটেলাইট ক্লিনিক/কমিউনিটি ক্লিনিক/এনজিও ক্লিনিক/স্তানীয় ফার্মেসি/অন্যান্য

৬৬. তফসিলভুক্ত কোন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কোন ব্যাংকে................................

৬৭. এনজিও-এর সাথে সম্পৃক্ততা আছে? হ্যাঁ/না

৬৮. হ্যাঁ হলে এনজিও সম্পৃক্ততার কারণ কী বলুন : ঋণ/অনুমোদন পাওয়া/শিক্ষা সহায়তা/বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান/স্বাস্থ্য সুবিধা/সঞ্চয় বৃদ্ধি/আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি/টিউবওয়েল/নারী পুনর্বাসন/গৃহ নির্মাণ/খাসজমি/অন্যান্য

৬৯. এনজিও সহায়তা নিয়ে জীবনের কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে বলুন : স্বাধীনতা বৃদ্ধি/আয়বৃদ্ধি/নারীর ক্ষমতায়ন/পারিবারিক অশান্তি হ্রাস/পরিবারের সদস্যদের শিক্ষিত হওয়া/সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি/সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি/স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন

৭০. বিগত ১/২ বছরের মধ্যে কোনপ্রকার ঋণ গ্রহণ করেছেন কি? হ্যাঁ/ না।

৭১. হ্যা হলে, কোথা থেকে? ব্যক্তি/সরকারি ব্যাংক/এনজিও

৭২. ঋণের পরিমাণ কত? ৫,০০০/১০,০০০/১৫,০০০/২০,০০০/৩০,০০০/৪০,০০০/৫০,০০০ টাকা

৭৩. ঋণের ধরন বলুন: গাভী ঋণ/ষাড় ঋণ/ছাগল ঋণ/মৎস ঋণ/ব্যবসা ঋণ/অন্যান্য

৭৪. ঋণ পেতে দুর্ভোগ পোহাতে হয় কিনা? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কী ধরনের?

....

৭৫. ঋণ পরিশোধে কোন সমস্যা হয়েছিল কিনা? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কি ধরনের

....

৭৬. বিগত ২/১ বছরের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কি? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কি ধরনের?..........

৭৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন সহায়তা পেয়েছেন কী? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে সরকারি/বেসরকারি। কী ধরনের সহায়তা- টাকা/ত্রাণ/পোশাক/অন্যান্য.......

৭৮. চিত্তবিনোদন বা অবসর সময়ে কীভাবে কাটান? প্রতিবেশির সঙ্গে আড্ডা/আত্মীয়ের বাসায় যাওয়া/হাটবাজার/দোকানপাট/ক্লাব/সমিতিতে খেলাধূলা/রেডিও/টিভি/সিডি ক্যাসেট/সংস্কৃতিচর্চা

৭৯. জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আপনি কি কোন প্রকার বঞ্চনা অনুভব করেন? হ্যাঁ/না

৮০. হ্যাঁ হলে কি ধরনের বঞ্চনা-ব্যক্তি পর্যায়/সমাজ পর্যায়/স্থানীয় প্রশাসন পর্যায়/রাষ্ট্রীয় পর্যায়/অন্যান্য

৮১. বর্তমানে জীবনযাপনে কি সন্তুষ্ট? হ্যাঁ/ না/ মোটামুটি/ জবাব নেই। না হলে একটু খুলে বলুন................

৮২. আপনাদের প্রতি প্রতিবেশি বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন মনে হয়? ভালো/মোটামুটি/ভালো না/অন্যান্য

৮৩. আপনাদের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন মনে হয়? ভালো/মোটামুটি/ভালো না/অন্যান্য

৮৪. আপনি রাখাইন নারীদের চলাফেরা ও কাজকর্মে কোনরকম সমস্যা অনুভব করেন কী? হ্যাঁ/না

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. নারীরা পরিবারের জন্য আগের মতো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারছে কি? হ্যাঁ/না/মোটামুটি। না হলে, কারণ বলুন ....

৮৬. রাখাইন নারীরা কি কোন প্রকার হয়রানি/নিপীড়ন/নির্যাতনের শিকার হচ্ছে? হ্যাঁ/না

৮৭. নির্যাতন সংক্রান্ত কোন ঘটনা জানা থাকলে খুলে বলুন...

৮৮. নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে আপনি কি কোন রকম চিন্তিত বা শঙ্কিত? হ্যাঁ/না

৮৯. আগের দিনে যে সব পারিবারিক ও সামাজিক সাংস্কৃতি উৎসব পালন করতেন তা কি বর্তমানে পালন করতে পারছেন? হ্যাঁ/না। না হলে, কি কারণ?..

৯০. কুটির শিল্পের কোন প্রকার কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন কী? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কী কাজ?
....

৯১. আপনার গ্রামে বিশেষ কোন অসুবিধা আছে : বিশুদ্ধ পানির অভাব/বৈদুতিক ব্যবস্থার অভাব/নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব/বিনোদনের অভাব/চিকিৎসাব্যবস্থার অভাব/ভালো রাস্তাঘাটের অভাব/আইন-শৃঙ্খলার অভাব/অন্যান্য

৯২. সমস্যার সমাধানে আপনার মতামত কি?
....

৯৩. গত এক/দুই বছরের মধ্যে আপনার পরিবারের কেউ অভুক্ত থেকেছে : হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কতদিন......কত সাজ....

৯৪. আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট? হ্যাঁ/না/মোটামুটি

৯৫. কোন্ বিশেষ সমস্যাকে আপনাদের নিজেদের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করেন? ....

৯৬. আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে? হ্যাঁ/না

৯৭. ভবিষ্যতে জন্মভূমি ত্যাগ করে বার্মায় চলে যাওয়ার কোন আগ্রহ আছে কী? হ্যাঁ/না

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- তিন

রাখাইন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তর
বিশেষ সাক্ষাৎকার

অনুসূচি নং:
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী:
তারিখ :

সাক্ষাৎদাতার নাম:...................................বয়স: ....গ্রাম ....মোবাইল ....

১. আপনি দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন দেখতে পান, খুলে বলুন.........................

২. কৃষিকাজে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? ....

৩. তাঁতের ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে বলুন..

৪. পারিবারিক উৎসব পালনে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে, এর কারণ, ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত বলুন..........

৫. সামাজিক উৎসব পালনে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে? ....

৬. সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? ....

৭. ধর্মীয় উৎসবে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? ....

৮. যে-কোন ধরনের উৎসব পালনের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় কিনা?......................

৯. খেলাধুলার পরিবর্তন বিষয়ে বলুন..

১০. সমাজে নেতৃত্বের পরিবর্তন ও তার প্রভাব নিয়ে বলুন...

১১. পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন দেখতে পান?..

১২. গ্রামীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন পন্থার পরিবর্তন নিয়ে বলুন...

১৩. বিবাহ-বিচ্ছেদ বিষয়ে বলুন..

Dhaka University Institutional Repository

১৪. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ
করুন...

১৫. আপনাদের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন মনে হয়?
....

১৬. আপনাদের প্রতি স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন মনে হয়?
....

১৭. আপনাদের প্রতি প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন মনে হয়?
....

১৮. আপনাদের প্রতি প্রতিবেশি বাঙালিদের আচরণ কেমন মনে হয়?
....

১৯. বাজার লেনদেন-কেনাকাটার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হয়
কিনা?..

২০. মজুরি ব্যবস্থা সম্পর্কে বলুন। যেমন বাঙালিদের তুলনায় কম, কিংবা নারীদের কম মজুরি প্রদান...........

২১. আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট? বিস্তারিত
বলুন...

২২. ভবিষ্যতে অভিবাসনের কোন চিন্তা-ভাবনা আছে কিনা
বলুন..

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- চার

তিনটি গ্রামের প্রধান তথ্যদাতাদের তালিকা

হাড়িপাড়া

১. মহেন চিং মাতবর, বয়স ৫০

২. নিপু মাতবর, পিতাঃ থামরাও মাতবর। বয়স ৪৮ বছর

মধুপাড়া

১. মমো মাতবর, বয়স ৫৫

২. এমং মাতবর, বয়স ৫২

তুলাতুলিপাড়া

১. লিফু মাতবর, বয়স ৬০

২. চামন, পিতাঃ মংতেনচি কবিরাজ, বয়স ৩০ বছর

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- পাঁচ

তিনটি গ্রামের বিশেষ সাক্ষাৎকারদাতাদের তালিকা

হাড়িপাড়া

১. মাওচুমেন, পিতা : উশেফ্রু মাতবর, বয়স ৩৫, পেশা : শিক্ষক (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়)

২. ওলাতেন মাতবর, বয়স ৪৭ বছর, পেশা : কৃষি

মধুপাড়া

১. আবু সে মাতবর, পিতা : নিমুশে মাস্টার, বয়স : ৪৭ বছর

২. অংচোলা মাতবর, বয়স ৫৬ বছর

তুলাতুলিপাড়া

১. মং চান, পিতাঃ পান চা থা মাতবর, বয়স ৪৩ বছর

২. ঠংজার মাস্টার, বয়স ৭০ বছর

Dhaka University Institutional Repository

স্থিরচিত্র

স্থিরচিত্র ৩ : হাড়িপাড়ায় দলগত আলোচনা। ৩১ মার্চ ২০১৮। সন্ধে ৭.০০ টা।

স্থিরচিত্র ৪ : তুলাতুলিপাড়ায় দলগত আলোচনা। ১ মে ২০১৮। বিকেল ৫.৩০ টা।

Dhaka University Institutional Repository

স্থিরচিত্র ৫ : তুলাতুলিপাড়ার মন্দিরে উকোয়েনডা ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ২ মে ২০১৮। বিকেল ৫.০০ টা।

স্থিরচিত্র ৬ : গ্রামবাসীর সাথে তুলাতুলিপাড়ার মন্দির প্রাঙ্গণে সাক্ষাৎ। ২ মে ২০১৮। বিকেল ৬.০০ টা।

Dhaka University Institutional Repository

স্থিরচিত্র ৭ : মধুপাড়ায় এমং মাতবরের সাথে আলোচনা। ৩ মে ২০১৮। সন্ধ্যা ৭.০০ টা

স্থিরচিত্র ৮ : তুলাতুলিপাড়ায় মংতেনচি কবিরাজের সাক্ষাৎকার গ্রহণ। ৩০ এপ্রিল ২০১৮। বিকেল ৫.০০ টা।

Dhaka University Institutional Repository

স্থিরচিত্র ৯ : হাড়িপাড়ার একটি গৃহ ও পরিচ্ছন্ন পারিপার্শ্বিক

স্থিরচিত্র ১০ : হাড়িপাড়ায় একটি গৃহের প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান

গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি বই

Adnan, S.	2004	*Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Cause of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, Rearch and Advisory Service, Dhaka
Ahmed, N.	2007	*Research Methods in Socia Sciences*, ECDO, Syihet
Ali, A.	1989	*Santals of Bangladesh*, Mindnapur (India): Institute of Social 1998 Research and Applied Anthropology, India
Ahsan, S.	1993	*The Marmas of Bangladesh*, HRDP, BARC, Dhaka
Alamgir, M. K.	1978	*Bangladesh, A Case of Below Poverty Level Equilibrium Trap*, The Bangladesh Studies of Development, Dhaka
Ali, M. A.	1989	*Social Change Among Santals of Bangladesh : A Story of Cultural Isolation*, ISRAA, Midnapur, WB
Ali, S. M.	1964	*History of Chittagong*, Dacca
Alvin	1990	*Social Change and Development: Modernization, Dependency and World System Theory*, SAGE Publicatio, Newbury Park, London
Annisuzzaman, & Khan, S.	2012	*Cultural Diversity*, Bangla Academy, Dhaka
Arefeen, H. K. S.	1986	*Changing Agraian Structure in Bangladesh : Shimulia*, Centre for Social Studies, Dhaka
Aspinal, A.	1980	*English Relation with Burma in the Time of Cornwallis and (1786-1798) Shore in Bengal Past and Present*, Vol. XL, Part-II
Aziz, K. M. A.	1979	*Kinship in Bangladesh*, ICDDRB, Dhaka
Bandopadhya , S.	2004	*From Palashi to Partition*, Orient Longman
Banerjee, A. C.	1973	*Buddhism in India and Abroad*

Barkat, A., Hoque, M., Halim, S. and Osman, A.	2009	*Life and Land of Adibashis, Land Dispossession and Alienation of Adibashis in the Plain Districts of Bangladesh*, Pathak Shamabesh, Dhaka
Barua, B. P.	2001	*Ethnicity and National Integration in Bangladesh: A Study of the Chittagong Hill Tracts*, Har Anand Publications Pvt. Ltd., New Delhi
Barua, K. L.	1938	*Early History of Kamrupa*, Shillog, Assam
Bassaignet, P.	1958	*Tribesmen of Chittagong Hill Tracts*, Dacca
…………….	1960	*Tribes of the Northern Borders of East Pakistan*, Social Research in East Pakistan
Batler, John	1897	*A Sketch of Assam with Some Account of the Hill Tribes*, London
Benedict, A.		*The Imagined Community*
Bennison, J. S. (ed.)	1993	*Census of India*, vol. xi, Burma, Part ii, Rangoon
Beveridge, H.	1876	*The District of Bakergong : Its History and Statistics*, London
Biswas, A. A.	1996	*Ethnography of a Coastal People of Bangladesh*(Unpublished Ph. D. Thesis), Department of Sociology, University of Dhaka
Bleie, T.	2005	*Tribal Peoples, Nationalism and the Human Rights Challenges: The Adivasis of Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka
Bose, J. K.	1980	*Glimpses of Tribal Life in North-East India*, Calcutta
Bowney, H. B.	1882	*The Wild Tribes of India*, London
Brown, A R.	1922	*The Andaman Islander*, Cambridge
Burling, Robbins	1977	*The Strong Women of Modhupur*, UPL
Caddy, J. F.	1958	*A History of Modern Burma*, Cornell University Press
Chowdhury, A.	1978	*A Bangladesh Village: A Study of Social Stratification*, Centre of Social Studies, Dhaka
Chowdhury, R. T.	1969	*Permanent Settlement in Operation : Bakergonj District*, East Bengal University of Wiscons in Press

C, Jack J. 1905 *Bakergonj District Gazzetteer*, Bengal Secretariate Press, Cal.

Codrington, R. H. 1891 *The Melanesians*, Oxford

Collis, M. 1943 *The Land of Great Image : Being experience of Friar Manrique in Arakan* (Trans), London

Crindle, M. 1877 *Ancient India as described by Megasthenes and Arrian*

Dalton, G. 1960 *Descriptive Ethnology of Bengal*, Goverment Printing Press, Calcutta, India

Danda, D. 1979 *Among the Dimsa of Assam : An Anthropological Study*, New Delhi

Darwin, C. R. 1871 *Decent of Man*, London: John Murray

Dasgupta, P. K. 1984 *Life and Culture of Matrilineal Tribe of Meghalaya*, New Delhi

Dasgupta, S. (ed.) 1967 *Methodology of Social Science Research*, Impex India, New Delhi

Davis. K. 1949 *Human society, MacMillan*

Dawson, J. 1881 *Australian Aborigines*, Melboume

Deb, S. B. 1987 *The Chakmas and the Maghs*, Agartala

Doyle, M.W. 1986 *Empires*, Ithoca, Cornell University Press

Dube, S. C. 1977 *The Tribal Heritage of India*, Calcutta

Edari, R. S. 1976 *Social Change*, Wm. C. Brown Company Publishers, USA

Frank, A. G. 1967 *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*, Monthly Review Press, New York

Fetterman, D. M. 1989 *Ethnography Step by Step*, Sage Pubications, New Delhi

Freud, S. 1910 *Totems and Taboos*

Gain, P. et all 2000 *Discrepancies in Census, Socio-economic Status of Ethnic Communities*, SHED, Dhaka

Gain, P. (ed.)	2000	*The Chittagong Hill Tracts: Life and Nature at Risk,* SHED, Dhaka
……….. (ed.)	1995	*Bangladesh Land Forest and Forest People*, SHED, Dhaka
……..... (ed.)	1993	*Year of the Indigenous People*, SHED, Dhaka
Ghosh, J. M.	1960	*Magh Raiders in Bengal*, Calcutta
Gillen, F. J.	1899	*The Native Tribes of Central Australia*, London
Ginsberg, M.	1968	*Essays in Sociology and Social Philosophy,* Peregrine Book
Gomes, S. G.	1988	*The Paharias:* a Glimpse of Tribal Life in Northwestern Bangladesh, Caritas, Dhaka
Grierson, G. A.	1906	*The Linguistic Survey of India,* Calcutta
Grison, W. V.	1941	*The Aboriginal Problem in the Balaghat District,* Government printing
Guha, B. S.	1937	*An Outline of the Racial Ethnology of India*, Calcutta
Gurdon, P. R. T.	1914	*The Khasis*, London
Hafeez, Z. S. M.	1970	*The Village Culture in Transition,* Honolulu, East West Centre Press
Hall, D. G. E.	1955	*A History of South East Asia*, Macmillan and Co. Ltd. London
……………	1968	*History of South-East Asia*, London
Haque, F.	1944	*Bengal To Day*, Dhaka
Harvey, G. E.	1967	*History of Burma*, London, Original: 1925
Hasan, M.	2003	*The Changing Life Styles of the Santals of the Barind Tract*, (M. Phil. Thesis), Department of History, Dhaka University
Hislop, S.	1866	*Aboriginal Tribes of the Central Provinces*, the University of Michigan
Hodson, T. C.	1911	*The Naga Tribes of Manipur*, London

Hout, W.	1995	*Capitalism and the Third World*, Reprint, Edward Elgar Publishing Limited, England
Hughes, W. G.	1915	*The Hill Tracts of Arakan*, Rangoon
Huhon, J. H.	1931	*The Angami Nagas*, London
Hunter, W. W.	1875	*A Statistical Account of Bengal*, Vol. V, London
……………	1868	*The Annals of Rural Bengal*, Smith, Elder & Co, London
Hussain, T.	1995	*Land Rights in Bangladesh*, UPL
Hutchinson		*Eastern Bengal and Assam District Gazetter*
Islam, M. R.	2017	*Santals and Oraons of Bangladesh: A Study of Changing Economic Life of Ethnic Communities in the Barind Region*, Hawlader Prakashani, Dhaka
Jack J. C.	1905	*Bakergonj District Gazzetteer*, Bengal Secretariate Press, Calcutta
………..	1918	*Bengal District Gazetteers : Bakerganj*, Calcutta
Jahangir, B. K.	1979	*Differentiation Polarisation and Confrontation*, Centre for Social Studies, Dhaka University, Dhaka
Jen, K. R.	1901	*Life and work in Khasis*, London
Karim, A.	1964	*Murshid Qudi Khan and His Times*, Dacca
Karim, A. K. N.	1961	*The Changing Society of India and Pakistan*, Ideal Publication, Dhaka
Karim, N.	1994	*Exploitation Domination and Alienation: The Genesis of Bangladesh*, Osmania Library, Dhaka.
Khaleque, K.	1979	*Social Change Among The Garo*, Dhaka
Khan, A. M.	1999	*The Maghs A Buddhist Community in Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka
Kothari, C. R.	1994	*Research Methodology*, New Age International Limited, India
Kothari, K. L.	1985	*Tribal Social Change in India*, Delhi

Kosambi, D. D.	1975	*An Introduction to the History of Indian History*, Popular Prakashan, Bombay
Kottak, C. P.	2000	*Cultural Anthropology*, The McGraw-Hill Companies, U.S.A.
Krader, L.	1975	*The Asiatic Mode of Production*, Van Gorcum & Comp. B.V-Assen, The Netherlands
Levi-Strauss	1951	*Miscelleneous Notes on the Kuki of the Chittagong Hill Tracts*
Lewin, T. H.	1869	*Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein*, London
…………...	1870	*Wild Race of South Eastern India*, London
Lindzey, G. & Elliot, A. (ed.)	1975	*The Handbook of Social Psychology*, Vol. 2, Research Methods, Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi
Luce, G. H.	1969	*Old Burma and Early Pagan*, New York
Mackenzie, A.	1884	*History of the Relations with Government with the Hill Tribes of the North Eastern Frontier of Bengal*, Calcutta
Mahmood, A.	1977	*A Plea for a Fresh Approach to Socio-Economic Development*, Centre for Social Studies, Dhaka
Majumdar, D. N.	1957	*A Tribe in Transition*, London
………………..	1978	*Culture Change in Two Garo Villages, Calcutta*
……………….	1953	*Fortune of Primitive Tribes*, London
Majumdar, R. C.	1963	*The History of Bengal*, vol. I, Reprinted Edition, Second Impression, University of Dhaka, Dhaka
Majumder, R. C. & Dasgupta, K. K.(ed.)	1982	*A Comprehensive History of India*, Delhi
………………	1971	*History of Ancient Bengal*, Calcutta : G. Bharadwaj
Maung, H. A.	1967	*A History of Burma*, London
Mazwell, L. C.	1963	*The Land and People of Burma*, London

Dhaka University Institutional Repository

Moniruzzaman, T.	1975	*Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, Bangladesh Book International Ltd., Dhaka
Mohsin, A.	2002	*The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts*, University Press Limited, Dhaka
Moshe, Y.	1972	*The Muslim of Burma : A Study of Minority Group, Rangoon*
Mukherjee, C.	1962	*The Santals*, Calcutta
Mukherjee, R.	1957	*The Dynamics of Rural Society- Study of the economic Structure in Bengal Villages,* Akademic verlag, Berlin
Mukherje, R. K.	1971	*Six Villages of Bengal,* Popular Prakashan, Bombay
Murdoc, G. P.	1949	*Social Structure,*. The Macmillan Company, New York
Myumder, D. N.		*A Tribe in Transition*
Pakistan Government.	1963	*Pakistaner Upajati*, Pakistan Government Publication Department, Dhaka
Pati, B.	2011	*Adivasis of Colonial India*, Indian Council of Historical Research, India
Playfair, M. A.	1909	*The Garos*, London
Prebish. R.	1950	*The economic develoment of Latin America and its principal problems*, Lake Success, N.Y., United Nations Department of Economic Affairs
Qunungo, S. B.	1990	*A History of Chittagong,* Chittagong
Qureshi, M. S. (ed.)	1985	*Tribal Cultures in Bangladesh*, IBS, Rajshahi University, Rajshahi
Rahaman, M. M.	2013	*Plain Land Indigenous People of Bangladesh Development Toward Ending Poverty*, Shrabon Prokashani, Dhaka
Rajivlochan, M.	2014	*Historical Method in Sociological Research*, @ http://www.researchgate.net/publication/274963527Hi

		storical_ Method_in_Sociological_Research
Rajput, A. B.	1963	*The Tribes of Chittagong Hill Tracts*, Karachi
Ray, S. C.	1915	*The Oraons of Chhotonagpur*, Ranchi
Reibeck, E.	1885	*The Chittagong Hill Tribes*, London
Risely, H. H.	1931	*The Tribes and Castes of Bengal*, Routledge, London
Ritzer, G.	1992	*Classical Sociological Theory*, McGraw-Hill, Inc. New York
Rostow, W. W.	1960	*The Stage of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, Cambridge University Press, Cambridge, UK
Rozario, S.	2001	*Purity and Communal Boundaries*, UPL, Dhaka
Russell, R. V. & Raibahadur, H. L.	1916	*Tribes and Castes of the Central Provinces of India*, Macmillan & Co. Ltd. London
Sangma, S. M.	1981	*History and Culture of the Garos, New Delhi*
Sarkar, J. A.	1907	*The Feringht Pirates of Chaatgaon*, Calcutta
Sarkar, J. N.	1948	*History of Bengal*
Sattar, A.	1983	*In The Sylvan Shadows*, Bangla Academy, Dhaka, *Original : Bangla Academy, 1971*
Sattar, A.	1975	*Tribal Culture in Bangladesh*, Muktadhara, Dhaka
Schapera, I.	1956	*Government and Politics in Tribal Societies*, London
Schendel, V.	2009	*A History of Bangladesh*, Cambridge University Press India Pvt. Ltd.
Scott, J. G. B.	1906	*Hanbook of Political Information*, London
Sen, A.	1962	*The State, Industrilization and Class Formation in India*, Routledge & Kegan Paul, London, Boston & Henly
Shakespear, C. J.	1912	*The Lushai Kuki-Clans*, London
Shwe, L. M.	1989	*Burma : Nationalism and Ideology : An Analysis of Society, Culture and Politics*, Dhaka

Singh, S. (edt.)	1987	*Tribal Politics and Stay Systems in Precolonial Eastern and North Eastern India*, Kolkata
Sinha, Surajit	1982	*Tribes and Indian Civilization*, Varanasi
Sirajuddin, A. M.	1971	*The Revenue Administration of the East India Company in Chittang*, Chittagong University
Smith, R. B.	1878	*Aborigines of Victoria*, Melbourne
Sotirios, S.	2005	*Social Research*, Palgrave Macmillan, Newyork
Stephen, G. G.	1982	*The Paharis : A Glimses of Tribal Life in North-Western Bangladesh*
Tanga, L. B.	1978	*The Mizos : A Study in Racial Personality*, Gauhati
Thurston, E.	1909	*Castes and Tribes of Southern India*, Madras
Timm, R. W.	1991	*The Adivasis of Bangladesh*, London
Tragor, H.	1966	*Burma Through Alien Eyes*, Bombay
Tsaya, P.	1886	*Myamma : The Home of the Burman, Calcutta*
Ullah, M.	1996	*Land, Livelihood and Change in Rural Bangladesh*, UPL, Dhaka
Voget, F. W.	1956	*American Indian in Transition : Reformation and Accomodation American Anthropologist*, vol. 58
Wallenstein, I.	1974	*The Modern World System*, Academic Press, New York
....	1979	*The Capitalist World-economy*, Cambridge University Press, Cambridge, U. K.
Watter, H.	1971	*Geographical Statistical and Historical Descriptions of Hindustan and Adjacent Countries*, London, 1820 (Reprint : Delhi)
Watts, N. V.	1970	*The Half-clad Tribes of Eastern India*, Calcutta
Westergard, T.	1979	*Boringram: An Economic and Social analysis of a Village in Bangladesh*, Rural Development Academy
Wilson, H. H.	1857	*Narrative of the Burmese War*, London

Wise, J. 1883 *Notices all the Races Castes and Tribes of Eastern Bengal*, Her Magistis Printer Harison and Son, London

Wissler, C. 1938 *The American Indians*, New York

Wocott, H. F. 1980 *Practicing Anthropology*

Yeo, S. 1963 *His Life and Nations,* 1882 (Reprint), New York

Yin, R. K. 1984 Case Study Research : Design and Methods, Beverly Hills, CA : Sage

Young, P. 1977 *Scientific Survey and Research*, Prentice-Half of India Pvt. Ltd. New Delhi

Y, V. L. (ed.) 1989 *The Creation of Tribalism in Southern Africa,* Berkeley

ইংরেজি প্রবন্ধ

Ahmed, N. 1969 "Evolution of Budhist Stupas and Monasteries in Indo-Pak Sub Continent", *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, XIV, 2

Alamgir, S. M. 1986 "Muslim influence in Arakan and the Muslim Name of Arakanese Kings", *Journal of the Asiatic Society of Bangadesh*, XXXI

Alavi, H. 1972 "India and the Colonial Mode of Production", in Miliband, R. & Saville, J. (ed.) *The Socialist Register*, Monthly Review Pess, New York

.... 1975 "The Colonial Transformation of India", in Miliband, R. & Saville, J. (ed.) *The Socialist Register*, Monthly Review Pess, New York

Ali, J. I. 2017 "Language situation and linguistic diversity of Bangladesh", in *Mother Language*, Vol. 1, Num. 1, International Mother Language Institute, Dhaka

Ali, S. M. 1967 "Arakan Rule in Chittagong (1550-1666 AD)", *Journal of the Asiatic Society of Pkistan*, XII, 3

Amin, S.	1972	"Under Development and Dependence in Balck Africa: Origins and Contemporary Forms", *Journal of Modern African Studies*, Vol.10, No. 4
Askari, S. A.	1959	"The Mughal-Magh Relations Down to the Time of Islam Khan Mashhdi", *Proceedings of the Indian History Congress*, 1959
ASK Research Unit (Ain O Salish Kendra).	2007	"Rights of the Adibashis" in *Human Rights in Bangladesh 2006* by Hameeda Hossain & Sara Hossain, ASK, *Dhaka Journal of Sociology*, Vol. 5, Issue 2, January-June 2013, Nazmul Karim Study Centre, Dhaka University, Dhaka
Aspinal, A.	1930	"English Relations with Burma at the Time of Cornwais and Shore (1787-1789)", Bengal Past and Present, I, II, No. 79-80
Bernot, L.	1953	"In the Chittagong Hill Tracts", Pakistan Quarterly, 3
………..	1957	"Chittagong Hill Tribes", HRAF, *New Haven*, Marton, Stanly (ed.)
Beverly, H.	1971	"The Feringhee Pirates of Chittagong", *Calcutta Review*, 53
Collis, M. S.	1925	"Arakan's Place in the Civilization of Bay", *Journal of the Burma Research Society,* XV, 1
Cooper, J.	1993	"What is an Indigenous People?", *Year of the Indigenous People 1993*, SHED, Report 2, Dhaka
Dani, A. H.	1962	"Coins of the Chandra King of Eastern Bengal", *Journal of the Numismatic Society of India,* XXXIV, 1-2
Gultun, J.	1971	"A Structural Theory of Imperialism", *Journal of Peace Research,* Souce : https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002234337100800201
Habibullah, A. B. M.	1945	"Arakan in Pre-Mughal History of Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, II

Halim, S. 2015 "Land Loss and Implications on the plan land Adivasis", in Drong, S. (ed.) *Solidarity 2015,* Bangladesh Adivasi Forum, Dhaka

Hall, D. G. E. 1933 "The English Contact With Burma", *Journal of the Burma Research Society,* XXIII

Harvey, G. E. 1961 "Bayinnaury Living Descendent : The Magh Bohmong", *Journal of the Burma Research Society,* vol. XLIV, Part I

Kapaeeng Foundation 2015 "Human Rights Report 2014 on Indigenous Peoples in Bangladesh". Available at: http://unpo.org/article/13718

Karim, A. k. N. 1986 "Max Weber's Theory of Prebendalization and Bengal Society", *Bangladesh Sociological Review,* The Bangladesh Sociology Association, Vol. 1, NO. 1, Sept.

………………. 1980 "The Dynamix of Bangladesh Society", Delhi

Kauffman, H. E. 1962 "Observation on the Agriculture of Chittagong Hill Tracts", *Sociology in East Pakistan,* E Owen, John (ed.), Dacca

Kazi T. H. 2008 "The Santals of Bangladesh: An Ethnic Minority in Transition". Available at: http://anthropology-bd.blogspot.com/2008/07/santals-of-bangladesh-ethnic-minority.html

Khaleque, K. 1995 "Ethnic Communities of Bangladesh", in Gain, P. (ed.), SHED, Dhaka

Latter, T. L. 1846 "A Note on Some Hill Tribes on the Kuladyne River", *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* XV

Leofflar, L. G. L. 1968 "A Note on The History of Marma Chief of Banderban", ll Tribes on the Kuladyne River", *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* XIII, 2

Levi-Strauss, C. 1951 "Miscellous Notes on the Kukis of the Chittagong Hill Tracts : Pakistan", *Man in India,*

……………….	1952	"Kinship System of the Chittagong Hill Tribes", *Southern Journal of Anthropology,* 8, 1 (n.d.)
Mahmudul, S.	2003	"Adibasi land law, anthropology and historical reconstructions : Binding upon the Adibasis?" নৃবিজ্ঞান পত্রিকা-৮, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Maung, U.	2000	"Status Report on Rakhaing Community Bangladesh", in *The Rakhain Review,* Vol. III, Coxbazar
Montaz, S.	2014	"Constitutional Recognition of the Indigenous Peoples of Bangladesh", in *Research Journali's Journal of Sociology,* Balasore, Odisha, India.
…………	2016	"Endangered Life of Forest Indigenous Peoples: Bangladesh Perspective", International Journal of Management and Social Science, June 2016, New Delhi, India.
Mukherjee, B. N.	1976	"The Coin Legend of Harikel", *Journal of the Asiatic Society*, XVIII,
Patam, R.	2003	"Tribalization of Ethnic Peoples: Ethnic Identity at Stake", in Drong, S. (ed.) *Solidarity 2003*, BIPF, Dhaka
Patron, C.	1828	"Historical and Statistical Account of Arracan", *Asiatic Researches,* XVI
Peal, S. E.	1893	"The Communal Baracks of Primitive Races", *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* LXI
Phayre, A.	1844	"On the History of Arakan", *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* XIII
…………	1864	"On the History of Burmah Race", *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* vol. 33
Prebish. R.	1959	"Commercial policy in the underdeveloped countries", *American Economic Review, Papers and Proceedings,* vol. 49, no. 2

Rahman, S. S. 2014 "Going Back to Suuare One", *First News,* March, Dhaka

Roy, R. D. 2002 "Social, Economic and Cultural Aspects of the Chittagong Hill Tracts", Mathura Tripura Land (ed.), *Cultural & Indigenous peoples,* Zabarang Kalyan Samity, Khagrachari

Samad, M. 2006 "The Rakhainnes in Bangladesh : Ethnic Origin, Life Livelihood", in Islam, Z. and Shafie, H. (ed.) *Anthropology on the Move : Contextualizing Culture Studies in Bangladesh*, Dhaka University Press, Dhaka

San, S. B. 1923 "The Arakan Mug Battalion", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, XIII, 1

San, T. A. 1980 "The Mog or The Magh or The Arakanes of Bangladesh", Rakhaine, Tazung

Saraswati, S. K. 1937 "The Stupas of Bengal", *Journal of the Department of Letters*, XXIX, Calcutta University

Sarkar, J. N. 1907 "The Firinghee Pirates of Chatgaon 1661 A. D.", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, N. S.

Sen, M. K. 1931 "Notes on the Maghs of Cox's Bazer", *Census of India*, 1, 3

Shahy, K. N. 1977 "Tribal Self-Image and Indentity", in *Tribal Heritage of India* (ed. S. B. Dube), Delhi

Sharif, A. 1966 "On Arakan and Arakaness", Nalinikanta Bhattasali Commemoration Volume, Dacca Museum

Strauss, L. 1952 "Kinship System of Three Chittagong Hill Tribes", *South Western Anthropology*, Spring, New York

Stuart, J. 1923 "An Appeal for More Light on Arakanese History", *Journal of the Burma Research Society,* XIII, 11

Sumon, M. 2003 "Adibasi land law, anthropology and historical reconstructions : Binding upon the Adibasis?", NRIBIGGAN PATRIKA 8, Jangirnagar University, Saver, Dhaka

Tilly, C. | 1994 | "History of Sociological Imagining", *The Tocqueville Review 15*, no. 1

U, A. T. | 1980 | "Arakanese Scripts", Rakhaine, Tazung

Watkins, R. D. | 2015 | "International Day of the World's Indigenous Peoples 2015, Message from the UN Resident Coordinator", in Drong, S. (ed.) *Solidarity 2015*, BIPF, Dhaka

বাংলা বই

অং, মং বা | ২০০৩ | *বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা*, চট্টগ্রাম

আজাদ, আবুল কালাম | ২০০৬ | *বাংলাদেশের জেলা পরিচিতি*, বুক ওয়াল্ড, ঢাকা

আজাদ, লেলিন | ১৯৮৯ | *ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষি কাঠামো*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

আরেন্স, ই. ও ব্যুরদেন, ই. | ১৯৮০ | *ঝগড়াপুর গ্রামবাংলার গৃহস্থ ও নারী*, গণস্বাস্থ্য প্রকাশনা, ঢাকা

আরেফিন, হেলালউদ্দিন খান | ১৯৯২ | *বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

.... | ১৯৯৪ | *শিমুলিয়া বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল কৃষি কাঠামো*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

আলম, মাহবুব | ১৯৬৬ | *চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী ও কোম্পানী আমল*, চট্টগ্রাম

আলাওল | ১৩৪৭ | *সপ্তপয়কর*, *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা

আলী, মেহরাব | ১৯৮০ | *দিনাজপুরের আদিবাসী*, আদিবাসী সাংস্কৃতিক একাডেমী, দিনাজপুর

আহমেদ, সিরাজ উদ্‌দীন | ১৯৮৫ | *বরিশালের ইতিহাস*, ঢাকা

.... (সম্পা.) | ১৯৯০ | *বাকেরগঞ্জের ইতিহাস*, ঢাকা

ইসলাম, এ কে এম আমিনুল | ১৯৮৭ | *এই পৃথিবীর মানুষ* (১ম ও ২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ইসলাম, মযহারুল ও হাফিজ, আবদুল (সম্পা.) | ১৯৬৯ | *সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

ইসলাম, মোঃ সিরাজুল | ১৯৯৮ | *ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ইসলাম, সিরাজুল | ১৯৮৫ | *ভূমি সংস্কার ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

উমর, বদরুদ্দীন | ১৯৭২ | *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, ঢাকা

এরেন্স, ইয়েনেকা ও বুর্দেন, | ১৯৮০ | *ঝগড়াপুর গ্রামবাংলার গৃহস্থ ও নারী*, গণস্বাস্থ্য প্রকাশনা, ঢাকা

ইওস ফান

করিম, আবদুল	১৯৯০	*কক্সবাজারের ইতিহাস*, কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার
করিম, এ কে নাজমুল	২০০৮	*পরিবর্তনশীল সমাজ: ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ*, ইউপিএল, ঢাকা (মূল : ১৯৬৫)
করিম, নেহাল	২০১১	*বাংলাদেশের উন্মেষ ও বিকাশ*, পারিজাত প্রকাশনী, ঢাকা
কাদির, আব্দুল	১৯৬৬	*সাঁওতাল : পাকিস্তানের উপজাতি*, ঢাকা
কার্টার, আইডান ফস্টার	১৯৯৮	*উন্নয়নের সমাজতত্ত্ব*, (অনু. সাদাত উল্লাহ খান) বাংলা একাডেমী, ঢাকা
কোকো, অন্তোনভা	১৯৮২	*ভারতবর্ষের ইতিহাস*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো
কামাল, মেসবাহ ও কিবরিয়া, আরিফাতুল (সম্পা.)	২০০৯	*বিপন্ন ভূমিজ: অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ: বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা
কাসেম, মোহাম্মদ	১৯৮৪	*বাংলাদেশ : জাতি ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
খান, আবদুল মাবুদ	২০০৬	*পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী
....	১৯৭৮	*বাংলাদেশে আরাকানী শরণার্থী আগমনের পটভূমি*, চট্টগ্রাম
....	২০০৭	*বান্দরবান জেলার মারমা সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
খান, মোঃ নজরুল ইসলাম	২০০৮	*ভূমি আইনের সহজ পাঠ*, রিসার্চ ইনিশেয়েটিভ বাংলাদেশ, ঢাকা
খান, সাদাত উল্লাহ (অনূ.)	১৯৯৮	*উন্নয়নের সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
খান, হাফিজ রশিদ	১৯৯৩	*বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী : অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত*, বাংলাদেশ উপজাতি ও আদিবাসী ঐতিহ্য পর্ষদ
খাসনবিশ, রতন	১৯৮৬	*আধাসামন্ততন্ত্র ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি*, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, কলিকাতা
খীসা, প্রদীপ্ত	১৯৯৬	*পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, সাহিত্য প্রকাশ
খোকন, সালেক	২০১২	*সাংস্কৃতিক বৈচিত্রে আদিবাসী*, ইত্যাদি
গাইন, ফিলিপ (সম্পা.)	২০০৪	*বন বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম*, সেড, ঢাকা
ঘোষ, সতীশচন্দ্র	১৯১৫	*চাকমা জাতি*, কলিকাতা
ঘোষ, সুবোধ	১৩৫৫	*ভারতের আদিবাসী*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা
ঘোষাল, সত্যেন্দ্রনাথ	১৬৫৯	*সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী*, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

(সম্পা)

চক্রবর্তী, তপংকর ও বাশার, এসা. এ. (সম্পা) ২০০৪ *বৃহত্তর বাকেরগঞ্জের ইতিহাস*, আনন্দধারা, ঢাকা

চক্রবর্ত্তী, রতন লাল ১৯৯৮ *সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

চাকমা, মঙ্গল কুমার ২০১৬ *বাংলাদেশের আদিবাসী সংক্রান্ত রিসোর্স বই*, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা

.... ও অন্যান্য ২০১৩ *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা*, ২য় খণ্ড, উৎস প্রকাশন, ঢাকা

চাকমা, শরদিন্দু শেখর ২০০৫ *পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও বিপন্ন মানবতা*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা

চাকমা, সুগত ১৯৮৫ *বাংলাদেশের উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

.... ১৩৩৪ *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার* (২য় সংস্করণ), নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

চাকমা, হিমাদ্রী উদয়ন ১৯৮৩ *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও সংগ্রাম*, জনসংহতি সমিতি, চট্টগ্রাম

চৌধুরী, আনোয়ার উল্লাহ ১৯৮৩ *বাংলাদেশের একটি গ্রাম: সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারা,* এসোসিয়েট বুক কোম্পানি, ঢাকা

চৌধুরী, আব্দুল হক ১৯৭৬ *চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, ১ম সংস্করণ, চট্টগ্রাম

চৌধুরী, পিসি ১৯২০ *চট্টগ্রাম জেলার ইতিহাস*, কলিকাতা

চৌধুরী, ফকরুজ্জামান ১৯৬৬ *রাজবংশী : পাকিস্তানের উপজাতি*, ঢাকা

ছিদ্দিকী, রহমত আলী ২০০২ *সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ছেন, চিং মং ২০০১ *বাংলাদেশে রাখাইন জাতির লোক সংস্কৃতি ফোকলোর*, বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি, ঢাকা

জনসন, এরিক ১৯৯০ *গ্রামীণ বাংলাদেশ : সীমিত সম্পদের প্রতিযোগিতা*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

জলিল, মুহম্মদ আবদুল ১৯৯১ *বাংলাদেশের সাঁওতাল : সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

জাহাঙ্গীর ১৮৬৪ *তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী*, আলীগড়, ভারত

জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান ১৯৯৩ *বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শ্রেণীসংগ্রাম*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

.... ১৯৮০ *সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

(অনূ.)		
টিম, ফাদার আর ডব্লিউ	১৯৯২	*বাংলাদেশের আদিবাসী*, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, ঢাকা
তাহান	১৯৭৮	*বাংলাদেশের উপজাতি রাক্ষাইন*, পটুয়াখালী জেলা বৌদ্ধ যুব সংস্থা, পটুয়াখালী
ত্রিপুরা, প্রশান্ত	২০১৫	*বহুজাতির বাংলাদেশ: স্বরূপ অন্বেষণ ও অস্বীকৃতির ইতিহাস*, সংবেদ, ঢাকা
ত্রিপুরা, প্রশান্ত ও হারুন অবন্তী	২০০৩	*পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষ*, সেড, ঢাকা
ত্রিপুরা, মথুরা (সম্পা.)	২০০৭	*ভূমি সংস্কৃতি ও আদিবাসী*, জবারং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি
ত্রিপুরা, শোভা	২০০৭	*ত্রিপুরা জাতি*, উত্তরণ প্রকাশনা, ঢাকা
দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন	১৯৮৬	*বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*, ২য় সংস্করণ ১ম মুদ্রণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা
দেওয়ান, বিরাজমোহন	১৩৭৬	*চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত*, রাঙামাটি
দ্রং, সঞ্জিব (সম্পা.)	২০০৩	*সংহতি ২০০৩*, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
নাথান, মির্জা	১৯৮৯	*বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (অনুবাদ: খালেকদাদা চৌধুরী)
পূততুণ্ড, বৃন্দাবনচন্দ্র	১৩২০	*চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস*, কলকাতা
পুরাকায়স্ত, এম	১৯৫৮	*ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য*, কলিকাতা
ফজল, আবুল	১৮৭৭	*আইন-ই-আকবরী*, বিবলিয়োথিকা (অনুবাদ); (পু. মু. ২০০৩ : বাংলা একাডেমী, ঢাকা)
বড়ুয়া, আর সি	১২৬৭	*চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস*, কলিকাতা
বড়ুয়া, প্রণব কুমার	২০০৭	*বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী
বসু, রাজশেখর	১৪১৬	*চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান*, নতুন সংস্করণ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
বার্টুসি, পিটার জে	১৯৯২	*অস্পষ্ট গ্রাম*, ন্যাসনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, ঢাকা
বাশার, সিকদার আবুল (অনূ.)	২০০৮	*দি ডিস্ট্রিক্ট অব বাকেরগঞ্জ: ইটস হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস*, গতিধারা, ঢাকা
বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ	১৯৮৭	*পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসী সমাজ*, কলকাতা
বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ	২০০১	*আদিবাসী সমাজ ও পালাপর্বণ*, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র, কলকাতা

বিশ্বাস, অশোক ২০০৫ *বাংলাদেশের রাজবংশী : সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী

বেগম, নাজমির নূর ১৯৯২ *সমাজ গবেষণা পরিচিতি*, বুক হাউস, ঢাকা

বেভারেজ, এইচ ১৮৭৬ *দি ডিস্ট্রিক্ট অব বাকেরগঞ্জ ইটস হিস্টরি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস*, লন্ডন (অনুবাদ : বাশার, সিকদার আবুল, (২০০৮), গতিধারা, ঢাকা

বেসেইনে, পিয়ের ১৯৯৭ *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (অনু. : সুফিয়া খান)

ভূঁইয়া, মোঃ আবদুল ওদুদ ১৯৯৪ *সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা

মজিদ, মুস্তাফা ১৯৯২ *পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

.... ২০০৪ *মারমা জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি ২০০৪ *আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি*, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা

মজুমদার, রমেশচন্দ্র ১৩৮৫ *বাংলাদেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ), তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা

মন্তাজ, সাহেদ ২০১৪ *বাংলাদেশের আদিবাসীঃ পূর্বাপর*, দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা

মনিরুজ্জামান ২০১৯ *পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ভাষা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মনিরুজ্জামান, তালুকদার ২০০৮ *বামপন্থী রাজনীতি ও বাংলাদেশের রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (অনূ. আলী মোঃ সাহেব ও কুতুবউদ্দিন, এ. কে. এম)

মহাপাত্র, অনাদিকুমার ১৯৯৪ *বিষয় সমাজতত্ত্ব*, ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন, কলকাতা

মার্কস-এঙ্গেলস ১৮৯৩ *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো

মাইতি, প্রভাতাংশু ১৯৮৮ *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা

মাহবুব-উল-আলম ১৯৬৯ *চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী আমল*, চট্টগ্রাম

মিত্র, সতীশ চন্দ্র ২০০১ *যশোহর খুলনার ইতিহাস* (১ম ও ২য় খণ্ড), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা (১ম মুদ্রণ কলকাতা, ১৯২২)

মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু ১৩৭১ *ভারত কোষ*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা

মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার ১৯৮৭ *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী)*, কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা

মুরশিদ, গোলাম ২০১২ *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

মোমতাজী, আ জ ম সিকান্দার ২০০৫ *পটুয়াখালীর লোকসাহিত্য, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা*

মোমেন, আবুল	১৯৯৬	*সংস্কৃতির সংকট ও সাম্প্রদায়িকতা*, সন্দেশ, ঢাকা
মোহাম্মদ, ইসা	১৯৯৯	*এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের সামন্তবাদ সন্ধান ও বিচার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
রহিম, এম এ	১৯৯৬	*বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৪
রহমান, এএসএম আতিকুর, ও শওকতুজ্জামান, সৈয়দ	১৯৯২	*সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
রায়, অজয়	১৯৯৭	*আদি বাঙালি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, বাংলা একাডেমী
....	১৯৮৭	*বাংলা ও বাঙালি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
রায়, খোসলালচন্দ্র	১৮৯৫	*বাকরগঞ্জের ইতিহাস*, দ্রষ্টব্য : তপংকর চক্রবর্তী ও সিকদার আবুল বাশার (সম্পা.), *বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস*, আনন্দধারা, ঢাকা
রায়, নীহাররঞ্জন	১৯৫১	*বাঙ্গালীর ইতিহাস*, কলিকাতা
রায়, ভুবনমোহন	১৯১৯	*চাকমা রাজবংশ*, রাঙামাটি
লাইজু, নাজমুন নাহার	২০১১	*বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা
শরীফ, আহমদ	১৯৮৩	*বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা
....	১৯৬৬	*লায়লী মজনু*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
.... (সম্পা.)	১৯৬৭	*চন্দ্রাবতী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
শাসমল, কার্তিক	১৩৯৯	*সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান*, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
সাত্তার, আব্দুস	১৯৭১	*আরণ্য জনপদে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
সামাদ, এবনে গোলাম	১৯৬৭	নৃতত্ত্ব, কেন্দ্রীয় বাঙ্‌লা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
সিকদার, সৌরভ	২০১২	*বাংলাদেশের আবিসী ভাষা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
সিংহ, রামকান্ত	২০০২	*বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী*, এএইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ঢাকা
সিদ্দিকী, কামাল	১৯৯২	*বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যেও রাজনৈতিক অর্থনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
....	১৯৮১	*বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা
সেন, রংগ লাল	১৯৮৫	*সামাজিক স্তরবিন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা*
সেন, রোহিণীকুমার	১৯১৫	*বাকলা, কলকাতা;* দ্রষ্টব্য : তপংকর চক্রবর্তী ও সিকদার আবুল

Dhaka University Institutional Repository

		বাশার (সম্পা.), (২০০৪), *বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস*, আনন্দধারা, ঢাকা
সেন, সুনীল	১৯৮৫	*ভারতে কৃষি সম্পর্ক*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা
সেন্দেল, ভেলাম ভান ও বল, এলেন (সম্পা.)	১৯৯৮	*বাংলার বহুজাতি : বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ*, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, দিল্লি
সোলাইমান, আবেদ ইবনে	২০১৯	*আদিবাসীদের জীবনধারা*, রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা
স্থবির, পি	১৯৩৬	*সধর্ম রত্নাকার*, রেংগুন
হক, আব্দুল	১৯৭৬	*চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, ১ম সংস্করণ, চট্টগ্রাম
হক, এম ই ও করিম, এ	১৯৩৫	*আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা
হক, মুহম্মদ এনামুল	১৯৬৫	*মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা
হক, মোঃ আজিজুল	২০০৬	*বাংলাদেশের সাঁওতাল সংস্কৃতির পরিবর্তন : ক্রিয়াশীল উপাদানের প্রভাব* (অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস), আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
হালদার, গোপাল	১৯৮৪	*সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা, ঢাকা
হান্টার, ডব্লিউ ডব্লিউ	১৯৬৯	*পল্লী বাংলার ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
....	১৯৮৭	*পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসী সমাজ*, কলকাতা

বাংলা প্রবন্ধ

অং, মং বা	২০০০	"ইতিহাস : একটি বিতর্কিত অধ্যায়", *দি রাখাইন রিভিউ*, ভলিউম-৩, কক্সবাজার
অরিজিৎ	২০১৬	"লোকসংস্কৃতিতে আগ্রাসনের কয়েকটি দিক", দ্র. চক্রবর্তী, দীপংকর, *অনীক*, পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা
আহমদ, কাজী খলীকুজ্জামান	২০০৮	"টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা
আহম্মদ, এমাজউদ্দিন	১৯৭৯	"নব্য উপনিবেশবাদ : কেন্দ্রপ্রান্ত সম্পর্ক : উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ১০ম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ইসলাম, মুহম্মদ নূরুল	২০০০	"রাখাইন সম্প্রদায়ের নন্দন সংস্কৃতির নিদর্শন", *দি রাখাইন রিভিউ*, ভলিউম-৩, কক্সবাজার
উচুন, উবা	১৯৯১	"আরাকান পটভূমি ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ", *কর্ণফুলীয়*

		দেশ, ১৩-২৬
উবাচাং	২০০০	"রাখাইনদের তাঁত শিল্প", *দি রাখাইন রিভিউ*, ভলিউম-৩, কক্সবাজার
কর, সবুজ	২০১৬	"পণ্য-সর্বস্ব পুঁজিবাদী সংস্কৃতি ও পরিবেশ", দ্র. চক্রবর্তী, দীপংকর, *অনীক*, পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা
করিম, এ এইচ এম জেহাদুল	১৯৯১	"বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্বেও ধরন", *সমাজ নিরীক্ষণ*, ৩৯ সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
করিম, এ. কে. নাজমুল	২০০০	"পূর্ব সীমান্তের অধিবাসী", *এ. কে. এম. নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কানুনগো, এস.	১৩৭৪	"চট্টগ্রামে মগ শাসন", *ইতিহাস পত্রিকা*, নং-২, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
খান, এ. মাবুদ	১৩৯৩	"চট্টগ্রাম জেলার আরাকানী সম্প্রদায়", *ইতিহাস*
....	১৯৮৩	"পটুয়াখালী জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়", *CILO*, A Journal of History Department, Vol. 1, Jahangirnagar University, Dhaka
....	১৯৭৮	"আরাকানে মুসলমান সম্প্রদায়", *দৈনিক আজাদী*, চট্টগ্রাম, ২২-২৭ আগস্ট
খান, এম সিদ্দিকী	১৩৭০	"কক্সবাজারের প্রতিষ্ঠাতা হিরাম কক্স", *পরিক্রম*, আষাঢ়-শ্রাবণ
খান, মুহম্মদ	১৯৫৯	*সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ সংবাদ*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সম্পা. শরীফ, আহমদ)
গোস্বামী, কাননবিহারী	১৪১৫	"আত্মীয়-কুটুম্ব : প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ২০ বর্ষ ৪ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা
চক্রবর্ত্তী, আর. এল.	১৩৮৪	"অষ্টাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামে আরাকানী উদ্বাস্তু", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, আষাঢ়, ঢাকা
চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র	১৪১৫	"জ্ঞাতি নাম", দ্র. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ২০ বর্ষ ৪ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা
চাকমা, মঙ্গল কুমার	২০০৩	"গণতন্ত্র, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং নাগরিক সমাজঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রেক্ষিত", দ্র. দ্রং, সঞ্জিব (সম্পা.), *সংহতি ২০০৩*, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা, শরদিন্দু শেখর	২০০৯	"আদিবাসী জনগণ ও বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রে তাদের অবস্থান", দ্র. কামাল, মেসবাহ ও কিবরিয়া, আরিফাতুল (সম্পা.), পূবোক্ত
চিং, মং ছেন		"বাংলাদেশের রাখাইন জাতির লোক, সংস্কৃতি, ফোকলোর", *ফোকলোর পত্রিকা*, বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি, ঢাকা
চৌধুরী, আব্দুল হক	১৯৯৫	"বৃহত্তর চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহের মঘ বা মারমা উপজাতি", *প্রবন্ধ বিচিত্রা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
জাঁ, উথুন অং	১৯৯২	"বাংলাদেশের উপকূলীয় রাখাইনদের জীবন সংগ্রাম", *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২১ বর্ষ : সংখ্যা-৪, জুন ১২, ঢাকা
ডি'সুজা, ব্রাদার জার্লাদ,	২০০৭	"আদিবাসীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম", দ্র. গাইন, ফিলিপ ও সাহা, পার্থ শঙ্কর, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি*, সেড, ঢাকা
তাজরীন-এ-জাকিয়া	২০১৯	"বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা", দ্র. *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, খণ্ড ৩৬, বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৫, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা
ত্রিপুরা, সুরেন্দ্রলাল	১৯৮৪	"পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজস্বের ইতিহাস", *উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, ২য় সংখ্যা, রাঙামাটি
দীপু, দীপক বড়ুয়া	২০০০	"শতাব্দীর শিল্প বিলুপ্তির পথে", *The Rakhain Review 2000*, *বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন*, কক্সবাজার
নভেদ্, রুচিরা তাবাস্সুম	১৯৯১	"বাংলাদেশের কৃষিতে প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি: অবক্ষয়ের বিবরণ", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা
নাহার, আইনুন ও ত্রিপুরা, প্রশান্ত	২০১৪	"ক্ষুদ্ররা নগণ্য থাকবে, না অগ্রগণ্য হবে?", দ্র. খাতুন, সায়েমা ও সুমন, মাহমুদুল (সম্পা.), *আদিবাসী আছে?...আছে! আদিবাসী নাম বিতর্কের প্রবন্ধ সংকলন*, সংবেদ, ঢাকা
নাসরীন, জোবাইদা	২০১৯	"সংখ্যালঘুর ভাষা রক্ষার দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের", *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৯ আগস্ট
নেভী, মং ক্য শোয়ে নু	২০০৪	"মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ", দ্র. মজিদ, মুস্তাফা, (২০০৪), *মারমা জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
ফেরদৌস, হাসান	২০১১	"আদিবাসী আমাদের প্রথম মানব", *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৩ জুন
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান	১৪১৫	"আত্মীয়-ব্যবস্থা : মেচ সমাজ", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ২০ বর্ষ ৪ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

বসু, রাজশ্রী	১৪১৫	“জ্ঞাতি-কুটুম”, দ্র. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ২০ বর্ষ ৪ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা
বেগম, খুরশিদা	২০১৩	“বাংলাদেশে তথাকথিত ‘আদিবাসী’ প্রচারণা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রশ্নসাপেক্ষ”, *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ২৮, ২৯ ও ৩০ জুলাই
বেগম, নাজমির নূর	১৯৯৭	“সামাজিক গবেষণা পরিচিতি”, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
মং, উসাং	১৯৯১	“বাংলাদেশের আরাকানী সম্প্রদায়”, *দৈনিক পূর্বকোণ*
মং-চ-উ-চৌধুরী	১৯৭৬	“পার্বত্য চট্টগ্রামের বোমাং সার্কেল”, *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ নভেম্বর, ঢাকা
মজিদ, মুস্তাফা	২০০৭	“বাংলাদেশে রাখাইন জাতির ইতিবৃত্ত ও অভিবাসন”, *প্রাঙ্গণ*, ৪র্থ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা, ঢাকা
মজুমদার, বিমলেন্দু	২০০৪	“টোটো জনজাতির আর্থ-সামাজিক বিবর্তন”, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, *আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা
....	২০০৪	“টোটো জনজাতির গ্রামসংগঠন”, দ্র. দিব্যজ্যোতি মজুমদার
মনিরুজ্জামান	১৩৯৪	“প্রান্তিক সীমায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার অবস্থান ও সংযোগ প্রকৃতি : রাক্ষাইন প্রসঙ্গ”, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-আশ্বিন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
....	২০১৮	“মারমা শব্দরূপ : ভূমিকা”, *The Dhaka University Journal of Linguistics*, Vol. 10, No. 19, Dhaka University, Dhaka
....	১৯৮৭	“সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু ভাষার সংযোগ, মিশ্রণ ও সমবিন্দুক পরিবর্তন: রাখাইন পরিস্থিতি”, *পূর্বকোণ*, ৩০ জানুয়ারি
মারমা, অং সুই	২০০৪	“মারমা ইতিহাসের উপর একটি অনুপুঙ্খ আলোচনা”, দ্র. মজিদ, মুস্তাফা, *মারমা জাতিসত্তা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
মিন্‌স, আন্না	২০১৯	“ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা চর্চা ও সংরক্ষণ”, *যুগান্তর*, ঢাকা, ৯ আগস্ট
মুমু, স্টিফেন	১৩৯৪	“আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা”, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-আশ্বিন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
মুরশিদ, গোলাম	২০১২	*হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা
মুহাম্মদ, আনু	১৯৯৩	“বাংলাদেশের জাতিগত সমস্যা : পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিপ্রেক্ষিত”
মোমেন, আবুল	১৯৯৬	*সংস্কৃতির সংকট ও সাম্প্রদায়িকতা*, সন্দেশ, ঢাকা

রব্বানী, গোলাম	২০১৩	“ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন”, দ্র. *Journal of Sociology,* Vol. 5, Issue 2, June 2013, Nazmul Karim Study Center, University of Dhaka, Dhaka
রশিদ, হারুন	২০১২	“আদিবাসী সংস্কৃতিঃ বহুমাত্রিকতা ও বহুত্ববাদ”, *ভোরের কাগজ*, ঢাকা, ২৭ মার্চ
রায়, রাজা দেবাশীষ	২০০৭	“আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অধিকার ও বাঙালি সংস্কৃতির শেকড় সন্ধান”, দ্র. গাইন, ফিলিপ ও সাহা, পার্থ শঙ্কর, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি*, সেড, ঢাকা
শরীফ, আহমদ	১৩৫৬	“ধাওরজ্য বারোজ প্রশস্তি”, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ভাদ্র-চৈত্র সংখ্যা, ঢাকা
....	১৩৭৬	“চট্টগ্রামের ইতিহাস”, *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, তৃতীয় বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ঢাকা
সরকার, জে. এন.	১৩৫৩	“মগ ফিরিংগির দৌরাত্ম”,*প্রবাসী*
সরকার, বি.	১৯৮৫	“বাংলাদেশে মগ ফিরিংগি”, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
সরদার, সীজার	২০১২	“তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক মুক্তি কোন পথে?” ইন্টারনেটঃ http://www.somewhereinblog.net/blog/cesar007/29617881
সাদ উদ্দিন, এ কে এম	১৯৮৫	“উন্নয়ন তত্ত্ব ও নব্য মার্কসবাদ” *বীক্ষণ*, ১ আগস্ট ১৯৮৫
সেন, ডি.	১৩৫৪	“চট্টগ্রামে পাঠান ও মগ রাজত্ব”, *প্রবাসী*
সেন, শুচিব্রত	২০১৬	“ট্রাইব-এর কথকতা”, খাসনবিশ, রতন ও অন্যান্য (সম্পা.), *অনীক*, ৫৩ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা
সোহরাওয়ার্দী, জি. এম.	২০১৩	“বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশঃ রস্টোর স্তর তত্ত্বের নিরিখে একটি পর্যালোচনা”, *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, খণ্ড ৩০, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা
হক, মোঃ আজিজুল	২০১১	“ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার মাতৃভাষায় বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার : সমস্যা ও সম্ভাবনা”, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৫৩ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
হাওলাদার, উত্তম কুমার	২০১১	“রাখাইনদের বৌদ্ধ মন্দির”, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (1991). *The 1991 Population Census Report,*

Bangladesh Bureau of Statistics. (2006). *Population Census-2001, Community Series Zila: Patuakhali*, Dhaka

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2011). *The 2011 Population Census Report,* BBS, Dhaka

Bangladesh Bureau of Statistics (2011). *Population and House Census, Community Report: Patuakhali*, July, Dhaka

Bangladesh Population Cencus (Barisal District), *1974,* 1981, 1991, B. G. Press, Dhaka

Bangladesh Population Cencus (Patuakhali District), *1974,* 1981, 1991, B. G. Press, Dhaka

Government of Bangladesh, (1982), *District Gazetteers: Patuakhali*, B. G. Press, Dhaka.

Population Census-2001, Community Series Zila: Patuakhali, Bangladesh Bureau of Statistics, March 2006

Population Cencus of Pakistan1951, 1961, East Bengal: Bakarganj District, BBS, Dhaka

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (২০০৬), *জাতীয় সংস্কৃতি নীতিমালা ২০০৬*, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৩ মার্চ ২০১৮

বাকেরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার, (১৯৮৪), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (২০১০), দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (২০১১), চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০১১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, (২০০৩), *বাংলা পিডিয়া* (৫ম খণ্ড), ঢাকা

প্রথম আলো, (২০১০), ৩ জুলাই, ঢাকা

প্রথম আলো, (২০১১), ২৭ জুলাই, ঢাকা

প্রথম আলো, (২০১৮), ১৩ মার্চ, ঢাকা

যুগান্তর, (২০১৯), ৯ আগস্ট, ঢাকা

রাখাইন রিভিউ, (২০০০), ভলিউম-৩, রাখাইন বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, কক্সবাজার